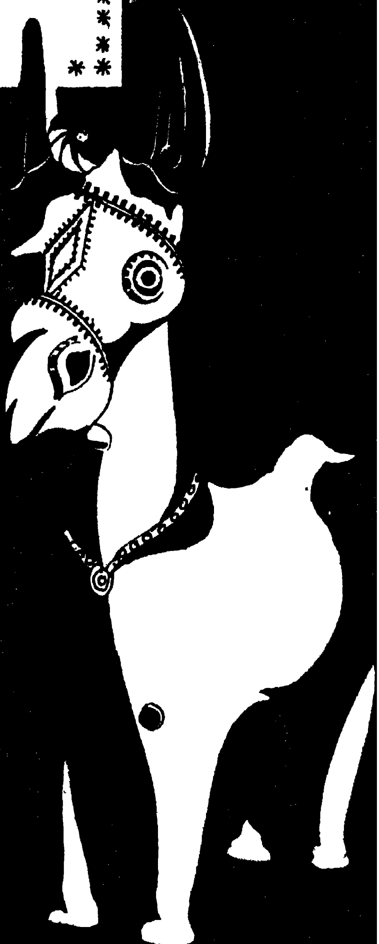
সীমান্তবাঙলার লোকযান



সীমান্তবাঙ্‌লার লোকযান

SIMANTA BANGLAR LOKAYANA

(Some aspects of regional folklore of West Bengal)

By Sudhir Kumar Karan, M. A., D. Phil.

Price : Rs. 12·00 (Rupees Twelve) only

সীমান্তবাঙলার লোকযান

শ্রীসুধীরকুমার করণ
এম এ, ডি. ফিল
অধ্যক্ষ, বালুরঘাট কলেজ

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়,
ম্যানেজিং ডিরেক্টর—
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মূল্য ১২·০০ (বারো) টাকা মাত্র

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৩৭১

প্রচ্ছদপট—শ্রীসুখেন গুপ্ত

মুদ্রাকর—শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩ লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৪

আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,
আচার্য শ্রীসুকুমার সেন,

শ্রীচরণেষু—

নিবেদন

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমসীমান্তভূমির ভৌগোলিক প্রকৃতি এবং পশ্চিমবঙ্গের সমতলভূমির ভৌগোলিক প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ ধরণের পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য কোন-না-কোন রূপে ইতিহাসকেও স্পর্শ করে; শুধু তাই নয়, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বিশিষ্টতাও এই সীমান্তভূমিতে বিশেষ ভাবে পরিদৃষ্ট হয়।

পশ্চিমসীমান্তের এই বাঙ্লাদেশ শুধু রাজনৈতিক মানচিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানচিত্র ছাড়িয়ে মনচিত্রেই এর বিস্তার। বিহারের অন্তর্গত সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমা, সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন অঞ্চল,' মানভূম থেকে বিচ্ছিন্ন ইচাগড়, চাষ, চাণ্ডিল, পটমদা, ধানবাদ প্রভৃতি অঞ্চলও মূলতঃ বাঙ্লাভাষী এবং পশ্চিমসীমান্তবাঙ্লার বাঙালী সংস্কৃতির অন্তর্গত। পশ্চিম-বাঙ্লার অন্তর্গত মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমা, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বীরভূম এবং অংশতঃ বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমা-ও এই সংস্কৃতি-পরিমণ্ডলে বর্তমান।

ভারত সরকারের সীমা কমিশনের নির্দেশে, বিহারের অন্তর্ভুক্ত মানভূম জেলার কিয়দংশ, উনিশ শ ছাপ্পান্ন খ্রীষ্টাব্দের পয়লা নভেম্বর, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই জেলাটি ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ভাষাতাত্ত্বিক প্রভৃতি নানাদিক দিয়ে নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

সীমান্তবাঙ্লার লোকযান নামক এই গ্রন্থে, পুরুলিয়া জেলাকে কেন্দ্রভূমি হিসাবে গ্রহণ করে একটি আঞ্চলিক পরিমণ্ডলের লোক-সংস্কৃতির কয়েকটি বিশেষ দিককে পরিস্ফুট করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, 'মানভূম' নামক শব্দটিকে রাজনৈতিক কারণে বিলুপ্ত করা হলেও শব্দটি এখনও জন-মানসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। শব্দটির এই অকারণ বিলুপ্তি ঘটানোর জন্য এই অঞ্চলের জনসাধারণ স্বাভাবিক রূপেই বিক্ষুব্ধ। মানচিত্রে এই নামের অস্তিত্ব না থাকলেও মানস-চিত্রে এর বিলুপ্তি ঘটেনি। তাই এই গ্রন্থের মধ্যে মানভূম নামটিকে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি।

পশ্চিমবাঙ্লার এই সীমান্ত পরিমণ্ডলের জনগোষ্ঠীর বিবিধ পর্ব-পার্বণ,

বিধি-আচার, সাহিত্য-সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে যতটুকু আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি তা' কোন ক্রমেই সামগ্রিকতার দাবী করতে পারে না। তবু, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ অনায়াসে এই ভিত্তি অবলম্বন করে সন্ধানকার্যে রত হতে পারেন, এটি আমার বিনীত বিশ্বাস।

মুখ্যতঃ বাঙলাভাষী জনগণের সংস্কৃতির কথাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু প্রসঙ্গতঃ সাঁওতাল-মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন-চিত্রও অনিবার্য রূপেই আলোচ্য গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।

সীমান্তবাঙলার সঙ্গে আমার পরিচয় মূলতঃ গ্রন্থের মাধ্যমে ঘটে নি। দীর্ঘ দিন ধরে, সীমান্তবাঙলা ও ছোটনাগপুরের সঙ্গে আমার পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে। সীমান্তবাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেই নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি।

লোকযানের বিস্তৃত পরিধির মধ্যে জনজীবনের সবকিছু তুলে ধরা সময়-সাপেক্ষ এবং দীর্ঘদিনের কাজ। এই গ্রন্থে, তা' নিশ্চয়ই সম্ভব হয়নি। আঞ্চলিক পর্ব-পার্বণ-সংশ্লিষ্ট রীতি-নীতি, লোকসংগীত ও লোক-বিশ্বাসের কয়েকটি দিকই মাত্র এখানে উপস্থাপিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি,—এই আঞ্চলিক পরিমণ্ডলের মধ্যেও সর্বত্র সমান রীতিতে লোকউৎসবগুলি পরিপালিত হয় না। তাই কোন-কোন ক্ষেত্রে উৎসববিশেষের উপ-আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকেও স্বীকৃতি দান করেছি।

সীমান্তবাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করেছে বটে, কিন্তু লোকযানের মূলতত্ত্ব এবং বহুবিধ তথ্যাদি সম্পর্কে নানা গ্রন্থের সাহায্যও গ্রহণ করেছি। বিশিষ্ট গ্রন্থাদির নাম-পঞ্জী—গ্রন্থের শেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন জেলার 'গেজেটিয়ার' ও 'হ্যানড্‌বুক' থেকে যথারীতি সাহায্য গ্রহণ করেছি। বিশেষ ক'রে, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম, রাঁচি প্রভৃতি জেলার 'গেজেটিয়ার'গুলি থেকে আমি প্রভূত উপাদান গ্রহণ করেছি। যে-সমস্ত পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্যের এবং তত্ত্বের সাহায্য লাভ করেছি, তা'র মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল পেপার্স, ম্যান ইন্ ইণ্ডিয়া, জার্নালস্ অফ এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, ইণ্ডিয়ান ফোক্‌লোর প্রভৃতি মুখ্য। 'মেমোয়েরস্ অফ এসিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল'-ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এ বিষয়ে, জ্ঞানবারিধি আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য সুকুমার সেন, ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ শিক্ষাগুরুগণ আমাকে বহুবিধ উপদেশ দানে ধন্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে গভীর বেদনার সঙ্গে স্বর্গত আচার্য শশিভূষণ দাশগুপ্তের কথা স্মরণ করছি। এই গ্রন্থটির প্রকাশনা ব্যাপারে তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল।

আমার ঋণের সীমা নেই। সারা সীমান্তবাঙ্‌লার খ্যাত-অখ্যাত বহু ব্যক্তি আমাকে সস্নেহ-ঋণে আবদ্ধ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থটি যেন তাঁদেরই রচনা, আমি লিপিকর মাত্র। আমার সেই উত্তমর্ণদের কাছে আমি চিরঋণী।

বৈদ্যনাথধামের প্রধান মোহান্ত সদুপাধ্যায় ভবপ্রীতানন্দ ঝা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর রচিত ঝুমুর সংগীত আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, লোক-কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি এই অঞ্চলে অসামান্য। তাঁর গানের সঙ্গে জনসাধারণের আন্তরিক সংযুক্তি বিস্ময়কর। তাঁকে আমার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

পুরুলিয়া জগন্নাথ কিশোর কলেজের ইংরাজীভাষার প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধ বসুরায় এম্. এ., এবং আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীরবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্. এ. তাঁদের সংগ্রহ থেকে আমাকে সংগীত গ্রহণের সুযোগদান করেছেন। টুসু-সম্পর্কিত কাহিনী এবং বহুবিধ তথ্যের জন্য আমি শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর মাহাতো, বি. এ. বি.টি.-র নিকট ঋণী। শ্রীযুক্ত ধনপতি সিংহদেব (নরসিংগড় রাজবাটী), বিষ্ণুপদ দাশ প্রমুখ লোককবিগণ তাঁদের রচিত গান পাঠিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। সংগীত সংগ্রহের ব্যাপারে শ্রীমান কালিরাম সরেন, বি. এ, শ্রীমান বিনয় মাহাতো, বি. এ, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মাহাতো এবং আরো অসংখ্য সুহৃদের কাছে আমি ঋণ স্বীকার করছি। ঝাড়গ্রাম মহকুমার অধিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ সাঁতরার কথাও এই প্রসঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করছি।

এঁদের সকলের কাছে আমি আন্তরিক ভাবেই আমার প্রীতি নিবেদন করছি।

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত আলোক-চিত্রগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর প্রবোধচন্দ্র ভৌমিক তাঁর সংগ্রহশালা থেকে দান করে আমাকে গভীর কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

প্রখ্যাত গ্রন্থ-প্রকাশক শ্রীযুক্ত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রকাশনার দায়িত্ব বহন করেছেন। তাঁকে এবং এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং-র কার্য-নির্বাহকমণ্ডলীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ইতি—

পুরুলিয়া।

বিনীত
সুধীর করণ

সূচীপত্র

আদিপর্ব

মধ্যপর্ব

[পর্ব-পার্বণ]

অনুপর্ব

লোকসংগীত সংকলিকা

[আদি পর্ব]



গেরাম-থান (গ্রাম দেবতার স্থান)



গ্রাম দেবতার আর একটি 'থান'



গ্রাম-থানের আর একটি ছবি



সর্প-বিদ্যা-বিশারদ 'গুণী' ও চেলা



বাঁধনা পরবের আয়োজন



বাঁধনা পরবের একটি দৃশ্য



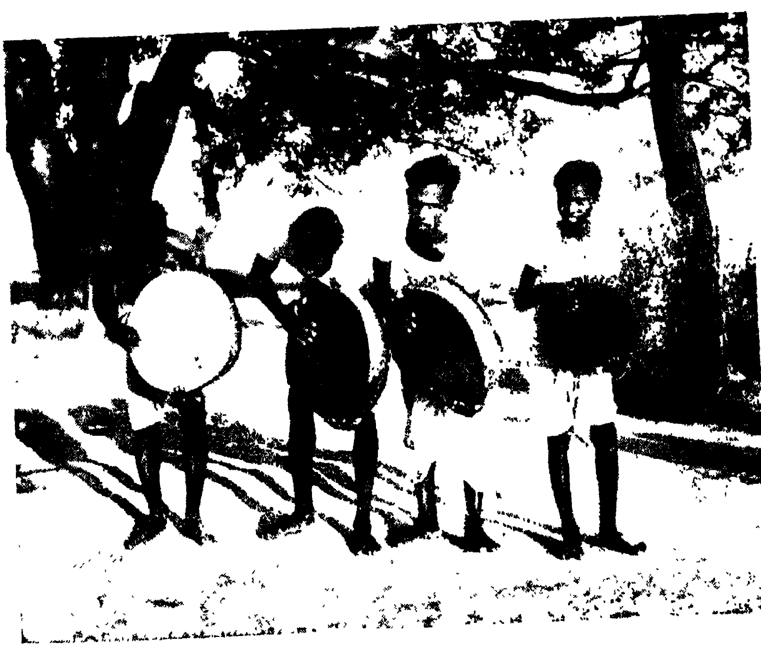
বাঁধনা পরবের আর একটি চিত্র



সীমান্তবাঙলার নৃত্যগীতের একটি দৃশ্য



সাঁওতালী নাচ



লোধা-শবরদের চাঙল বা চাঙু নাচ



নৃত্যের আঙিনায় মুণ্ডা উপজাতি



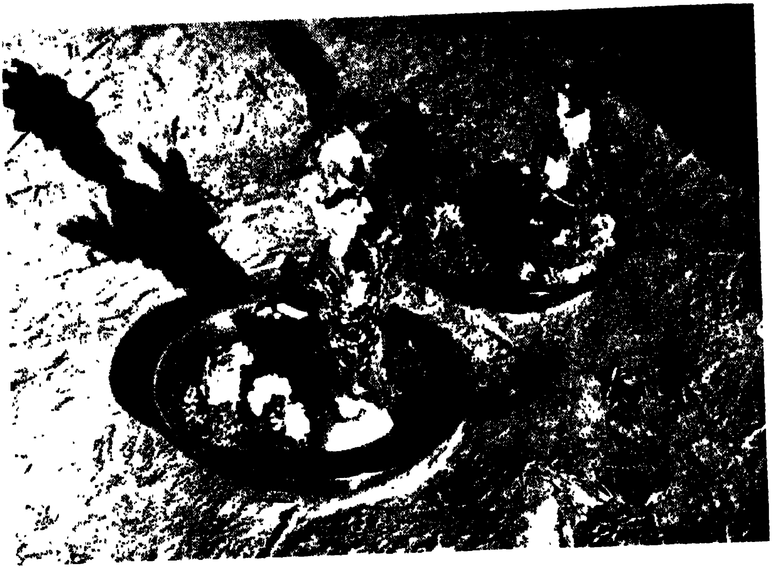
করম পরবের দৃশ্য



সীমান্তবাঙলার নৃত্যগীতের আরেকটি দৃশ্য



টুসুর মূর্তির সামনে গ্রামীণ মেয়েরা



টুসুর মূর্তি



পল্লী উৎসবের নৃত্যগীত

লোকযান

।। এক ।।

ইংরাজী 'ফোকলোর' শব্দটিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার মতো কোন ভারতীয় প্রতিশব্দ আজও সুপ্রচলিত হয়নি। 'লোক-সংস্কৃতি' বা 'লোক-কৃষ্টি' নাম দিয়ে অনেক সময় কাজ চালানো হয় বটে, কিন্তু তাতে 'ফোকলোর' শব্দের অভিধা সংকুচিত হয়ে পড়ে, এবং তার অন্তর্নিহিত অর্থ কোন ক্রমেই বিকশিত হতে পারে না। লোকচর্যা নাম দিয়ে এই শব্দ-দৈন্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করা যেতে পারে, এর ফলে, আর যাই হোক 'আচার-আচরণের', একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গোড়ার দিকে সিদ্ধাচার্যদের যে সমস্ত গান বর্তমান ছিল, সে সমস্ত গানকে 'চর্যা' বা 'চর্যাপদ' নামেই অভিহিত করা হয় এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জগতে 'চর্যা' কথাটি এতো বেশী প্রচলিত যে, তার পক্ষে অন্যার্থ পরিগ্রহণ করা সহজসাধ্য হবে না। অবশ্য, 'চর্যা'র আদিতে 'লোক' শব্দটিকে সংযুক্ত করে 'লোকচর্যা'কে 'ফোকলোর'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে যুক্তির অভাব হবে না; বরং 'চর্'-ধাতু-সঞ্জাত 'আচরণ' শব্দটি এক্ষেত্রে 'লোকাচরণে'র বিশেষ একটি দিককে উদ্ভাসিত করার পক্ষে সহায়ক হ'তে পারে।

কিন্তু, এই শব্দদৈন্যের হতাশা থেকে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার আমাদের রক্ষা করেছেন। 'ফোকলোর' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে তিনি 'লোকযান' শব্দটি নির্মাণ করেছেন।* 'লোকযান' শব্দটি সর্বতোভাবে সর্বভারতীয় মর্যাদা লাভের উপযোগী। 'যান' শব্দটির মূলে 'যা' ধাতুর অধিষ্ঠান; এর মধ্যে গতিশীলতার প্রবাহ রয়েছে। মহাযান, হীনযান, বজ্রযান, দেবযান প্রভৃতি

---

* "I think, Loka-Yana would be a good Indian equivalent in imitation of Maha-Yana, Hina-Yana, Vajra-Yana, etc. in as much as it means 'A way of life (Yana) among the People (Loka) which is carried down by tradition without any book-learning and sophistication.' "

Indian Folk-Lore—Vol. I, Part I,
April, 1956

বিশিষ্টার্থক শব্দগুলির মতো 'লোকযান' শব্দটিও জীবনচর্যার বিশেষ একটি দিকের বিশিষ্ট অর্থ বহন করার যোগ্যতা রাখে। শুধু তাই নয়, 'ফোকলোর'-এর চরিত্র বিশ্লেষণ করে এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোকযান'কেই সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া যুক্তিযুক্ত। ইংরাজী 'লোর' শব্দটির অভিধাগত অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। যান শব্দের অর্থ প্রসারণও এক্ষেত্রে গ্রহণীয় এবং 'জীবনচর্যা'র একদিক (a way of life) হিসাবে 'যান' শব্দের যে যোগ্যতা, তা 'লোকযানে' আরো বেশী সমঞ্জস ও অর্থবাহক হবে ; তখন 'লোকযান-এর' অর্থই হবে 'জীবনচর্যা'র এক দিক (a way of life of the people)। বলা বাহুল্য, মহাযান, হীনযান, বজ্রযান, দেবযান প্রভৃতি শব্দগুলিও বিশেষ বিশেষ চিন্তাধারাকে বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করে। 'যান' শব্দটি এদের ক্ষেত্রেও 'এ ওয়ে অফ্ লাইফ'্ (a way of life)।

ফোকলোর শব্দটির অভিধাগত অর্থ, জনসাধারণের শিক্ষা (learning of the people)। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ডব্লিউ. জে. টমাস্ শব্দটি গ্রহণ করেন এবং 'popular antiquities' (জনপ্রিয় পুরাতনী) শব্দের পরিবর্তে প্রচলন করেন। ক্রমে ক্রমে এই শব্দটি আন্তর্জাতিক শব্দরূপেই স্বীকৃতি লাভ করে।

লোকযান শব্দটির বৃহৎ পরিবেষ্টনীর মধ্যে 'লোক' সম্বন্ধীয় প্রায় সবকিছুই এসে পড়ে। সাধারণ মানুষের যুগ-যুগান্তরের বিশ্বাসধারা, তাদের আচার-আচরণ, ক্রিয়া-অনুষ্ঠান, এবং গানগল্প প্রবচন প্রভৃতি মানস-সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ রূপ, এর অঙ্গীভূত। সি. এস. বার্নের ভাষায়, "It covers everything which makes part of the mental equipment of the folk as distinguished from their technical skill."*

সাধারণতঃ 'সংস্কৃতি' এবং 'লোকসংস্কৃতি' বলতে দুটি বিশিষ্ট স্তরের কথা আমাদের মনে পড়া স্বাভাবিক। 'লোকযান'এর মধ্যে এই স্তরভেদের কোন বিভাজ্য রূপ কল্পনা করার অবকাশ নেই। মানসচর্যার অগ্রগমনের সংগে সংগে সৃষ্টিক্ষমতার এমন এক পর্যায়ে মানুষ উন্নীত হতে পারে যেখানে শিল্প-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতির এক চূড়ান্ত রূপের ইংগিত পাওয়া যায় ; এবং সংস্কৃতি বলতে আমরা সেই উচ্চমার্গের সৃষ্টিফলকেই বুঝে থাকি। এই সংস্কৃতিকেই কেউ কেউ বলেছেন : the essence of civilization—সভ্যতার নির্যাস। কিন্তু লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সংজ্ঞাকে গ্রহণ করা হয় না। বস্তুতঃ

* **A Handbook of Folklore—C. S. Burne.**

এখানে মার্গভেদেরই প্রশ্ন ওঠে। 'সংস্কৃতি' বা 'কালচার' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু একমাত্র: নৃ-তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতেই শব্দটির অর্থগত ব্যাপকতা স্বীকৃত।

জনজীবনের সাধারণ কৃতির উপরেই লোকসংস্কৃতির নির্ভরশীলতা। তার মধ্যে অকৃত্রিমতা যেমন সত্য, অগ্রজের আদিম বিশ্বাসও তেমনি সত্য। পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে লোকসংস্কৃতি সংস্কারবাদী এমনকি অনেক ক্ষেত্রে কুসংস্কারবাদী। এর অনেক কিছুই চর্চা-নিরপেক্ষ, প্রায় সব কিছুই ধারাবাহিক। আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব-ব্যসন থেকে সুরু করে, মানুষের প্রতিদিনের ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে এই লোকসংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য একথা বলে দেবার প্রয়োজনীয়তা নেই যে, মানুষের সবকিছু আচার-আচরণই লোকসংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত নয়। শস্য উৎপাদনের জন্য জমিতে ধান্য রোপণ করা লোকসংস্কৃতির অঙ্গ নয়; ধান্য রোপণের পূর্বে ক্ষেত্র-দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে অনুষ্ঠান তা-ই লোকসংস্কৃতির অংশ। পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করা লোকসংস্কৃতির পর্যায়ে পড়ে না, কিন্তু পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাকল্পে পূজার্ঘ্য প্রদান বা পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটি খুঁটি পুঁতে দেওয়া এর অংশবিশেষ। লোকসংস্কৃতি, সাধারণতঃ, অন্ধবিশ্বাসকে অনুসরণ করে। লোকসংস্কৃতিকে তাই ব'লে সম্পূর্ণরূপে আদিম সংস্কৃতির পর্যায়ে ফেলা যায় না,—যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কারণে, কোন কোন গোষ্ঠীর (tribe) মধ্যে আদিম পর্যায়ের আচার-আচরণ, বিশ্বাস-কৃতি প্রভৃতি থেকে যায়। আসলে জনজীবনের চিন্তাধারার মধ্যেও অনগ্রসর লোক-বিশ্বাসাদির চিহ্ন অনিবার্যভাবেই কিছু কিছু থাকে। বলা বাহুল্য, লোকসংস্কৃতি উচ্চমার্গের সংস্কৃতির পরিপন্থী না হয়েও বেঁচে থাকতে পারে এবং মূলতঃ লোকসংস্কৃতির সোপানে পদক্ষেপ করেই উচ্চমার্গে আরোহণ করা সম্ভবপর হয়, যদিও আরোহণ করার পরে সোপান-শ্রেণীকে আর মনে রাখার কোন প্রচেষ্টা থাকে না।

খুব খুঁটিনাটি বিচার বিশ্লেষণ না করলে সাধারণতঃ লোকযান এবং লোকসংস্কৃতিকে অভিন্ন মনে হতে পারে। একথা অবশ্যই সত্য যে, এ দুইয়ের মধ্যে গুরুতর পার্থক্যের কোন অবকাশ নেই। শুধু তাই নয়, এরা ভিন্ন হলেও অভিন্ন-হৃদয়। 'সংস্কৃতি' শব্দটির একটি সাধারণ সংজ্ঞা আছে বলেই এবং শব্দটির মাধ্যমে সম্যক্-কৃতির বিশেষত্ব আছে বলেই,—শব্দটির আদিতে 'লোক' শব্দ সংযোগ করেও তার কোন-না-কোন বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের ঝোঁক।

এমনকি, লোক-সংস্কৃতিকে আমরা লোকযানের নির্যাস রূপেও গ্রহণ করতে পারি। যার ফলে এও স্বীকার করতে হয় যে, লোকসংস্কৃতি পুরোপুরি গ্রহণধর্মী নয়; বর্জন করার অধিকার তার আছে; সর্জনের প্রতিভাও তার আছে। মানসচর্চার আনন্দময় পরিপ্রেক্ষার মধ্যে এর সার্থকতা। আর লোকযান সম্পর্কে শুধু এই কথাই বলা যেতে পারে যে এর মধ্যে নির্বাচনী বৃত্তি নেই বললেও চলে। জনজীবনের সংগে সম্পৃক্ত প্রায় সবকিছুই লোকযানের পর্যায়ে আসতে পারে।—চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রভৃতির মধ্যেও যে আচার-আচরণ বর্তমান, তার অনেক কিছুই লোকযান কর্তৃক স্বীকৃত। লোকযানের মধ্যে আদিম চিন্তাধারার একটি সজীব প্রবাহ বর্তমান। ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজগঠন, উৎসব-পার্বণ, পূজা-আচার, সংগীত-ক্রীড়া-নৃত্যকলা, কথা এবং উপকথা প্রভৃতি বিষয়ে আদিম মানুষের আদিম চিন্তাধারাই হচ্ছে লোকযানের বিষয়বস্তু, এবং সে আদিমতা সভ্য, সংস্কৃত সমাজের মধ্যেও আত্মগোপন করে থাকতে পারে। এর মৃত্যু নেই। আপাতদৃষ্টিতে লোকযানকে কোন কোন সমাজে খুঁজে পাওয়া না গেলেও, সেই সমাজের বিশ্লেষণে তাকে পাওয়া যেতে পারে। চার্ল্‌স্ ফ্রান্সিস্ পটারের "Folklore is a lively fossil which refuses to die"—এই কথাটি লোকযানের চরিত্রকে বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট করেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সভ্যতার বর্তমান স্তরে উপনীত হওয়ার পূর্বে মানুষকে অনেক অনেক স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। জ্ঞানের উজ্জ্বল শিখা একদিনেই তারা লাভ করেনি, যুগ যুগ ধরে মানস চর্চার মাধ্যমেই তা সম্ভবপর হয়েছে। মস্তিষ্কের সাহায্য নিয়ে আদিম মানুষ যখন প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করতে শেখেনি তখন, অজ্ঞাতকে না জানার যে ভয়, সেই ভয় থেকেই এমন সব বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়েছিল, যা বর্তমান যুগের সভ্য মানুষের মন থেকেও সম্পূর্ণরূপে মুছে যায়নি। পরিবেশ এবং প্রতিবেশ সম্পর্কে মানুষের আদিম বিশ্বাসকেই লোকযানের প্রথম অধ্যায় হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। পৃথিবীর সব কিছুর সম্পর্কে মানুষের যে অযৌক্তিক বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসই লোকযানের পর্যায়ভুক্ত। দেবতা-অপদেবতা, ভূত-প্রেতের সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিকথায়, আধি-ব্যাধির কারণ নির্ণয়ে আদিম মানুষের যে মনস্তত্ত্ব, সেই মনস্তত্ত্বই লোকযানের মুখ্য বিষয়।

নানা আচার-আচরণের মাধ্যমে এই সমস্ত কুসংস্কারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শনের রীতিনীতিও এর অন্তর্ভুক্ত। আচার-আচরণের পরিবর্তন যাতে

ঘন ঘন সংঘটিত হতে না পারে,—সেইজন্য প্রথার শৃংখলে এই সমস্ত আচার-আচরণকে বেঁধে রাখার প্রয়োজনীয়তা হয়। সমাজ সংগঠন, ব্যক্তিক অধিকার ও ক্রিয়াচার, পূজাপার্বণ, বারব্রত প্রভৃতির পক্ষে প্রথানুগ যে বিধি-নিষেধ, যা উত্তরাধিকারের মতোই যুগের পর যুগ ধরে মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে তা লোকযানেরই বিষয়ীভূত।

এসব ছাড়া লোকযানের আর একটি বিশেষ দিক আছে যা 'লোকসাহিত্য' নামের বহির্বাসে নিজের অংগ আচ্ছাদিত করেছে। লোকসৃষ্টির এ এক বিশিষ্ট পর্যায়। অনেক সময় ইংরাজী 'ফোকলোর' শব্দটি নিজের অর্থ সংকোচন ঘটিয়ে 'লোকসাহিত্য' রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। লোকযানের এই অধ্যায়টি ব্যক্তিমানস ও সমাজমানসের সৃষ্টিধর্মী কবিত্বকে এমন অভিন্নভাবে বহন করে যে, ব্যষ্টিগত সৃষ্টিও ব্যষ্টিকে ছাড়িয়ে সমষ্টিগত সৃষ্টিরূপেই বিকশিত হয়। লোকসংগীত, লোকনৃত্য, প্রবাদ, প্রবচন, উপকথা প্রভৃতি লোকযানের এই শিল্পকৃতির পর্যায়ভুক্ত।

লোকযানের বিষয়বস্তুকে এই ভাবে ছক কেটে দেখানো যেতে পারে :—

প্রথম : **বিশ্বাস ও আচরণ :—**

(১) পৃথিবী ও আকাশ সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও তৎসম্পর্কিত আচরণ ;

(২) জীবজগৎ ও তরুলতা সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও আচরণ ;

(৩) আত্মা ও পরলোক সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও আচরণ ;

(৪) মানব-অতিমানব, দেবতা-অপদেবতাদি সম্পৃক্ত বিশ্বাস ও আচরণ ;

(৫) যাদুবিশ্বাস, শুভাশুভ লক্ষণ-বিশ্বাস, দেবদেবীভর-প্রাপ্তিতে বিশ্বাস এবং তৎসম্বন্ধীয় আচরণ ;

(৬) মূর্তিগঠন প্রভৃতিতে বিশ্বাস ও তৎসম্পৃক্ত আচরণ ;

(৭) আধি ব্যাধি প্রভৃতির কারণ সম্বন্ধীয় বিশ্বাস ও আচরণ।

দ্বিতীয় : **রীতি-নীতি ও প্রথা :**

(১) সমাজ সংগঠনের রীতি-নীতি ও প্রথা ,

(২) ব্যক্তিগত ক্রিয়াচার ;

(৩) পেশা এবং ব্যসনাদি সম্পর্কে রীতি-নীতি ও প্রথা ;

(৪) দিন-ক্ষণ, তিথি-নক্ষত্র, বার-ব্রত, উপবাস পর্বপার্বণের রীতি-নীতি ও প্রথা ;

(৫) ক্রীড়া ও ব্যসন সম্বন্ধীয় রীতি-নীতি ও প্রথা।

তৃতীয়ঃ **লোকসাহিত্য** ঃ

(১) কাহিনী ;

(২) সংগীত ও গাঁথা ;

(৩) প্রবাদ ও প্রবচন ;

(৪) ছড়া ও ধাঁধা প্রভৃতি।

চতুর্থঃ **লোকনৃত্য**।

॥ দুই ॥

অধুনা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই লোকযান চর্চার বিশেষ আগ্রহ পরিদৃষ্ট হচ্ছে। ইউরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বিজ্ঞানসম্মত ভাবে লোকযান চর্চার দিকে সুধীজনের দৃষ্টি পড়ে। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, বিংশ শতাব্দীতে লোকযান চর্চার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

এই আগ্রহের মূলে ঠিক কি ধরণের মনোবৃত্তি ক্রিয়াশীল, তা হয়তো হঠাৎ বলা যায় না। হয়তো সংগুপ্ত অতীতের প্রতি আমাদের আনুগত্যই এর মূলে। সভ্যতা যত্ই অগ্রসর হচ্ছে মানুষের জীবনে ততই জটিলতা দেখা দিচ্ছে। জীবনযাত্রার কৃত্রিম আবেষ্টনী মানুষকে পীড়িত করছে নিশ্চয়ই। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জাতীয় জীবনের মধ্যে এমন এক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে যার ফলে চিরাচরিত প্রথানুগ জীবনযাত্রা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। ইউরোপে তা অনেক আগেই ভেঙেছে। আমাদের সমাজেও তার সূচনা হয়ে গেছে। ভারতবর্ষ অনেকক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে সংস্কারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলেই, তার জীবনধারার মধ্যে মোটামুটিভাবে একটা গতানুগতিক স্থবিরতা চলে আসছিল। ফলে লোকযান চর্চার দিকে আমাদের দৃষ্টিকে আমরা নিক্ষেপ করতে পারিনি। বলা বাহুল্য, লোকযান চর্চা উন্নত সমাজের পোষ্য এবং সভ্য সমাজের মানুষের প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল রূপে গৃহীত হলেও প্রাক্-পৌরাণিক জীবন-সারল্যের দিকে দৃষ্টিপাতের প্রয়োজনীয়তা হয়তো উপলব্ধ।

সভ্যতা বা সংস্কৃতির প্রগতির সংগে সংগে জীবনের নানাবিধ মান যে ভাবেই বদলে যাক্ না কেন প্রথাসিদ্ধ আচার-আচরণ তার মধ্যেও কিছু কিছু বেঁচে থাকে। সেই আদিম জীবন-চর্চার যতোটুকু অংশ সভ্য জীবনধারার

মধ্যে আজও পাওয়া যাচ্ছে ততোটুকুকেই যদি সুষ্ঠুভাবে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তা হলে মানুষের ইতিহাস চর্চা সুপুষ্ট হবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ যে উচ্চমার্গীয় সংস্কৃতির সন্ধান লাভ করছে তার সংগে যদি লোকযানের কুসংস্কারকে বাদ দিয়ে তার অকৃত্রিম সারল্যকে সংযুক্ত করতে পারে তা, হলে হয়তো বা জীবনের জটিলতা কমতে পারে।

যাই হোক একটা কথা মনে রাখতে হবে, লোকযান অতীত নয়, পরিত্যক্ত অতীতের সজীব ভগ্নাংশ—"Relics of an unrecorded past." এই সজীব ভগ্নাংশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি সংকুচিত থাকলে, ক্ষতির পরিমাণ অনিবার্যভাবেই বেড়ে যাবে। রবীন্দ্রনাথের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এ প্রসংগে স্মরণ করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ বস্তু সম্পর্কে আমাদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তির অভাবের কথা তিনি বলেছিলেন বহুদিন আগে। আমাদের দেশের স্বরূপকে উপলব্ধি করার জন্য দেশের জনগণের আচার-আচরণ ও মানসিকতার সংগে আমাদের পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁর এক ভাষণে এই কথা উপলব্ধি করার জন্য মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'বাঙ্‌লায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোন খবরই রাখেন না। তাঁহারা একথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায়, অলক্ষ্য গতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া পথে তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে, নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই। সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য তাহা আমি বলি না,—যেখানেই হউক না কেন মানব সাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে—পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতে পারে না।"···"আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnology-র বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে ডোম কৈবর্ত পোদ বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য

আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনি বুঝিতে পারি পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কতো বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কতো বড় মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদি নিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না।”

বলা বাহুল্য, লোকযানের মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের সেই আদি নিকেতনেই প্রবেশ করি।

সীমান্তবাঙ্‌লার পরিচয়

॥ এক ॥

ভাষাতত্ত্বের কয়েকটি সূত্র থেকেই ভারতীয় আর্য ভাষার সংগে ইউরোপীয় ভাষাবর্গের আত্মীয়তা প্রমাণিত। কিন্তু নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে ভারতবর্ষের আর্য-ভাষী জনগোষ্ঠীর সংগে ইউরোপীয় আর্য-ভাষী জনগোষ্ঠীর একটি স্পষ্ট পার্থক্য প্রতীয়মান। ভারতবর্ষে আর্য ও প্রাগার্য ভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের মধ্যেই ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণতা।

এদিক দিয়ে, বাঙ্‌লাদেশের ভাষাতত্ত্ব-নৃতত্ত্ব আমাদের কাছে সমন্বয়বাদের একটি স্পষ্ট ইঙ্গিতের ধারক। সীমান্তবাঙ্‌লায় এই ইঙ্গিত স্পষ্টতর।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউ-এন্-ৎসাঙ্ চীনদেশ থেকে এদেশে আসেন। বাঙ্‌লাদেশ পরিভ্রমণের সময় তিনি গৌড়-বঙ্গ-কামরূপ-রাঢ়ে প্রায় একই ভাষা শুনেছিলেন এবং সেই ভাষা পূর্বমাগধী-জাত অপভ্রংশ বলেই ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের অভিমত। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, হিউ-এন্-ৎসাঙ্ অন্ততঃ মোটামুটি ভাবে গৌড়-বঙ্গ-কামরূপ-রাঢ়ের ভাষা বুঝতেন, এবং ঐ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কোথাও তিনি অস্ট্রিকভাষী বা দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাননি। এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বেই বাঙ্‌লাদেশের অস্ট্রিকভাষী এবং দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠী আর্যভাষা গ্রহণ করেছিল।

বৈদিক যুগে, বাঙ্‌লাদেশে আর্যজাতির আর্যভাষী মানুষের কোন উপনিবেশ ছিল কি না, এ সম্পর্কে সুষ্ঠু প্রমাণ কিছু নেই। মৌর্যযুগেই বাঙ্‌লাদেশে প্রথম আর্য-উপনিবেশের সূত্রপাত বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত।

অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ভাষী নরবর্গের ভাষা ও সংস্কৃতির সংগে আর্যভাষী নরগোষ্ঠীর মিলনেই এক নবসংস্কৃতির জন্ম ঘটেছিল এ দেশে। এই সংস্কৃতিকে বংগজন-সংস্কৃতির আদিরূপ বলতে পারি। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের মধ্যে,—সমন্বয়ের ইতিহাসের মধ্যে—বাঙালী জাতির মৌলিক পরিচয় নিহিত।

বাঙ্‌লাদেশের অস্ট্রিকভাষী এবং দ্রাবিড়ভাষী গোষ্ঠীরা কালক্রমে নিজেদের ভাষা পরিত্যাগ করে এবং আর্যভাষা গ্রহণ করে বৃহত্তর বাঙালী সংস্কৃতির সংগে একীভূত হয়েছে। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া, বাঙালী জাতি ও

বাঙ্লাভাষার স্বরূপ সহজে আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। তবে, আমাদের নানাবিধ আচার-আচরণ এবং ধর্মচর্চার মধ্যে অষ্ট্রিকভাষী এবং দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠীর দান যে নিহিত, এ কথা সংস্কৃতি-বিজ্ঞানীরা প্রমাণিত করেছেন। এ বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানীদের দান অসামান্য। ভাষাতত্ত্বের মূল সূত্রগুলি আমাদের কাছে বাঙ্লা ভাষার মধ্যস্থিত অষ্ট্রিক প্রভৃতি ভাষাবর্গের সংগুপ্ত স্বরূপটি উন্মুক্ত করে দেয়। কোল-মুণ্ডা, খাসি-নিকোবরী এবং মোন্-খ্মের প্রভৃতি অষ্ট্রিক ভাষাগুলি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আজও প্রচলিত। বাঙ্লাদেশে কোল-মুণ্ডা গোষ্ঠীর প্রভাবই বেশী পরিমাণে বিদ্যমান ছিল বলে মনে হয়। বাঙ্লা-ভাষার নানা দেশী শব্দে এই অষ্ট্রিক ভাষার নিদর্শন আজো সংরক্ষিত।

হেমচন্দ্রের 'দেশীনামমালা'য় অসংখ্য অসংস্কৃত শব্দ সংগৃহীত আছে। তাতে ভারতীয় আর্যভাষায় অন্-আর্য ভাষার অনুপ্রবেশের তথ্যই স্বীকৃতিলাভ করেছে। 'দেশীনামমালা'য় উদ্ধৃত কিছুকিছু শব্দ বাঙ্লা-দেশী শব্দের সংগে মেলে; কিন্তু এ বিষয়ে বাঙ্লাদেশের মৌলিকতা যথেষ্ট। বাঙ্লাভাষায় অষ্ট্রিক ভাষার সংখ্যা মোটেই অল্প নয়। কয়েকটি পরিচিত শব্দের উদাহরণ দিচ্ছি—

কুড়ি, কাড়া, কলি, কানি,
খুঁটি, খোকা, খোস, খড,
গড, চোঙ্, চ্যাঙ্, ছাঁচ,
ছোট, ঝোপ, ঝিঙ্গা, ঝাড়,
টঙ্, ঠ্যাঙ্, ডিঙ্গা, ঠোঁট,
ডাঙা, ডাব, ডিম, ঢিল,
ঢিপি, ঢাক, ঢেঁকি, ঢোল,
পাগল, পগার, পেট,
বাদুড়, বাঁখারি, ব্যাঙ্,
বরজ, বোয়াল, বাসি,
মুড়কি, হুড্রুম, মেড়া।

বলা বাহুল্য, এতেই অষ্ট্রিক বা অনুরূপ শব্দসমষ্টির শেষ হলো না।

বাঙ্লাদেশের অঞ্চলভেদে আবার অষ্ট্রিকভাষার শব্দসংখ্যা সাধারণ বাঙ্লা ভাষায় অনেক বেশী ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমসীমান্ত বাঙ্লায় এর নিদর্শন অনেক। সাধারণ বাঙ্লাভাষায় আর একজাতীয় শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শব্দগুলি

মূলতঃ অন্-আর্য ভাষার-ই, কিন্তু সংস্কৃতে পরিগৃহীত হয়ে তৎসম বা তদ্ভব শব্দরূপেই বাঙলাভাষায় তাদের আবির্ভাব। এই প্রসঙ্গে, অম্বু, কপি, কাল, পূজা, ঘোড়া, তিন্তিড়ী, হেরম্ব [দ্রাবিড় ভাষার শব্দ] এবং কদলী, কম্বল, কার্পাস, কন্দ, বাণ, পণ, তাম্বূল [অস্ট্রিক ভাষার শব্দ] প্রভৃতি শব্দগুলিকে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। এ ছাড়া-ও আমড়া (অম্বাড়), পিঁপড়ে (পিম্পড়ী), বোঁটা (বোণ্ট), পেড়া, পেড়ী (পেটক) প্রভৃতি শব্দগুলিও এ ক্ষেত্রে বিচার্য।

বাঙলাদেশের অনেক স্থান-নাম প্রাচীন অস্ট্রিক-ভাষীদের অবস্থিতির অভিজ্ঞান। কালক্রমে এই নামগুলি-ও ভাষাতত্ত্বের সহজ নিয়ম অনুসরণ করেই কিছুটা রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে তা' অবিকৃত রূপেই আছে। বাঙলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতি সমন্বয়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ তথ্য আমাদের অজ্ঞাত নয়। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অন্-আর্য ভাষারও যে আর্যীকরণ হয়নি, তা নয়। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্ট্রিক ভাষার শব্দগুলি অপরিবর্তিত রূপে অথবা ঈষৎ-পরিবর্তিত রূপে বিদ্যমান। হাওড়া, চুঁচুড়া, রিষড়া, বগুড়া প্রভৃতি শব্দগুলি অপরিবর্তিত রূপেই বর্তমান বলে পণ্ডিতদের অভিমত।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং তারও পূর্বে রচিত গ্রন্থে এবং ভূমিদানপত্রে অনেক স্থানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। স্থান-নামগুলি যে অন্-আর্য ভাষা থেকে জাত, তা' সহজেই অনুমান করা যায়। আচার্য সুকুমার সেন 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এই ধরণের কয়েকটি স্থান-নামের উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণ :—

অম্বয়িল্লা (আধুনিক 'আমিলা' আমলে)
কুডুম্ববা (আধুনিক 'কুডুম্বা')
বাল্লহিট্‌ঠা (আধুনিক 'বালিঠা', 'বালিটে')
বেতড্ড (আধুনিক 'বেতড়')
মোড়ালন্দী (আধুনিক মুড়ুন্দী)।

বাঙলাদেশের গ্রাম-নাম সম্পর্কিত কোন প্রামাণ্য গ্রন্থের সন্ধান আমার জানা নেই। এ বিষয়ে বিশদ্ আলোচনা হ'লে বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক পটভূমির বিচিত্র ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবাঙলার পশ্চিমসীমান্তবর্তী অঞ্চলের গ্রাম-নামসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত

করলেই উক্ত অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক স্বতঃই প্রতীয়মান হবে। মূল অস্ট্রিকভাষী সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, বীরহড়, মাহ্‌লী, কোড়া প্রভৃতি উপজাতির অন্তরঙ্গ ভূমি হিসাবেই এই অঞ্চলের অবস্থিতি। যে সমস্ত উপজাতি বর্তমানে অস্ট্রিকভাষাকে বর্জন করে সীমান্তরাঢ়ী বাঙ্‌লাকে গ্রহণ করেছে তাদের সংস্কৃতিতে-ও পূর্ব-ঐতিহ্য বর্তমান। ভূমিজ, লোধা, খাড়িয়া এবং অন্যান্য বাঙ্‌লাভাষী উপজাতিদের সংখ্যা এ সব অঞ্চলে অল্প নয়। সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রাথমিক পর্যায়গুলি এখানে সহজ-দৃষ্ট। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চল, সিংভূমের ধলভূম পরগণা, পশ্চিমসীমান্ত বাঁকুড়া-বর্ধমান-বীরভূম, সাঁওতালপরগণার কিয়দংশ এবং সমগ্র মানভূম জেলা (পুরুলিয়া ও ধানবাদ) ভাষাতত্ত্বের বিচারে বাঙ্‌লাভাষী, কিন্তু সাংস্কৃতিক-পরিমণ্ডল রূপে বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। এই পরিমণ্ডলের গ্রাম-নামগুলির অধিকাংশই অন্‌-আর্য ভাষা-সম্ভূত। তৎসম বা তদ্ভব শব্দের সঙ্গে দেশী শব্দ বা প্রত্যয় যুক্ত হয়েও অসংখ্য গ্রাম-নাম সংস্কৃতিসমন্বয়ের উদাহরণ রূপে বর্তমান। 'ড়া' প্রত্যয়ান্ত গ্রাম-নাম এই অঞ্চলে লক্ষণীয় ভাবেই প্রচুর। এমন কি যে সমস্ত গ্রামে অস্ট্রিকভাষী জনগোষ্ঠীর বাস নেই, সে-সমস্ত গ্রাম-নামেও পূর্ব-ইতিহাস বিধৃত। সমতল বাঙ্‌লার বাঙালীজন এ সব অঞ্চলে ক্রমে ক্রমে বসতি স্থাপন করেছে। তাদের ভাষাও গ্রাম-নামে প্রতিষ্ঠিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিকৃতি-প্রাপ্ত।

সীমান্তবাঙ্‌লায় কোন স্থায়ী প্রাচীন আর্য উপনিবেশ দীর্ঘকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এমন প্রামাণ্য ইতিহাস নেই। তবু কোন কোন অঞ্চলের জৈন মূর্তি আজও একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে একদা এ সমস্ত অঞ্চলে জৈন এবং হয়তো-বা বৌদ্ধদের আগমন ঘটেছিল। কিন্তু জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভাব এদেশে সুস্পষ্ট নয়। পরিবর্তে অস্ট্রিক ভাষা এবং অস্ট্রিক সংস্কৃতির প্রভাবই সমুজ্জ্বল। 'ড়া' প্রত্যয়ান্ত গ্রাম-নাম এই প্রভাবেরই অভিজ্ঞান। এই ধরণের গ্রাম-নামের সংখ্যা এতো বেশী যে, অল্পাংশের নাম করলেও তা' অল্প হবে না। উদাহরণ ঃ

ঃ দাব্‌ড়া, দুব্‌ড়া, বাক্‌ড়া, মাক্‌ড়া,
বাসড়া, বামড়া, বাঁক্‌ড়া, আমড়া,
একড়া, ঝাঁক্‌ড়া, চিঁচ্‌ড়া, চিংড়া,
কাঁদড়া, সেম্‌ড়া, ঝাঁপ্‌ড়া, শাঁক্‌ড়া।

তা' ছাড়া এ-ধরণের গ্রাম-নামও এই অঞ্চলে বহুশ্রুত :—

হুটমুড়া, লৌলাড়া, কাঁড়ারবেড়া, কাঁড়্‌রা
টেঁক্‌বহড়া, বহড়াগোড়া, কাড়াগাড়িয়া, আড়রা
বালিয়াগুড়ি, লুধুড়কা, পুঞ্চা, হুঁড়া, ছড়্‌রা।

'আড়া' শব্দান্তিক বেশ কিছু গ্রাম-নাম সীমান্তবাঙ্‌লার প্রাচীন সম্পদ। 'আড়া' শব্দটি বাঙ্‌লা ভাষাতেও অচলিত নয়। সীমান্তবাঙ্‌লায় এবং বাঙ্‌লা ভাষাতেও আড়া শব্দের অর্থ উচ্চভূমি, পুকুরের 'পাড়' হিসাবেই শব্দটির চলন। 'চণ্ডীমঙ্গলে' কবিকংকণ মুকুন্দরামও লিখেছেন :

আশ্রয় পুখরি আড়া নৈবেদ্য শালুক নাড়া
পূজা কৈল কুমুদ প্রসন্নে।

'আড়' (আল, আইল) শব্দটিও ঐ অর্থেই ক্ষুদ্রত্বের পরিচায়ক। আড়া এবং আড় মূলতঃ অষ্ট্রিক ভাষারই শব্দ। সীমান্ত বাঙ্‌লায় আইড় এবং (আ)-হিড় শব্দও আইল এবং আল অর্থেই প্রচলিত। সাঁওতালী ভাষায় 'হিড' শব্দটি আছে যার অর্থ অঞ্চলভেদে আল এবং জমি।

গ্রাম-নাম স্থাপনের পশ্চাতে কোন না কোন রূপ যুক্তি বর্তমান। সাধারণতঃ বসতি স্থাপনের সময় কৃষিক্ষেত্রের উপযোগী নিম্নভূমি বা জলাভূমির সন্নিকটে উচ্চভূমিতে গৃহ নির্মাণ করা হয় এবং যেক্ষেত্রে উচ্চভূমি অপ্রাপ্য সে সব অঞ্চলে গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রেও ভূমিকে উঁচু করে নিতে হয়। বিশেষ বিশেষ মানুষের বা দেবতার নামে গ্রাম-নাম চিহ্নিত করার বিধি প্রচলিত হওয়ার পূর্বে সীমান্তবাঙ্‌লার প্রাচীন অধিবাসিগণ প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশের নামেই গ্রাম-নাম চিহ্নিত করেছে—অরণ্য, বৃক্ষ-পশু-পক্ষী, নদী-নালার নামে এবং প্রয়োজন মতো নিজেদের উপজাতিক নামে গ্রামের নাম রেখেছে। সীমান্তবাঙ্‌লা মুখ্যতঃ অরণ্য-রাজ্য, তাই আরণ্যক পরিবেশই গ্রাম-নামের স্মারক। ভূমিগত অবস্থাকে পরিস্ফুট করতে পারে, এমন শব্দকেও বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ লতা প্রভৃতির নামের শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে। এদিক দিয়ে 'আড়া' এবং 'আড়' শব্দটি বিশেষভাবেই উপযুক্ত। বৃক্ষ-নামের শেষে 'আড়' শব্দ সংযুক্ত আছে এমন কয়েকটি গ্রামের নাম :

কুসুমাড়া বা কুসুমাড় (কুসুম গাছ), মহুলাড়া (মহুল বা মহুয়া গাছ), পলাশাড়া (পলাশ গাছ), ধানাড়া (ধান), বেলাড়া (বেল গাছ), কুলাড়া

(কুল গাছ), বোলাড়া* (বোল বউল বকুল গাছ), ললাড়া বা নলাড়া (নল গাছ), অহরাড়া (বটগাছের ঝুরি), জিয়াড়া (জিয়া গাছ), ইত্যাদি।

এ ছাড়াও আড়া-অন্তিক সংখ্যাহীন গ্রাম-নাম এই অঞ্চলে সুপ্রচলিত। উদাহরণ :—

শিয়ালাড়া (শিয়ালের আবাস ভূমি),
বাঘাড়া (বাঘের অবস্থান ভূমি),
নথাড়া, লথাড়া (নদীর ধার),
কামারাড়া (কামার জাতির আবাসস্থল),
গোয়ালাড়া (গোয়ালা জাতির আবাসস্থল)
(অথবা গোয়ালের জন্য ভূমি),
বামুনাডা }
যুগীয়াড়া } ঐ জাতির আবাসভূমি
মালীয়াডা }

* বোলাড়া (বাহুলাড়া ?) গ্রামের কথা প্রসঙ্গে, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' নামক সুপরিচিত গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ বলেছেন যে, বোলাড়া (এবং বেলাড়া, কুলাড়ার) মধ্যে রাঢ় বা লাঢ় দেশের প্রতিধ্বনি বর্তমান। "এই লাড়-লাড়ম-লাড়া নামই বেলাড়া ও বাহুলাড়া" নামের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। বোলাড়ার আশেপাশের আরও একাধিক গ্রামের নামান্তে 'লাড়া' আছে—যেমন বেলাড়া, কুলাড়া। মনে হয় যেন লাড় দেশের অন্তঃপুরে প্রবেশ করছি।" (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা—১০৫)।

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের প্রতিপাদ্য অঞ্চলটি প্রাচীন রাঢ়ভূমির অন্তর্গত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু বেলাড়া এবং কুলাড়া 'বে+লাড়া' এবং 'কু+লাড়া' নয়, বেল+আড়া এবং কুল+আড়া-ই উক্ত গ্রাম দুটির ব্যুৎপত্তিগত স্বরূপ। আর—বাহুলাড়া (?) যে, "সাধারণ গ্রামের লোকের কাছে বোলাঢ়া বলে পরিচিত"—একথাও বিনয় বাবুর স্বীকৃত। ভাষাতত্ত্বের সূত্র অনুসারে বকুল (আড়া)> বউল (আড়া)>বোলাড়া। মহুল শব্দের সাদৃশ্যে এবং মধ্য বাঙ্‌লা 'বহু' শব্দের সাদৃশ্যে বউল শব্দটি 'বহুল' রূপে বিকৃত যদি হয়েও থাকে, তা'হলেও 'বহুলাড়া' শব্দ অসম্ভব নয়, কিন্তু বাহুলাড়া-র সাক্ষাৎ লাভ ওভাবে সম্ভব নয়। গ্রামটির আসল নাম বোলাড়া-ই। 'লাড়' বা রাঢ় শব্দের সম্পর্ক এখানে নেই। এ ভাবে উদাহরণ সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে, 'আড়' শব্দের অর্থই রাঢ়া বা রাড় না হয়ে রাঢ়ী অর্থে স্থানবাচক শব্দে পরিণত হয়েছে। শব্দের আদিতে অস্ট্রিক ভাষার শব্দযুক্ত আড়া-অন্তিক শব্দের সংখ্যাও সীমান্তবাঙ্‌লার সীমাতীত। কয়েকটি উদাহরণ :

হাতুয়াড়া [হাতু=মুণ্ডারী গ্রাম], আনাড়া, গেঁগাড়া, কানাড়া, সাতাড়া, ভাগাড়া, শংকাড়া (শংখ আড়া ?), হাড়াড়া, ভেটাড়া, হিয়াড়া প্রভৃতি।

ঝাঁটিয়াড়া—(ঝাঁটি = ঝোপ ঝাড়ের শুক্‌নো ডাল যুক্ত জায়গা)

সীমান্তবাঙ্‌লায় শোল বা শোলি-অন্তিক গ্রাম-নামেরও অভাব নেই। এই সব গ্রাম-নামের মধ্যেও অরণ্য-পরিবেশ ঘনিষ্ঠ ভাবেই পরিস্ফুট। সাঁওতালী ভাষায় শোল শব্দটির অর্থ জলাভূমি বা নিম্নভূমি। 'শোলি' শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র শোল। এই অঞ্চলে ক্ষুদ্র বন অর্থে 'বনি' এবং ছোট পাহাড় অর্থে 'পাহাড়ি'ও অনুরূপভাবে প্রচলিত। আসনবনি, শালবনি, কুড়চিবনি, ধ-বনি, পলাশবনি, মহুলবনি এবং বেলপাহাড়ি, ঝাঁটিপাহাড়ি, প্রভৃতি গ্রাম-নামই এর প্রমাণ বহন করে। শোল-অন্তিক শব্দের সঙ্গে বন, বৃক্ষ, পশুপক্ষী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরণ্যক উপজাতির নাম বিজড়িত। গ্রামসীমানাকে চিহ্নিত করার পূর্বে চোখের সামনে অরণ্যভূমির বিশেষ বিশেষ অংশের দিকে দৃষ্টি রেখেই গ্রাম-নাম-গুলি নির্মিত হয়েছে। বিশেষ কোন নিম্নভূমিতে বিশেষ কোন পশুর আবাসের জন্যই অথবা কোন না কোন রূপে উক্ত জায়গার সঙ্গে বিশেষ কোন পশুর সম্পর্ক ছিল বলেই সন্নিহিত স্থান-নামগুলিতে পশু-নাম সংযোজিত হয়েছে। নিম্নভূমির মধ্যস্থিত অথবা সন্নিহিত বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ-লতাদির নামেও পরবর্তী কালের গ্রাম-নাম পরিচিত হয়ে ওঠে। উদাহরণ :

(১) পশু-নামের সঙ্গে যুক্ত শোল-অন্তিক গ্রাম-নাম :—

নেকড়াশোল, বাঘুয়াশোল, ভাল্‌কিশোল, হাতিয়াশোল, শিয়াড় (শিয়াল)-শোল ইত্যাদি।

(২) বৃক্ষ-লতাদির নামের সঙ্গে যুক্ত শোল-অন্তিক গ্রাম-নাম :—

আসানশোল [আসলে, আসন (গাছ) শোল],আমড়াশোল, কুস্‌মা (কুসুম গাছ)-শোল, কুমড়াশোল, ডুমুরশোল, ছাঞ্চাশোল, বেনাশোলি, জামশোলা।

(৩) উপজাতিক নামের সঙ্গে যুক্ত শোল-অন্তিক গ্রাম-নাম :

লোধাশোলি (লোধা উপজাতি), খয়রাশোল (খয়রা বাগ্‌দী)

(৪) ব্যক্তিবিশেষের নামের সঙ্গে জড়িত :—

গোবরাশোল, মদনশোল, ভেদুয়াশোল (বেধুয়া>ভেদুয়া = জারজ)

['পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৫০) শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ 'ভাল্লুকশোল' নামক গ্রামের প্রসঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, উক্ত গ্রামে পূর্বে ভাল্‌কী গ্রামের সদ্‌গোপ রাজাদের 'ভল্লুকশালা' ছিল। কিন্তু সীমান্তবাঙ্‌লার শোল-অন্তিক শব্দগুলি অন্য কথাই

বলে। ভাষা-তত্ত্বের কোন নিয়ম অনুসারে 'শাল' বা 'শালা' (তৎসম)—অস্ট্রিক্ ভাষার শোলে রূপান্তরিত হয় না। ভাল্‌কী গ্রামের সদ্‌গোপ রাজাদের ভল্লুক 'টোটেম' থেকে 'ভাল্‌কী' গ্রাম-নাম অসম্ভব নয়, এমনকি ভাল্লুকশোলের সংগে উক্ত টোটেমের আবাসিক সম্পর্কও উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কিন্তু শোলের অর্থ বাসভূমি নয়, কৃষি-উপযোগী নিম্নভূমি। 'শালা'র সঙ্গে 'শোলে'র ধ্বনিগত সাদৃশ্য থেকেই বিনয় বাবু যুক্তি আহরণ করেছেন বলে মনে হয়।]

ড়া, আড়া এবং শোল-অন্তিক গ্রাম-নাম ছাড়াও আরো নানা ধরণের শব্দযুক্ত গ্রাম-নামের সন্ধান সীমান্তবাঙ্‌লায় মেলে। তড়, তড়া, তড়িয়া, তোড়া, তোড়িয়া প্রভৃতি শব্দযুক্ত গ্রাম-নামও এই অঞ্চলে অনেক। উপরিউক্ত শব্দগুলি অস্ট্রিক ধ্বনিবাহী হলেও মূলতঃ তৎসম শব্দ। 'তল' (বৃক্ষতল, সমতল) শব্দটি—এদের আদিরূপ। ধ্বনিবিকৃতির চিহ্ন বহন ক'রে 'তল'ই বিচিত্র রূপে চিহ্নিত।

'তল' শব্দের 'ল' সংস্কৃতে দন্ত্যবর্ণজ। বাঙ্‌লা ভাষাতেও 'ল' আত্মবিস্মৃত নয়। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্‌লায় 'সেরেব্রাল' বা মূর্ধন্য 'ল'-এর অবস্থিতি অসম্ভব নাও হ'তে পারে। 'তাড়ি', 'খাড়ি', প্রভৃতি কয়েকটি শব্দে তার নিদর্শন মেলে, এবং তাড়ি, তাল থেকে এবং খাড়ি, খাল থেকেই জাত। তাল-এর, খাল-এর ল যদি মূর্ধন্যবর্ণের না হয়, তা'হলে দন্ত্যবর্ণ 'তালি' আর 'খালি' ছাড়া আর কিছু দিতে পারবে না। এই মূর্ধন্য-লধ্বনি প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষায় না থাকলেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় প্রচলিত ছিল বলেই আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত।

সীমান্তবাঙ্‌লায় মালপাহাড়িয়া এবং খাড়িয়া প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে মূর্ধন্য ল-ধ্বনি এখনো বর্তমান, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা' 'ড়' ধ্বনিতে রূপান্তরিত। আর্যভাষাকে গ্রহণ করতে গিয়ে আর্য-ভাষার ধ্বনিকে যথাযথরূপে উচ্চারণ করতে না পেরেও ধ্বনিবিকৃতি ঘটানো হয়েছে। সাঁওতালী ভাষাতেও এমনিভাবে অনেক সংস্কৃত শব্দ বিকৃত করে গ্রহণ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে অবশ্য আরো একটি ভাববার কথা আছে। সংস্কৃত 'তল' শব্দের 'ল' দন্ত্যবর্ণের, কিন্তু ওড়িয়া ভাষাতে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙ্‌লায় 'তল' শব্দের 'ল' মূর্ধা-জাত। এক্ষেত্রে একই ধ্বনিতা (ফোনেম্) থেকে উদ্ভূত 'ল' ধ্বনি-দ্বয়ের দন্ত্য বর্ণের উপর মূর্ধন্য বর্ণের প্রভাব কোন-না-কোন রূপে এসে গেছে, ওড়িয়া ভাষাতে এই ভাবেই 'জল, তল, বন, জন'—প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য বর্ণ

দন্ত্য বর্ণের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে নি। অথচ উক্ত শব্দগুলি তৎসম শব্দ, উচ্চারণেও তৎসম।

কিন্তু এ প্রসঙ্গে আপাততঃ আর কিছু না বলাই ভালো। মূলতঃ তল, তলা, তলিয়া কিন্তু উচ্চারণ-বিকৃতিতে তড়, তোড়, তডা বা তড়িয়া শব্দ-অন্তিক গ্রাম-নামের কয়েকটি উদাহরণ :—

(১) শালতোড়, মহুলতোড়, বেলতোড়, মৌ-তোড়, বড় অহর-তোড় (=বটের ঝুরির তল), চাকলতোড়, ফুলতোড় প্রভৃতি

(২) জামতড়া (উচ্চারণ-বিকৃতিতে জামতাড়া), শালতড়া, আমতোড়া, ভেলিয়াতোড়া, আমলাতড়া—ইত্যাদি।

(৩) মৌ-তড়িয়া, বড়-তড়িয়া—ইত্যাদি।

উপরিউক্ত গ্রাম-নামের আদিশব্দটি বৃক্ষবাচক।

সীমান্তবাঙ্‌লার গ্রামের মধ্যেও আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির অনেক কাহিনী সংগুপ্ত।

॥ দুই ॥

নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা মত, নানাবিধ আচার অনুষ্ঠানের সম্যক্ সমন্বয়ে বাঙ্গালী সংস্কৃতির জন্ম ; শুধু জন্ম নয়, জন্মের পরও এই নিয়েই তার চলা। বহু মনীষার তথ্যানুসন্ধানে বাঙ্গালী সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার স্বরূপটি আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু বাঙ্গালী সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপকে স্বীকার করেও একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, বাঙ্‌লাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন উপভাষার মতোই বিভিন্ন উপ-সংস্কৃতি বিদ্যমান। আর্য সভ্যতা এবং আর্য ভাষা যখন উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, তখন পুর্বপ্রান্তের এই বাঙ্‌লাদেশে অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীরাই একাধিপতি। উত্তর ভারতের আর্য-ভাষী অধিবাসীদের পক্ষে তখন বাঙ্‌লাদেশ ছিল অস্পৃশ্য। এদেশে পদার্পণ করাও পাপ বলে গণ্য হতো। আর্যভাষীদের ঘৃণার বেড়াজালে বাঙ্‌লাদেশ তখন বদ্ধ। তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন কারণে যদি কোন আর্যভাষী বাঙ্‌লাদেশে আসতো, তাহলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে জাতে উঠতে হতো। আর—বাঙ্‌লাদেশে বসবাস করলে 'পতিত' বলে গণ্য হতো; সে হতো 'ব্রাত্য'।[১] শেষ পর্যন্ত

১ "আরণ্যক আর উপনিষদের সময়ে বাঙলাদেশে আর্যদের আগমন হয়নি, আর বুদ্ধদেবের সময়েও নয়। বিহার অঞ্চলে যে সমস্ত আর্য প্রথম এসে বসবাস করে তারা ঘরবাসী কৃষাণজাতীয় ছিল না, তারা ছিল যাযাবর বা ভবঘুরে; তারা তাদের ঘোড়া গোরু ছাগল ভেড়া নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াত; পশ্চিমা ঘর-বাসী চাষী আর্যেরা তাদের নাম দিয়েছিল ব্রাত্য। তারা অবশ্য আর্য ভাষা বলত, কিন্তু তাদের আর্যভাষা উদীচ্য আর কুরু পাঞ্চাল অঞ্চলের আর্যদের ভাষা থেকে উচ্চারণে কতকটা আলাদা হয়ে গিয়েছিল; আর তাদের ধর্মও ছিল বৈদিক ধর্ম থেকে আলাদা—খুব সম্ভব তারা শিবের উপাসনা করত, তারা বৈদিক যাগযজ্ঞ হোম অগ্নিপূজা ইত্যাদি করত না, আর ব্রাহ্মণ পুরোহিতকেও মান্‌ত না। বেদমার্গী পশ্চিমা আর্যেরা এই সব কারণে তাদের অবজ্ঞা কর্‌ত; এই জন্যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে তাদের সম্বন্ধে নানান্ নিন্দার কথা লিখে গিয়েছে। কিন্তু এরা যে আর্য ছিল আর আর্যভাষা বল্‌ত, যদিও এদের উচ্চারণ ঠিক ছিল না, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এ কথাও স্বীকার করা হয়েছে; আর বৈদিক আর্যেরা এদের শুদ্ধি করে বেদমার্গী করে নিত খুব—যে অনুষ্ঠানের দ্বারা এরা বৈদিক দীক্ষা নিত সে অনুষ্ঠানের নাম ছিল ব্রাত্যস্তোম। খুব সম্ভব এই ব্রাত্যরা অনার্য দ্রাবিড় লোকদের সঙ্গে কতকটা মিশে গিয়েছিল। সে যুগে জাতিভেদের এত কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, আর ব্রাত্য আর্যেরা বেদমার্গী আর্যদের আগে মগধ অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়; আর এটা খুবই সম্ভব যে তারা বৈদিক ধর্ম গ্রহণ করলেও সে ধর্ম তাদের মধ্যে তেমন দৃঢ় হতে পারে নি। তাই বৈদিক ধর্মের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে দুটি বড়ো ধর্মমত প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয়েছিল, —বৌদ্ধমত আর জৈনমত—সেই দুটি মত এই মগধ অঞ্চলেই উদিত হয়, আর প্রথমে এখানকার লোকেদের মধ্যেই প্রসার লাভ করে।"

—বাঙ্‌লা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

নানাকারণে, আর্যভাষী জনগোষ্ঠী মগধ অতিক্রম করে দলে দলে প্রবেশ করলো বাঙলা দেশে। সুরু হলো আর্য উপনিবেশ। বরেন্দ্রভূমিতে এবং রাঢ় সীমান্তে জৈনমতাবলম্বী আর্যভাষীদের উপনিবেশ গড়ে উঠলো। জৈন মতের পরে বৌদ্ধ মত এবং সর্বশেষে ব্রাহ্মণ্য মত এদেশে প্রসার লাভ করে। আর্যভাষী জনগোষ্ঠীর আবির্ভাবের পূর্বে রাঢ় এবং সুহ্ম সম্পূর্ণরূপে অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীরই অধ্যুষিত দেশ ছিল। বর্তমান পশ্চিমবংগেরই প্রাচীন নাম ছিল রাঢ় এবং সুহ্ম। রাঢ় জাতি এবং সুহ্ম জাতির নাম থেকেই দেশের নাম। পরবর্তী কালে অনার্যভাষী এবং আর্যভাষী জনগোষ্ঠীর এক সম্যক্ সমন্বয় সাধিত হয়েছিল বাঙলাদেশে। বলা বাহুল্য, এর অনেক আগের থেকেই উত্তর ভারতেও এই সংস্কৃতি-সমন্বয় ঘটেছিল। "ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্যেরা যাদের দেখা পেলেন, তাদের ডাকলেন তাঁরা অন্যব্রত বলে। এটা ঠিক যে আর্যেরা আসবার আগে এদেশে দলে দলে এইসব অন্যব্রত ছেলেমেয়ে যুবকযুবতী, বুড়োবুড়ি, দলপতি, গোষ্ঠীপতি, যোদ্ধা, কৃষাণ—নিজেদের আচার অনুষ্ঠান, দেবতা অপদেবতা, কলাকৌশল, ভয়ভরসা, হাসিকান্না নিয়ে বাস করছিল। এবং এটাও ঠিক যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যাঁরা এলেন এবং এদেশের মধ্যে যাঁরা ছিলেন সেই আর্য এবং না-আর্য বা 'অন্যব্রতদের' মধ্যে সবদিক দিয়ে এমন কি বিয়েতে এবং ভোজেতেও আদানপ্রদান চলেছিল। পুরাণের দেবদেবীর উৎপত্তির ইতিহাস এই আদান প্রদানের ইতিহাস।[১]"

অতএব, বিভিন্ন মতাবলম্বী যে সব আর্যগোষ্ঠী ক্রমে ক্রমে বাঙলাদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার দিকে ঝোঁক দিলেন সেইসব আর্যদের সংস্কৃতি আর তার প্রাচীন বিশুদ্ধতা নিয়ে নিশ্চয়ই ছিল না। আর্যদের আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে তখন অনার্য-সংস্কৃতির ধারা প্রবহমান; বাংলাদেশে আর একবার সে সমন্বয় ঘটলো। অষ্ট্রিকভাষীরা বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, ফলমুল, ফুল, কোন বিশেষ স্থান, বিশেষ বিশেষ পশুপক্ষী ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করতো। আর্য সংস্কৃতি তাও গ্রহণ করেছিল। সারা ভারতবর্ষেই এই মিলন এমনভাবে সংসাধিত হয়েছে, যে সম্যক্ বিশ্লেষণ ছাড়া সহজ ভাবে তা দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং বোধগম্য নয়। আর্যভাষী জনগোষ্ঠী অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীদের 'অন্যব্রত' নামে অভিহিত করলেন বটে, কিন্তু সেই অন্যব্রতদের ব্রতকেও গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। বিজিত জাতির সংস্কৃতি বিজয়ী জাতিকে গ্রাস করলো।

১ বাঙলার ব্রত

বেদপূর্ব আর্য ও অনার্যভাষীদের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে 'বাঙ্‌লার' ব্রত পুস্তকে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বেদের অনেক দেবতাকেই আমরা অন্যব্রতদের মধ্যে খুঁজে পাবো। নানা ঋতুর মধ্য দিয়ে নানা সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে, এবং সেই সকল ঘটনার মূলে দেবতা অপদেবতা নানারকম কল্পনা করে নিয়ে তা'রা শস্যকামনায় সৌভাগ্যকামনায়—এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করছে, কি আর্য কি অন্যব্রত সব দলেই……।' পারস্পরিক আদান প্রদানের রীতিনীতি এমনি করে এক যুগ থেকে আর এক যুগে এগিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত সংমিশ্রণের পালাও এগিয়ে চলেছে যুগের পর যুগ অতিক্রম করে। কিন্তু তবুও অনার্যভাষী গোষ্ঠীগুলির বিলয় ঘটে নি। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আর্যভাষা গ্রহণ করে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের শেষের তলায় অন্ত্যজ রূপে টিকে আছে; কোন কোন ক্ষেত্রে—বিশেষ করে বাংলাদেশে তারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের আওতায় এসে রক্ত-মিশ্রণের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী জাতিতে পরিণত হয়েছে। এবং সব কিছুর শেষেও দেখা যাচ্ছে যে ভারতের প্রায় সর্বত্র কিছু অনার্যভাষী জনগোষ্ঠী, নিজেদের ভাষা, ধর্মমত ও আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে সেই প্রাচীন কাল থেকেই আর্যভাষীদের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বসবাস করছে। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, এই সমস্ত অনার্য-ভাষী গোষ্ঠী একেবারেই আর্য প্রভাব বর্জিত। তবে একথা ঠিক, এরা নিজেদের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে বাইরের প্রভাবকে কিছু পরিমাণে এড়িয়ে গেছে, এদের বৈশিষ্ট্য প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে এখনো।

এই সংস্কৃতি-সমন্বয় এবং রক্ত-মিশ্রণের কথা আজ আর নতুন করে বলবার প্রয়োজনীয়তা নেই। নৃ-তত্ত্বের বিচারে বাঙ্গালী 'সংকরজন'। প্রাচীন বাঙ্‌লার ধর্মকর্মের ক্ষেত্রে, শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে এই সাংকর্য বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এই সংস্কৃতির অর্ধেক পুরাতন ঐতিহ্যজাত; এই ঐতিহ্যের মধ্যে থাকে জনগত, বর্ণগত রক্তের স্মৃতি। বাকী অর্ধেক সমসাময়িক সমাজবিন্যাসের প্রয়োজনে গড়ে ওঠে। কাজেই অতীতের স্মৃতি ও বর্তমানের প্রয়োজন এই দুই বস্তুই বিশেষ দেশ ও বিশেষ কালের সংস্কৃতির মধ্যে জড়াজড়ি করে মিশে থাকে। বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, বিচিত্র ধর্মসংস্কার, পূজা আচার অনুষ্ঠান, অসংখ্য দেবদেবী এবং নানাবিধ ব্রতের মধ্যেই বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপরেখা। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' নামক গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন।

এদিকে, রাঢ় ভূমির পশ্চিম সীমান্তদেশ কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত আর্যভাষী জনগোষ্ঠীর পদক্ষেপে কম্পিত হয় নি। বাঙ্‌লাদেশের সর্বত্র যখন ব্রাহ্মণ্যমত প্রসারিত হয়েছে তখনো অরণ্যময় রাঢ়সীমান্ত তার আপন মানুষগুলিকে সযত্নে পোষণ করে চলেছে—। মাঝে মাঝে জৈন ও বৌদ্ধ শ্রমণরা এই সীমান্তভূমিতেও যাওয়া আসা করেছিলেন ; কিন্তু সে অঞ্চলের লোকে তাঁদের উপর সদয় ব্যবহার তো করেই নি, বরং 'ছু ছু' করে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে। জৈনদের সবচেয়ে পুরাতন গ্রন্থ 'আচারঙ্গসূত্তে' একথার প্রমাণ আছে। অবশ্য আরো অনেক পরে জৈন শ্রমণগণ এই অরণ্যভূমিতেও মঠ স্থাপন করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। রাঢ় দেশের এই পশ্চিম প্রত্যন্ত ভূমিতে পরবর্তীকালে আবার নতুন করে যে সংস্কৃতি-সমন্বয় ঘটেছিল, তার এমন একটি আঞ্চলিক রূপ আছে যা সামগ্রিক বাঙ্গালী সংস্কৃতির উপ-সংস্কৃতি বলে কথিত হতে পারে। এই অঞ্চলের জন-গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস, আচার নিষ্ঠার কাহিনী থেকে এমন একটি 'পরিবর্তন-যুগ' আজও খুঁজে পাওয়া যাবে, যার ভেতর থেকে আরো প্রচীনকালের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আসল রূপটি চোখের সামনে ভেসে উঠবে। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবাংলার প্রান্তভূমিতে আজও চলছে সেই পরিবর্তন। কোন কোন ক্ষেত্রে সমন্বয়ের কাজ মোটামুটিভাবে শেষ হয়ে গেছে ; কোন কোন ক্ষেত্রে সমন্বয়ের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অবশ্য একথাও ঠিক যে—একে সমন্বয় না বলে মিশ্রণ বলাই সঙ্গত। কারণ, এক্ষেত্রে দুটি পৃথক সাংস্কৃতিক ধারা একত্র হলেও বিশেষ একটির প্রভাব মূলতঃ স্বীকার্য। এই সাংস্কৃতিক ধারাকে জানতে হলে সবচেয়ে আগে জানা দরকার, সীমান্তরাঢ়ের জনগোষ্ঠীকে। এখানে অনার্যভাষা ও আচার-আচরণ নিয়ে বসবাস করছে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, ওরাওঁ, হো। তেমনি এদের রক্ত-সম্পৃক্ত বাগ্‌দী, বাউরী, ডোম, বাঁশফোঁড়, মালপাহাড়ী, মাল, ভুঁইয়া, প্রভৃতি উপবর্ণের আর্যভাষী জনগোষ্ঠীও বসবাস করছে পাশাপাশি। সাঁওতাল, মুণ্ডা, প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলি আদি-অস্ট্রেলীয়দের বংশধর বলে পণ্ডিতজনের অভিমত। এদের সঙ্গে উপরিউক্ত আর্যভাষী উপবর্ণগুলির রক্ত সম্পর্ক আছে বলেই তাঁরা রায় দিয়েছেন।

এই অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম-কর্ম প্রভৃতির সঙ্গে এই হিন্দুধর্মী সংকর-জনদের যে সম্পর্ক, তার ইতিহাস সংগুপ্ত আছে করম-ইদ-ছাতা পরবে, জীতা পরবে ; সে ইতিহাস সংগুপ্ত আছে বাঁধনা পরবে, বিঁধা পরবে। সে কাহিনী কথা বলেছে টুসু গানে, ভাদু গানে। তার সুর

লুকিয়ে আছে টাঁড় ঝুমুর আর দাঁড় ঝুমুরে। তাকে আমরা দেখতে পাবো, নাচনী নাচে, করম নাচে, কাঠি নাচে। মনসা পুজায় এবং শিবের গাজনেও নোতুন এক সমন্বয়ের প্রচেষ্টা এখানে পরিদৃষ্ট।

রাঢ়ভূমির এই পশ্চিম সীমান্তভূমি, ধর্মে-কর্মে, আচারে-অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বণে, নাচ-গানে, রীতিনীতি-শিল্পকলায় তার নিজস্ব প্রান্তিক বৈশিষ্ট্য আজও রক্ষা করে চলেছে। উত্তরপশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বাঁকুড়া, প্রান্তিক বীরভূম আর বর্ধমানের অংশবিশেষ এবং ধলভূম-মানভূম-সাঁওতালপরগণার হিন্দুধর্মী এবং প্রায় হিন্দুধর্মী জনগোষ্ঠীদের সঙ্গে অত্যন্ত পাশাপাশি অবস্থান করছে সাঁওতাল-ভূমিজ-মুণ্ডা-খাড়িয়া-শবর-লোধা-মালপাহাড়ী ; বাস করে বিরাট এক অংশ জুড়ে হিন্দুধর্মী মাহাতো (কূর্মক্ষত্রিয়) সম্প্রদায় ; বাস করে বাগ্দী, মাল, বাউরী, মালো আর মাহলী ; ডোম এবং হাড়ি-কাহার এবং লোহার। সাঁওতাল মুণ্ডাদের নিজস্ব ভাষা আছে, সংস্কৃতি আছে। দ্বিতীয় ভাষা কিন্তু তাদের বাঙলা। অনেক ক্ষেত্রে এরাও অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রান্তিক সংস্কৃতির অঙ্গীভূত।

এই প্রান্তিক সংস্কৃতি, সর্বগোষ্ঠীর সমন্বয়-প্রসূত নবজনসংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির দেবতা ধরম-করম-বড়াম ; বড়পাহাড়ী, সাতবহিন ; ভাদু-টুসু-মনসা, দুয়ারশিনি, কুদরাশিনি-বাসুলী ; গ্রামদেবতা ক্ষেত্রপাল। সমস্ত অরণ্যভূমি জুড়ে এদের অধিষ্ঠান, পাহাড়ের গুহায়, শালবনের সীমান্তে, গ্রামের উপকণ্ঠে এদের বাসভূমি। মানভূম-ধলভূম-ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম সীমান্তের বর্ধমান আর বীরভূম এদের লীলাঙ্গন। এ সমস্ত অঞ্চলই পশ্চিমবাঙলার পুরাভূমি। অনুর্বরা বন্ধ্যা ক্ষেত্র সোণালী ফসলের স্বপ্নকে এখানে সফল করে না, কিন্তু এরই মাঝে বিরাম নেই ফসল ফলানোর। শালবনের কোল দিয়ে লালমাটির বুক বিদীর্ণ করে সীমান্ত ভূমির নদীনালা অজয়, দামোদর, বরাকর, ধলকিশোর, শিলাই, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, ডুলং সমতল বাংলার মাটিকে শস্যপ্রসবিনী করেছে। এদেশের মাটির তলায় মাণিক, লোহা-তামা-সোনা, কয়লা আর ম্যাঙ্গানিজ। এর বনে বনে পশু আর পাখী, ফুল আর ফল, গাছে গাছে লাক্ষা আর তসরের গুটি। পাহাড়ে পাহাড়ে পলাশের আগুন জ্বলে ওঠে বসন্তে। দাবানলের মালা পরে জামসেদপুরের আলোকমালাকে ব্যঙ্গ করে দালমা পাহাড়।

ধলভূম-মানভূমের গা ছুঁয়ে রাঁচি আর সিংভূমের অরণ্য আর পাহাড় আরো ঘন, আরো বিস্তৃত ময়ূরভঞ্জের সীমায়। সেই বনপাহাড়ের মানুষ, আদি-অস্ট্রেলীয়দের দূর-গোষ্ঠীর মানুষ। তাদের ধর্মকর্ম পূজাপার্বণ, রীতিনীতি,

আচার-আচরণ মানভূম-ধলভূম-ঝাড়গ্রামের ঈষৎ সমতলবাসী মানুষদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছে। বলা বাহুল্য, এইসব অঞ্চল মুখ্যতঃ আদিবাসী, প্রায়-আদিবাসী, হিন্দুধর্মী আদিবাসী এবং অন্যান্য হিন্দুধর্মীদের মিলনভূমি। এদের বারোমাসে তেরো পার্বণ। এদের গাছে গাছে ভূত প্রেত দেবতার অধিষ্ঠান; গ্রামে গ্রামে ডাকিনী। অপদেবতার আক্রোশ এদের চিরসাথী। এদের ঢাক-ঢোল-নাগরা-ধুম্সা-মাদোলের বোলে মেঘগর্জন। মনু-নিষিদ্ধ গ্রামদেবতাদের সীমাহীন প্রভাবে প্রভাবিত এদের গ্রামজীবন। নাচে গানে চঞ্চল এদের জীবনযাত্রা; প্রাচীনতম সংস্কার এদের আচারে অনুষ্ঠানে। নিজস্ব এদের বৈশিষ্ট্য; বিশিষ্ট এদের সংস্কৃতি, বিচিত্র এদের জীবন।

॥ তিন ॥

পশ্চিমবাঙলার পশ্চিম সীমান্ত। ভূমি-রাজ্য। ভূমি থেকে ভূম আর ভুঁই। এই 'ভূম'গুলির কয়েকটি আজো পড়ে আছে বাংলা দেশের বাইরে, বিহার-ভূমিতে।

সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে এই 'ভূম'-গুলি ছড়িয়ে আছে। একেবারে উত্তরপশ্চিম সীমানায় বীরভূম; আরো দক্ষিণ-পশ্চিমে নেমে এলে মানভূম। রাষ্ট্রনীতির মারণযন্ত্র মানভূমকে বিলুপ্ত করেছে মানচিত্র থেকে কিন্তু মন-চিত্র থেকে নয়। এরই আশে-পাশে ভাষা-সংস্কৃতি-জনগোষ্ঠীর অচ্ছেদ্য বন্ধনে পরস্পরের গা ছুঁয়ে আছে ধলভূম, তুঙ্গভূম, মল্লভূম, সামন্তভূম; এরই অংশরূপে বেঁচে আছে শিখরভূম, বরাহভূম; প্রাকৃত ভাষায় ধলভুঁই, মলভুঁই, সাঁংভুঁই, শিখরভুঁই, বরাহভুঁই। পশ্চিমবাঙলার প্রাচীনতম অঞ্চল এই সব পুরাভূমি। ভূঞা আর ভূমিজদের বাসভূমি; মাহাতো-বাগদী-বাউরী-লায়েক-মালের কীর্তিগাথার দেশ। 'বাঙলার সভ্যতার ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির অনেক উত্থানপতন অনেক ভাঙ্গাগড়া অনেক ঘাত প্রতিঘাত পশ্চিমবাঙলার এই প্রাচীনতম অঞ্চলে ঘটে গেছে। এই অঞ্চলগুলিকে একই সীমারেখার আওতায় রেখে একটি বিশেষ অঞ্চলে রূপায়িত করা যায়। রাণীগঞ্জ কেন, আরো উত্তর পূর্বে নলহাটি, অণ্ডাল, গঙ্গাজলঘাটি, বাঁকুড়া, শিমলাপাল, গড়বেতা, শালবনি, মেদিনীপুর, দাঁতন, জলেশ্বর পর্যন্ত দক্ষিণে, তাহলে সেই রেখার পশ্চিমে যে অংশ পড়ে তার ভৌগোলিক প্রকৃতি একরকম এবং পূর্বাংশের অন্যরকম দেখা যায়।……বীরভূমের কিছুটা অংশ বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ এবং মেদিনীপুর (উত্তরপশ্চিম : ঝাড়গ্রাম) এই রেখার পশ্চিমে পড়ে। বাঙলাদেশের মধ্যে এই অঞ্চলই হলো প্রাকৃতিক বয়সের দিক থেকে সব চেয়ে প্রাচীন।'[১]

বস্তুতঃ উত্তর বিহারের দক্ষিণসীমায় গঙ্গানদী অতিক্রম করে, বাঙলা বিহার সীমান্ত ধরে সোজা দক্ষিণ দিকে পরিক্রমণ আরম্ভ হোক; বন-পাহাড়-নদী-নালা-মাঠ-ঘাট, শাল-মহুল-পলাশ-কুর্চির স্পর্শ নিয়ে চলে আসুন, দেখতে পাবেন রাজনৈতিক সীমারেখার এপারেও বাঙলাদেশ ওপারেও বাঙলাদেশ। এপাশে বীরভূমের পশ্চিম সীমানা, ওপাশে সাঁওতাল-পরগণা; এপাশে পশ্চিম

১। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ

বর্ধমান, ওপাশে ধানবাদের খনি অঞ্চল; এপাশে পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর, ও পাশে চাষ-চাণ্ডিল-ধলভূম। বলা বাহুল্য, কৃত্রিম এই সীমারেখা। এ রেখা দুপাশের মানুষকে ভাগ করতে পারে নি। ভূ-প্রকৃতি, সমাজ-বিন্যাস, ভাষা-সংস্কৃতির আত্মিক বন্ধনে এই দুটি পাশ এক এবং অভিন্ন।

'বাঙ্গালীর ইতিহাসে' ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এই ভূ-প্রকৃতির কথা আরো বিশদভাবে বিবৃত করেছেন।[১]

১...উত্তর বিহারের দক্ষিণসীমা ধরিয়া রাজমহল পাহাড়ের ভিতর দিয়া মালদহের পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা ঘেঁসিয়া গংগা বাঙ্‌লাদেশে আসিয়া ঢুকিয়াছে।......

রাজমহল ও গংগার দক্ষিণে বর্তমান সাঁওতাল পরগণা প্রাচীন—উত্তররাঢ়ের উত্তর-পশ্চিম অংশ—ভবিষ্য-পুরাণে এই ভূমিকে বলা হইয়াছে অজলা, উষর, জঙ্গলময় ভূমি, যেখানে কিছু কিছু লৌহ আকর আছে, যেখানে তিনভাগ জঙ্গল একভাগ গ্রাম, স্বল্পভূমি মাত্র উর্বর। ভবদেব ভট্টের একাদশ শতাব্দীর লিপিতেও এই ভূমিকে বলা হইয়াছে উষর ও জঙ্গলময়, ইহাই য়ুয়ানচুয়াং বর্ণিত কজঙ্গল। সপ্তদশ শতকে রাজা জয়নাগের (রাজধানী কর্ণসুবর্ণ) বপ্পঘোষবাটপট্টোলীতে ঔডুম্বরিক বিষয় নামে একটি ক্ষুদ্র জনপদের উল্লেখ আছে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের উদুম্বর সরকার পূর্ণিয়া সরকারের দক্ষিণসীমা হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে মুর্শিদাবাদ বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বস্তুতঃ, রাজমহল ও সাঁওতালপরগণার কিয়দংশ যে বাংলার অন্তর্গত ছিল এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। বাঁকুড়ার পশ্চিমসীমায় মানভূম জিলা বর্তমান বিহারের অন্তর্গত, অথচ এই মানভূম প্রাচীন মল্লভূমি: মালভূমেরই অন্তর্গত (...বর্তমানে মানভূম জেলার অংশবিশেষ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পুরুলিয়া জেলা রূপে আখ্যাত)। বাঁকুড়া ও মানভূমের ভিতর কোন প্রাকৃতিক সীমা নাই; সেই সীমানাই মানভূম অতিক্রম করিয়া একেবারে ছোটনাগপুরের শৈলশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই শৈলশ্রেণীই এই দিকে প্রাচীন বাংলার সীমা। ভাষায় ভূ-প্রকৃতিতে সমাজে ও কৌমবিন্যাসে সাঁওতাল-পরগণার সঙ্গে যেমন উত্তর বীরভূমের তেমনি মানভূমের সংগে বাঁকুড়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। দক্ষিণে মেদিনীপুরের পশ্চিম দক্ষিণ সীমায় বালেশ্বর জেলা উড়িষ্যার অন্তর্গত এবং সিংভূম বিহারের। এই দুইটি জেলারই কতকাংশ মেদিনীপুর জেলার যথাক্রমে কাঁথি, সদর, ঝাড়গ্রাম মহকুমার সংগে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যুক্ত—ভাষায়, ভূ-প্রকৃতিতে, সামাজিক সংহতিতে এবং কৌমবিন্যাসে। সম্প্রতি, মেদিনীপুর সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত মহারাজ শশাংকের যে তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে উৎকলদেশও সপ্তম শতকে দণ্ডভুক্তির (বর্তমান দাঁতনের) অন্তর্গত ছিল। যে-কোনও প্রাকৃতিক ভূমি-নকসা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে রাজমহল হইতে এক অনুচ্চ শৈলশ্রেণী এবং গৈরিক পার্বত্যভূমি দক্ষিণে সোজা প্রসারিত হইয়া একেবারে ময়ূরভঞ্জ, কেওঞ্ঝর, বালেশ্বর স্পর্শ করিয়া সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই শৈলমালা এবং গৈরিক মালভূমিই সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর, মানভূম সিংভূম এবং ময়ূরভঞ্জ—বালেশ্বর কেওঞ্ঝর শৈলমালার অরণ্যময় গৈরিক উচ্চভূমি এবং বাঙলার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পশ্চিমসীমা। বাঙলার ভাষা, সমাজবিন্যাস, জন ও কৌমবিন্যাস এবং উত্তর রাঢ় ও পশ্চিম দক্ষিণ মেদিনীপুরের ভূ-প্রকৃতি এই সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

সীমান্তবাঙ্‌লার এই সমস্ত অঞ্চলের যে অংশগুলি একদা 'জংগলমহল' নামে পরিচিত ছিল—সেই অংশগুলির বিশেষ একটি সাংস্কৃতিক পটভূমি আছে। সীমান্তবাঙ্‌লার লোকযান প্রসঙ্গে মূলতঃ এই অঞ্চলগুলিকেই মুখ্যস্থান দেওয়া হয়েছে। মানভূম, ধলভূম, পশ্চিম বাঁকুড়া আর উত্তর-পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের প্রকৃতিগত এমন একটি স্বাতন্ত্র্য আছে, যা সারা সীমান্ত-বাঙ্‌লার অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যেও একক এবং অবিচ্ছিন্ন। এর ভূমি-রাজ্যগুলির সর্বাঙ্গে প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের ছাপ আজো বর্তমান। বস্তুতঃ ভাষা ও সংস্কৃতির দিক্ থেকে এর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য সহজেই পরিলক্ষিত হয়। যে সমস্ত ভূমি-রাজ্যগুলির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, একমাত্র বীরভূম এবং তুঙ্গভূম ছাড়া অন্য সবগুলিই এই সীমানার অন্তর্গত। এদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ইতিহাস ভূগোলের সীমাতেই আবদ্ধ নয়; সচল জীবনপ্রবাহের একই স্রোত এখানে প্রবহমান। ইতিহাসের একই স্বাক্ষর এর পটভূমিতে। ভূগোলের একই আয়তন এর বিস্তারে। পশ্চিম বাঙ্‌লার পশ্চিম সীমান্তে সম্পূর্ণ নোতুন আর এক সংস্কৃতি-কেন্দ্র।

এই সব পুরাভূমির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাঁকুড়া জেলার বন-আসুরিয়া গ্রামে প্রস্তরযুগের কুঠারফলকাদি এবং ধলভূম-মানভূমে প্রাপ্ত প্রস্তরময় কুঠার আজো প্রস্তরযুগের স্মৃতিবাহী। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের বিনপুর থানার তামাজুড়ী গ্রামে তাম্রময় কুঠার ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে; লালগড়ে পাওয়া গেছে নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার। বর্ধমানের দুর্গাপুর অঞ্চলে পাওয়া গেছে প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্রশস্ত্র। এদিকে, পুরুলিয়ার ছড়রা, পাকবিড়রা প্রভৃতি গ্রামের জৈনমূর্তিগুলি জৈন-যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মানভূমের কোন কোন জায়গায় সরাক জাতির অবস্থিতিকে 'শ্রাবক'দের শেষ পর্যায় বলে অভিহিত করা হয়। এই জাতি আজও জীবহিংসার বিরুদ্ধবাদী এবং নিরামিষভোজী।

এই সব প্রান্তভূমি বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করেছে। অনায়াসে কোন বিদেশী শক্তি এ সব অঞ্চলে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। না ধর্মচর্চার পথে, না রাষ্ট্রশাসনের পথে। আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই অঞ্চলের গণ-বিপ্লবের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল।

কবে কোন্ যুগে, ইতিহাসের এক বিস্মৃত পৃষ্ঠায় প্রাচীন সভ্যতার রূপরেখা এখানে অংকিত হয়েছিল, তার নিশ্চিত তারিখ আজ অবলুপ্ত, কিন্তু মানভূম-

ধলভূমের গভীর অরণ্যে আজও তার নিদর্শন মেলে। সুবর্ণরেখার তীরভূমিতে, আজো আছে প্রাচীন কোন নগরের ধ্বংসাবশেষ, ডুল্‌মী গ্রামের সীমানায়। শ্বাপদ-সংকুল ঘন বনের মধ্যে মন্দির আর আম্রকুঞ্জ, আজো স্মরণ করিয়ে দেয় ফেলে-আসা আরেক যুগের কথা-কাহিনী। ধলভূমের পূর্ব সীমান্তে বহড়াগোড়া থানার অন্তর্গত খাঁড়ামৌদা গ্রামে লোহাগালানো প্রস্তর চুল্লীর বহুল সমাবেশ, এ অঞ্চলে অসুর জাতির অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যাদের কিছু অংশ আজো অবস্থান করছে রাঁচি জেলার গভীর অরণ্যে। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত দিপ্‌কিয়ারচাঁদ গ্রামসীমান্তে অগণ্য প্রস্তরস্তম্ভ সে অঞ্চলে অনার্য আধিপত্যের ধ্বজা বহন করছে আজো।

সীমান্ত রাঢ়ভূমির এইসব অঞ্চল বহু প্রাচীন কাল থেকে রাঢ় বাঙলার অবিচ্ছিন্ন অংশ ছিল। পরবর্তী কালে নানা রাজনৈতিক কারণে এই সীমান্ত-ভূমিকে বারংবার বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তার জের আজো শেষ হয় নি। 'জংগলমহল' নামে অভিহিত যে অঞ্চলটি একদা ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তি সৃষ্টি করেছিল এবং সেই অঞ্চলের গণ-বিদ্রোহ দমনের জন্যই শেষপর্যন্ত জংগলমহলকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে আবার বিভিন্ন অঞ্চলের সৃষ্টি করেছিল, সেই অঞ্চলের যে সত্তা তাকে তারা খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত করতে পারেনি। ভাষা-সংস্কৃতির দৃঢ় গ্রন্থনে এই অঞ্চলগুলি সুনিবদ্ধ। নির্বাধ এবং অবিচ্ছেদ্য সেই গ্রন্থন। মানভূম-ধলভূম-মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার মধ্যে সেইসব মহলগুলি তাদের অতীত আর ভবিষ্যৎ নিয়ে আজো বর্তমান।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে তেইশটি পরগণা এবং মহল নিয়ে এই জংগলমহল জেলা গঠিত হয়েছিল। সে সময়ে বীরভূমের সীমারেখা মানভূম-বাঁকুড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের প্রায় সবটুকুই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। গোটা মানভূম (পুরুলিয়া-ধানবাদ) ; সারা ধলভূম, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বাঁকুড়া এবং বর্তমান বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ নিয়ে এই জংগলমহল একই সূত্রে গথিত ছিল। ব্রিটিশ রাজত্বের সূত্রপাত হতেই এই সব অঞ্চলে সমতল ভূমির মানুষ এসে আত্মীয়তা স্থাপন করে জংগলমহলের মানুষগুলির সঙ্গে। অবশ্য, তার বহু আগে থেকেই এই সব অঞ্চলের হিন্দু রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সমতলবাসী কিছু কিছু হিন্দু এবং মুসলমান, রাজশক্তিকে নানাভাবে সাহায্য করার জন্য অবস্থান করছিল।

বিদেশীর ইতিবৃত্ত এই জংগলমহলের মানুষগুলিকেও অভিহিত করেছে দস্যু

নামে। বলেছে: বর্বর, চুয়াড়, বন্য। স্বাধীনতাপ্রিয় এই মানুষগুলি বার বার বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং বলা বাহুল্য, এই সব অঞ্চলে ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বেগ পেতে হয়েছে সব চেয়ে বেশী। ক্ষত্রিয় নামধারী আঞ্চলিক ভূস্বামীদের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াও ব্রিটিশ শক্তিকে বার বার মোকাবিলা করতে হয়েছে জনশক্তির সঙ্গে। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় একশ' বছরের ইতিহাসে এই সীমান্তভূমির জনশক্তি উজ্জ্বল হয়ে আছে। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৭৪ পর্যন্ত ধলভূম রাজার স্বাধীনতা সংগ্রাম; ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ সুরু হলো বিষ্ণুপুরে। ক্রমাগত তথাকথিত চুয়াড় বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ, ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে রক্তস্বাক্ষর রেখে গেল। সিপাহী বিদ্রোহেও পিছিয়ে থাকল না সীমান্তবাঙ্‌লা। 'চুয়াড় বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়ে জনশক্তির যে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতা সংগ্রামকে নিন্দিত করা হয়েছে, তা দীর্ঘকাল ধরেই চলেছিল। ইংরাজের সৈন্যবাহিনীকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে এই গণ-উত্থান দমন করার জন্য। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিজ-বিদ্রোহের পর জংগলমহলকে ভেঙ্গে চুরে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে দিয়ে আঞ্চলিক সমগ্রতাকে বিনষ্ট করা ছাড়া অন্য কোন উপায় খুঁজে পেলো না ব্রিটিশ রাজশক্তি।

এ সব, ব্রিটিশ-শক্তির স্বীকৃত ইতিহাসের কথা। সীমান্তবাঙ্‌লার সত্যকারের ইতিহাস আজো রচিত হয়নি। নানা কাহিনীতে সে কথা ছড়ানো আছে। এর সম্পূর্ণ ইতিহাস যদি কথা বলতে পারে, তা হলে আমরা যা শুনবো, তা এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। কিন্তু ইতিহাস কথনের দায় অন্যের। এই ইতিহাস যারা রচনা করেছিল, তাদের জীবন-চর্যার কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এই গ্রন্থে। সীমান্তবাঙ্‌লার সর্বত্র তারা ছড়িয়ে আছে। তারা সীমান্তবাঙ্‌লার বাঙ্‌লাভাষী জনগোষ্ঠী। ভূমিজ-মাহাতো-মাহলী, বাগ্‌দী-বাউরী-মাল, হাড়ি-মুচি-ডোম, লোধা-খাড়িয়া-ভূঞা, লোহার-কাহার-কুর্মি। আর আছে প্রাণধর্মী সাঁওতাল। কিন্তু সাঁওতালদের কথা এখানে গৌণ। সীমান্তবাঙ্‌লার ইতিহাসে এই জাতির অবদান অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির রাজ্যে এদের বৈশিষ্ট্য এরা আজো এমন ভাবে বজায় রেখেছে, যার ফলে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের আচার-বিচার পুজা পার্বণের গণ্ডীর বাইরেই এরা প্রাণবান। আমি শুধু তাদের কথাই বলবো যারা হিন্দুসমাজব্যবস্থার পথ ধরে

হাঁটছে অথবা হাঁটতে সুরু করেছে, যারা বাংলাভাষাকে গ্রহণ করেছে পুরোপুরি এবং সংস্কৃতিগত ভাবে প্রায় একত্বের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালী জনসংস্কৃতির একটি নোতুন কেন্দ্রহিসেবে মানভূম-ধলভূম সীমান্ত বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চলকে এক সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলের কিছু অংশও এরই মধ্যে পড়বে। মূলতঃ এই উচ্চাবচ কংকরময় এবং অরণ্য-পর্বতপূর্ণ-ভূমিজাত মানুষগুলির জীবনচর্যার কয়েকটি দিক নিয়েই এই আলোচনা। সংস্কৃতিগত ভাবে এই অঞ্চলের অনার্যভাষী এবং আর্যভাষী জনগোষ্ঠীগুলি কোন-না-কোন সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। অতএব, এখানে বিশেষ কোন গোষ্ঠীর কথা বলতে গেলেও নির্বিশেষের আগমন অবশ্যম্ভাবী। অনার্য-সংস্কৃতির যে রূপান্তরে বাঙ্গালী সংস্কৃতির জন্ম তার প্রত্যক্ষ রূপ আমরা চোখে দেখিনি, কিন্তু সংস্কৃতি বিশ্লেষণের ফলে তার অনেক দিক আমাদের বোধগম্য হচ্ছে। সীমান্তবাঙ্‌লার জনসংস্কৃতি এই রূপান্তরকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে চিনিয়ে দিতে পারবে। অনার্যসংস্কৃতির ভিতর থেকে আর এক নব জনসংস্কৃতির উদ্‌ভব এখানে হয়েছে যা ক্রমশঃ বৃহৎ হিন্দুজনসংস্কৃতির ইতিহাসের পথ ধরে অগ্রসরমাণ। সাঁওতাল-মুণ্ডা হো-ওরাওঁ প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের গোষ্ঠীভুক্ত মানুষগুলি তাদের গোষ্ঠীর বাঁধন ছিড়ে কেমন করে আর এক নতুন গোষ্ঠী নতুন সংস্কৃতির পর্যায়ে এসে পড়েছে, সেই কথাই বলছি। এই মানুষগুলির আচার-নিষ্ঠা, শিল্প-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, পুরাণ-কাহিনী এবং সমাজব্যবস্থায় আজো সেই মূলগোষ্ঠীগুলির উজ্জ্বল ছাপ। এ যেন অন্তর্ভেদ করে পাখির ছানার কচি কচি ডানা ঝাড়ার ইতিহাস। তার গায়ে সেই ডিমের গন্ধ লেগে আছে; সামনে নোতুন পৃথিবীর আহ্বান। সীমান্তবাঙ্‌লার জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রধানতঃ কুর্মক্ষত্রিয় সম্প্রদায় এবং ভূমিজসম্প্রদায় নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। মূলতঃ এদের জীবনচর্যার ধারাই সীমান্তবাঙ্‌লার সংস্কৃতি। বাগ্‌দী-বাউরী-লোহার-কাহার-মাল প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলির জীবনচর্যাও এদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে পৃথক। এরা মূলতঃ হিন্দুগোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত বলে বহু প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃতিলাভ করেছে। বলা বাহুল্য, বাগ্‌দী-বাউরী-ডোম-গোষ্ঠীগুলি বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়াতেই সুপ্রতিষ্ঠ; এই সমস্ত জেলায় এদের সংখ্যা অনেক। সীমান্তবাঙ্‌লার যে সব অঞ্চলের কথা আমি বলতে যাচ্ছি, সেখানে এদের সংখ্যা অল্প।

॥ চার ॥

নৃ-তত্ত্বের মতানুসারে সীমান্তবাঙ্‌লার এই অধিবাসিগণের অধিকাংশ গোষ্ঠীই আদি-অস্ট্রেলীয় বংশসম্ভূত। সারা বাঙ্‌লা দেশের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে এই বংশধারা সুচিহ্নিত। অবশ্য একথাও স্বীকৃত যে বাঙ্গালীজাতি বহু উপজাতি ও বহু বর্ণের মিলন-ফল এবং মূলতঃ অনার্যভাষীদের রক্তই বাঙ্গালীজাতির ধমনীতে প্রবহমান। সীমান্তবাঙ্‌লার কয়েকটি গোষ্ঠী আজও অষ্ট্রিকভাষী। সাঁওতাল, মুণ্ডা, মাহ্‌লী—প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। অন্য কয়েকটি প্রাক্-অষ্ট্রিকভাষী সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে আর্যভাষাকে গ্রহণ করেছে। সিংসর্দার উপাধি-যুক্ত 'ভূমিজ' নামক মুণ্ডা সম্প্রদায়ভুক্ত গোষ্ঠী কোন কোন অঞ্চলে অষ্ট্রিকভাষাকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছে। কোথাও বর্জন করার কাজে এখনও ব্যস্ত। ফলে, সীমান্তবাঙ্‌লার একই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষগুলি ভাষাগতভাবে দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং বোধহয় তার অনিবার্য ফলরূপে সংস্কৃতিগত পার্থক্যও এখানে দেখা দিয়েছে। বলা বাহুল্য, বাঙ্‌লাভাষী এই সব জনের জীবনচর্যার মধ্যে সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, বীরহড় প্রভৃতি অষ্ট্রিকভাষী জনের ঘনিষ্ঠ প্রভাব তাদের ঐক্যের সূত্রটিকে বিধৃত করে আছে।

আর্যভাষা এবং অষ্ট্রিকভাষা এখানে পরস্পরের সম্মুখীন। এর একদিকে ছোটনাগপুর আর সাঁওতালপরগণার অরণ্যভূমি এবং অনার্যভাষা, আর একদিকে মধ্য বাঙলার সমতলভূমি এবং আর্য ভাষা। এর মধ্যবর্তী ভূভাগে প্রাক্-অনার্যভাষী গোষ্ঠী। যে সমস্ত আর্যভাষী মানুষ একদা এ অঞ্চলে পদার্পণ করেছিল, তারাই হয়তো আর্য ভাষার প্রচার করেছে। অষ্ট্রিক এবং দ্রাবিড় ভাষী জনগোষ্ঠীর সংগে আর্যভাষী মানুষ, এইসব ভূমিতেই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটিয়েছিল; আজ-ও সে যোগাযোগের পালা শেষ হয় নি। এরই মাঝে যে কয়েকটি প্রাক্-অনার্যভাষী গোষ্ঠী আর্য ভাষাকে গ্রহণ ক'রে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের দিকে এগিয়ে চলেছে, তাদের মধ্যে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রত্যক্ষ রূপায়ণ। এদের নানা আচরণে তার উজ্জ্বল পরিচয় আছে।

অবশ্য একথা ঠিক যে, আর্য আগমনের পূর্বে, বাঙ্‌লাদেশে যে সব অনার্যভাষী গোষ্ঠী বাস করতো, তাদেরই আচার-অনুষ্ঠান ধর্ম-বিশ্বাস-

সংস্কার, সব কিছুই বাঙালী সংস্কৃতির গোড়ায়। বৃক্ষপুজা-ধ্বজাপুজা চড়কপুজা, পাহাড়-নদী-পশু-পাখির পুজা সব কিছুই অনার্য সংস্কৃতির দান। বাঙলাদেশের সর্বত্রই অনার্য সংস্কৃতি সম্ভূত গ্রাম-দেবতার পুজার্চনা অনুষ্ঠিত হয়। মনুনিষিদ্ধ এই সব গ্রাম-দেব-দেবীর দল সীমান্তবাঙ্‌লার দেবসমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। অষ্ট্রিকভাষী সমাজে তো এদের স্থানই সর্বাগ্রে। সীমান্তবাঙ্‌লার যে সব গ্রাম-দেব-দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের বেশ কয়েকটি এখনো সাঁওতাল-মুণ্ডাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত। ক্ষেত্রপাল, শীতলা, মনসা, বাশুলী, রংকিণী, ভৈরব ছাড়া-ও এই গ্রামদেবতার সমাজভুক্ত অনেক ছোট বড় দেব-দেবী। অনার্যভাষী গোষ্ঠীর বড়াম, বডপাহাড়ী, মারাংবুরু প্রভৃতি দেবতাগুলি, সীমান্তবাঙ্‌লার বহু হিন্দু গ্রামেও সম্মানিত। বলা বাহুল্য, সীমান্তবাঙ্‌লার প্রত্যেক গ্রামেই গ্রাম-দেবতার সসম্মান অধিষ্ঠান। দুর্গা কালী শিব অথবা যে কোন পুরাণসম্মত দেবদেবীর পূজা-অর্চনার পূর্বে এইসব গ্রাম-দেবতাদের সন্তোষবিধান অবশ্যকৃত্য। গ্রামসীমান্তে 'জাহেরথান' এবং 'গরামথান' না থাকলে তাকে সীমান্তবাঙ্‌লার গ্রাম বলাই চলে না। অসংখ্য গ্রামে, গ্রামের নাম অনুসারেও গ্রামদেবতার নাম পাওয়া যায়। তা ছাড়া সাধারণতঃ 'সিনি' বা 'সুনি' শব্দযুক্ত অসংখ্য দেবীর নামও পাওয়া যায়। পাখরাসুনি, দুয়ারসিনি, কুদরাসিনি, সাতবহিনী প্রভৃতি গ্রামদেবীর সংখ্যাও এ অঞ্চলে অনেক।

যে সমস্ত পর্ব পার্বণের উৎসব সারা বাঙ্‌লাদেশে প্রচলিত, তার বেশ কিছু অংশ মুলতঃ কৃষি-উৎসবের পর্যায়ভুক্ত। সীমান্তবাঙ্‌লার প্রায় প্রত্যেকটি উৎসবেই কৃষি-সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য। করম, ঈদ, বাঁধনা, টুসু প্রভৃতি প্রাচীন কৃষি উৎসবেরই বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন ঋতুগত অনুষ্ঠান। নাচে এবং গানেও এই ঋতুগত বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ছোটনাগপুরের এবং সীমান্তবাঙ্‌লার আদিম-অধিবাসীদের সমাজেও এই উৎসব এবং নৃত্যগীতের ঋতুগত বিভিন্ন রূপ বিদ্যমান। বলা বাহুল্য, কয়েকটি বিশেষ জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'রে আঞ্চলিক সংস্কৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বর্ণ-হিন্দু নামে কথিত সম্প্রদায়গুলি, মুখ্যতঃ এই আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রভাবযুক্ত হলেও ধারক নয়।

॥ পাঁচ ॥

সীমান্তবাঙ্‌লার বাঙ্‌লাভাষী আদি বাসিন্দাদের অন্যতম 'মাহাতো' সম্প্রদায়। বর্তমানে এই সম্প্রদায় কূর্মক্ষত্রিয় নামে পরিচিত। প্রচলিত নাম কুরমী বা কুড়মী। মানভূম-ধলভূম-ঝাড়গ্রাম এবং ময়ূরভঞ্জ সীমান্তে এদের বাসভূমি। সীমান্ত সংস্কৃতির যে বৈশিষ্ট্য, তার অধিক-অংশই এই সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য। উপবীত ধারণ করে ক্ষত্রিয়ত্ব দাবীর আন্দোলন একদা এই সমাজের মধ্যে সাড়া তুলেছিল। 'কূর্মক্ষত্রিয়' শব্দটিও খুব বেশীদিনের আমদানী নয়; ক্ষত্রিয়জাতিরূপে স্বীকৃতিলাভের প্রচেষ্টার সংগেই এই নামটি জড়িত। বিংশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকেই এর জন্ম। সীমান্তবাঙ্‌লার এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়টি বর্তমানে শিক্ষা-দীক্ষার রাজ্যে অগ্রসরমান। এদের বাদ দিলে সীমান্তবাঙ্‌লাও থাকে না, সীমান্ত-সংস্কৃতিও থাকে না। হিন্দু-সমাজ-ব্যবস্থায় যে বর্ণবৈষম্য আছে, তার ফলে এরা ক্ষত্রিয় পরিচয় বহনে উদ্‌গ্রীব হয়েছে সন্দেহ নেই।[১] কিন্তু একথা সত্য যে ক্ষত্রিয়ত্বের অহমিকা এদের গ্রাস করে নি। কৃষিজীবীরূপেই এদের জীবনচর্যা। এদের সম্প্রদায়ের সকলের পদবীই 'মাহাতো'। আদিতে গ্রাম প্রধানেরই উপাধি ছিল 'মাহাতো'। এদের মধ্যে জাতিভেদের প্রথা নেই, কিন্তু উপবীত ধারণের আন্দোলনের ফলে কোন কোন অঞ্চলে উচ্চ, মধ্যম এবং নীচ কুর্মি বলে পরিচয় দানের সামান্য আগ্রহ

১। আচার্য স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীন বাঙলার রাঢ় সুহ্ম বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন অনার্য-ভাষী জাতি সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন :—

'এখন এই সব জাতি নিজেদের আর্য ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলে পরিচয় দিচ্ছে; এই সকল জাতির দ্বারা শূদ্র আখ্যা ত্যাগ ক'রে ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্বের বা বৈশ্যত্বের দাবীটি হ'চ্ছে,—মূলতঃ—উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের আর বৈশ্যের তথা-কথিত আর্যত্বের বিরুদ্ধে একরকম প্রতিবাদ মাত্র,—আমরাও তোমাদের চেয়ে কম নই, তোমাদের মতো আমরাও আর্য, দ্বিজ! আমি এই প্রতিবাদের অন্তর্নিহিত ভাবটি বুঝি, আর তার সঙ্গে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে।......কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে ঐ ব্যাপারটি দেখলে স্বীকার করতেই হবে যে বাঙ্‌লার আদি অনার্য (কোল বা দ্রাবিড়ভাষী Dravidian Long heads, Alpine আর Mongoloid শ্রেণীর) মানবগণ থেকে উৎপন্ন এই সব জাতের বংশধরদের কেবল উত্তরভারত থেকে আগত North Indian Long-heads লম্বা-মাথা আর্যভাষীকেই পূর্বপুরুষরূপে কল্পনা করা চলে না—।..."

বাঙলাভাষা আর বাঙালী জাতের গোড়ার কথা

(বাঙ্‌লা-ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা)

পরিলক্ষিত হয়। এদের বিবাহাদি অনুষ্ঠান আদিমজাতির জীবনধারা বয়ে চলেছে আজ-ও। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত শাসিত হিন্দু সমাজের নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান এরা ক্রমশঃ গ্রহণ করতে চলেছে বটে, কিন্তু মূলতঃ এদের আচার-অনুষ্ঠানে, উৎসবে-প্রথায় আদিম বৈশিষ্ট্য আজও বর্তমান। এদের গানের মূর্ছনায় সীমান্তবাঙ্‌লা মুখরিত ; এদের পর্ব-পার্বণে প্রাণ প্রবাহের চাঞ্চল্য।

বলা বাহুল্য, উত্তর ভারতের হিন্দিভাষী কুরমী এবং ছোটনাগপুরের গোয়ালা-মাহাতোর সংগে এদের নৃতাত্ত্বিক কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা বিচার সাপেক্ষ। নৃতত্ত্বের বিচারে এরা বৃহত্তর অষ্ট্রিকভাষী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে অনেকে মনে করেন ; আবার অনেকের মতে এরা আসলে উক্ত গোষ্ঠীর মানুষ নয়। যাই হোক্, 'মাহ্‌তো' শব্দটি ওরাওঁ ভাষার মধ্যেও বিদ্যমান। ওরাওঁ গ্রামের প্রধান ব্যক্তির উপাধি 'মাহাতো'। বলা বাহুল্য, গ্রাম-প্রধানদের এই উপাধিটি কুরমী সম্প্রদায় নিজের গোষ্ঠী-নামের সংগে জড়িত করেছে। কুরমী-মাহাতো রূপেই সাধারণ্যে এদের পরিচয়।

মাহাতোদের মধ্যে যে উপকথার প্রচলন আছে, তাতে অবশ্য উত্তর ভারত থেকেই এদের আগমনের কথা প্রচলিত। এ কথা ঠিক যে, এই সম্প্রদায় মানভূম অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসীদের অন্যতম ; প্রতিবেশী হিসাবে সাঁওতাল জাতির সংগে এদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং সাঁওতাল জাতি কুরমী-মাহাতোদের অগ্রজের সম্মান দেয় আজও।

কূর্ম বা 'কুরুম' টোটেম থেকেই 'কুরমী' নামের উৎপত্তি। এদের গোত্র-ভাগের মধ্যে কুরুম গোত্র অন্যতম। যতদূর জানা গেছে, তাতে মানভূম অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের চারটি উপসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে। এই উপসম্প্রদায়গুলির প্রচলিত নাম : কুরুম, আধ-কুরমী বা মধ্যম কুরমী, শিখরিয়া বা ছোট কুরমী আর নীচ কুরমী। তবে, এই উপসম্প্রদায়গুলি প্রায়ই আঞ্চলিক ; প্রত্যক্ষভাবে সম্প্রদায়ভেদ বা জাতিভেদের কোন লক্ষণই এদের মধ্যে নেই। ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে যে চারটি উপসম্প্রদায়ের নাম পাওয়া গেছে, তাদের নাম পশু টোটেম-যুক্ত। গাইসরি, মইষাসরি, বাঘসরি এবং গাধাসরি নামেই এই উপসম্প্রদায়গুলি পরিচিত।

শিখরভূমের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে এই সমাজের পৌরোহিত্য করার ভার গ্রহণ করেছে। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে বিবাহ ছাড়া

অন্যান্য উৎসব-যজ্ঞে এই পুরোহিতের ডাক পড়ে। মানভূম এবং ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে সাধারণতঃ শ্রাদ্ধকর্মে পুরোহিতের প্রয়োজন হয়; বিবাহাদি উৎসব এবং অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠান গ্রামবৃদ্ধ এবং লায়ার দ্বারাই উদ্‌যাপিত এবং সমাপ্ত হয়। অধুনা বিবাহ উপলক্ষেও ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োজিত হচ্ছে।

'মাহাতো' সম্প্রদায়ের মধ্যে সাঁওতাল-মুণ্ডাদের মতোই বারোটি গোত্র বিদ্যমান। বলা বাহুল্য, গোত্রগুলির কয়েকটি টোটেম-জাত। অপর কয়েকটি বোধহয় পেশাগত নামমাত্র। এই পেশাগত গোত্র-নামগুলি—জালবুনার (জালিক), শাঁখোয়ার (শংখবাদ্যকর), তীরোয়ার (তীরন্দাজ), এবং কাটিয়ার (তসরের গুটি সংগ্রহকারী তসর-বস্ত্রবয়নকারী)। টোটেমজাত গোত্র: কাড়া (মহিষ), ডুমরিয়া (ডুমুরগাছ), ছোঁচমুতরা (মাকড়সা), কুরুম (কচ্ছপ), বাঘুয়ার (বাঘ), কেশরিয়া (কেশরঘাস) প্রভৃতি।

কালী, দুর্গা, শিব, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা এদের সমাজে বহু পূর্বেই গৃহীত। কিন্তু সাধারণতঃ বড়পাহাড়, গোঁসাইএরা, ঘাট, বড়াম, ডাকুমবুড়ী, সাতবহিনি, মহামাই, কিঙ্কেশ্বরী প্রভৃতি অপৌরাণিক দেবদেবীর পূজাই এদের সমাজে মুখ্য। বাঁধনাপরব, করম, আখ্যানযাত্রা, ইঁদ, টুসু পরব, জিতিয়া, ছাতা এদের শ্রেষ্ঠ পার্বণ।[১]

'মাহাতো' জাতির অতীত পর্যায় প্রায়-বিলুপ্ত। নোতুন জগতের ভিতরে এরা প্রবেশ করেছে, কিন্তু পুরাতনকে অস্বীকার না করে। অতীতের অনুবর্তী হয়েও এরা সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটাচ্ছে। এদের নাচে-গানে কথায়, পূজা-পাবণে-উৎসবে, মধ্যবর্তী আর একটি যুগ; অতীত আর বর্তমানের মাঝামাঝি পর্যায়ে এদের অবস্থিতি। কৃষিজীবী, এই আদিম জাতির ইতিহাস বদলে যাচ্ছে ক্রমশঃ। সীমান্তবাঙ্‌লার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হয়েও এরা কোনদিন রাজ্যস্থাপন করে নি। এদের উপকথায়, লোকগাথায়—কোন রাজবংশের কীর্তি কাহিনী নেই। মাহাতো-রাজার কোন অস্তিত্বই জানে না ইতিহাস। পঞ্চকোটের রাজাই এদের একমাত্র রাজা এবং অনেকের মতে পঞ্চকোটের প্রথম রাজা কূর্মক্ষত্রিয় বংশেরই লালিত। প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার ভেতরে এরা নিজেদের লালন করেছে। বলা বাহুল্য, নির্বিরোধ এদের ইতিহাস; জন-বিপ্লবের ভূমিকায় সীমান্তবাঙ্‌লার বাগ্‌দী-বাউরী, মাল, ভূমিজদের যে অবদান, সে অবদান এদের নেই। কিন্তু ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে এরা বার বার

১ দ্রষ্টব্য: **Manbhum District Gazetteer—Coupland.**

সাড়া দিয়েছে অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে। আগস্ট সংগ্রামে শহীদ হয়েছে অনেকে। পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি এদেরই আন্দোলনের বিজয়-চিহ্ন।

প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ইতিহাসকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি, সংগ্রামের ভিতর দিয়ে মানুষের সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। মানভূম-ধলভূমের ভূমিজ জাতির ইতিহাস—এই সত্যকে আরও বেশী প্রতিভাত করে। ছোটনাগপুর উপত্যকার আদিম অধিবাসীদের অন্যতম মুণ্ডা গোষ্ঠীরই একটি শাখা এই ভূমিজ সম্প্রদায়। রাঁচির মুণ্ডাদের সংগে এদের আত্মীয়তা সূত্র বিলুপ্ত হয়ে গেছে বললেও চলে। এই বিচ্ছিন্নতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে আচার-আচরণে ধর্ম-চর্যায় এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এরা একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে, যদিও মূলতঃ এরা মুণ্ডাগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকেই অবলম্বন করে এগিয়েছে। এদের অধিকাংশেরই সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে অর্থনীতির বাঁধাপথে। এদের বর্ধিষ্ণু কৃষকরা শেষ পর্যন্ত হিন্দুত্ব গ্রহণের দিকে অগ্রসর হয়েছে। বলা বাহুল্য, এর অনিবার্য ফলরূপে অষ্ট্রিকভাষাকে এরা ত্যাগ ক'রে আর্যভাষা গ্রহণ করেছে। পশ্চিম মানভূম, ধলভূম, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে এদের সংখ্যা অল্প নয়।

সুবর্ণরেখা নদী যেখানে রাঁচি জেলার সীমান্ত অতিক্রম করেছে ঠিক সেইখান থেকেই সুবর্ণরেখার উভয় কূলে এদের বাসভূমি। রাঁচির মুণ্ডাগোষ্ঠীর একটি শাখাই যে পাঁচপরগণা অঞ্চলের ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত মানভূম-ধলভূমে ছড়িয়ে পড়েছিল এ কথা ঠিক। কালক্রমে হিন্দুজাতির সংস্পর্শে এসে এরা কালী, দুর্গা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর ভক্ত হয়ে পড়ে। এবং একথা ঠিক, এর পথ খুলে দিয়েছিল, বর্ধিষ্ণু মুণ্ডারাই যাদের হাতে জমি ছিল। এই জমিবান্ মুণ্ডা-রা ভূমিজ নামে পরিচিত হলো, সংগে সংগে অন্যান্য সকলে-ও এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়লো। অষ্ট্রিকভাষার পরিবর্তে গৃহীত হলো বাংলাভাষা: সীমান্ত রাঢ়ের বাংলা। এদের বর্ধিষ্ণুরা সর্দার উপাধি গ্রহণ করলো। ধলভূমের 'দেশীভূমিজ' সম্প্রদায় এমনি ভাবেই বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করে সাধারণ 'মুঢ়া' (মুণ্ডা) ভূমিজদের সম্প্রদায় থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। বরাভূম, পাতকুম, বাগমুন্ডি, ধলভূম প্রভৃতি অঞ্চলে এই ভূমিজ গোষ্ঠীরই সংখ্যাধিক্য। বলা বাহুল্য, এই ভূমিজ গোষ্ঠী ক্রমশঃ হিন্দুজাতির আর একটি 'জাত' রূপে পরিগণিত হতে চলেছে।

অনেকের মতে প্রাচীন রাঢ়ভূমির অন্তর্গত বজ্রভূমি বা বজ্জভূমির যে সব 'রূঢ়' এবং বর্বর মানুষদের কথা জৈন আচারাঙ্গসূত্তে বর্ণিত আছে,—তারা এই ভূমিজ গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ।

সীমান্তবাঙ্‌লার জমিদারদের রক্ষী সৈন্যদল হিসাবে এরা নিযুক্ত হতো এবং অনেকেই সর্দার ঘাটোয়াল, পাইক প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত হতো। বাঁধাধরা বেতন এরা পেতো না। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় এদের জমি দেওয়া হতো। সীমান্তবাঙ্‌লার ভূস্বামিগণ এদের সহায়তাতেই ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ধলভূম রাজার বিদ্রোহের উৎস এদের শক্তির উপরই নির্ভরশীল ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত সীমান্তবাঙ্‌লায় যতো বিদ্রোহ ঘটেছে, তার সব কয়টিতেই সীমান্তবাঙ্‌লার ভূমিজগোষ্ঠী জড়িত ছিল। 'চুয়াড়-বিদ্রোহ' নাম দিয়ে এদের বিদ্রোহ-কেই কুখ্যাত করার প্রয়াস লাভ করেছেন ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ। বলা বাহুল্য, এই সংগ্রামে বাগ্‌দী, মাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথাও স্মরণীয়।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে খাজনা বাকীর দায়ে পঞ্চকোট রাজ্য যখন নীলামে উঠলো, তখন এদের বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলে ওঠে এবং ইংরাজ শক্তির আদেশ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত তা থামেনি। ধলভূমের রাজগদীতে এদের মনোনীত ব্যক্তিকে বসানো হয় নি বলে, সেখানে এদের রোষ-বহ্নি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল, অষ্টাদশ শতকে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বরাভূমের বিখ্যাত 'গংগানারায়ণ হাঙ্গামা' সংঘটিত হয়েছিল এদের দ্বারাই।[১] বলা বাহুল্য, বরাভূমের ভূমিজ সম্প্রদায় নিজেদের ক্ষত্রিয় নামেই অভিহিত করে।

এদের সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস থেকে আজ-ও বিলুপ্ত হয়নি অষ্ট্রিকগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। বর্ধিষ্ণু ভূমিজদের কেউ কেউ কালী পুজা, মহামায়া পুজা প্রভৃতির জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত করে বটে ; কিন্তু মুখ্যতঃ জাহিরবুরু, বাঘুত, গরাম, বড়াম, কুদরা, বিষাচণ্ডী প্রভৃতির পুজাই এরা করে। বাঁকুড়ার

১। বরাহভূমের রাজা বিবেকনারায়ণের মৃত্যুর পর; ব্রিটিশরাজশক্তির নির্দেশ অনুসারে, বিবেকনারায়ণের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত পুত্র রঘুনাথসিং গদী অধিকার করে। ভূমিজ সম্প্রদায় রঘুনাথসিংকে মনোনয়ন দেয় নি। তারা ছিল পাটরাণীর পুত্র লক্ষ্মণের পক্ষে। লক্ষ্মণসিংকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জেলেই তার মৃত্যু হয়। এই লক্ষ্মণসিংহের পুত্র গংগানারায়ণের পক্ষ নিয়ে ভূমিজ সম্প্রদায় সারা অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

ভূমিজগোষ্ঠীর মধ্যে 'সাতবহিনী' এবং 'বারডেলা' দেবতার পুজা প্রচলিত। করম, বাঁধনা, সরহুল, বিঁধা প্রভৃতি জনপর্বের এরা অংশীদার।

যে সমস্ত ভূমিজভূস্বামী হিন্দু বলে পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই জাত হিসেবে রাজপুত বা ক্ষত্রিয় পরিচয় দিতেই ব্যগ্র। কিন্তু সমগ্র ভূমিজগোষ্ঠীর মধ্যে মুণ্ডা গোষ্ঠীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস আজো বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। পর্ব-পার্বণ এবং বিবাহাদি উৎসবের সমস্ত রীতি-নীতি, আচার-আচরণের একত্ব আজো অস্বীকৃত হয়নি। তবে একথা ঠিক, এই ভূমিজ গোষ্ঠী বৃহৎ হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্তির দিকে ক্রম-অগ্রসরমান।

টোটেম অনুসারী এদের গোত্র, যা মুখ্যতঃ অস্ট্রিকভাষী সমাজেরই। এদেরই কয়েকটি গোত্রের নাম এবং টোটেমের নাম যথাক্রমে সালরিসি (সালমাছ), হাঁসদা (বুনোহাঁস), লেং (ছাতু), সাণ্ডিল্য (একজাতীয় পক্ষী), হেমরম্ (পান), তুমারুং (শশা), নাগ (সাপ) ইত্যাদি।

বাংলাদেশের বর্ণ-বিভাগ করতে গিয়ে রিজ্‌লী সাহেব সাতটি শাখার কথা উল্লেখ করেছেন। ষষ্ঠ শাখার মধ্যে তিনি 'বাগ্‌দী' জাতকেও ফেলেছেন। নিম্নবর্ণের যে হিন্দুরা গো-মাংস বা শূকর-মাংস ভক্ষণে বিরত এবং পতিত ব্রাহ্মণ কর্তৃক উপযজ্ঞিত সেই সব জাত বা সম্প্রদায় এই ষষ্ঠ শাখার অন্তর্ভুক্ত। মানভূমের পূর্বাঞ্চল, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং উত্তর পশ্চিম মেদিনীপুরে এদের সংখ্যা অনেক, লায়েক এবং মল্লক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ও এই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত; যদিও বর্তমানে এরা পৃথক গোষ্ঠীরূপে বর্তমান। সীমান্তবাঙলার প্রাচীনতম অধিবাসী হিসাবে এদের পরিগণিত করা যায়। হিন্দু সমাজের বেষ্টনীর মধ্যে অনেক দিন থেকেই এদের অধিবাস; মাহাতো বা ভূমিজ গোষ্ঠীর সামাজিক পরিবর্তনের যে রূপটি আজো আলোক-বিধৃত, সে রূপটি বাগ্‌দী সম্প্রদায়ের নেই। হিন্দু সমাজ থেকে এরা বিচ্ছিন্ন নয়। এদের আচার আচরণ, পর্ব পার্বণ, দেব দেবীর নিজস্ব একটি গণ্ডী আছে; কিন্তু শিব, দুর্গা, মনসা, প্রভৃতি পৌরাণিক দেবদেবীর পুজা অর্চনা এদের জীবন-সিদ্ধ হয়ে গেছে অতীত কাল থেকেই। সংগে সংগে ধরম রাজ, বড়্‌পাহাড়ী, ভাদু, মানসিং, কুদরাসিনি প্রভৃতি লৌকিক এবং আঞ্চলিক গ্রামদেবতার পুজাই এদের কাছে মুখ্য হয়ে আছে।

নিজেদের উদ্‌ভব সম্পর্কে এদের মধ্যে নানা কাহিনী বিদ্যমান এবং প্রত্যেক কাহিনীর সংগে শিব-পার্বতী প্রায় ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। বলা বাহুল্য, বৃহৎ

বাঙালী হিন্দু সমাজের লৌকিক দেবতা শিবের সংগে এদের লোককাহিনীর সংযোগ এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রাচীনতম বাঙালী জাতির উত্তরপুরুষরূপেই এরা বিদ্যমান। লোকযান চর্চার ক্ষেত্রে এই সমস্ত কাহিনীর বিশেষ মূল্য আছে।[১] এদের মধ্যেও বিভিন্ন উপসম্প্রদায় রয়েছে। বিষ্ণুপুরের রাজকাহিনীর সংগে এই উপসম্প্রদায়গুলির কাহিনী জড়িত আছে।

উড়িষ্যা এবং উত্তর পশ্চিম মেদিনীপুরের দণ্ড-ছত্র মাঝি নামে পরিচিত একটি সম্প্রদায় ও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়। মল্লক্ষত্রিয় নামে পরিচিত মাল জাতির আদি বাসভূমি মল্লভূমিই ; বিষ্ণুপুরের রাজ দেবতা মদনমোহনের সংগে এদের জাতিগত উপাখ্যান জড়িত।

এই বাগ্‌দী জাতি বাঁকুড়াতে সুপ্রতিষ্ঠিত। মালভূমের পুর্বাঞ্চলেও এদের সংখ্যা কম নয়। বাঘ, সাঁতরা (সামন্তরায়), পুইলা (ধানমাপার পাত্র বিশেষ), মাঝি, মশালচি, পালংখাই (পালকী বহনের জন্য যারা পুরুষানুক্রমে জমি পেতো), সর্দার, ধাড়া (ধাটক : সৈন্য), প্রভৃতি উপাধিধারী এদের মধ্যে নানা উপসম্প্রদায় বর্তমান। তেঁতুলিয়া, কাঁসাইকুলিয়া, দুলিয়া, ওঝা, মাছুয়া,

১। একটি কাহিনীতে বলা হয় যে একদা দেবী পার্বতী, মৎস্যজীবী নারীর ছদ্মবেশে শিবকে প্রলুব্ধ করেন। শিবঠাকুর যে অন্য নারীতেও আসক্ত এই কথা প্রমাণ করার জন্যই পার্বতীর ছদ্মবেশ। শিব যখন প্রলুব্ধ হন, তখন পার্বতী স্বমূর্তি ধারণ ক'রে শিবকে বিপদে ফেলেন। এই মৎস্যজীবী-নারীর গর্ভে যাদের জন্ম, তাদেরই নাম বাগ্‌দী। সেইজন্যই বাগ্‌দীদের জীবিকা নির্বাহের উপায় নির্দেশিত হলো মৎস্যজীবীরূপে। আর একটি কাহিনীতে এ প্রসংগে কোচ্‌ জাতির উল্লেখ করা হয়। (বলা বাহুল্য প্রাচীন বাঙ্‌লা-সাহিত্যে শিবঠাকুরের কুচুনী প্রীতির বহু কাহিনী রয়েছে।) বুড়ো শিবের, পার্বতীর প্রতি আর তেমন আসক্তি নেই ; তিনি কোচ্‌ পাড়ায় এসে কুচ্‌নী মেয়েদের সংগেই কাল কাটান। পার্বতী ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরেন। ঈর্ষ্যাতেই তিনি কোচ্‌দের ধানের ক্ষেত নষ্ট করে দিলেন তারপর জেলেনীর ছদ্মবেশে শিবের কাছে এলেন। শিবঠাকুর জেলেনীকে দেখেই ভালোবেসে ফেললেন এবং ভালোবাসার ফলরূপে এই 'জেলেনীর' গর্ভে জন্ম নিল এক মেয়ে এক ছেলে। পরে এই ভাই-বোনের বিয়ে হয় এবং এদেরই সন্তান 'বীর হাম্বীর' বিষ্ণুপুরের রাজা হয়। বীর হাম্বীরের চার মেয়ে : শান্ত, নেতু, মন্ত, ক্ষেতু। এদের গর্ভ থেকে উদ্ভূত হয় : বাঁকুড়া অঞ্চলের বাগদীদের চারটি উপসম্প্রদায় : তেঁতুলিয়া, দুলিয়া, কুশমাটিয়া এবং মাটিয়া।

তৃতীয় এক কাহিনীতে বলা হয় যে, ছদ্মবেশিনী পার্বতীর প্রলোভনে পড়ে শিব যখন কাম-ক্রীড়ায় রত, সেই সময় পার্বতী নিজের রূপ প্রকাশ করেন। মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন যে পার্বতীর এই গর্ভের সন্তানরা নিম্নবর্ণের ব'লে পরিগণিত হবে।

গুলিমাঝি, দণ্ডমাঝি, কুশমাটিয়া, মল্লমাটিয়া, মাটিয়া, মাটিয়াল, প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।[১]

টোটেম অনুসারী গোত্র বিভাগের পর্যায়ে এদের মধ্যে পাওয়া যাবে: কাসবক (বক), পাংখঋষি (মোরগ), সালঋষি (সালমাছ), পাতঋষি (শিম), কাছিম (কচ্ছপ), প্রভৃতি। 'ঋষি' শব্দটি পুরোপুরি আর্য প্রভাব জাত।

সীমান্তবাঙলার বীর সৈনিক হিসাবে এরা আঞ্চলিক ভূস্বামীদের পক্ষ অবলম্বন করে বহুবার লড়াই করেছে। তথাকথিত চুয়াড় বিদ্রোহের সংগে এদের নাম ঘনিষ্ঠরূপে জড়িত। এ প্রসঙ্গে এও বলা দরকার যে 'চুয়াড়' নামে আখ্যাত এই সব বীর সৈনিকদের মধ্যে বাগদী, মাল, ভূমিজ, ভুঞা প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। সে যুগের গণ-বিদ্রোহকে 'চুয়াড়দের বিদ্রোহ' বলে অভিহিত ক'রে ইংরাজ শক্তি একে নগণ্যতার পর্যায়ে ফেলেছিল নানা কারণে।

সীমান্তবাঙলার মানুষ তখনো ব্রিটিশের অধিকারকে স্বীকার করে নি। স্বাধীন জাতি হিসাবে গর্ব করার মতো শক্তিমান তারা ছিল। পাহাড়-বনের প্রাকৃতিক দুর্গ ছিল তাদের সহায়; প্রকৃতিপুষ্ট এই সম্প্রদায়গুলি তখনো ছিল জমির মালিক। সেই জমির উপর যখন রাজশক্তির নজর পড়লো, তখনই তারা এগিয়ে এলো জমির জন্য প্রাণ দিতে। এর ইতিহাস সুরু হলো অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। ১৭৫৭-কে হাতের মুঠোয় পেয়ে, ইংরাজ বোধ হয় ধরেই নিয়েছিল যে সারা বাংলাতে আর কেউ কোথাও নেই যারা তাদের পশুশক্তির সামনে দাঁড়াতে পারে। বলা বাহুল্য, সীমান্তবাঙলার মানুষগুলি তাদের ধারণার মূলে প্রচণ্ড আঘাত করলো। স্তম্ভিত হলো

১। তুলিয়া বাগদীদের আর একটি উপকথা আছে, যাতে শিবের পরিবর্তে রামের নাম জড়িত। বলা বাহুল্য রামচন্দ্রকে অনুরূপভাবে জড়িত করার কাহিনী মৌলিক বলে মনে হয় না। এই উপকথায় বলা হয়েছে যে সীতার দাসীরূপে নিযুক্তা কোন এক তরুণীকে দেখে রামচন্দ্র প্রলুব্ধ হন। এই তরুণীর গর্ভের সন্তানকে রামচন্দ্র পাল্‌কীবাহক হওয়ার নির্দেশ দেন এবং উচ্চবর্ণের মহিলাদেরও বহন করার অধিকার তাকে এবং তার উত্তরপুরুষদের দিয়ে যান। এদের একটি উপকথায় বলা হয়েছে যে দেবতাদের এক সভায় হঠাৎ এক দেবীর তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। লজ্জা পেয়ে সেই দেবী তাঁর সন্তানদের বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখেন। যাকে তিনি তেঁতুলগাছের তলায় লুকিয়ে রাখেন, তার উত্তরপুরুষরা হয় তেঁতুলিয়া বাগদী; যাকে রাখেন লোহার পাত্রে তার উত্তরপুরুষরা হয় লোহার মাঝি আর সন্ন্যাসী-দণ্ডের আড়ালে যাকে লুকিয়ে রাখেন, তার উত্তরপুরুষরা হয় দণ্ডছত্র মাঝি।

ইংরাজ।—কিমাশ্চর্যম্! পলাশীর ময়দানে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত শক্তিকে যারা পরাস্ত করেছে, তাদের সামনে মাথা তুলতে সাহস করে এই আরণ্যক দল! নিশ্চয়ই তারা চুয়াড়, বর্বর। ব্রিটিশ সিংহ ফুঁসে উঠলো। কিন্তু তার কেশরে টান পড়লো বহুবার, কয়েকটি দাঁতও ভাঙলো।

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই 'জংলী মানুষদের' দর্পচূর্ণ করার আয়োজন স্থরু হলো। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আরম্ভ হলো অভিযান। ইংরাজের গতি রুদ্ধ হলো না কল্যাণপুরে; রুদ্ধ হলো না ঝাড়গ্রামে, রামগড়ে, লালগড়ে, জামবনি-সিলদায়। ভূস্বামীরা বাধা না দিয়ে সাদরে এদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং করদানে স্বীকৃত হলেন। কে জানে ইতিহাসের সত্য কি! কারণ ইতিহাসের সত্যরচনার কলম তো ইংরাজদের হাতেই ছিল। সেনাপতি ফার্গুসন ঝাড়গ্রামের দুর্গ কি বিনা বাধাতেই দখল করেছিল! চাকুলিয়ার পথ ধরে এগিয়ে চললো ইংরাজ বাহিনী। ধলভূমের বীর সৈনিকরা তাদের প্রথম বাধা দিল চাকুলিয়া থেকে মাইল পাঁচেক দূরে, বেঁদ গ্রামের সন্নিকটে।

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এবং ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঘাটশীলা থেকে আরম্ভ করে বরাভূম পর্যন্ত অঞ্চলের মানুষ দু দুবার গণ-বিদ্রোহ করলো। ফার্গুসন পালিয়ে এলো এদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। এর মধ্যে সীমান্তবাঙলার কিছু কিছু মানুষ অবশ্য কোম্পানীর সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল এবং এরাই লড়েছিল মারাঠাবাহিনীর সংগে। ধলভূমের রাজার পক্ষ অবলম্বন করে ধলভূমের যোদ্ধারা বারবার কোম্পানীর শক্তিকে বাধা দিচ্ছিল। অষ্টাদশ শতকের একেবারে শেষভাগে ধলভূমের দর্পচূর্ণ করার বিপুল আয়োজন হলো। রাজা জগন্নাথ ধল প্রাণ দিলেন শেষ পর্যন্ত। ব্রিটিশশক্তি এবারে নজর দিলো জমির ওপর। পাইকদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে তাদের শেষ আঘাত হানবার চেষ্টা করলো। গর্জে উঠলো সারা সীমান্তবাঙলার মানুষ। স্থরু হলো পাইক বিদ্রোহ এবং এদের বিদ্রোহকেই ইংরাজরা নাম দিয়ে গেল 'চুয়াড়' বিদ্রোহ।

সর্দার এবং পাইকদের রোষবহ্নি জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। সারা অরণ্য-ভূমিতে দাবানল। জমিহীন নিঃস্ব মানুষের ঘৃণা আছড়ে পড়লো সর্বত্র। শিলদা এবং রায়পুর অঞ্চলে আগুন জ্বললো। একজন বাগদীযোদ্ধার অধীনে চারশো বীর সৈনিক চন্দ্রকোণা দখল করে নিলো। ঝাড়গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত নয়াবাসান এবং বারাজিত আক্রান্ত হলো। দক্ষিণে নারায়ণগড় থেকে

আরম্ভ করে উত্তরে ভঞ্জভূম পরগণা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে গণ-বিদ্রোহীদের প্রতিহিংসার অভিযান ছড়িয়ে পড়লো। শেষপর্যন্ত সীমান্তবাঙ্‌লার ভূস্বামীদের হাতেই জঙ্গলমহলের শাসনভার ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী। পাইক আর সর্দারদের জমি ফিরিয়ে দিয়ে, সীমান্তবাঙ্‌লার মানুষকে কিছু পরিমাণে শান্ত করার চেষ্টা করলো ইংরাজ। নিজেদের অধিকার বজায় রাখার সংগ্রামে জয়ী হলো সীমান্তবাঙ্‌লা। সীমান্তবাঙ্‌লার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজো অনাবিষ্কৃত। বহু তথ্যকে বিকৃত করেছেন ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ। তবু, একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, যতোটুকু তথ্য আমরা পেয়েছি, তাও তাঁদেরই লেখা ইতিহাস থেকে।

সাঁওতাল, বাগ্‌দী ভূমিজ, মাহাতো, মাল ছাড়াও আরো অনেক সম্প্রদায়ের মানুষ সীমান্তবাঙ্‌লার প্রাণ স্বরূপ। বাউরী, কোড়া, মাহ্‌লী, লোধা, খাড়িয়া, হাড়ি, ডোম, লোহার, কাহার, বাগাল, ভূঞা, করঙ্গা রূপে এদের পরিচিতি। বিভিন্ন শ্রমের মাধ্যমে এদের জীবিকা নির্বাহ হয়। এদের অধিকাংশেরই জমির সংগে পরিচয় নেই। মানভূম-বাঁকুড়ার বাউরীদের মধ্যে ন'টি উপসম্প্রদায় আছে বলে জানা গেছে। সম্প্রদায়গুলির নাম হয় পেশাগত অথবা আবাস-গত। সম্প্রদায়গুলির নাম মলভূঞা বা মল্লভূমিয়া, শিখরিয়া, পঞ্চকোটিয়া, মলুয়া (মল্ল), ধলুয়া বা ধুলিয়া, মালুয়া, ঝাঁটিয়া, কাঠুরিয়া এবং পাথুরিয়া। শিখরিয়া সম্প্রদায়ের সংগে শিখরভূমের নাম জড়িত, এদের 'গোবরিয়া' নামেও অভিহিত করা হয়। গোবর দিয়ে এরা অন্যের ঘর পরিষ্কার করে বলেই হয়তো এই নাম। ঝাঁট দেওয়া কাজ যাদের তাদের নাম ঝাঁটিয়া, (ঝাণ্টিয়া)। ধলুয়া কি ধলভূমের স্মৃতিবাহী? অবশ্য ঢোল বাজানোর কাজ থেকে এদের ঢোলুয়া নামই স্বাভাবিক।

করঙ্গা সম্প্রদায়ের লোকে সাধারণতঃ পাথর কেটে, বাঁশের ঝুড়ি তৈরী করে অথবা কাঠের কাজ করে অন্নসংস্থান করে। টোটেম অনুসারী এদের গোত্র সালমাছ, কচ্ছপ, প্রভৃতি। আবাস-গত নামে পরিচিত এদের উপসম্প্রদায়গুলি ধলুয়া, মলুয়া, শিখরিয়া এবং তুঙ্গী নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য, ধলভূম, মল্লভূম, শিখরভূম এবং তুঙ্গভূম থেকেই এই সম্প্রদায়গুলির নাম।

পূর্ব মানভূম এবং বাঁকুড়ার 'কোড়া' সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে মুণ্ডাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মাটি কেটে এরা অন্ন সংস্থান করে নিজেদের। বাঁকুড়াতে এরা চারটি

উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত : ধলুয়া (ধলভূম), মলুয়া (মল্লভূম), শিখরিয়া (শিখরভূম) এবং বাদামিয়া (বাদাম পাহাড়িয়া)। মানভূমের কোড়াদের কোন উপসম্প্রদায় নেই বলেই জানা গেছে। কালী, দুর্গা, মনসা, ভাদু, ভৈরব, কুদরা, গরাম দেবতার পুজা অর্চনা এদের মধ্যে প্রচলিত। টোটেম অনুসারী এদের গোত্র বিভাগ যথাক্রমে : কাশ্যপ (কচ্ছপ), সাউলা (সালমাছ), কাশিবক (বক), হাঁসদা (বুনোহাঁস), বুট্‌কু (শূকর) এবং সান্‌পু (ষাঁড়)। 'খয়রা' সম্প্রদায়ও এই পর্যায়ের অন্তর্গত।

'মাহ্‌লী' সম্প্রদায় বাঁশের ঝুড়ি প্রভৃতি তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করে। এরাও মুণ্ডা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন অঞ্চলে এদের মধ্যে অষ্ট্রিকভাষা এখনো বর্তমান। গোত্র এবং টোটেম যথাক্রমে : ডুমরি (ডুমুর গাছ), তুরু (তুরুঘাস), কান্‌তি (যে কোন পশুর কান), হাঁসদা (বুনো হাঁস) এবং মুরমু (নীল গাই)।

লোধা এবং খাড়িয়া সম্প্রদায়কে স্বভাবদুর্বৃত্ত জাত বলে ইংরাজ শক্তি চিহ্নিত করে গিয়েছিল। ধলভূম-ঝাড়গ্রাম এবং ময়ুরভঞ্জ-এর অরণ্যেই এদের বাস। বৃহত্তর শবর গোষ্ঠীর অংশ বিশেষ এই দুটি সম্প্রদায়ও প্রায়-হিন্দু।

॥ ছয় ॥

সীমান্তবাঙ্‌লার এই সম্প্রদায়গুলির সুষ্ঠু ইতিহাস আজো রচিত হয় নি। এদের সামাজিক পরিবর্তনের প্রত্যেকটি স্তর আজো অনির্দিষ্ট। বর্তমানের গণ্ডীতে যে স্তরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এই পরিবর্তনের একটি ছাপ স্পষ্টীকৃত। পূর্বেই বলেছি, এদের কয়েকটি সম্প্রদায় হিন্দুসমাজের নিম্নতম পর্যায়ে অবস্থান করছে প্রাচীন কাল থেকেই। বলা বাহুল্য, এদের মধ্যে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আদি-রূপটি চিহ্নিত হয়ে আছে। এদের কথাই মূলতঃ, সীমান্তবাঙ্‌লার লোকযান।

হিন্দুসমাজের বর্ণবৈষম্য বা জাতিভেদ প্রথা, প্রত্যেকটি জাতকে অনৈতিহাসিক জন্ম-বিবরণী প্রস্তুত করতে বাধ্য করেছে। এই বিবরণী প্রত্যেকটি 'জাতের' জন্মায়নকে বিধৃত করে আছে আজ-ও। উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের ভেদ যে সমাজে বর্তমান, সে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ নিজেদের আত্ম-পরিচয়ের মধ্য দিয়ে, আর কিছু না হোক্ একধরণের সাম্যনীতির মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করে। আর্থনীতিক অসাম্যই জাতিভেদের ধারক একথা অস্বীকৃত হবার নয়। সীমান্তবাঙ্‌লার যে সম্প্রদায়গুলি কৃষির মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক অবস্থার সামান্যতম উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল, তারাই জায়গা খুঁজেছিল বৃহৎ হিন্দু সমাজের মধ্যে। কিন্তু জায়গা খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলো যে বর্ণবৈষম্যের প্রাবল্য সেখানে এতো বেশী, যার ফলে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করার দোরগোড়ায় তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তাই অনৈতিহাসিক উপকথা রচনা করে সবাই চাইলো জাতিগত প্রতিষ্ঠা। তার জের আজো চলছে। ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেবার মূলতত্ত্ব এরই মধ্যে খুঁজতে হবে। বলা বাহুল্য, সীমান্তবাঙ্‌লার বহু ভূস্বামী এমনি ভাবে নিজেদের আত্মপরিচয় দান করে আসছেন বহু প্রাচীন কাল থেকেই। নৃতত্ত্বের অনুসারক হয়ে বাঙালী জাতিতত্ত্বের ইতিহাসকে স্বীকার করার কথা তাঁরা আজো ভাবতে পারেন না। এ কথা তাঁরা কোনদিন শোনেন নি যে বাঙালী জাতি আর্য-গৌরবের অধিকারী নয়; তাই মানভূমের বহু ভূমিজ ভূস্বামী ক্ষত্রিয় পরিচয় বহন করে

চলেছেন।—আসলে এই চাতুর্বর্ণ্য প্রথা যে কত অলীক তাও আধুনিক কালে প্রমাণিত।[১]

বলা বাহুল্য বাঙালীর জাতিতত্ত্বের আলোচনার ফলে একথা এখন সর্বজনস্বীকৃত যে বাঙালী সংকর জাতি। বাঙ্‌লাদেশের আদিম নরগোষ্ঠীর রক্ত প্রত্যেক বাঙ্গালীর ধমনী-ভূষণ।

সীমান্তবাঙ্‌লার যে সব রাজগোষ্ঠী ইতিহাসের আড়ালে আত্মগোপন করে বহুদিন থেকে রাজত্ব করে আসছিলেন, তাঁদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী এবং মর্যাদা আজ আর অস্বীকৃত নয়। তবুও এ প্রসঙ্গে এ কথারও উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রত্যেকটি রাজগোষ্ঠীর জন্ম কুলজিতে অনৈতিহাসিক উপকথার কাহিনী। ছোটনাগপুরের রাজবংশ (রাতু) পঞ্চকোট রাজবংশ, বিষ্ণুপুর রাজবংশ, ধলভূম রাজবংশ প্রভৃতি বংশের ক্ষত্রিয় মর্যাদা ভারতের যে-কোন ক্ষত্রিয় রাজার সমান। এদের গোড়ার কথাতেও উপকথা। আর সব চেয়ে অবাক্ হতে হয়, সীমান্তবাঙ্‌লার প্রায় প্রত্যেকটি রাজবংশের জন্মকথা প্রায়ই এক ছাঁচে ঢালা। যেন একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি।

ছোটনাগপুরের রাজবংশের প্রাচীনত্ব নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। নাগবংশী ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত এদের আদিপর্বে পুণ্ডরীক নাগের উপকথা। মুণ্ডা সমাজের সংগে ঘনিষ্ঠ তার সম্পর্ক। (এই গ্রন্থের ইঁদ্ নামক অধ্যায়ে এই উপকথাটি সংযোজিত হয়েছে।)

বিষ্ণুপুর-মল্লভূমের রাজগোষ্ঠীর উদ্ভব কাহিনীতে বাগ্‌দী সম্প্রদায়ের আত্মীয়তা। কাহিনীতে বলা হয় উত্তর ভারতের জয়নগর রাজ্যের অধিপতি সস্ত্রীক শ্রীক্ষেত্রে যাত্রার পথে বিষ্ণুপুরের অরণ্যভূমিতে উপস্থিত হলেন। সেখানে, রাণী প্রসব করলেন একটি পুত্রসন্তান। এবং কিমাশ্চর্যম্! রাণীর

১। "এই চাতুর্বর্ণ্য প্রথা অলীক উপন্যাস, এ সম্পর্কে সন্দেহ নাই। কারণ, ভারতবর্ষে এই চাতুর্বর্ণ্যের বাহিরে অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোম বিদ্যমান ছিল, প্রত্যেক বর্ণ, জন ও কোমের ভিতর আবার ছিল অসংখ্য স্তর ও উপস্তর।......"

"চাতুর্বর্ণ্যের বহির্ভূত অসংখ্য বর্ণ, জন ও কোমের নরনারীর সংগে চাতুর্বর্ণ্যভুক্ত নরনারীর যৌন-মিলনের ফলে সমাজের যে বিচিত্র বর্ণ ও উপবর্ণের বিচিত্রতর সংকরবর্ণের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা একান্তই অনৈতিহাসিক এবং সেই হেতু অলীক।" বাঙালীর ইতিহাস—

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়

মাতৃহৃদয় অথবা রাজার পিতৃহৃদয় এই সন্তানকে বনের মাঝে ফেলে আসতে কুন্ঠিত হলো না; এমনি তীর্থক্ষেত্রের আকর্ষণ। কুশমাটিয়া নামে একজন বাগ্দী তখন বনের ভিতর কাঠ কাটছিল। হঠাৎ শিশুকণ্ঠের কান্না এসে তার কানে পৌঁছালো। কুশমাটিয়া বাগ্দীর অবাক্ হবারই কথা। কী ক'রে এ গভীর বনে শিশুটি এলো? চারিদিকে ঘুরে বেড়ালো সে, যদি সেই শিশুটির মায়ের দেখা মেলে। কিন্তু নিরাশ হলো। রাজারাণী তখন অনেক দূরে। শিশুটিকে সে নিজের কুটীরে নিয়ে এলো। বাগ্দী শিশুদের সঙ্গে বাগ্দীর অন্নে পুষ্ট হয়ে বেড়ে উঠলো শিশুটি। নাম হলো রঘু। মল্লভূমের এক ব্রাহ্মণ কিন্তু শিশুটিকে দেখেই বুঝতে পারলেন যে, শিশুটি বাগ্দী-বংশজ নয়, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় সন্তান। ঠিক সেই সময় মল্লভূমের অনার্যরাজার মৃত্যু হলো। যথারীতি ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হলো তাতে। মল্লভূমের সেই ব্রাহ্মণ গেলেন ব্রাহ্মণ-ভোজনে; সংগে গেল রঘু। ব্রাহ্মণই তাকে নিয়ে গেলেন আদর করে ডেকে। মৃত রাজার পাট হস্তী হঠাৎ দেখতে পেলো রঘুকে। আর, সংগে সংগে, রঘুকে শুঁড়ে তুলে একেবারে বসিয়ে দিল রাজার শূন্য সিংহাসনে। রঘু হলো রঘুনাথ সিংহ।

শিখরভূমের রাজগোষ্ঠীর উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনী বর্তমান। সাঁওতালদের উপকথায় বলা হয়ঃ শিখরভূমের গহন বনে এক স্ত্রীলোক একটি পুত্র আর একটি কন্যা প্রসব ক'রে শিশুদের ফেলে চলে যায় কোথায়। কেউ তার সন্ধান পায় নি। শিশুদুটির কান্না শুনে একপাল বুনো মোষ এসে তাদের ঘিরে দাঁড়ালো। তারপর থেকে মোষের দুধ খেয়ে সেই বনেই মোষের পিঠে পিঠে তারা বাড়তে লাগলো। বড় হয়ে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তারপর সেই শিখরভূমেই দুর্গ তৈরী করে রাজত্ব করতে থাকে।[১] পঞ্চকোট রাজবংশ সম্পর্কে এই কাহিনীটিই একটু রকমফের করে বলা হয়েছে। কুরমী সম্প্রদায়ের কেউ নাকি এমনিভাবেই একটি শিশুকে কুড়িয়ে পায়, বনভূমি থেকে। শিশুটিকে পালন করতো কপিলা গাভী। বলা বাহুল্য, পঞ্চকোট রাজবংশ নিজেদের না-কি গো বংশী রাজপুত বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

১। বাগ্দীদের উদ্ভব সম্পর্কে একটি কাহিনীর মধ্যে, ভাই-বোনের অনুরূপ বিয়ের কথা বলা হয়েছে।

সারা বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে সংগুপ্ত। সীমান্তবাঙ্‌লায় সেই প্রাচীনরূপের ছায়াচিত্র। এই সীমান্তভূমির লোকচর্যা সংস্কৃতি-সমন্বয় এবং সামাজিক পরিবর্তনের গোড়ার সূত্রগুলির সন্ধান দেবে, যা অরণ্য অঞ্চলের সংস্কৃতির স্বরূপসহ জনজীবনে প্রোজ্জ্বল। সে কথা সুরু করার আগে আরো একটি কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে ; সীমান্তবাঙ্‌লার নিজস্ব আঞ্চলিক সংস্কৃতি মূলতঃ এক হলেও তারও অঞ্চল-ভেদ আছে। বিশেষ বিশেষ পর্ব-পার্বণ সর্বত্র অনুষ্ঠিত হলেও তার মধ্যে এক এক ধরনের বিশিষ্টতা বিদ্যমান। কিন্তু প্রাণস্পন্দন সর্বত্রই এক। দেশের ভূ-প্রকৃতি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে লোক-সমাজে। বন্ধুর, কর্কশ, কংকরময় মাটির গন্ধ, নদী-নালা-ঝর্নাধারার চাঞ্চল্য, সবুজ বনের তারুণ্য, পাহাড় ডুংরীর কঠিনতা, বনপুষ্পের নিরাবরণ সৌন্দর্য—সব কিছু রূপায়িত হয়েছে সীমান্তবাঙ্‌লার আচার-আচরণে। লোকচর্যার আদিতম পর্যায় এখানে বেগবান। এর মধ্যে, গণ্ডী-বেষ্টনীকে স্বীকার করে হিন্দুসমাজের যে বর্ণগুলি এখানে উপনিবিষ্ট হয়েছিল, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ছত্রছায়ার মধ্যে যারা দর্পিত, তাদের জীবনেও সীমান্তবাঙ্‌লার জনসংস্কৃতির প্রভাব কোন না কোন রূপে বিবর্ধিত ; সে রূপ কোথাও বহির্মুখী, কোথাও বা অন্তঃশীলা।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মেনে নিতে হবে যে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় পৃথক হ'লেই মানুষ হিসাবে পার্থক্য দেখা দেয় না। আমাদের আচার-আচরণ, ধর্মচর্যাদির বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেই আমরা এক। সংস্কৃতির রূপ-রেখাকে স্পষ্ট করার জন্য, সংস্কৃতি-সমন্বয়ের দিকটিকে পরিস্ফুট করার জন্য এবং আমাদের সংস্কৃতিকে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করার জন্য বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের কথা অনুল্লেখ্য হ'তে পারে না।

সীমান্তবাঙ্‌লাদেশে এই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের রূপটি খুবই স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ব'লে এই অঞ্চলের দর্পণে আমরা অতীত কালের আর্য-অনার্য সংস্কৃতি সমন্বয়ের আভাস পেতে পারি। হিন্দু-জাতি এই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অভিজ্ঞান।

মধ্য পর্ব

(পর্ব-পার্বণ)

কামিনা

॥ এক ॥

"উলুকং বাহনং ধর্মং কামিন্যা সহিতে শিবং।
ধৌতকুন্দেন্দুধবলকায়ং ধ্যায়েদ্ধর্মং নমাম্যহং ॥"

পশ্চিমবাংলার পশ্চিমসীমান্ত ভূমিতে ধর্মঠাকুরের তেমন প্রতিপত্তি এখন আর নেই। পূর্ব-মানভূমের কোন কোন অঞ্চলে অবশ্য ধর্মঠাকুর যথারীতি অবস্থান করছেন, কিন্তু সাধারণত সারা সীমান্তভূমিতে শিবের প্রার্থনাই পরিলক্ষিত হচ্ছে। একদা এই অঞ্চলের সর্বত্রই যে ধর্মঠাকুর পূজা প্রাপ্ত হতেন তার বহু স্মৃতিচিহ্ন আজো সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধর্মকে সাক্ষীরূপে গ্রহণ করা এখনো গ্রাম-জনতার প্রথা। 'হে ধরম তুই সাক্ষী'—বলে সাধারণ মানুষ আজো নিজেদের নিষ্কলুষ প্রমাণের চেষ্টা করে। 'ধরমবোদা'[১] এবং 'ধরম ডাক'[২] ধলভূম, ঝাড়গ্রামে আজো সু-প্রচলিত শব্দ। অবশ্য এ দুটি শব্দ ধর্মঠাকুরের স্মৃতিকে জীবিত রেখেছে মাত্র, ধর্মঠাকুরকে নয়।

বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের সংখ্যাহীন গ্রামদেবতাদের অন্যতম এই ধর্মঠাকুর। গ্রামান্তের বৃক্ষমূলে এর অধিষ্ঠান। কোন কোন অঞ্চলে কূর্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ডই ধর্মের প্রতিরূপ। পূর্ব-মানভূমে মূর্তি-বাহুল্য নেই বললেও চলে। পুজারিগণ সাধারণত ডোম সম্প্রদায়ের। 'পণ্ডিত' বা 'পঁড়িত' নামেই এদের পরিচয়।

একথা বর্তমানে সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত যে, ধর্মঠাকুর বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্ন তো নয়ই, বৌদ্ধ মতবাদের বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের সংগে এর কোনরূপ সম্পর্ক নেই। ধর্মঠাকুরের সংগে সূর্য, যম, বরুণ, শিব প্রভৃতি দেবতার নাম একই সূত্রে গ্রথিত। পরবর্তীকালে ধর্মঠাকুরের পূজার সংগে কূর্মদেবতার পূজাও মিশে যায়।[৩]

---

১ ধর্মের পাঁঠা।

২ ধর্মের পূজার জন্য পুরোহিতের আহ্বান রীতি। অন্যমতে রাজদ্বার উন্মুক্ত হলে রাজদর্শনপ্রার্থীদের যে ডাক দেওয়া হতো।

৩ এ প্রসঙ্গে আচার্য সুকুমার সেন লিখিত ধর্মঠাকুরের ইতিহাস (রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকা) বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

এই ধর্মই কালক্রমে বাংলার অতিপ্রিয় গ্রাম-দেবতা শিবঠাকুরের সংগে একীভূত হয়ে শিবের গাজনের মধ্যে তার অস্তিত্বকে সীমাবদ্ধ করেছে। ধর্ম-শক্তি 'কামিনী' 'কামশক্তির' প্রতীকরূপেই লিংগদেবতা শিবের সংগে অধিষ্ঠিতা। বলা বাহুল্য রাঢ় সীমান্তের গাজন উৎসবে এই 'কামিনী' বা 'কামিনা'-র বিশেষ একটি স্থান আছে। এ প্রসংগে এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য যে 'কামিনা' বর্তমানে সীমান্তবাংলার সর্বত্রই বিস্মৃতদেবী। ধর্ম অথবা শিব, কোন ঠাকুরের সংগেই এই 'কামিনী'র নাম জড়িত নয়। শুধু পূর্ব-ধলভূম এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে কামিনীকে বাদ দিয়ে শিবের গাজন সম্পন্ন হতে পারে না। ধর্মমঙ্গলের 'কামিনী' ধর্মচ্যুতা হয়েছে বটে, কিন্তু শিবঠাকুরকে আশ্রয় করে আজও তার অবস্থান।

সীমান্তের শালবনে ফাগুনের কচি পাতার আগুন যখন স্তিমিত হয়ে আসে, কোমল সবুজ পাতায় যখন তারুণ্য দেখা দেয় তখন শাল ফুলের গন্ধ-মধুর বনস্থলীতে 'সরহুল'[১] পরবের প্রস্তুতি। ধূ ধূ করা প্রান্তর কাঁপিয়ে নাগরার (নাকাড়া) বজ্র-গর্জনে কম্পিত হয় 'শালুই থান'। ওদিকে দূরান্তের পাহাড়ে পলাশ ফুলের দাবানল। তারপর, চৈত্র মাস। বসন্তের বেড়া ডিঙিয়ে প্রচণ্ড খরাকে আহ্বান জানায় সে। লাল-গুলাল আবীর আর রং লাগানোর উৎসব শেষ হয়ে গেছে কবে। দেখতে দেখতে কাঠি পড়ল ঢাকে। গাজনের ঢাক। মধ্য চৈত্র মাস।

সারা বাংলা দেশ জুড়েই কাঠি পড়বে ঢাকে, সারা বাংলা দেশ জুড়েই সন্ন্যাসীর দল 'শিবো—মহাদেবো' বলে মাতিয়ে তুলবে চতুর্দিক। মানভূম-ধলভূম-বীরভূম-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম, সব জায়গাতেই একটি প্রাণ-স্পন্দন জাগবে। কিন্তু সবই কামিনী-হীন গাজন। শুধু এই কামিনীর স্মৃতিকে যে অঞ্চল আজো সঞ্জীবিত রেখেছে, কালান্তরের বেড়া ডিঙিয়ে সেই অঞ্চলের গাজনের কথাই বলছি; ধলভূম ঝাড়গ্রাম আর দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর অঞ্চলের গাজন পর্বের কথা। এই উৎসব একান্তভাবে সর্বজনীন। মাহাতো এবং ভূমিজ সম্প্রদায় এতে বিশেষভাবেই অংশ গ্রহণ করে থাকে।

শিবপূজার সংস্কৃত রূপটির মধ্যে আদিম অনার্য-ভাষী-জনতার লিঙ্গপূজা-বিধি এবং নানারূপ ধর্ম-ধারণা প্রচ্ছন্ন আছে বলেই পণ্ডিতদের অভিমত। ঋগ্বেদে 'শিশ্নদেবের' যে কথা আছে তা থেকে অনেকেরই ধারণা যে বৈদিক

১ সাঁওতালদের বসন্ত উৎসব।

আর্য-জগতে লিংগপূজার প্রচলন ছিল। অবশ্য পরবর্তী যুগের পুরাণ-কাহিনী থেকে একথা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক ধর্মের সংগে লিংগ-পূজার প্রবল বিরোধ ছিল। বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে কামার্ত এবং উলংগ শিবের প্রতি মুনিপত্নীদের অত্যধিক আগ্রহের কথা বর্ণিত হয়েছে। মুনিপত্নীদের নির্লজ্জ আচরণ মুনিদের সংক্ষুব্ধ করে তুললো এবং তাঁরা শিবের লিংগচ্ছেদ করে দিলেন। পরে এই মুনিপত্নীরাই শিব-পূজার প্রচলন করেছিল বলে পুরাণের অভিমত।

এ প্রসংগে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বিশ্বাস, বৈদিক ও অবৈদিক ধারার মিলন কাহিনীর ইংগিত রয়েছে এই সব পুরাণ কাহিনীর মধ্যে।[১]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, যে শিব অবিসম্বাদিত গণদেবতারূপে আত্ম-প্রকাশ করেছে, সেই শিবঠাকুরের বিভিন্ন রূপান্তরের ধারাবাহিক পর্যায় আজো সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয় নি। বৈদিক রুদ্র দেবতা এবং শিশ্নদেব, পৌরাণিক শিবত্ব লাভ করে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ধ্যানমগ্ন মহাদেব হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে বটে, কিন্তু বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিবঠাকুর যে, বাঙ্গালী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিদ্যমান, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। বাঙলা ছড়ার 'ধান ভানতে শিবের গীত' বাঙলা দেশের শিবস্মৃতির ধারক তো বটেই, সংগে সংগে পশু-টোটেম শিবার বিবাহ যে শিবের বিবাহের সংগে এক হয়ে যায়নি, একথাও জোর করে বলা যায় না। 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এলো বান, শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিনটি কন্যাদান,' এই গ্রাম্য ছড়াটিকে রোদ-বৃষ্টির ইন্দ্রধনুর রঙে রাঙিয়ে নেওয়া হয়েছে হয়তো বা। 'খেঁকশিয়ালের

১ মুনিপত্নীরাই খুব সম্ভব শিবপূজা প্রবর্তনের মূলে, কিন্তু তার হেতু হয়তো মাত্র কাম নয়। শিব ছিলেন শূদ্রের দেবতা। শবর ও কিরাতদের দ্বারা পূজিত শিব ছিলেন কিরাত বেশী, শিবানী ছিলেন শবরী মূর্তি, এই সব কথা নানা পুরাণেই মেলে। আর্যেরা যখন ভারতে এলেন তখন তাঁদের সংগে নারীর সংখ্যা ছিল কম। সেই যুগে মুনিরা বহুক্ষেত্রেই অনার্যকন্যাদের যে বিবাহ করেছেন সেই সব কথা নানা শাস্ত্রেই দেখতে পাই। তাই ব্রাহ্মণপত্নী হলেও নারীরা শূদ্র। ব্রাহ্মণকন্যা হয়েও এখন ব্রাহ্মণপত্নীরা শূদ্র বলেই গণ্য। সেইজন্য মুনিপত্নী হয়েও নারীরা তাঁদের পৈতৃক উপাস্য দেবতাকে স্বীকার করেছেন। মুনিরা হয়তো তাতে বাধা দিয়েছেন কিন্তু ক্রমে মুনিপত্নীদের মধ্য দিয়েই চারিদিকের প্রাকৃত ধর্ম মুনিদের মধ্যেও এসে পড়েছে। এই সব গণ-দেবতার প্রচণ্ড স্রোতকে বাধা দিতে বহু চেষ্টা করেও মুনিরা পারেন নি।"......"ভারতের সংস্কৃতি" —ক্ষিতিমোহন সেন।

বিয়ে’ নামক প্রবাদ বাক্য আজো গ্রামদেশে জীবন্ত। যাই হোক্ শিবঠাকুর নামক এই বাঙ্গালী গণদেবতা ক্রমে ক্রমে অনেক কিছু আত্মসাৎ করে নিজের মহিমার্জন করেছেন সন্দেহ নেই। ধর্ম ঠাকুরের শক্তিও একে আশ্রয় করে নিজেকে বিলুপ্তির কবল থেকে রক্ষা করে চলেছে।

লৌকিক দেবতাদের মধ্যে প্রাচীনতম দেবতা শিব ঠাকুর। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এই দেবতাকে কৃষকের দেবতা রূপেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। ধর্মঠাকুর-ও প্রাচীন গ্রামদেবতাদের অন্যতম। কালক্রমে ধর্মের গাজনই শিবের গাজনে রূপান্তরিত হয়েছে। ধর্ম ও চড়কপূজাকে প্রাচীন ‘কোমের’ ভূতবাদ ও পুনর্জন্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে অনেকে মনে করেন। প্রত্যেক কোমের মৃত ব্যক্তিদের পুনর্জন্ম কামনা করে এই দুটি পূজার বাৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শরীরের উপর নানারূপ যন্ত্রণা দিয়ে বাণ ফোঁড়া প্রভৃতি যে অনুষ্ঠান করা হয়, তার মধ্যে প্রাচীন কোমসমাজের নরবলি প্রথার স্মৃতি বিদ্যমান বলেই কোন পণ্ডিতের ধারণা।[১]

বলা বাহুল্য, এসব প্রথার মূলে প্রাচীনতম যে স্মৃতিই বিদ্যমান থাকুক না কেন, আমার আলোচনার মুখ্য প্রসংগ ‘কামিনী’ বা ‘কামিনা’কে নিয়েই। এই কামিনী বা কামিনা মূলত ধর্ম-শক্তিরূপেই পূজা প্রাপ্ত হতো। ধর্মের গাজনে অপরিহার্য ছিল কামিনী। কিন্তু বর্তমানে ধর্মের গাজনের মধ্যেও সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি বিলুপ্ত। বাঁকুড়া, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্মের গাজন আজও অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মের গাজনের প্রকৃষ্ট সময় জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাস। বাঁকুড়া অঞ্চলে এই সময়ের গাজনকে বলা হয় আবাল গাজন। মানভূম জেলার পূর্বাঞ্চলে, শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে ধর্ম ঠাকুরের পূজা করা হয়। ডোম সম্প্রদায়ের লোকেরাই সাধারণত পুরোহিত। ধর্মের কাছে বলিদান করা ছাড়াও ধর্ম ঠাকুরের নামে মানৎ করে পাঁঠা ছেড়ে দেওয়া হয়, পরে যে কোন শুক্লপক্ষের শুক্রবারে সেই পাঁঠা বলি দিয়ে মাঠেই প্রসাদ ভক্ষণ করতে হয়। এ অঞ্চলে ধর্ম ও সূর্য যে একই দেবতা তা পূজার বিধি-বিধান ও সূর্য আরাধনা থেকেই প্রমাণিত হয়, ধলভূম ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে সাক্ষী মানার ক্ষেত্রেও সূর্যকেই ধর্ম বলে গ্রহণ করা হয়। শিবের গাজন চৈত্র মাসের উৎসব; চৈত্র সংক্রান্তিতে তার পরিসমাপ্তি। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে শিবের যে গাজন অনুষ্ঠিত হয়, তা সরাসরি ধর্মের গাজনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস : ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পার্শ্ববর্তী মুণ্ডা ভূমি রাঁচি জেলার আদিবাসীদের মধ্যেও চৈত্র বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে গাজন-উৎসবের রীতি রেওয়াজ আছে। মূলত এই উৎসবের প্রথাগুলি হিন্দুদের নিকট থেকেই গৃহীত। মুণ্ডা গোষ্ঠীর যে অংশটি ক্রমহিন্দুধর্মী, তার মধ্যেই গাজন উৎসব বিদ্যমান। পশ্চিমসীমান্ত ভূমির বাংলা ভাষী ভূমিজ-শবর-খাড়িয়া সম্প্রদায় প্রতিবেশী হিন্দুদের গাজন-উৎসবে যোগদান করে। রাঁচির হিন্দুধর্মী মুণ্ডাদের মধ্যে এই উৎসবের নাম 'মাণ্ডাপরব'। এই মাণ্ডা শব্দটি মুণ্ডা সম্প্রদায় সিংভূম অঞ্চলের সেরাইকেলা-খরশোয়াঁ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে গ্রহণ করেছে। এ কথা ঠিক, মুণ্ডাদের এই মাণ্ডা পরবের মধ্যে সিংভূম মানভূম প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গাজনের প্রভাব সুস্পষ্ট। এর সংগে তাদের নিজস্ব কিছু প্রথাও সংমিশ্রিত হয়েছে।

মাণ্ডা শব্দটি পরিবর্তিত রূপে বাঁকুড়া-মানভূম-ধলভূম-মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যাতেও বর্তমান। এসব অঞ্চলে 'মাণ্ডা' হয়েছে 'মাড়ো'। মণ্ডপ শব্দ থেকেই এর উদ্ভব। উপরিউক্ত অঞ্চলে, এই শব্দটি বর্তমানে 'দেবস্থান' রূপে গৃহীত। শীতলা-মাড়ো, মংগলা-মাড়ো, শিবের মাড়ো প্রভৃতি নামেই তার পরিচিতি বিদ্যমান। ধলভূম-মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে 'শিবের মাড়ো' শুদ্ধ 'মাড়ো'তে রূপান্তরিত হয়েছে, যার অর্থ দাঁড়িয়েছে: গাজন; অর্থাৎ দেবস্থানের পরিবর্তে সেই স্থানের বিশেষ একটি উৎসবের নামেই তার পরিচয়।[১] এই 'মণ্ডপ' শব্দটি মূলত দেবস্থান রূপেই প্রচলিত

১ অনেক ক্ষেত্রে গাজন শব্দটি 'মাড়ো' শব্দের দ্বারা বহিষ্কৃতও হয়েছে। গাজন শব্দটি উক্ত অঞ্চলে 'গাজ্জন' রূপে উচ্চারিত হয় বলে, সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে মূলত 'গর্জন' (শিবের বিবাহে বরানুগামীদের উল্লাস ও গর্জন) শব্দই এ'র মূলে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে, এসিয়াটিক সোসাইটিতে শ্রীযুক্ত রামকমল সেন চড়কের গাজন সম্পর্কে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তা'তে গাজন শব্দের ব্যুৎপত্তি হিসাবে, তিনি 'গা-জন' অর্থাৎ গ্রাম-জনের উৎসবের কথা বলেছিলেন। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষও উক্ত মতকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গাঁ-এর আনুনাসিকতা এমনভাবে বিলুপ্ত হয়নি। গাজন শব্দটি মূলত 'শিবের গাজন' নামেই প্রচলিত এবং রূঢ়ি প্রয়োগেই শুধু 'গাজন' নামে বিখ্যাত। গাজন উৎসব শিবের বিবাহ উৎসব রূপেই গ্রামাঞ্চলে উদ্‌যাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ, মরণ-মিলন কবিতায় ত্রিলোচনের বিবাহ চিত্রটি যথার্থ ভাবেই রূপায়িত করেছেন। ভূত-প্রেতাদির উল্লাস ধ্বনিতে, বৃষের গর্জনে, ভুজঙ্গের তর্জনে এবং বিষাণের নিনাদে বরানুগামীদের পথ কোলাহলমণ্ডিত। শিবের গাজন উপলক্ষে এই ধরণের দৃশ্য (মূলত সং নামেই কথিত) গ্রামাঞ্চলে আজ-ও দৃষ্ট হয়।

ছিল,সন্দেহ নেই। ধর্মের মণ্ডপও হয়তো ধর্ম-দেবতার স্থান বলেই পরিজ্ঞাত ছিল এবং এমন কথাও বলা যেতে পারে যে 'ধর্মের মণ্ডপ' থেকেই মণ্ডপ শব্দটি কালক্রমে অন্যান্য দেবতাদের নামের সংগে যুক্ত হয়েছে। ধর্মপূজার সময় নূতন মণ্ডপ তৈরী করে ধর্মের পূজা করা হতো।[১]

বাংলাদেশের অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম ঠাকুরের পূজা সীমাবদ্ধ। ওরাওঁগোষ্ঠীর ধরমদেবতা-র সঙ্গে এই ধর্মঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়। তা ছাড়া ধর্মঠাকুর যে প্রাগার্য আদিবাসী গোষ্ঠীর দেবতা এ সম্পর্কে মতভেদ নেই বললেও চলে। আচার্য সুনীতিকুমারের অভিমত 'ধর্ম' শব্দটি অস্ট্রিকভাষী গোষ্ঠীর। রাঁচির মুণ্ডা সম্প্রদায় অবশ্য ধর্মঠাকুরের গাজন করে না, মহাদেবের গাজন করে।

মুণ্ডাদের বোঙাথান, বোড়ামথান প্রভৃতি দেবস্থানের সংগে সংগে প্রায়-হিন্দু মুণ্ডা সম্প্রদায় আর একটি থান সংযোজন করেছে, সেটি 'মহাদেও থান'। মুণ্ডা গ্রামের মধ্যে বা প্রান্তভাগে কোন গাছের তলায় বা ঝোপঝাড়ের মধ্যে 'দেওথান' থাকবেই। মহাদেও থানের বিশিষ্টতা কিন্তু অবশ্য লক্ষণীয়। কোন কোন অশ্বথ গাছের নীচে বাঁধান বেদীর উপর একটি পাথর বসানো থাকে। এই পাথরটি মহাদেও। মহাদেও থানের পাশে অন্যান্য দেওথান। সেখানে থাকে পার্বতী, মহামাঈ, ভৈরব, হনুমান প্রভৃতি দেবতা। বলা বাহুল্য, এ সমস্তই হিন্দু প্রভাবের ফল।

এই মহাদেও থানেই মাণ্ডা পরবের অনুষ্ঠান। চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, যে কোন মাসেই এই 'পরব' উদ্‌যাপিত হয়। দিন-ক্ষণ নির্ভর করে গ্রামবাসীদের চাঁদা-তোলার উপর। উৎসবের শেষ তিনটি দিনই মুখ্য। প্রথম দিনে 'ভক্তগণ' মাছ মাংস বর্জন করে ; বর্জন করে নুন আর মশলা। ভাত খাওয়া নিষিদ্ধ নয়, তবে তরকারী যেন আলুনী আর তেল-মশলা-বিবর্জিত হয়। পরিবর্তে, অবশ্য, দুধ আর ফলমূলের উপর নির্ভর করেও থাকা যায়। শেষের দুদিন পরিপূর্ণ উপবাস। নেহাৎ অসুবিধে হলে দুধ খেয়ে উপবাসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। এই মাণ্ডা পরবের ভক্তাদের পোষাক-

[১] হরিশ্চন্দ্র রাজা করে ধর্মপূজা
ভরএ নবাহুতি ঘর।
নৌতন মণ্ডপে ধর্মের সমীপে
রাজা মাগে পুত্রবর।
—ধর্ম মংগল।

বৈচিত্র্য দর্শনীয়। মাথায় রঙীন পাগড়ী, পাগড়ীর পুচ্ছবৎ দীর্ঘপ্রান্ত কানের পাশ দিয়ে, চিবুকের তলা দিয়ে, আবার অন্য কানের পাশ ঘেঁসে মাথার পাগড়ীতেই পরিসমাপ্তি লাভ করে; গালপাট্টা দাড়ীর মতো। বাহুতে বাঁধা রঙীন কাপড়ের লম্বা টুকরো। পায়ে ঘুঙুর, হাতে বালা। হাতের মুঠোয় চামর অথবা বেত। কেউ কেউ ধরবে ময়ূরপুচ্ছের পাখা, কেউ বা ঢাল। হাতে-মুখে পিটুলী-গোলার ছিটে। গলায় পুঁতির মালা। লাল শালুর টুকরো, গলা জড়িয়ে বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে সংযুক্ত।

এই বিচিত্র পোষাকে মণ্ডিত মাণ্ডা পরবের ভক্তাগণ শোভাযাত্রা করে চাল ডাল সংগ্রহের জন্য গ্রাম-পরিক্রমা করে। এদের অনুষ্ঠানের প্রধান প্রথা— স্নানের শেষে 'হাণ্ডেল সেবা'। মেদিনীপুরের পশ্চিমপ্রান্তে এর নাম হেংগেল বা হেঁগল কাঠ। ধর্ম বা শিবের গাজনে হিন্দোল অনুষ্ঠানই এই হাণ্ডেলসেবা। মহাদেও থানে এই হিন্দোল কাঠ প্রোথিত করা থাকে পূর্ব থেকেই। হিন্দোল কাঠে পা ঝুলিয়ে, হেঁটমুণ্ডে উর্দ্ধপদে দোদুল্যমান অবস্থায় থেকে, নীচে যে অগ্নিকুণ্ড থাকে, সেই কুণ্ডের অগ্নি স্পর্শ করাই এর উদ্দেশ্য। গাজন উৎসবের আনুষ্ঠানিক প্রথা হিসাবে এই কৃচ্ছ্রসাধন বাংলা দেশের সর্বত্রই প্রচলিত এবং এর উৎস রয়েছে ধর্ম পূজার বিধানে। রাণী রঞ্জাবতী পুত্রকামনায় এইভাবেই ধর্ম-তপস্যা করেছিলেন বলে ধর্মমংগলের অভিমত।[১] অবশ্য এই ধরণের কৃচ্ছ্র-সাধনা বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত।

ধলভূম-মানভূম-মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যা সীমান্তে এই গাজন উৎসবের সংগে 'ছো-নাচের' স্মৃতি বিজড়িত। মাণ্ডাপরবের পরিসমাপ্তির পূর্বরাত্রেও নাচের অনুষ্ঠান অবশ্যকৃত্য। পার্শ্ববর্তী গ্রামের বা স্বগ্রামের মুখোশ-নৃত্যই এক্ষেত্রে প্রধান। মুখোশ নৃত্য ছাড়া, পাইক-নাচ এবং অন্যান্য নাচের অনুষ্ঠানও হয়। শেষ দিনে, মহাদেব আর পার্বতীর থানে পাঁঠা বলি দিয়ে 'চরকী' অর্থাৎ চড়ক অনুষ্ঠান করা হয়।

---

১ "এত শুনি উল্লাসিনী ধর্মব্রতদাসী।
করিল কঠোর তপ পুত্র অভিলাষী॥
উপরে টাঙ্গায়ে পদ হেঁটে জ্বালে ধুনা।
মুখে মাত্র পুর ধর্ম মনের বাসনা॥
হিন্দোলেতে রঞ্জাবতী রহে অনাহার।
উৎকট তপস্যা করে অস্থি হইল সার॥"
—অনাদি মংগল: রামদাস আদক।

মানভূমের ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় এবং হিন্দুভাবাপন্ন অন্যান্য অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ অনুন্নত এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সংগে একই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে গাজন উৎসবে যোগদান করে। সংস্কৃতি সমন্বয়ের এমন সর্বজনীন পূজা-বিধি শিবের গাজন ছাড়া অন্য কোন উৎসবে পরিলক্ষিত হয় না। মানভূমের কোন কোন জায়গাতে গাজন উপলক্ষে মন্দিরের বাইরে ছাগ বলি দেওয়া হয়।

ধলভূম-সিংভূম এবং পশ্চিমপ্রান্তিক মেদিনীপুব অঞ্চলে আঞ্চলিক আদিবাসী গোষ্ঠী দলে দলে যোগদান করে গাজন উৎসবে। জিভ্‌ফোঁড, রজ্‌নীফোঁড প্রভৃতি যে সমস্ত কৃচ্ছ্রমূলক প্রথা আদিমযুগের কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সেই সমস্ত আচার অনুষ্ঠানে এরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। আত্মনির্যাতনের বীভৎস প্রক্রিয়াগুলি এই সব অঞ্চলে আজো বিদ্যমান।

ধর্মপূজার অনুষ্ঠানে বা ধর্মের গাজনে যে সব আচার-নিষ্ঠা, প্রথা-প্রতীক বিদ্যমান ছিল, তার সব কিছুই প্রায় উক্ত অঞ্চলের শিবের গাজনে গৃহীত হয়েছে। 'কামিনা', হাকণ্ড, মেল, বানফোঁড়া, চড়ক, আলম, পাট—প্রভৃতি শব্দগুলি শিবের গাজনেও অপরিহার্য। অথচ মূলত এই শব্দগুলি ধর্মের পূজা বিধানেরই অন্তর্গত ছিল। পূর্বেই বলেছি যে সীমান্তবাঙ্‌লার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে গাজন উৎসবের অনেক প্রথাগত স্বাতন্ত্র্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে 'কামিনী বা কামিনা' শিব-শক্তিরূপে সর্বত্র পরিগৃহীত হয় নি। ধলভূম এবং মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলেই এই 'কামিনা' শিবের গাজনে অবিচ্ছেদ্য।

শিবের গাজনে উপরিউক্ত অঞ্চলে যে ঘট প্রতিষ্ঠা করা হয়, তারই নাম 'কামিনা'। এই ঘট আনয়নের কোন দিন স্থির করা থাকে না। পঞ্চমী থেকে একাদশীর মধ্যে শনিবার বা মঙ্গলবার রাত্রিতে 'কামিনা' আনতে হয়। ধর্মশক্তি কামিনী যে শিবশক্তি কামিনা, এ সম্পর্কে দ্বিমত হওয়ার অবকাশ নেই। ধর্মমঙ্গলে, মানিক গাঙ্গুলির ধর্ম বন্দনায়, শিব ও ধর্মঠাকুর-এর একাত্মক রূপটি বর্ণিত হয়েছে এবং কামিনাকে উভয় দেবতার শক্তিরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধের প্রারম্ভিক শ্লোকটি মানিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল থেকেই উদ্ধৃত। জাড়াগ্রামের ধর্মঠাকুর কালুরায়কে বন্দনা করার সময়ও তিনি কামিন্যার উল্লেখ করেছেন।[১]

১ জাড়াগ্রামে কালুরায়ে কামিন্যা সহিত।
যাজপুরে গোঁহারে বন্দি দার্ঢ্য করি চিত॥

—দুই—

ময়ূরভট্ট কামিনীকে পার্বতী বলেই বর্ণনা করেছেন।[১]

এই কামিনী শিবশক্তিতে রূপান্তরিত হলেও অনেক শিব-মন্দিরেই এর প্রবেশাধিকার নেই। ধর্মশক্তি রূপে এর আদি অধিষ্ঠান বলেই একে পৌরাণিক শিবের হিন্দুত্ব নষ্ট করার অধিকার দেওয়া হয় নি। কামিনী যে মূলত সংস্কৃতি সমন্বয়ের ফল, তা অবিসম্বাদিত রূপে সত্য, কিন্তু ধর্মের শক্তিকে গ্রহণ করেও তাকে শিবের পাশে অধিষ্ঠানের অনুমতি দেয়নি ব্রাহ্মণ পুরোহিত। সাধারণ মানুষ যখন ধর্মঠাকুরকে ছেড়ে শিবঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করলো, তখন ধর্মঠাকুরের সব কিছুই তারা সংগে করে নিয়ে এলো। নিয়ে এলো না শুধু ধর্মঠাকুরকে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে শিব বহুপূর্ব থেকেই গৃহীত হয়েছিলেন বলে, শিবই মুখ্য অবলম্বন হলো ধর্মসেবকদের। ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ ধর্মের সব কিছুকেই শিবের সংগে জুড়ে দেওয়ার অধিকার দিলেন; ধর্মশক্তি কামিনাকেও তারা শিবের শক্তি বলে স্বীকার করলেন, কিন্তু তার স্থান নির্দেশিত হলো মন্দিরের অভ্যন্তরে নয়, বাইরে। কামিনী আজও অন্ত্যজা। অবশ্য এই প্রথা সর্বত্রই সমান নয়: কোন কোন ক্ষেত্রে 'কামিনা ঘট' মন্দিরের এক কোণে রক্ষিত হয় বলেও জানা গেছে।

'কামিনা ঘট' মাথায় বহন করে পাটভক্তা যে পথ দিয়ে আসে, সে পথের উপর একটি মুরগীর ডিম ভেঙে ফেলার নিয়ম আছে। কোন কোন অঞ্চলে ডিমটিকে না ভেঙে রাস্তার উপর মাটির তলায় পুঁতে দেওয়া হয়: সেই রাস্তা মাড়িয়ে গাজনের ভক্তগণকে আসতে হয়। এই প্রথা পুরোপুরি অ-হিন্দু। ধর্মঠাকুরের শক্তি কামিনা বা কামিন্যার কাছে বলিদান করার যে রীতি ছিল, সেই রীতিই এইভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে বলে মনে হয়।[২] বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ পুরোহিত কামিনা ঘটকে মাথায় তুলে নিয়ে আসে না, এমন কি স্পর্শও করে না।

---

১ বিষম পাপেতে মুক্তি দিতে জীবগণ।
কামিন্যা রূপেতে রব ধর্মের গাজনে॥

২ ধর্মের গাজনে, কামিন্যার কাছে পাঁঠা বা মাগুর মাছ বলি দেওয়া হয়। ধর্মপূজায় বলিদানের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে ময়ূরভট্ট অদ্ভুত একটি কাহিনী বিবৃত করেছেন। বালখিল্য মুনির বালক সন্তানদের দেখে দেবী পার্বতীর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয়। তিনি মুনি-নন্দনদের খাদ্যদানে পরিতুষ্ট করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দশম-দ্বাদশ-চতুর্দশ-ষোড়শ বৎসর বয়স্ক এই

চৈত্র সংক্রান্তির চড়কের দিনে, অথবা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গাজনের শেষ দিনে কামিনা ঘটকে মন্দিরের বাইরে প্রোথিত করা হয়; অন্যান্য হিন্দু দেবীর ঘটের মতো কামিনা ঘটকে বিসর্জন দেওয়া হয় না। কোন কোন অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে একটি মুরগীর ডিম রাখা হয়, তার ওপরে কামিনা ঘটকে রেখে মাটি চাপা দেওয়া হয়।

কামিনী বা কামিন্যাকে শিব-শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে মাত্র, প্রত্যক্ষ ভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম তাকে দেবী হিসাবে গ্রহণ করে নি। একটি লৌকিক তরজাতে শিব ও কামিনার বিবাহ প্রসংগের উল্লেখ আছে; তাতে কামিনার সংগে ব্রাত্য-দেবতা ধর্মের সম্পর্ক পরোক্ষভাবে স্বীকৃত। এই তরজার সাথে কামিনাকে শিবের দ্বিতীয় পত্নীরূপে প্রচার করা হয়।[১] বলা বাহুল্য, গাজন উৎসবকে শিবের বিবাহ উৎসব রূপেই গ্রহণ করা হয় সর্বত্র। গাজনের সং বা 'ছো'র মধ্যে শিবের বিবাহ অনুষ্ঠান অনিবার্য অংগ। ভূতপ্রেত পরিবৃত হয়ে বিবাহের শোভাযাত্রায় শিবঠাকুরের নৃত্য ছো-নাচের মধ্যে অন্যতম। ধর্মশক্তি কামিনা ও গাজন উৎসবটি এমনি ভাবে ধর্মচ্যুত হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য দেবতা শিবের গাজনে মিলিত হয়েছে। ধর্মের গাজনে নরমুণ্ড নিয়ে নৃত্য করার যে রীতি ছিল, শিবের বিবাহ-নৃত্যে সেই রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। গাজন উৎসবের শেষ তিনটি দিনে গাজনের মুখ্য উৎসব। এই শেষ তিনটি দিনে শিবের সংগে কামিনীর মিলন সংগঠিত হয় বলেই সাধারণের ধারণা। কামিনী দানব কন্যা, তাই ব্রাহ্মণ-শাসিত দেব-চর্যায় তাকে হিন্দুদেবীর পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয় নি। লৌকিক প্রথাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েও যথাসম্ভব শুচিতা রক্ষা করে চলেছে ব্রাহ্মণ্য-দেবতা।

বালকগুলি, পার্বতীর রূপ দেখে কামাতুর হয়ে ওঠে। পার্বতী তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে তাদের ছাগ বংশে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন, আর বলেন, তিনি যখন কামিন্যারূপে অধিষ্ঠিতা হবেন, তখন, এই পশুদের বলি দেওয়া হবে, তাঁর সম্মুখে।

১ প্রশ্ন:

মধুমাসে শিবের গাজন কর পূজন দেব ত্রিলোচন।
দ্বিতীয় বিবাহ শিবের অতি মনোরম॥
বুড়ো বরে মাথায় টোপর, রূপে ঝরঝর হলুদ দিয়ে গায়।
শাঁখা-শাড়ী-আলতা দিয়ে কনেটি সাজাও॥
ঢাক-ঢোল বাজনা করে শিবের বিয়ে দাও।
সে কনে কোথায় ছিল, শিব বিয়ে হলো শংকরী ত্যজিয়ে॥
আবার তার প্রসাদ কেউ খায় না জলে ভাসাও গিয়ে॥

বলা বাহুল্য, কামিন্ধ্যা যে ব্রাত্যদেবী তাতে আর সন্দেহের কারণ নেই। পুরাণ এবং বেদের দোহাই দিয়ে তাকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়েছে মাত্র, কিন্তু পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি।

কিছু বুঝতে নারি—ত্রিপুরারির কেন কর সেবা
আবার নিশাকালে ভোগ ভাসাও এত বড় ধাঁধা॥
সেবা শেষ হলে পরে, প্রতিমারে সবে ভাসায় জলে
তা না করে গর্ত করে পুঁত অবহেলে॥
কথাটা বড়ই ভারী ত্রিপুরারির চৈত্রের গাজন।
সন্দেহ মোচন কর বলিয়া এখন॥
দীন যোগেশে বলে চরণতলে ওমা নারায়ণী।
অন্তকালে পাই যেন চরণ দুখানি॥

উত্তর : নমোনমো মা সারদা
নমামি চরণে।
ইহার উত্তর-বাণী শুন সর্বজনে॥
দেবীপুরাণের কথা বলবো হেথা
শুন দিয়া মন।
মূর্খে বুঝিতে নারে পণ্ডিতে দুর্গম॥
কামিনী নামে কন্যা রূপে ধন্যা
দানবেরই সুতা।
পাতালেতে বাস তার 'ধর্ম অনুরতা'॥
সদাই ভাবিত মনে ত্রিলোচনে পতিত্বে বরিবে
চরণ যুগল তার কিরূপে পাইবে
চিন্তিয়া কিছুদিন তনুক্ষীণ ক্রমেতে হইল।
হাজার বছর শিবের আরাধনা কৈল॥
প্রসন্ন উমাপতি কন্যা প্রতি কহিতে লাগিল।
কি জন্য তপস্যা কর আমারে বলহ॥
শুনে দানবী সুতা হর্ষাযুতা কহিতে লাগিল।
সদয় হইলে যদি মোরে পত্নীরূপে লহ॥
শুনি দানবীর বাণী ভাবি শুনি কহেন ত্রিপুরারি।
দুর্গা অনুমতি ভিন্ন কিছু বলিতে না পারি॥
শুনে দানবী সুতা বিরসযুতা বড় চিন্তিত হইল।
দেবীপদ চিন্তি ঘোর তপস্যা আরম্ভিল

এই প্রসঙ্গে হাকণ্ড সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। এই শব্দটি 'হাকঁড়্' রূপেই উচ্চারিত হয়, যেমন মণ্ডপ (মাড়ো) শব্দটি সাধারণত উচ্চারিত হয় 'মড়প' রূপে উত্তর মানভূমে। অথবা পণ্ডিত উচ্চারিত হয় 'পঁড়িত' রূপে পূর্ব মানভূমে।

মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলের গাজনে 'হাকঁড়্'-এর সাক্ষাৎ মেলে। শিবের গাজনে,পাটভক্তাসহ অন্যান্য ভক্তাগণ শোভাযাত্রা সহকারে পার্শ্ববর্তী কোন নদী অথবা জলাশয়ে স্নান করে আসে প্রতিদিন। স্নান করে সিক্তবস্ত্রে বেত্রধারী ভক্তাগণ শিবের মন্দিরে উপস্থিত হয়। এই স্নান শোভাযাত্রার নামই হাকণ্ড যাত্রা বা হাকঁড়ে যাওয়া। 'হাকঁড' শব্দটি আর্য ভাষার শব্দ নাও হতে পারে।* বাংলা-দেশের বহু গ্রাম-নাম, নদ-নদীর নামের মূলেই অস্ট্রিকভাষার ইংগিত আছে।

থাকিয়া অনশনে একমনে নির্জন কাননে।
ষাইট হাজার বছর দেবী থাকে ধ্যানে॥
প্রসন্ন দক্ষসুতা আসি সেথা দরশন দিল।
কন্যা প্রতি হরজায়া কহিতে লাগিল॥
শোন কামিনী কন্যে কোন জন্যে সাধিছ আমায়।
কি জন্য তপস্যা কর বলহ আমায়॥
শুনে দানবী সুতা হর্ষযুতা কহেন দেবীরে।
পতিত্বে বরিব আমি ভোলা মহেশ্বরে॥
যদি এই অধীনারে কৃপা করে না করিবে দয়া।
তব বিদ্যমানে মাগো তেয়াগিব কায়া॥
শুনিয়া দক্ষসুতা গণমাতা চিন্তিত হইল।
কিছুক্ষণ পরে দেবী কন্যাকে কহিল॥
বৎসরান্তে তিনদিন তব অভীষ্ট পুরিবে—
পতিরূপ সদা শিবে ভজনা করিবে॥
সেই হৈতে চৈত্রমাসে শিবের পাশে সেই দানবী রয়।
গন্ধ পুষ্প টোপর দিয়ে শিবের বিয়ে হয়॥
দানবীর পূজা বলে নিশাকালে ভোগ ভাসাতে যায়।
বেদের বর্ণিত যাহা কহিনু সবায়॥
সেবা শেষ হলে পরে কামিনীরে পুঁতে অবহেলে।
পাতালেতে বাস তার আসে তিন দিনের তরে॥
দেবী পুরাণ হতে তরজা রসে রচে যজ্ঞেশ্বর।
দাও দেব ত্রিলোচন চরণ পঙ্কজ॥

* ডক্টর সুকুমার সেনের অভিমত: 'হাকণ্ড' বা 'হাকন্দ' শব্দটি সংস্কৃত 'আক্রন্দ' শব্দ-জাত।

ধর্মমংগলের কাহিনী অনুসারে 'হাকণ্ড' একটি নদীর নাম। এই হাকণ্ড নদীর তীরে দেবরাজ ইন্দ্র শিবের গাজন করেছিলেন বলে 'হাকণ্ড-মাহাত্ম্যে' কথিত আছে।[১] শুধু তাই নয়, এই হাকণ্ড নদীর তীরেই দুশ্চর তপশ্চর্যায় ব্রতী হয়েছিল লাউসেন।[২] ধর্মঠাকুরের কৃপা লাভ করে সূর্যকে পশ্চিমগগনে উদিত হতে বাধ্য করেছিল ধর্মমংগলের নায়ক লাউসেন।

গৌড়সম্রাটের শ্যালিকা, সুন্দরী তরুণী রঞ্জাবতীর স্বামী কর্ণসেন ময়নার রাজা। রঞ্জাবতী নিজে গৌড়সম্রাটের প্রিয়পাত্রী। কর্ণসেনের সঙ্গে তার বিবাহ সংঘটিত করেছিলেন গৌড়সম্রাট নিজে। কিন্তু এই বিবাহকে সুনজরে দেখতে পারে নি মহামদা, রঞ্জাবতীর ভ্রাতা। শুধু রঞ্জাবতীর ভ্রাতা নয়, মহামদা, গৌড় সম্রাটের সেনানায়ক, প্রবল পরাক্রান্ত বীর। গৌড়সম্রাট তার উপর নির্ভরশীল। রঞ্জাবতীর রূপ কিন্তু তাকে সন্তানবতী করতে পারল না। বন্ধ্যানারীর জীবনে বিতৃষ্ণা এলো তার। ফলে, পুত্রকামনায় ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহ লাভের জন্য দুশ্চর তপস্যা করে শালে ভর দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলো রঞ্জাবতী। কিন্তু ধর্মের মহিমায় সে পুনর্জীবন লাভ করে সর্বগুণান্বিত পুত্র লাউসেনের জননী হয়। মহামদার উপদেশ অনুসারে গৌড়সম্রাট ধর্মপূজা করেন। কিন্তু পূজার ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে ধর্মরাজ সম্রাটের উপর অসন্তুষ্ট হন। ধর্মের রোষে গৌড়রাজ্যে দুর্দিন দেখা দেয়। গৌড় সম্রাট আহ্বান জানালেন ধর্মরক্ষিত লাউসেনকে। মাতুল মহামদা কিন্তু লাউসেনকে দেখতে পারতো না। তাই, লাউসেনের উপর সবচেয়ে কঠিন কাজের ভার দিয়ে ছলে বলে কৌশলে লাউসেনের প্রাণহরণের চেষ্টা করলো সে। লাউসেনকে নির্দেশ দেওয়া হলো, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সে যেন সূর্যকে পশ্চিমদিকে উদিত করে। সূর্য পশ্চিম দিকে উঠলেই নাকি গৌড় রাজ্যের মংগল। ধর্মানুগৃহীত লাউসেনকেই এ কাজ করতে হবে।

---

১ আরক্তবরণ নদী হাকণ্ডের জল।
দূর হতে ভাকতা দেখেন অস্তাচল॥
দ্বিতীয় গোলোক ইথে অনাদ্যের ঘর।
কর‍্যাছিল গাজন এথানে পুরন্দর॥ —'হাকণ্ড-মাহাত্ম্য।'
দেখিল হাকণ্ড নদী বয়েছে উজান।
সলিল রয়েছে পূর্ণ শোণিত সমান॥
সামুলা আমিনী সব দেখাইয়া দেই।
চেয়ে দেথ বাপুরে হাকণ্ড নদী এই

নিরুপায় লাউসেন ধর্মস্মরণ করে চলে গেল হাকণ্ডের তীরে। সেখানে অমানুষিক তপস্যায় রত হলো সে। অবশেষে সন্তুষ্ট হলেন ধর্ম। তাঁর ইংগিতে সূর্য উঠলো পশ্চিম আকাশে।

ধর্মমঙ্গলের এই কাহিনীতেও হাকণ্ডকে নদী বলা হয়েছে। এই হাকণ্ডে ধর্মরাজের বারো ভক্তাও আত্মবিসর্জন করেছিল; পরে অবশ্য তারা পুনর্জীবন লাভ করে। বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রামের হাকণ্ডদীঘি ও ধর্মঠাকুরের সম্পর্কিত।

শিবের গাজনে এই হাকণ্ডস্নানের শোভাযাত্রা, ধর্মমঙ্গলের স্মৃতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। পাটভক্তা ও তার বারো জন সংগীর আত্ম-নির্যাতনের নানা প্রক্রিয়া ধর্মঠাকুরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ধর্মনিরঞ্জন আব শিবঠাকুর যে অভেদাত্মক তাও ধর্মঠাকুরের বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে। পৌরাণিক শিবের মতোই ধর্মঠাকুরের রূপসজ্জা :

মাথায় জটায় বাঁধা স্ফটিকের মালা।
বদনে বিভূতিমাখা পরা বাঘছালা॥
করে শিঙ্গা ডমরু কপালে উর্ধ্ব ফোঁটা।
কুব্জ খর্ব কলেবর কান্ধে যোগপাটা॥

অনুষ্ঠানের শেষ দিনটি 'পাট'। এ প্রসংগে বলা দরকার যে ধর্মের সিংহাসনের নামও পাট। পেরেক পোতা তক্তার উপর সেদিন পাটভক্তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়। পাটভক্তাকে মৃত কল্পনা করে সেই অবস্থাতেই তাকে গ্রাম প্রদক্ষিণ করানো হয়। ধর্মের এবং শিবের গাজনেও উপরিউক্ত প্রথা উদ্‌যাপিত হয়।

'পাটের' আগের দিনটি ধর্মের গাজনে 'মেলাঘর' নামে পরিচিত। শিবের গাজনেও এই দিনটিকে বলে 'মেল'।

এই নদী হাকণ্ড সর্ব শাস্ত্রেতে কয়।
সন্ধ্যাকাল হলে সূর্য এইখানে নায়॥
এইখানে পূজিলে ধর্মের দেখা পাবে ;
বন কাট এইখানে ধর্মের পূজা দিবে॥

—অনাদি মঙ্গল : রামদাস আদক।

হাকগুম্নানের শেষে সেদিন পাটভক্তা—বারো ভক্তা এবং মেলব্রতীদের যে শোভাযাত্রা দেখা যায় মেদিনীপুর জেলার একেবারে পশ্চিমসীমান্তে অবস্থিত সুবর্ণরেখাবিধৃত চোরচিতা গ্রামে, তা মনে রাখবার মতো। হাজার মেল-ব্রতী জিভ ফুঁড়ে নেয় ত্রিশূলাকৃতি লোহার কাঁটা দিয়ে অথবা পেতলের কাঁটা দিয়ে। পরস্পরের মুষ্টিধৃত বেত্রগুচ্ছের ঠোকাঠুকিতে প্রকম্পিত হয় আকাশ। ভূমিজ-খাড়িয়া-ভূঞা প্রভৃতি আদিবাসী এবং অন্যান্য সম-আদিবাসী জনতা মাতাল হয়ে পেটের এবং দু' বাহুর চামড়া ফুটো ক'রে লোহার হাতা অথবা রজ্জু ঢুকিয়ে দেয় তাতে। পরস্পরের বাহুনিবদ্ধ রজ্জুঘর্ষণ আর উন্মাদ-নৃত্য বীভৎস ভাবে প্রতিভাত হয়। এই রজ্জুঘর্ষণের নামই রঁজনীফোঁড়।

গাজন-উৎসবে সর্বত্রই এই আত্ম-নিপীড়নের বাহুল্য। দণ্ডসেবা, ভূঁইসাপ্টা, ধুনাপোড়ানো, কাঁটাবিদ্ধ পাটের ওপর শোয়া, আগুনে হাঁটা, প্রভৃতি নানাবিধ প্রক্রিয়ার কথা সকলেরই জানা। ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণে এই আত্ম-নিগ্রহের জীবন্ত বর্ণনা আছে।[১]

সীমান্তবাঙ্লার কোন কোন অঞ্চলে, হাকগুম্নানের শেষে ভক্তাদের শোভা-যাত্রার সামনে কয়েকজন নিম্নশ্রেণীর নর্তকী নেচে নেচে চলে। এ নাকি ধর্মের অংগ। ধর্মমঙ্গলে যে আমিনীদের কথা আছে, এই নর্তকীরা তাদেরই স্মৃতি-বাহী বলে মনে হয়। ধর্মের গাজনে বারোজন পুরুষভক্তা এবং চারজন নারী-ভক্তার প্রয়োজন হয়। এই নারীভক্তাদের নামই 'আমিনী'।

এই গাজন উৎসবকে অবলম্বন করে যে বিশেষ ধরণের নৃত্যকলা বিকশিত হয়েছে, সে কথাও এই প্রসংগে বলে রাখা ভালো। সীমান্তবাঙ্লায় এই নাচের নাম 'ছো' নাচ—'ছৌ' নয়। সেরাইকেলা, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলেই 'ছৌ' নামটি প্রচলিত। লোকনৃত্যের আদিমতা এর মধ্যে একেবারে নেই। মার্জিত এবং উন্নত রুচির পরিচিতি নিয়েই এর অভিযাত্রা। গাজন বা চৈৎ-পরব (চৈত্রপর্ব)-কে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এই লোকনৃত্যের বিকাশ। এ নাচের আদিভূমি বাংলা-উড়িষ্যার সীমান্তদেশ। মূলত সেরাইকেলা এবং ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি রাজ্যের রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ছো-নাচ কলা কৃতিত্বের অধিকারী হতে পেরেছে।

১ সংজাত বিধান মত কেহ করে দণ্ডবৎ
নিজ অংগে কেহ বেত্র মারে।
কেহ উর্ধ্বপদ হয়ে উর্ধ্ব সেবা করে গিয়ে
অগ্নিসেবা দণ্ডসেবা সারে।।

ছো-নাচকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—মুখোশনাচ এবং পাইক নাচ। সাধারণতঃ সংঘবদ্ধ ভাবেই ছো-নাচের শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করে। একক ভাবে নাচও অস্বীকৃত নয়।

রাঁচির মুণ্ডাসম্প্রদায়ের মধ্যে যে মাণ্ডাপরব বিদ্যমান সে পরবেও মুখোস-নাচ বা 'মহড়ানাচ' চলে। ছো-নাচের প্রকৃষ্ট সময় চৈত্রমাস। শিবের গাজন ছাড়া অন্য কোন উপলক্ষে এ নাচ হয় না, যদিও আজকাল যে কোন উপলক্ষে ছো-নাচ দেখানো হয়। গোটা চৈত্রমাস ধরে চৈৎ পরবের শেষদিন পর্যন্ত মাড়ো-তলায় এই নাচ চলে।

'ছো' শব্দটির অর্থ সং বা ঢং। গাজনের সং বলতে যা বোঝায়, চৈৎ-পরবের 'ছো' বললেও তাই বোঝায়। মূলত সং সেজে নাচ দেখানোর যে প্রথা ছিল, কালক্রমে সেই ছো-নাচ পাইক নাচের কলা-কুশলতার সংগে এক হয়ে গেছে। ফলে ছো-নাচের অর্থ হয়ে গেছে সং এবং পাইকনাচ দুইই।

নানা দেবদেবীর মুখোশ ছাড়াও ভূতপ্রেত রাক্ষস প্রভৃতির মুখোশ পরে নাচের অনুষ্ঠানে যোগ দেয় নৃত্যশিল্পিগণ। পৌরাণিক বহু কাহিনীকে নৃত্যের মাধ্যমে রূপায়িত করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সংগীতের ভূমিকা দিয়ে নৃত্যের বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়। আর আছে বাবু মুহা বা বাবু মহড়া (মুখোশ)। 'বাবু'দের মতো চুনটকরা পাতলা ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবী পরে আর হাতে ছড়ি নিয়ে নাচের তালে তালে পা ফেলতে ফেলতে নৃত্যশিল্পী 'বাবু' নাচ দেখিয়ে যায়।

মুখোশ, মুহা বা মহড়া তৈরী করা হয় মাটি আর পাতলা ন্যাকড়ার সহ-যোগে, যার ফলে মুখোশ খুব ভারী হয় না। পরচুলো চাপিয়ে, কানের উপর দিয়ে মুখোশের দড়ি টান করে বেঁধে দেওয়া হয়। নাচের আসরে ঢোলে কাঠি পড়লে, তাল অনুসরণ করে নাচতে নাচতে প্রবেশ করে শিব-দুর্গা, কার্ত্তিক-গণেশ লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রভৃতি। সপারিষদ্ শিব-দুর্গার নৃত্যও উপভোগ্য। কিম্ভূতকিমাকার মুখোশ পরে মড়ার খুলি গলায় ঝুলিয়ে, ভাগাড় থেকে কুড়িয়ে আনা মরা গরুর কংকালে চড়ে ভূতপ্রেতের দল নাচ দেখিয়ে

কেহ কণ্টক শয্যায় শুইয়া ধর্ম ধেয়ায়
কেহ বাণে করে অংগক্ষত।
কেহ খড়্গশয্যা করে ভাবে ধর্ম অবতারে
এই রূপ সেবে ভক্ত্য যত ॥

যায়, এই হচ্ছে আসল 'ছো' বা সং। আসলে, এইটুকুই ছিল লোক-নৃত্য। পরে, নাচেব উৎকর্ষসাধন ক'বে, নাচকে লোক-বীতিব উর্ধ্বে তোলা হয়েছে। এই উর্ধ্বায়িত নাচই বর্তমান কালেব সংস্কৃতি-অনুষ্ঠানগুলিতে প্রদর্শিত হয় এবং এ ক্ষেত্রে 'ছো' শব্দটি রূঢি প্রয়োগ মাত্র।[১]

নাচেব মধ্যে যে কোন বিষয়ই রূপায়িত কবা হয়। কখনো আসে ব্যাধ এবং বাঘ। কোন কোন সময় সখী-পবিবৃতা বাধা এবং কৃষ্ণ। কখনো পাইক যোদ্ধাব দল। ছো নাচে মেয়েদেব অংশ গ্রহণ কবা নিষিদ্ধ। এ নাচ কোমলাংগীদের পক্ষে সহজসাধ্য নয় মোটেই।

ছো-নাচে লোকনৃত্যেব আংগিক কিছু কিছু আছে বটে, কিন্তু নৃত্যবীতিতে বিভিন্ন তাল এবং দেহভংগিমায় শিল্পসৌষ্ঠব লক্ষণীয়। যথেষ্ট শ্রমেব মাধ্যমে একাগ্রভাবে এ নাচ শিখতে হয়। দেহে প্রচুব শক্তি না থাকলে এ নাচে পা ফেলা অসম্ভব। সীমান্তবাঙলাব আদিবাসী নৃত্যেব সংগে এব মৌলিক পার্থক্য আছে।

১। 'ছো' শব্দটিব আঞ্চলিক অর্থ 'সং'। ওড়িযা অভিধানে ছো শব্দটি নেই। ওড়িয়া ছও (=ছলনা) শব্দটি সীমান্তবাঙলায় 'ছো' রূপে উচ্চারিত যার অর্থ সং এবং ছলনা দুইই হয় তবে সং অর্থেই বিশেষ ভাবে গৃহীত। যে অঞ্চলে ছো শব্দ পাওয়া যায়, তার নিজস্ব কোন অর্থ উক্ত অঞ্চলে অপ্রচলিত। হয়তো সীমান্তবাঙলার ছো শব্দটি ওড়িযা উচ্চারণের স্বরাস্তিক প্রবলতায় ফলে ছো রূপে উচ্চারিত হয। ওড়িষ্যাব আদিবাসী এবং সম-আদিবাসী কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চাঙ্গুনাচ প্রচলিত আছে, সেই নাচে চাঙ্গু নামক যে আনদ্ধ বাদ্য যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়, সেই বাদ্য যন্ত্রের বাজনার তালে সুর মিলিয়ে ওরা 'ছোউ ছোউ ছোউ ঘিন ঘিন ছোউ' শব্দগুলি আবৃত্তি করে। এর সঙ্গে 'ছো' নাচের নামগত সম্পর্ক থাকাও অসম্ভব নয়।

সেরাইকেলা অঞ্চলেব কোন কোন জায়গাতে 'ছো'-এব পরিবর্তে ছো-শব্দও প্রচলিত। সেরাই-কেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর নামক একটি সাঁওতাল গ্রামে একদা ছো-নাচ দেখবার সুযোগ হয়েছিল। এই গ্রামের সাঁওতালরা প্রায়-হিন্দু। সাঁওতাল সম্প্রদাযেব মধ্যে 'ছো-নাচ একেবারে অপ্রচলিত কিন্তু গোবিন্দপুরে আছে। এই গ্রামে একটি শিব-মন্দিরও বর্তমান। গাজন উৎসবে সাঁওতালরা যোগদান করে। সেরাইকেলা, ময়ূরভঞ্জের ওড়িয়াভাষীদের মধ্যে 'ছৌ' শব্দটি প্রচলিত, কিন্তু সীমান্তবাঙলায় বাঙলাভাষী সব জায়গাতেই 'ছো' শব্দের ব্যবহার লোক-সিদ্ধ।

জ্যোৎস্নার উড়নী গায়ে চড়িয়ে, রাত বারোটার সময় গোবিন্দপুর গ্রামে 'ছো-নাচ' দেখতে গেলাম আমরা। ছড়ানো পাহাড়, চষা মাঠ পেরিয়ে গ্রাম থেকে কিছুদূরে অনেক-লোকের সমাবেশ। চার ভাগের তিনভাগই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের নর-নারী। আমার এক উন্নাসিক ধারণা এখানে ভাঙলো। ধারণা ছিল, পুরো লোকনৃত্যের আদিম পর্যায় ছাড়িয়ে যারা কলা-চর্চায় অনগ্রসর, তাদের কাছে উন্নত ধরণের নৃত্যকলার আশা করা যেতে পারে না। কিন্তু সে ভুল ভেঙে দিয়ে সাঁওতাল ছেলেরা

বর্তমানে এ নাচ ক্রমবিলীয়মান। তার বিশেষ একটি কারণ, শিল্পীদের দৈহিক শক্তিহীনতা। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে অর্ধভুক্ত কৃষক বা ক্ষেতমজুরের দল দিন দিন হারিয়ে ফেলছে দৈহিক শক্তি। এই কৃষক ও শ্রমিকদের ভেতর থেকেই নৃত্য-শিল্পীদের আবির্ভাব হতো। যারা আজো টিকে আছে টিম টিম করে, তাদের পরবর্তীকালে এ নাচের স্মৃতি হয়তো বা গ্রামবৃদ্ধদের কাহিনীর

ওস্তাদের নির্দেশ মতো, ঢোলের বোলে,—নির্ভুল পদক্ষেপ ক'রে উচ্চ তালযুক্ত ছো-নাচ নেচে গেল, শিব-দুর্গা নন্দি-ভৃঙ্গি সেজে। অন্য কোথাও সাঁওতালরা এভাবে নৃত্যকলাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছে বলে জানি না। সাঁওতাল সমাজের মধ্যে যে আদিম যৌথনৃত্যের প্রচলন আছে তা' পুরোপুরি অকৃত্রিম লোকযানের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ঋতুতে প্রচলিত মাত্র কয়েকটি সুরের এবং কয়েকটি তালের মধ্যেই এদের নৃত্য-গীতের সীমা। কচি বয়স থেকেই সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের পদক্ষেপে কলা-কৌশলবর্জিত একটি স্বাভাবিক গতি, ছন্দের মতোই এসে বাসা বাঁধে। ভারতীয় নৃত্য-গীতকলার কোন প্রভাবই এদের সমাজে স্বীকৃত নয়।

এদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য এদের কাছে নূতন সংবাদ পরিবেশন করছে। গোবিন্দপুর ক্রমশঃ উন্নত পন্থার অনুসারক হ'তে চলেছে।

প্রতি বুধবারে গোবিন্দপুর গ্রামে সাঁওতাল লোকনৃত্যের আসর বসে। আপন সংস্কৃতিকে এরা ত্যাগ করেনি। কিন্তু অন্য সংস্কৃতিকে এরা গ্রহণ করছে। এর আগে কোন মেলায়, কোন পর্ব-পার্বণে, সাঁওতাল মেয়েদের বসে থাকতে দেখিনি। পুরুষদের সঙ্গে একযোগে তারা নেচেছে। কিন্তু ছো-নাচ দেখতে এসে এরা চারিদিকে ঘিরে বসে আছে। ওদের নাচের চাঞ্চল্য কি স্তব্ধ হয়ে যাবে ক্রমে ক্রমে!

অবাক হয়ে দেখেছি, তরুণী মেয়েরা পরস্পরের গায়ে গা ঠেকিয়ে খাটিয়ার ওপর অথবা চাটাই পেতে বসে আছে, এদের মধ্যে কেউ লজ্জাবতী লতা নয়; চপলা কৃষ্ণকলি সবাই।

এই সব মেয়েদের দেখছি। উজ্জ্বল চাঁদের আলোকে পাহাড়-বনের কোলঘেঁষা গ্রামে এদের কাছে আমরাই যেন অপ্রাকৃত। তবু যেন কেমন লাগলো। এদের প্রাণচঞ্চল যৌথ নৃত্যের সহজ ছন্দ দেখেছি। চোখে আনন্দের দীপ্তি, একটুকরো মধু-মালতী হাসি, আর পরস্পরের বাহুবন্ধ-অঙ্গুলিবদ্ধ সান্নিধ্য অর্ধবৃত্ত রচনা করে মাদোল আর ধুমশার একটানা তালের মধ্যে যখন পা ফেলে নাচে, তখন সে আর এক পরিবেশ। সেই রূপেই এরা রূপবতী।

গোবিন্দপুর কি এদের পায়ের সহজ ছন্দ কেড়ে নেবে একদিন? আজ এদের পা নিথর। দেহ অকম্পিত। পরিবর্তে, জামসেদপুরের গন্ধ এদের গায়ে।

গোবিন্দপুর গ্রামের সংগে সেরাইকেলা রাজাদের সম্পর্ক খুবই আত্মীয়তাপূর্ণ। বহুকাল থেকে এ গ্রামের সঙ্গে তাদের প্রীতির সম্পর্ক। সেই সম্পর্কেই গ্রামে রাজার প্রতিষ্ঠা করা শিবমন্দির। ছো নাচের চর্চাও সেই সূত্রেই। সাঁওতালরা যখন ছো-নাচ দেখতে আসে বা ছো-নাচ নাচতে আসে, তখন সিঙবোঙার নাম নেয় না। সবাই বলে: 'বল বল মহাদেব—।'

পরের দিন বিকেলে ছড়ানো পাহাড়গুলোর ধার থেকে বেড়িয়ে এলুম। দাঁত বার ক'রে পড়ে

আসরে হাহাকার ছড়াবে। হয়তো বা ধলভূম-মানভূম-সেরাইকেলার বন-ভূমিতে বিলীন হয়ে থাকবে একটি দীর্ঘশ্বাস। গাজন-উৎসবের নৃত্য-প্রাংগণ হয়তো বেদনাভারে মূর্ছিত হয়ে পড়ে থাকবে শক্তিশালী পদক্ষেপের অনাবির্ভাবে। সংস্কৃতিসমন্বয়ে প্রাণবন্ত শিবের গাজন হয়তো বা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে স্বপ্ন দেখবে বেদপূর্ব দিনের।

আছে পাহাড়গুলো। এবড়ো-খেবড়ো, দন্তুর, ভগ্নাংশ। এই সব পাহাড়ের খোপে খোপে নেকড়ে বাঘের বাসা। আরো একটু ঘুরে ঢেউ-এর মতো পাহাড়ের পর পাহাড়। নিবৃক্ষ। চারিদিকে যেন মরুভূমির শূন্যতা। চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হলো; চাঁদ উঠলো। আশে পাশে শস্যহীন ক্ষেত। গাছপালার সংখ্যা এখানে এতো কম।

বেড়াতে যাবার আগে, গ্রামের অলি গলি দিয়ে একটু ঘুরে এসেছি। এদিক ওদিকে ঘুরঘুর ক'রে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে মুরগী-মা আর বাচ্চারা। পথে ঘাটে কোন নোংরা নেই, আবর্জনা নেই। ঘরদোরগুলি ঝকঝকে। দেয়ালে-দেয়ালে রঙীন ছবি আঁকা। অনেক বাড়ীতেই দেখলুম, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে যথাসম্ভব সাজিয়ে গুজিয়ে রাখা হয়েছে। সাধারণ সাঁওতাল গ্রামে ন্যাংটো ছেলেমেয়ের পালই বেশী।

সকালে শিবমন্দিরে গিয়ে পুজারীর সঙ্গে আলাপ হলো। মন্দিরের ভেতর কাঠের তৈরী 'পাট আছে। একটা তক্তাকে কেটে প্রায় একটা মানুষের মতো রূপ দেওয়া হয়েছে। মাথায় একটা লোহার ত্রিশূল। এই পাটের ওপর শুইয়ে পাটভক্তাকে মড়ার মতো ক'রে ভক্তাপুকুর থেকে মন্দিরে নিয়ে আসা হয়, গাজন পর্বের শেষ দিনে। ভক্তাপুকুরে স্নান সমাপন ক'রে, ভক্তাকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হয় পাটের ওপর। তেমনি অবস্থায় তাকে শ্বেতবস্ত্রে আবৃত ক'রে ফেলা হয় এবং একজন সাঁওতাল লায়া (পুজারী) আঙুল দিয়ে সেই তথাকথিত মৃতদেহকে স্পর্শ করে। তারপর চারজন লোক পাটভক্তাকে পাটসহ বয়ে নিয়ে আসে মন্দিরে। মন্দিরের পুরোহিত তখন তার ওপর জল ছিটিয়ে তাকে পুনর্জীবিত করেন।

শুনলুম কামিনা ঘটকে এখানেও মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। ধর্মের শক্তি কামিন্তা এখানে শিবের গাজনে উপস্থাপিতা। কামিনাঘট নিয়ে আসার সময় গ্রাম-সীমান্তে একটি মুরগীর ডিম রেখে আসা হয়। পুরোহিতের মতে, ব্রহ্মভূতের কাছে তা' উৎসর্গ করা হয় এবং রেখে আসার সংগে সংগেই ডিমটি কোথায় যে উধাও হয়ে যায়, তার আর ঠিকানা মেলে না।

গাজনের সময় সাঁওতালরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করেনি বটে, কিন্তু পুজো দেওয়ার অধিকার পেয়েছে। গাজনের সময় সাঁওতাল লায়ার সহযোগিতার কথা অন্যত্র শুনিনি। এখানে লায়াকে পাট ছোঁয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আর এক নবরূপ।

———

ঝাঁপান

॥ এক ॥

"একশত শিষ্য সদা শংখের যোগান।
বান্ধিয়া ছত্রিশবানা নাগের ঝাঁপান ॥
তথির উপরে চড়ে নাগ আভরণ।
বিষম শবদ আর ঢাকের বাজন ॥"

একদা বিষবিদ্যা জাঙ্গুলী বোধিসত্ত্বকে সর্পমন্ত্র শিখিয়েছিলেন ঃ

ইল্লা চিল্লা চক্কোবক্কো কোডাকোডেতি মোডামোডেতি
কুরুডা কুরুডেতি।
নিকুরুডা নিকুরুডেতি পুরুডাপুরুডেতি নিপুরুডা নিপুরুডেতি
ফুট্টে ফুট্টেরুহে ফুট্ট টুটুগুরুহে নাগে নাগরুহে নাগটুটুগুরুহে
সর্পে সর্পরুহে সর্পটুটুগুরুহে অচ্ছে অচ্ছলে ইলবিকলবিষে
শীতে শীত বত্তালে—
লে হলনে তুণ্ডে তুতুণ্ডে তণ্ডিতে তণ্ডিতট্টে
তট্ট ফুট ফুটতু বিষং স্বাহা।*

প্রকৃতির এই ভীষণ জীবটি ভারতবর্ষের মানুষকে ভীত, সন্ত্রস্ত, বিস্মিত করে পুজা আদায় করে নিয়েছে। ভয়ংকর সৌন্দর্য এর। চক্রধারী হয়ে এই জীবটি যখন মাথা তুলে দাঁড়ায়, তার গায়ের বিচিত্র উজ্জ্বল রং যখন সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়, তখন ভয়ে, বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা জানে যে ছোট্ট একটি বিষধরের একটি মাত্র ছোবলে বিশালকায় হাতীও লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, হাজার হাজার মানুষের জীবলীলা সমাপ্তিলাভ করে প্রতি বছরে।

একদা ভারতের অষ্ট্রিকভাষী আদিমযুগের মানুষ সর্প-পুজার প্রচলন করেছিল; টোটেম হিসাবে গ্রহণ করেছিল একে। তার জের আজো চলছে। অরণ্য পাহাড়ের বক্ষ থেকে যে মানুষ অন্নসংস্থান করতো, প্রতিপদে

* বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড—ডক্টর সুকুমার সেন।

তাদের বিপদের আশংকা ছিল। বাঘ-সিংহের সংগে মানুষ তবু সামনাসামনি লড়াই করে কিন্তু সাপের সংগে কুস্তি লড়া অসম্ভব। আচম্‌কা ছোবল মেরে একটি ফোঁটা হলাহল যদি সে মিশিয়ে দিতে পারে মানুষের রক্তে, তা' হ'লে যন্ত্রণায় নীল হয়ে অদৃশ্য সর্পদেবতাকে স্মরণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। তবু, আদিম-পুরোহিততন্ত্র-'মন্ত্র' নামক অকারণ অনর্থক শব্দের উচ্চারণ করে মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ খুঁজেছে।

সর্প পুজার প্রথা অত্যন্ত প্রাচীন। বলা বাহুল্য, সর্পপুজাকে ঠিক পশুপুজার পর্যায়ে ফেলা যায় না। সর্পকে সর্প হিসাবে পুজা না করে সর্পদেবতা বা সর্পাত্মরূপেই পুজা করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সর্প-পুজার প্রচলন আছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সর্প-টোটেম আছে, কিন্তু সর্পপুজার প্রথা নেই। আফ্রিকার প্রায় সর্বত্রই সর্পদেবতা বিদ্যমান। ভারতবর্ষের বাস্তুসাপ তো মংগলবাহী বলেই পূজার্ঘ্য পায়। বিষধর সাপকে—বিশেষ করে গোখুরা সাপকে—যদি মেরে ফেলা হয়, তা হলে তাকে অগ্নিদাহ করে তার সংকার করতে হয়। সর্পশ্রেষ্ঠ এবং সর্পকুলের ব্রাহ্মণ বলেই এই সম্মান তাকে অর্পণ করা হয়। ভারতবর্ষের সর্পপুজা মূলত সর্প-দেবতারই পুজা।

ভারতবর্ষই পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে বিভিন্ন রকমের সাপ অবস্থান করে। সর্প-পুজার প্রথা আর্যদের মধ্যে ছিল না বলেই প্রতীয়মান হয়। যজুর্বেদে অবশ্য সর্প সম্বন্ধে সম্মানসূচক কথা আছে। অর্বাচীন অথর্ববেদে সর্পবিদ্যা এবং সর্পমন্ত্রাদির বিশদ উল্লেখ রয়েছে। সর্পদংশনের হাত থেকে রক্ষা পাবার অনেক উপায় সেখানে নির্দেশিত। মহাভারত বা অন্য কোন সংস্কৃত পুরাণে মনসাদেবীর নাম পাওয়া যায় না। তখনো পর্যন্ত সর্প-দেবতা বোধ হয় হিন্দু সংস্কৃতিতে প্রবেশ লাভ করে নি। ব্যাস-মহাভারতে নাগবংশের কাহিনী আছে বটে, কিন্তু তা সর্পকুলের নয়; নাগ-টোটেমযুক্ত কোন অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর কাহিনী। বলা বাহুল্য, অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে, টোটেম হিসাবে এই ভয়ংকর প্রাণীর পুজা আর্য-পূর্বযুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। ঠিক কোন্ সময়ে লৌকিক দেবী মনসার আবির্ভাব হলো, তার তারিখ নির্ধারণ করা কঠিন, কিন্তু শেষপর্যন্ত সর্প-পুজার মধ্যে সর্পদেবী দেখা দিলেন। সর্পরাজ্ঞী মনসা 'মা-মনসা' হয়ে সর্পভীত মানুষদের পুজা গ্রহণ করলেন।

'মনসা' শব্দ নিয়ে বহু বাগবিতণ্ডা হয়ে গেছে। কেউ বলেছেন: মনসা

হচ্ছেন—দ্রাবিড়-পূজিতা মন্‌চাম্মা এবং মন্‌চাম্মা থেকেই নাকি 'মনসা মা' কথাটি উদ্‌ভূত। এ কথা বলে তাঁরা প্রমাণিত করতে চেয়েছেন যে দক্ষিণদেশীয় দ্রাবিড়দের নিকট থেকেই বাঙ্‌লা দেশে মনসাপুজার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেন এই কষ্ট কল্পনার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন যে 'মনসা' শব্দটি দ্রাবিড়ভাষীদের নিকট থেকে ধার করা হয় নি। শব্দটি আর্যভাষার এবং এই শব্দটিকে মনসা নাম্নি…ইত্যাদি সূত্র দিয়ে, পাণিনি সিদ্ধ করেছেন। ঋগ্বেদে মনস্ নামক পুংলিঙ্গ শব্দটি আছে এবং চন্দ্রগোমিন্ তাঁর ব্যাকরণে 'মনসা' শব্দটি উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করেছেন।[১] 'মনসা' মনস্ শব্দের সংগেই সম্বন্ধযুক্ত।

পুরোহিত-তন্ত্র এই মনসাকে অবলম্বন করে এবং মনসার দোহাই দিয়ে সর্প-মন্ত্র সৃষ্টির কাজে ব্রতী হয়েছিল পরবর্তীকালে। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে মনসা প্রশস্তিও রচিত হলো :

অমলে বিমলে নির্মলে মনসে
মহামনসে অচ্যুতে অদ্‌ভুতে—
মুক্তে জীবতে রক্ষ স্বস্তিম
সর্ব উপদ্রবেভ্য স্বাহা।[২]

বাঙ্‌লাদেশে মনসার আবির্ভাব ঘটলো অনেক পরে। দ্বাদশ শতকের পরেও অনেক দিন ধরে পূজো গ্রহণ করেছিলেন বিষবিদ্যা জাঙ্গুলী দেবী, যে জাঙ্গুলী দেবী সর্পবিদ্যা শিখিয়েছিলেন বোধিসত্ত্বকে। মহাযান তন্ত্রসাধনায়, জাঙ্গুলী-দেবীর অসীম প্রতিপত্তি ছিল। এদিকে লৌকিক স্তরের মধ্যে মনসাদেবীর কাহিনীও কিছু কিছু প্রচলিত হয়ে আসছিল। নানা লোক-কথার মাধ্যমে, মনসাদেবী জাঙ্গুলীকে বিতাড়িত করার গোপন আয়োজনে লিপ্ত ছিলেন। জনমানসে এই লোক-কাহিনীর প্রভাব উপেক্ষার বস্তু নয়। একদিন অনিবার্যভাবে সদর্পে, সর্পাভরণভূষিতা মনসাদেবী চূড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে বাঙ্‌লার প্রাচীনতম মঙ্গলকাব্যে নিজের মহিমা প্রচার করলেন। এই লৌকিক নারী-দেবতাকে আর্যভাষী সমাজ যে সহজে গ্রহণ করেনি, সে কাহিনীর ইংগিতও মঙ্গলকাব্যে আছে। শেষ পর্যন্ত, ক্রূরা, নিষ্ঠুর, ঈর্ষাময়ী মনসা, চাঁদ বেনের সংগে বাদ-বিসংবাদ করে তার সর্বনাশ করে নিজের

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)—ডক্টর সুকুমার সেন।
২ ঐ

চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন। চাঁদের পূজা পেয়ে তিনি দেশ-পূজ্যা হলেন। এমনি করে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির রাখীবন্ধন হলো। মঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে এই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ইতিহাস সংগুপ্ত।

বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মনসাদেবীর আসন আজও সুপ্রতিষ্ঠিত। হিন্দুসমাজের নিম্নপর্যায়ভুক্ত কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মনসাদেবীর প্রভাবের পরিসীমা নেই। পশ্চিমবাঙলার পশ্চিমসীমান্তবর্তী অঞ্চলে মা মনসা প্রায় প্রত্যেক গৃহেই পূজা প্রাপ্ত হন। বহু গৃহস্থের তুলসীতলায়, কণ্টকী সিজ্ গাছও দেখা যায়। সাধারণত মনসা-সিজ[১] নামেই এর পরিচয়। দেবী মনসার প্রতীক রূপেই মনসা-সিজ বিরাজমান। লৌকিক দেবী বলেই, ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিতে মনসার স্থান গৌণ। বীরভূম, বাঁকুড়া, মানভূম, ধলভূম, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের বাগ্দী, বাউরী, মাল, ভূমিজ, ভূঞা এবং মাহাতো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে মনসাপূজার প্রচলন সর্বাধিক। বলা বাহুল্য, মনসাদেবীর পূজক হিসাবে কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে এরা গ্রহণ করে না।

প্রান্তিক রাঢ়ের বহু জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যাবে মনসা-থান। সিজ গাছ, মাটির তৈরী হাতী ঘোড়া এবং সিঁদুর-লেপা পাথর ভরা অর্চনাক্ষেত্র। এই মনসাথানে প্রাত্যহিক সাপ্তাহিক এবং মাসিক পূজা পাটের রীতি তো আছেই, তাছাড়াও বিশেষ বিশেষ তিথিতে বেশ জাঁকজমকের সংগেই মনসাপুজো হয়ে থাকে। অঞ্চল ভেদে তিথি ভেদও লক্ষ্য করা যায়।

কেতকা মনসার পূজা হয় আষাঢ়, শ্রাবণ অথবা ভাদ্রমাসের পঞ্চমী তিথিতে; আর সিজ্ মনসার পূজা হয় সাধারণত জ্যৈষ্ঠমাসে—শুক্লাদশমী তিথিতে। দশহরা, শ্রাবণসংক্রান্তি, ভাদ্রসংক্রান্তি এবং নাগপঞ্চমীতে দারুণ উৎসব। উত্তর ভারতে শ্রাবণমাসের নাগপঞ্চমী তিথিতে মনসাপূজা করা হয় আড়ম্বরের সংগে। দক্ষিণ ভারতে এই তিথি এবং উৎসবের নাম নাগ্রা পঞ্চমী। বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বেশী হয় বলেই এই সময় পূজা অনুষ্ঠান।

জ্যৈষ্ঠমাসের তেরো তারিখে 'রোহিণী পরবে'র অনুষ্ঠান হয় সীমান্ত-বাঙলায়। এই রোহিণী পরবের তিথিতেও মনসা পূজার বিধান আছে। কোন কোন অঞ্চলে রোহিণী তিথিতেই সর্প-বিদ্যাদানের সূচনা হয়। গুরু-

১ ধর্মপূজার বিধানে স্নুহি বা সিজ্ বৃক্ষস্থিতা দেবীর মন্ত্র আছে:

আহ্বাহিতাসি দেবী ত্বম্ স্নুহি বৃক্ষস্থিতা সদা

স্থিরাত্মাত্বম্ সদা ভূত্বা গৃহে কামপ্রদা ভব।

গৃহে বিদ্যার্থীরা সেদিন প্রথম পাঠ গ্রহণ করে। রোহিণী পরবের দিনে প্রভাতের ভূমিকা সুরু হতে না হতেই গোবর জলের ছড়া দিয়ে গৃহবেষ্টনী রচনা করা হয়। জনবিশ্বাস এই যে এর ফলে সারাবছর ধরে কোন সাপ আর ঘরে ঢুকতে পারবে না। এই গৃহবেষ্টনীর আঞ্চলিক নাম ধরণী-বন্ধন বা ধরণী-বাঁধা।

সং সেজে বালকের দল সেদিন বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায় আর পায়ে নূপুর বেঁধে নাচে। রাত্রে ফল খাওয়ার নিয়ম আছে, সে ফল হওয়া চাই আষাঢ়ে গাছের; আষাঢ় মাসে প্রথম ফল ধরেছে এমন গাছের। বলা বাহুল্য, এই রোহিণীপরব প্রারম্ভিক কৃষি উৎসব ছাড়া আর কিছু নয়। বিবাহিতা মেয়েরা সেদিন কয়েক ঝুড়ি মাটি নিয়ে এসে ঘরের কোণে জমিয়ে রাখে। এই জমিয়ে রাখা মাটিকে বলে রোহিণী-মাটি। ধান-বোনার জন্য বিশেষ একটি শুভদিন হিসাবেই এই রোহিণী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

মনসাপুজার জন্য উপরিউক্ত নির্দিষ্ট তিথিগুলি ছাড়াও অন্য একটি বিশেষ দিনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, ধলভূম এবং ঝাড়গ্রামের কোন কোন অঞ্চলে। আশ্বিন-সংক্রান্তি বা ডাক-সংক্রান্তি হচ্ছে সেই বিশেষ তিথি : ঝাঁপান উৎসবের তিথি।

অন্যত্র সাধারণত শ্রাবণ সংক্রান্তিতে অথবা নাগপঞ্চমীতে ঝাঁপান খেলার প্রথা প্রচলিত। একদা পশ্চিমবাঙ্‌লার সর্বত্র ঝাঁপানের অনুষ্ঠান হতো। বর্তমানে সীমান্তবাঙ্‌লার কোন কোন অঞ্চলে ঝাঁপানের আদিরূপটি বেঁচে আছে। অন্য সব জায়গা থেকেই ঝাঁপান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অন্তত স্বরূপে অবিদ্যমান।

এই ঝাঁপান উৎসবের স্বরূপ জানতে হলে সর্পবিদ্যাধর গুরু এবং তার শিষ্যদের প্রসংগ ত্যাগ করা চলবে না। মন্ত্রগুরু এবং চেলাদের নিয়েই ঝাঁপান কাহিনী। ঝাঁপানের প্রস্তুতিপর্বে গুরু-শিষ্য অপরিহার্য। সীমান্তবাঙ্‌লার প্রায় সর্বত্রই সর্পমন্ত্র শিক্ষার জন্য গুরু বরণ করে সর্প-বিদ্যার্থীরা। বছরের কয়েকটি মাস মন্ত্রজ্ঞ হওয়ার সাধনায় তারা লিপ্ত থাকে। ধলভূম মানভূম এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে এই গুরু শিষ্যদের বিভিন্ন দলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়

গুরু হচ্ছেন সাপের ওঝা,—চল্‌তি ভাষায় 'গুণী'। এই গুণীরাই মনসাদেবীর প্রধান পুরোহিত। কি করে সাপের বিষ নামাতে হয়, কি করে সাপের মুখবন্ধ করতে হয় মন্ত্রবলে, কি করে মন্ত্র-প্রভাবে পুজাংগনে হাজির করানো যায়—বিভিন্ন দেব-দেবী-ভূত ভৈরবদের, কি করে ডাইনীর হাত থেকে

উদ্ধার পেতে হয়, এ সমস্তই গুরুর নখদর্পণে। শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, একাগ্রচিত্তে গুরু-বিদ্যা গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ গুণীরা। সাপ খেলিয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য অনুমতি নিতে হয় এই গুরুর নিকট থেকেই। সীমান্তবাঙ্‌লার জন-বিশ্বাসে এই গুণীরা অসীম শক্তিধর। জ্যৈষ্ঠমাসের রোহিণী তিথিতে, মনসাথানে পুজা ক'রে, গুণী 'চেলা বসাবেন' অর্থাৎ শিষ্য গ্রহণ করবেন। তারপর প্রতি মঙ্গলবারে মা-মনসার পুজা করতে হবে। ধলভূম-ঝাড়গ্রামে, ডাকসংক্রান্তি না আসা পর্যন্ত এই সাপ্তাহিক পুজা বন্ধ হবে না। প্রত্যেক দিনের কর্মশেষে কৃষক-শ্রমিক-তরুণের দল সমবেত হবে গুরুগৃহে। গুরু শিক্ষা দেবেন নানা মন্ত্র, নানা তুক্‌তাক। সর্পমন্ত্র, ডাকিনীমন্ত্র, যোগিনীমন্ত্র, ধুলোপড়া, বাটিচালা, তেলদেখা এবং আরো নানা ধরণের ক্রিয়া-পদ্ধতি শিখে এরা প্রস্তুত হবে ভবিষ্যতের জন্য।

জ্যৈষ্ঠমাসের সংক্রান্তিতে,[১] দেবতাদের জাগরিত করার জন্য প্রথম ডাক দেওয়া সুরু হয় আখড়াতে; তারপর প্রত্যেক মঙ্গলবারেই দেবতা-ডাকানো মন্ত্রের মাধ্যমে দেবতাদের আখড়ায় আসতে বাধ্য করা হয়। বলা বাহুল্য, দেবতা দেহধারণ করে আসে না, গুরু বা চেলাদের ভর করেই আসে। দেবতা এলে তার নিকট থেকে জেনে নেওয়া হয় গ্রামের এবং দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গল-অমঙ্গলের সংবাদ। এই দেবতারা অবশ্য সহজে আসতে চায় না। নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এদের নামিয়ে আনা হয়। শ্মশানে মড়ার মাথার উপর বসে মন্ত্রপাঠ করা, একপায়ে দাঁড়িয়ে আর শিলের উপর বসে দেবতাকে ডাকা, অথবা কয়েকগাছি বেত ধরে সমবেতভাবে মন্ত্রগান করা—, নানা প্রক্রিয়ার কয়েকটি মাত্র। এর মধ্যে সমবেত কণ্ঠে মন্ত্রগানের প্রক্রিয়াটি বেশী জনপ্রিয়। সীমান্তবাঙ্‌লার সর্বত্রই যে একই রীতি প্রচলিত আছে তা' নয়। অঞ্চল-ভেদে আচার-আচণের পার্থক্যও লক্ষিত হয়। ঝাড়গ্রাম-ধলভূম অঞ্চলে, মনসাথানের পাশে, অথবা প্রয়োজনমতো কোন ঘরের মধ্যে গুণী এবং চেলার দল একত্র হবে, সন্ধ্যার পরে। আকাশে চাঁদ থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে, তার জন্য আসে-যায় না কিছুই। বর্ষাকালে টিপ্‌ টিপ্‌ করে বা প্রবল-ভাবে বৃষ্টি যদি আসে তো আসুক। তাহলে অংগন ছেড়ে গৃহকোণে আশ্রয় নিলেই চলবে।

১ জ্যৈষ্ঠমাস, আষাঢ়মাসে সংক্রমণ করে বলে কোন কোন অঞ্চলে একে 'আষাঢ়ী বা আষাঢ়ী-সংক্রান্তি'-ও বলে।

দুপায়ের উপর বসে, হাঁটুর উপর লম্বা করে হাত রেখে কয়েক গাছি বেত ধরবে সবাই। তারপরে সুরু হবে মন্ত্রগান। দেবতা ডাকানো গান। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দেখা যাবে কারুর বেত নড়ে উঠছে ; কেঁপে উঠছে থরথর করে ; সংগে সংগে বেত্রধরও কাঁপছে এবং মাথা নাড়ছে জোরে জোরে। ক্রমে ক্রমে সে মাথা নাড়ার বেগ বাড়তে থাকবে। বুঝতে হবে দেবতা এসে গেছেন।

দেবদেবীদের তো সংখ্যা নেই! তবু এদের ডাকে যে সব দেবদেবী সাড়া দেন তাঁরা হচ্ছেন শীতলা, মনসা, ধরম, গেরাম (গ্রামদেবতা), দুয়ারশিনি, কুদ্‌রাশিনি, সোনারমুহী, কালীমুহী, বাসুকী, পবন, সন্ন্যাসী, ভৈরব প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, লৌকিক দেবদেবী ছাড়া কোন পৌরাণিক দেবদেবীদের ডাকা হয় না। এই সব গ্রামদেবতাগণ গুরু এবং চেলাদের সম্মিলিত আহ্বান উপেক্ষা করেন না। দেবাশ্রয়ীর মাধ্যমে এঁরা দেশের দশের ভালো-মন্দ খবর দিয়ে যান আর পুজো নিয়ে যান। যাকে আশ্রয় করে দেবতার আবির্ভাব সেই হতচেতন ব্যক্তিটি কাঁপতে থাকে থরথর করে। এই অবস্থাকে ঝঁুপার বা 'ব্যাকড়া' বলে কোন কোন অঞ্চলে, মূলত যা' 'ভর' নামেই প্রচলিত। কাঁপতে কাঁপতে দেবাশ্রয়ী মানুষটি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের ভংগিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। মনসাথানের পুজারী তখন প্রশ্ন করে : কে এসেছ ?

: মনসাবুড়ি। (মনসা ছাড়া যে কোন দেব-দেবীও আসতে পারেন।) মনসা দেবীকে উঁ উঁ করে কাঁদতে হবে। এই বিশেষ লক্ষণে বুঝতে হবে সত্যি মনসা না অন্য কেউ। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ আগমন-চিহ্ন আছে॥

: গাঁয়ের কুশলমঙ্গল বল।

: ভালো নয় ; অমঙ্গল—

: পুজোতে কি বিঘ্ন ঘটেছে কিছু ?

: ঘটেছে।

: কি কি চাই , পাঁঠা, কুঁকড়া না পায়রা ;—না অন্য কিছু ?

: কুঁকড়া চাই।

: এখন ধুপধুনা নাও। সন্তুষ্ট হও। পুজা হবে আগামী মঙ্গলবারে কুঁকড়া বলি দিয়ে।

এই হচ্ছে প্রশ্নোত্তরের ধরন। সব সময় দেবতা যে গাঁয়ের অমঙ্গল বার্তাই শোনাবেন তা নয় এবং সব সময় যে পাঁঠা বা মুরগী চাইবেন তাও নয়।

দেবতা গাঁয়ের মঙ্গলবার্তাও শোনান, পুজোতে সন্তুষ্ট হয়েছেন একথা বলে ভক্তদের খুশীও করে যান।

বিভিন্ন দেবতাকে বিভিন্ন ভোগ দিতে হয়। মা মনসাকে ধূনা-ধূপ দিলেই চলে।[১] নরসিংহ বীবকে কোন নৈবেদ্য দিতে হয় না, শুধু কোড়াব বা বেতের আঘাত পেলেই বীবেব সন্তুষ্টি। দু বাহু বাড়িযে নবসিংহ বীব কোড়ার আঘাত চাইবেন। মৃদুভাবে কয়েক বাব বেত্রাঘাত পেলেই বীব লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বেন মাটিতে। এবপব বেত্রাঘাত বন্ধ হবে।

: কে এসেছো? বাঘৎ বীব। —মুবগী বলি না নিয়ে বাঘৎ বীব নড়বেন না। মুবগীব মুণ্ডটা দাঁতে ছিঁড়ে ফেলে, চোঁ চোঁ করে চুষে নেবেন মুবগীব বক্ত। তাবপব মুণ্ডহীন ধড়টাকে ছুড়ে ফেলে মাটিতে শুয়ে পড়বেন বাঘৎ বীর। শুয়ে পড়লেই বুঝতে হবে বীব বিদায় গ্রহণ কবেছেন। সন্ন্যাসী বীব[২] এলে বসতে দেওয়া হবে কাঁটাযুক্ত শিমুল গাছেব পাটা। ভোগেব উপকবণ—এক কলকে গাঁজা। এমনি ভাবে বিভিন্ন দেবদেবীব জন্য বিভিন্ন বকমেব ভোগেব ব্যবস্থা।

সীমান্তবাঙলাব সাধাবণ মানুষেব ধ্যানধর্ম, আচাবনিষ্ঠা এমন এক বিশ্বাসেব উপব প্রতিষ্ঠিত, যে-বিশ্বাস বর্তমান কালেও আদিমযুগেব বিশ্বাস-প্রবণতাকে এড়িযে যেতে পাবে নি। ভাবতীয় সংস্কৃতিব একেবাবে গোড়ায় এই আদিম বিশ্বাসপ্রবণতা সংগুপ্ত আছে সন্দেহ নেই।

এই বিশ্বাসই এখনো তাদেব কাছে দেব-দেবী-বীবদেব টেনে নিয়ে আসে। এব ভিতবেব কোন ফাঁকিই তাবা ধবতে পাবে না, ধবতে চায় না। দেবতা এবং বীবগণ যে ডাক দেওয়া মাত্রই চলে আসে তা নয়, তাব জন্য ঘণ্টাব পর ঘণ্টা ধবে আহ্বান জানাতে হয় সমবেত কণ্ঠে। সে আহ্বানে কোন দিন সাড়া আসে, কোন দিন বা নিষ্ফলা হয়। দেবতা যদি আসে, তাহলে তাব কাছ থেকে অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ জানবার চেষ্টা কবে তাবা। বিশেষ কবে জানতে চায় ফসলেব কথা, বৃষ্টির কথা, একমুঠো খেতে পাওয়াব কথা। দেবতাকে আহ্বান

১ মনসা পূজার জন্য চব্বিশপরগণা প্রভৃতি জেলায় ধুনা নিষিদ্ধ বলেই জানা গেছে, পশ্চিমসীমান্ত বাঙলায় ধুনা নিষিদ্ধ নয়, মনসাপূজার আবশ্যিক উপকরণ রূপেই এর ব্যবহার।

২ বীরদের ঠিক দেব-দেবীর পর্যায়ে ফেলা হয় না। গুণী বা ডাইনীদের অনুগত অনেক বীর (spirit) থাকে, এদের দিয়ে গুণী বা ডাইনীরা অসাধ্য সাধন করিয়ে নেয় বলে জনশ্রুতি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন: যারা বামাচারে সিদ্ধ নেপালে তাদের বীর বলা হয়। বড় বড় বীরের নাম বীরেশ্বর বা ডাক।

করবার সময়, তাই জানিয়ে দেওয়া হয় যে দেবতার সংগে মিলিত হবার জন্য তারা কঠিন সাধনায় গায়ের রক্ত জল করে দিচ্ছে। নিজেদের হাড় কেটে তৈরী করেছে চামরের মুষ্টিদণ্ড। ওদিকে টিলার ওপর গর্জন করছে সাপ, আখড়ায় গর্জন করছেন গুরু, দেবতাকে আসতেই হবে—, মন্ত্রগানে এই কথাগুলি ধ্বনিত হয়ঃ

টিলাতে গরজে টিলাতে সাপ
আখড়ায় গরজে গুরু যে গোঁসাই।
হাড় কাটি কাটি চাওরা করলম
রকত করলম পানি হে।—

সংগে সংগে তাল রাখবে ডম্বরু, চলতি নাম ডুমুর। অবশ্য, দেবতাকে আহ্বানের সময় ডম্বরু অপরিহার্য নয়। বাদ্যযন্ত্র ছাড়াও আহ্বান গীতি চলে। একটা গান শেষ হলেই আর একটা গানের সুরুঃ

সাজ দিলাম সন্ধ্যা দিলাম
(মাগো) স্বর্গে দিলাম বাতি—
আজ রাতি মা মনসা আসিবেন বলি
গুরু, হে জ্বালিছেন বাতি।

তারপর যদি ঝিম্ ঝিম্ করে জল পড়তে থাকে, অন্ধকার আকাশ থেকে বিদ্যুৎ ওঠে চমকে—তা হলে মন্ত্রগানে তাও প্রতিধ্বনিত হবেঃ

মেঘ বরষে বিজলী চমকে দেবতাকে ভুলাযবে
সাতশিমুল পরতের উপরে
দেবতা চলি চলি আযবে।

বলা বাহুল্য, বর্ষাকালেই সাধারণত দেবতাদের আহ্বান করা হয়। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে আশ্বিন সংক্রান্তির মধ্যবর্তী সময় তো কালো মেঘের লীলা-খেলায় বিচঞ্চল। ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ে, টিপ টিপ করে জল পড়ে, চমকে ওঠে বিদ্যুৎ। এর মধ্য দিয়েই দেবতাদের আবির্ভাব। সাতশিমুলের উচ্চতা-বিশিষ্ট মেঘচুম্বী পর্বতের উপর থেকেই কি দেবতারা আসেন?

শুধু এই কল্পনাতেই সন্তুষ্ট হয় নি গ্রাম্য কবিদল। বর্ষাচঞ্চল ঘনঘোর রাতে দেবতাদের নৃত্যানুষ্ঠানের ভাব কল্পনাও তাদের আছে।

ঝিমির ঝিমির পানি বরষে, ভিজি গেলাঁয় রাতি।
কোন দেবতা নাচ লাগায় নিশাভর রাতি॥

আকাশে বাজছে মেঘ-ডম্বরু। 'ঝিমির ঝিমির করে' বৃষ্টির মন্দিরা বাজছে। প্রদীপের আলো ভিজে ভিজে, অন্ধকারকে ডেকে আনছে, এই অন্ধকারের মধ্যে সারা আকাশ চিরে, কোন্ দেবতার নাচ চলছে।

দেবতারা যেখানে থাকুন, ভক্তদের আহ্বান তাদের শুনতেই হবে। গুরু এবং চেলা, সবাই মিলে ডাক দেবে গভীর বিশ্বাস আর অচঞ্চল একাগ্রতার সংগে। মনসাকে আহ্বান করার সময় মন্ত্রগান হবে:

আওয়া[১] চাউল আর কাঁচা দুধ
কার নামে দিব।
যদি আসেন মা মনসা তার নামে দিব ॥

আর আছেন সাত-বহিনী। সাতটি বোনের সমাহারে কারা এই সাতটি বহিনী? বাঙলাদেশের রূপকথায় তো সাতভাই চম্পার কাহিনী আছে,, সাত বোন পারুল তো নেই। এ সাত বহিনীকে সমতল বাঙলায় পাওয়া যাবে না। এদের জন্মভূমি ছোটনাগপুরের পাহাড়-বনে, নদী নালা-ঝোপ-ঝাড়-পাহাড়-বনের দেবী এরা সাতটি বোন।[২] উড়িষ্যার বনভূমিতেও এরা আছে 'সাতভৌনি' নামে।

নদীর তীর আলো করে 'লালে লাল' সুরগুজা ফুল। তারই সাতটি ফুলের মতো সাতটি বোন বুঝি। এদের আহ্বানের জন্য মন্ত্র হচ্ছে:

নদীর ধারে সুরগুজা ফুল ফুটে লালে লাল
হিলতে আয়রে দুলতে আয়রে
সাতবহিন সাত ফুলে আয়।

কোন্ দেবতা, করে অনুগ্রহ করে দেখা দেবেন, তার কোন ঠিকঠিকানা না থাকলেও ডাকতে হবে সকলকে, যার খুশী তিনি আসবেন। শুধু কি তাই। নিদ্রিত দেবতাদের ঘুম ভাঙাতে হবে। দেবতাদের নিদ্রাভঙ্গের বহু কাহিনী তো পুরাণে আছে। এই দেবতাদেরও ঘুম ভাঙ্গাতে হয়, বলতে হয়:

আখড়া জাগাওঁ[৩] পিঁড়া[৪] জাগাও, জাগাওঁ সবঘর[৫] দেবতা
আগে জাগাওঁ বাসুকী বসুমাতা[৬], পিছু জাগাওঁ চেলা।

১ আতপ। ২ সাঁওতালী উপকথায় 'সিঙ্গবোঙ্গার' সাতটি মেয়ের কথা পাওয়া যায়।

৩ জাগরিত করি। ৪ < পীঠক

৫ সব < (সর্বগৃহ ?)

৬ বাসুকী—বসুমতী * ঝাড়গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত।

আখড়া জাগাওঁ পিঁড়া জাগাওঁ জাগাওঁ সবঘব দেবতা
আগে জাগাও ধবম দেবতা পিছু জাগাওঁ চেলা।

... ...

এই ভাবে এই গানেব মধ্য দিয়েই সব দেবতাব নাম ধবে জাগবিত কবতে হয় তাদেব।

মনসাদেবীব দোহাই দিলে নাকি কোন দেবতাই স্থিব থাকতে পাবেন না। তাই মনসাব দোহাই দিয়ে বলা হয়ঃ

কাঁচ ঢুকতে কাসা বাজে
কোন্ কোন্ দেবতা খেলি খেলি আসে—
আয়বে, দেবতা মনসাব দোহাই—।

মনসাকে আহ্বান কবতে গিয়ে স্তবস্তুতি এবং কুৎসা দুই-ই চলে। কুৎসাব গানে দেবী মনসা নাকি খুব তাড়াতাড়ি চলে আসেন। স্তবস্তুতিতে বলা হয়ঃ

ঝুম্ ঝুম্বি ঝুম্বিয়া ঝুমুব খেলি আব—।
আমাব শিবে বাবা শিব,
ভানুমতীব ঝুমুব খেলি আয়।
কেঁই[১] আঙ্গুল কাটিয়ে মাগো সলিতা জ্বালিব।
ওগো মা মনসা আসিবেন বলি ॥

এতেও যদি সাড়া না পাওয়া যায়, তখন গাইতে হবেঃ

শুক ডালে শুকনা ডালে[২]
ডাকে শুকনীব গুণ বে—।
মায় তো হাড়িব জন্ম
বাপে তো চণ্ডাল বে—

শকুনী, হাড়ি, চণ্ডাল, আব ভানুমতী প্রভৃতি শব্দগুলি সাধাবণত কুহকবিদ্যা এবং লৌকিক তন্ত্র প্রসংগেই ব্যবহৃত হয়, এ ক্ষেত্রেও তন্ত্রেব প্রভাব লক্ষণীয়।

আগেই বলেছি, প্রত্যেকদিন দেবতাদেব ডাকা হয় না। প্রতি মঙ্গল-বাবে এবং বিশেষ বিশেষ তিথিতেই দেবতাকে আহ্বান করাব প্রথা আছে। অন্য সময়—'গুণী' বা গুরুব কাছে মন্ত্র শেখে চেলার দল। প্রত্যেকদিন সমবেত

১ কনিষ্ঠা।
২ শুক-শুকনী : শকুন-শকুনী।

ভাবে চেলারা মন্ত্র শেখে: সর্পমন্ত্র, ডাকিনীমন্ত্র, জ্বরনাশন মন্ত্র এবং আরো নানা কিছু ঝাড়ফুঁক তুকতাক। বিষবিদ্যা জাঙ্গুলী দেবী কি ভাবে বোধিসত্ত্বকে সর্পবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন, সে কথা প্রারম্ভেই বলা হয়েছে, এ যুগের ধন্বন্তরীগুরু শিষ্য-বোধিসত্ত্বদের শিক্ষা দেন:

শংখসাদা শিশির খেদা ধাইছে আপন মনে।
জটার ভিতর বিষ সাঁধালো ঝাড়িব কেমনে।
ঐ আসছেন শংখসাদা নটবরে দিয়ে পা।
হবল গবল বিষ মুখে ক্ষয়ে যা॥

গুরুগৃহে এই জাতীয় মন্ত্র আবৃত্তি করে শিখতে হয়। শিক্ষালাভের সময় গুরু এবং শিক্ষার্থী চেলার দল ছাড়া অন্য কেউই সেখানে থাকবে না। কি কি প্রক্রিয়ায় বিষকে জল করে দেওয়া হয়, কি ভাবে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে নির্বিষ করে দিতে হয় তার জন্য কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। অবসাদগ্রস্ত ঝিমন্ত রোগীকে চড় মেরে সজাগ রাখতে হবে এবং মন্ত্রপাঠ করতে হবে: 'ফুটুক চুঁই, চাপড়েতে বিষ নাই।' অথবা নিজের আঙুল মটকে বলতে হবে: 'চাঁই চট্‌কা, নাইরে বিষ, আঙুল মড়কা।' এ সব মন্ত্র আউড়ে সর্পাহত ব্যক্তির সর্বাংগে ফুঁ দিয়ে বলতে হবে:

বগী চরে হেটে,
পানি পড়ে পিঠে।
যদি বগা কারণ করে
তিন ভুবনের বিষ অলান করে[১]
নাম্ নাম্ বিষ বগার আজ্ঞায় নাম্।

আবার মন্ত্র, আবার ফুঁ:

চাঁদের চূড়ামণি চাঁদের থালা।
চাঁদের ধ্যানে বিষ উড়িয়ে পালা॥

চাঁদ সদাগরের স্মৃতি, এমনি করে নেতা ধোপানীর দোহাই দিয়েও মন্ত্রপাঠ করা হয়। দেবী মনসার সহচরী নেতা। দেবতাদের কাপড় কাচা তার কাজ। ভেলায় চড়ে চাঁদবেনের পুত্রবধূ বেহুলা, মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে ভেসে চলেছে—। দেবতার আশীর্বাদ লাভ করে সর্পদষ্ট মৃত স্বামীর পুনর্জীবন তার কাম্য। নেতা ধোবানীর ঘাটে এসে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলে বেহুলা,—

১ নামিয়ে দেয়।

এক রজকী কাপড় কাচছে আর সেই রজকীর শিশুপুত্র অক্লান্ত কান্নায় আব্দারে জননীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। কিছুতেই তাকে শান্ত করতে না পেরে, সেই রজকী এক চড়ে শিশুটিকে নিষ্প্রাণ করে শুইয়ে দিল এক ধারে। বেহুলা এ দৃশ্য দেখলো এবং স্তব্ধ হলো বিস্ময়ে। মা না রাক্ষসী! নিজের সন্তানকে যে হত্যা করতে পারে, তাকে মা বলা যায় কি করে! কিন্তু কিমাশ্চর্যম্! কাপড় কাচা শেষ করে সেই ধোবানী মৃতপুত্রের সর্বাংগে শান্তিহস্ত বুলিয়ে দিয়ে মন্ত্রপাঠ করলো। পুনর্জীবন লাভ করলো তার সন্তান। বেহুলা পা জড়িয়ে ধরলো নেতার। বললো: মাগো, আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দাও মা। বেহুলার বেদনায় ব্যথা পেয়ে এই নেতাই বলে দিয়েছিল তাকে, কি উপায়ে লখিন্দরের পুনর্জীবনপ্রাপ্তি সম্ভব। সেই নেতার দোহাই দিয়ে মন্ত্রপাঠ করা হয়:

চিতি চিতি চিতকান্না শিংগার করে ঘা।
সাত সমুদ্রে পা।
পড়িছে টুমুশ করে ঘা।
রক্ত পড়ে পুঁজ পড়ে আর পড়ে পানি
নাম্‌বে কান্‌কুটরীর বিষ শুনবে কাহানী।
অগা চলতে বগা চলে
সাত সমুদ্রের কূলে।
ধোবাধোবানী চলে সাত সমুদ্রের কূলে।
নিতা ধোবানী কাপড় কাচে
চৌদিকে পড়ে শিষ্‌—
উঠ পুত্র ঘরকে যাবা তোর অংগে নাই বিষ।

গুণী যেন বিষের নাগাল পেয়েছে, পাপিষ্ঠ বিষকে তাই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নেমে আসার জন্য:

ঝিনিক[১] পোকার পারা
বিষ করে দিক্‌দিক্[২]—
হাতের ভিতর থাকি।

১ জোনাকি
২ মিট্‌মিট্

বিষ গেল কোথা—
দেবীমার সনে হইল
জালিয়ার মার দেখা—,
নামরে পাপিষ্ঠ বিষ
আর যাবি কোথা।

এমনি ধরণের হাজারো মন্ত্র আছে।

এমনি ভাবে নানা ধরণের মন্ত্র শেখে চেলার দল। মন্ত্র শিখে এরাও গুণী হয় গুরুর মতো। গুরুকে তাই এরা দেবতার চেয়েও বড়ো বলে মানে। গুরুর নাম স্মরণ করে এরা গুণ দেখাতে যায়। আষাঢ়-শ্রাবণের ঘনঘটা'র মধ্যে এমনি করে তা'রা মনের মধ্যেও একটি মেঘাবরণ তৈরী করে। দিনের বেলায় গুরু-শিষ্য সবাই ক্ষেতে ক্ষেতে লাঙ্গল চালায়, ধান্য রোপণ করে, মেঠো সুরে ঝুমুর গান গায়। মাঝে মাঝে সাপ খুঁজে ধরবার চেষ্টা করে। ধরতে পারলে মাটির কলসীতে পুরে, কলসীর মুখ বন্ধ করে রাখে। সাপ খেলানো যাদের জীবিকা, তারা নোতুন ঝাপিতে সাপকে আশ্রয় দান করে।

এই গুরু-চেলারা শুধু যে সীমান্তবাঙলারই বৈশিষ্ট্য, তা অবশ্যই নয়, সারা ভারতবর্ষে এ ধরণের প্রথা আছে। এ প্রসংগে এও বলা যেতে পারে যে, রাঁচি জেলার ওরাওঁদের মধ্যেও ঠিক এই জাতীয় প্রথা বিদ্যমান। ওরাওঁ সম্প্রদায় দ্রবিড়ভাষী, দক্ষিণাঞ্চল থেকে তারা এই ধরণের প্রথা গ্রহণ করেছিল, অথবা সীমান্তবাঙলার এই গুরু-চেলাদের প্রভাব তাদের প্রথার উপরেও পড়েছে একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তবু বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ওরাওঁদের গুরু-শিষ্য প্রথা এবং সীমান্তবাঙলার এই গুরুশিষ্য প্রথার মধ্যে ঘনিষ্ঠ মিল আছে।[১] দ্রবিড়ভাষী ওরাওঁ-রা বাঙলা দেশের পশ্চিমসীমান্তে সর্পপূজার প্রচলন করেছিল কি না, তা তর্কসাপেক্ষ। দক্ষিণদেশ থেকে মনসার মূর্তিপূজা বাঙলাদেশে গৃহীত হয়েছে বলেই কোন কোন পণ্ডিতের অভিমত।

১ ওরাওঁ সমাজে যারা সর্প-বিদ্যার্থী, তাদের বলে 'নাগমেতিয়া'।

মন্ত্র শেখার সময় প্রত্যেক দিন, তারা সবচেয়ে আগে আহ্বান জানায় আদিগুরুকে এবং অন্যান্য দেবতাদের। সমবেত কণ্ঠে গান করেই দেবতাদের আহ্বান করতে হয়। এদের আটজন দেবতার নাম: কাঙরু, নেওর, মধু, দেওগাম, হনুমান, নরসিং, ভৈঁসাসুর এবং ভুঁইফোড়। কাঙরু, কামরূপেরই অপভ্রংশ, নেওর হচ্ছে নেউল। এই সব দেবতা এসে নাগমেতিয়াদের উপর ভর করে। যার ওপর ভৈঁসাসুর ভর করে, সে, সেই মুহূর্তে আখড়া ছেড়ে পার্শ্ববর্তী কোন ডোবায় বা খানায় পড়ে কাদার ওপর গড়াগড়ি দেয় মোষের মতো। কিছুক্ষণ পরে কর্দমাক্ত অবস্থায় ফিরে

—দুই—

এই গুরু শিষ্যদের কথা না বলে ঝাঁপানের স্বরূপটি প্রকাশ করা যেতো না। আষাঢ় যায়, শ্রাবণ আসে। লাউডগা সাপের মতো লকলকে হয়ে ওঠে ধানের চারা। শালবনের লাল মাটি ধুয়ে বর্ষার জল গৈরিক অজগরের মতো ঢালু জমির দিকে গড়িয়ে আসে। শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে মনসা পূজো হবে, ঝাঁপান উৎসব হবে।

— — — — — —

এসে সে তার প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় প্রকাশ করবে। গুরু তাকে গন্ধধূপের ভোগ দেবেন। তা হলেই নাগমেতিয়ার ভর কেটে যাবে। হনুমান ভর করলে, নাগমেতিয়া হনুমানের মতো লাফাতে থাকবে। নরসিং এলে গর্জন করবে বাঘের মতো। বলা বাহুল্য, এই দেবতাদেরও তারা গুরু বলেই মনে করে। এদের আহ্বান করার জন্য গান ধরে নাগমেতিয়াগণ :

কওনা গুরু মেরা আওত হোবাইন
দুয়ারিয়া দুয়ারা দুয়ারা ছাড়ি না দে

কোন গুরু আমার আসছেন, দ্বারী তুমি দ্বার ছেড়ে দাও।

যদি কাঙরু এসে পড়ে, তাহলে তাকে নাগফেনী কাঁটার আসন দিতে হবে :

গুরুজী·বাবাজী আই গেলাইন পাহুন
মোরে কাঙরু গুরু দে রাখো—
বৈসেকে নাগফেনীক পিড়িয়া

(আমার কাঙরু গুরুবাবা এসে গেছেন, তাঁকে নাগফেনীর পিঁড়ে দাও বসতে।) বিভিন্ন দেবতার জন্য বিভিন্ন আসন নির্দিষ্ট করা আছে।

এই নাগমেতিয়াদের প্রথম শিক্ষার শুভদিন :—রবিবার। ছয়দিন শিক্ষালাভের পর গুরুর সংগে পার্শ্ববর্তী জংগলে গিয়ে কোন উইঁঢিপি থেকে বাবুই ঘাস আহরণ করে কোড়া তৈরী করবে প্রত্যেকে। উইঁঢিপি ছাড়া অন্য কোন স্থানের বাবুই ঘাসে কাজ হবে না। যতদিন না শিক্ষা সমাপ্ত হয়, ততদিন পর্যন্ত নাগমেতিয়াদের কাছে এই কোড়া সযত্নে রক্ষিত হয়। মন্ত্র আবৃত্তি করার সময় কোন নাগমেতিয়া যদি ঘুমের ঘোরে ঢুলতে থাকে তাহলে পার্শ্ববর্তী সতীর্থদের কেউ তাকে কোড়ার আঘাতে সজাগ করে দেবে। এই হচ্ছে নিয়ম।

এদের মধ্যে কিন্তু সিজগাছ পূজা করার প্রথা নেই। তার পরিবর্তে আখড়াতে বেদীর উপর লম্বা একটি পাথর পুঁতে দেওয়া হয়। সেই পাথরের ওপর, বাঁকানো একটি লোহার শিক সাপের ফণার মতো উঁচু হয়ে থাকে। নাগমেতিয়াগণ সেখানে গন্ধদ্রব্য ধূপ-ধুনা দিয়ে পূজা করে। ঘি এবং গুড়ের সংমিশ্রণে জাত পদার্থকে এরা বলে গন্ধূপ।

এই নাগমেতিয়াদের কারুর উপর যদি ভুঁইফোড় দেবতার কৃপাদৃষ্টি পড়ে তা হলে সে নিজেই সব

ভাদ্র-আশ্বিনে, ধানেব ক্ষেতে কাকচক্ষু জল। ভাদ্র সংক্রান্তিতেও মনসা-পুজা হয কোন কোন অঞ্চলে। আসবে আশ্বিন সংক্রান্তি : ডাক সংক্রান্তি। ধলভূম আব ঝাডগ্রাম অঞ্চলে ঠিক এই দিনেই ঝাঁপান উৎসব। ভয়ংকব বিষধবদেব নিয়ে জীবন-মবণ খেলা খেলতে হয় বলে বৃটিশ আমলে এই উৎসব নিষিদ্ধ হযেছিল, বলা বাহুল্য, তাব পুনরুজ্জীবন আব ঘটে নি। বীবভূম, বধমান, মানভূম, বাঁকুডা প্রভৃতি অঞ্চলে এব রূপান্তব ঘটেছে। এব আদিম রূপটি শুধু ঝাডগ্রাম এবং পূর্ব ধলভূমেই বর্তমান। শিখবভূমেব খাসপোল অঞ্চলেব ঝাঁপানও কিছু পবিমাণে বক্ষণশীল। ডাক সংক্রান্তিতে* ঝাঁপান উৎসবেব কি কাবণ থাকতে পাবে, তা ভেবে দেখাব কথা। ডাক' শব্দটি ডাকিনীব পুংলিঙ্গ। বৌদ্ধতন্ত্রাচার্যদেবও ডাক নামে অভিহিত কবা হতো। আশ্বিনেব ে" দিনে এই ডাক-সংক্রান্তিতে গর্ভবতী ধান চাবাকে সাধ ভক্ষণ কবাতে হয়।

কিছু মন্ত্র এবং তুকতাকেব প্রক্রিয়া শিখে ফেলতে পারে। ভুইযোডের কৃপা লাভ কবে নাগ-মেতিযা আব সাধাবণ নাগমেতিয়া থাকে না। সে তখন ভগৎ বা ভক্ত হয়ে যায়। 'ভগৎ' হযে গেলে সে সমাজ-বিচ্ছিন্ন যোগীব মতো বাস করবে নির্জনে। মদ-হাঁড়িয়া-মাছ-মাংস তখন তার কাছে নিষিদ্ধ। কিছুদিন পরে ভগতের অমাজিত তৈলনিষিদ্ধ চুলে জটা হয়। সেই জটার রং সোনালী হলে বুঝতে হবে যে, সে তখন শুধু ভগৎ নয়, সে তখন প্রবলশক্তিশালী 'সোখা'—যার এক অঙ্গুলি হেলনে অবণ্যরাজ্যের ভূতপ্রেত ডাইনী, দেবতা অপদেবতাগণ ওঠে আব বসে। এই সোখার শিষ্যত্ব লাভ কবতে পারলে ধন্য হয় নাগমেতিয়াগণ।

দ্রষ্টব্য —(Memoirs of the Asiatic Society of Bengal) Vol. I—1905-7

* এই দিনে প্রত্যূষে ধানেব ক্ষেতে, সারের গাদায, শব বা নলগাছ পুঁতে দিতে হয়। তাতে হলুদ, ওল, শালুকডাঁটা এবং আবো অনেক কিছু দ্রব্য বেঁধে দেওযা হয় একটি পাতার পুঁটলীর মধ্যে। এই প্রসংগে যে ছড়া আবৃত্তি কবে কৃষকসম্প্রদায়, তাকে বলে 'ধান-ফুলানো' ছড়া। বর্তমানে ছড়াটি প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। আগের মতো আব ছড়া আবৃত্তি না কবেই শুধু প্রথা রক্ষাব জন্যই শরগাছ পুঁতে দিয়ে আসছে চাষীবা। অঞ্চলভেদে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকলেও ছড়াটি মূলত একই। ছড়াতে বলা হয় :

বাই সরিষা পাকট (প্যাকাটি) খাড়ি
ঝোট পাট কাঁকুড নাড়ি।
এতে আছে শুকুতা
ধান হবে গজ-মুকুতা।
এতে আছে পুরনা (পুবাতন) বড় (খড়ের মোটা দাড)
মাচা করবে কড় কড়।

এই ডাক সংক্রান্তির দিনে ঘটা করে মনসাপুজা করা হয়। গুণী এবং চেলারা এই উৎসবে মুখ্য অংশ গ্রহণ করে।

সংস্কৃত 'যাপ্যযান' থেকে এই ঝাঁপান শব্দটি এসেছে। যাপ্যযানের অর্থ: নরবাহিত যান। পূর্বে বাংলাদেশের সর্বত্রই নরবাহিত 'ঝাপানে' 'আরোহণকারী গুণীকে নিয়ে শোভাযাত্রা হতো। বর্তমানে, 'ঝাপান' শব্দটি বেঁচে আছে মাত্র, ঝাঁপানের অনুষ'গ বিলুপ্তপ্রায়। বর্তমানে যে 'ঝাঁপান' হয়, তাতে সর্বত্র ঝাঁপান নামক যানটি থাকে না। কোন উঁচু মঞ্চের উপর থেকে ওঝার দল সাপের খেলা দেখায় মাত্র।

— — —

এতে আছে সিন্দুর—
বিল থাকতে পালাবে ধেড়ে ইন্দুর।
এতে আছে কেঁউ (একজাতীয় গাছ)
ধান হবে সাত বেঁউ (দুটি হাতকে পাশের দিকে লম্বা করে ধরলে যে
মাপ পাওয়া যায়)

এতে আছে শুকা (শুটকী মাছ)
পোকামাকড় লুকা।
নলে আছেন নিম
ধান ফলবেন ভীম।
এতে আছেন হলদী
ধান ফলবেন জলদী।
নলে আছেন হলদী
মহাজনকে ঝোল দি।
ওল ওল মহাদেবের বোল
ছোট বড় ধান ফুলে ফুলে।

। ২ ।

আকাশের জল পাতালের নল
ধান ফুলে গলগল।
ওল শুল্ শুল্ মান পাত
ভজ গোঁসাই দুধু ভাত।
হও ধান ভালো থাল
ধান হও শুধু চাল
ছোট বড় ধান ফুলে ফুলে।

শিখরভূমের খাসপোল অঞ্চলে একটি গরুর গাড়ীকে ঝাঁপানে পরিবর্তিত করা হয়। গাড়ীর উপর কয়েকটি দড়ির খাট ঘরের মতো সাজিয়ে দেওয়া হয়। সবচেয়ে উপরের খাটে সর্প-বিভূষিত 'গুণী' বসে থাকে। গোরুব গাড়ীটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। কেওট বা জেলে সম্প্রদায়ের কেউ মনসাঘট মাথায় নিয়ে সামনে চলে।

হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় যে ঝাঁপান উৎসব হয়, তাতে ঝাপানের আদিরূপটি একেবারেই নেই।[১] অথচ উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ঝাঁপানের আসল রূপটি বাঙ্‌লাদেশে বিগুমান ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। সলভিন্‌সের[২] অঙ্কিত চিত্র এবং চিত্র-পরিচিতি থেকে বোঝা যায় যে তখন ভাদ্র-সংক্রান্তিতে একটি বালককে সর্পালংকৃত করে ঝাঁপানে বসিয়ে শোভাযাত্রা সহকাবে নিয়ে যাওয়া হতো।

আশ্বিন গেল কার্তিক হলো
সব ধানেব গর্ভ হলো।
নল পড়লো ভুঁয়ে
যা চাষী তুই উত্তর মুয়ে।
ইত্যাদি—

১ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁর শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী নামক উপন্যাসে এইরূপ বিবরণী দিয়েছেন।

......"আমাদের দেশে বিশেষতঃ হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় আগে ঝাঁপান হইত। এখনও কোথাও কোথাও হয়। বহুদূর দেশ হইতে বহু মাল-বৈদ্য-ওঝা একত্র হইত। অসংখ্য শিষ্যের সংখ্যা গণনা কবে কে? শিব মন্দির সমক্ষে বাঁশের বা কাঠের উচ্চ উচ্চ মঞ্চ নির্মিত হইত। এইরূপ বহু-সংখ্যক বড় বড় মঞ্চ শিবপ্রাঙ্গণে সুশোভিত হইত। এক মঞ্চের লোক বাঁশ বা কাঠেব উপর দিয়া অপর মঞ্চে যাইতে পারিত। ওস্তাদগণ শিষ্যসহ সাপের বহুসংখ্যক ঝাঁপি বা পেটাবী লইয়া সেই উচ্চ মঞ্চেব উপর উঠিত এবং সর্পের বিষম খেলা আরম্ভ করিত।

......প্রথমতঃ এই কার্য শেষ হওয়ার পর সর্পের অদ্ভুত্রূপ প্রদর্শন আরম্ভ হইল। কোন ওস্তাদ তাহার শিষ্যের সর্বাংগ সর্পদ্বারা ভূষিত করিল: সর্পেব উষ্ণীষ মাথায় পরাইল, কুণ্ডলাকারে মস্তক বেষ্টন করিয়া সর্প ঠিক মধ্যস্থলে চক্র ধরিযা রহিল; কোন সর্প কণ্ঠমালায় পবিণত হইল; কোন সর্প বলয় হইল; এইরূপে যে ওস্তাদ যতদূর পারিল, আপন আপন শিষ্যকে সাধ্যানুসারে ততদূর সাজাইল।"

২ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত (LES HINDOUS, Vol. II) নামে এক চিত্র গ্রন্থে, সলভিন্‌স (Par F. Baltazard Salvyns) নামে এক ফরাসী চিত্রকরের অংকিত ঝাঁপান চিত্র রক্ষিত

ঝাডগ্রাম এবং ধলভূম অঞ্চলেব ঝাঁপান এ প্রসংগে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে গুরু আব চেলাদেব কথা বলা হয়েছে, তাবা মনসাপূজোব পূর্ববাত্রে 'জাগরণ' পালন কববে। সাবাবাত ধবে দেবতা ডাকানো গান হবে এবং মন্ত্র আবৃত্তি কবা হবে।

পবেব দিন সকালে গুরুগৃহেব মনসাথানে প্রাবম্ভিক পুজা স্থরু হবে। মুবগী, পায়বা আর ছাগল নিয়ে আসবে চেলাবা। সিজ গাছকে সাজিয়ে দেওযা হবে পত্রপুষ্পমাল্যে। গোবব দিয়ে নিকিযে দেওয়া হবে পূজাংগন। উপবাসী স্নানসিক্ত শিষ্যমণ্ডলী এসে গোল হয়ে বসবে, গুরুকে মাঝখানে বেখে।

সীমান্তবাঙলাব অবাবিত মাঠেব বুকে ছোট ছোট কুঁডে ভবা গ্রামাঞ্চলেব কোন এক গ্রামে যদি মনসাপূজো দেখতে যাওয়া যায়, তা হলে অদূবেব নীলপাহাডেব বেখা আব বন্ধুব অনুর্বব মাঠেব মাঝে বড বড সিজগাছ বেষ্টিত মনসাথানে দাঁডিয়ে, আদিমযুগেব কথা মনে পডতে পাবে।

মনসাথানেব একপাশে কতকগুলো মডাব মাথা। একটা কোডা বা 'কডবা'। খুব ভাল কবে লক্ষ্য কবলে দেখা যাবে, সিজগাছেব পাশে একটা তুলসীগাছও আছে।

আছে। সলভিন্‌স্ সেই প্রসংগে লিখেছেন : "The Jaupaun is the feast of serpents, the lower classes call it also the carpenters' feast, because it is celebrated particularly by carpenters, joiners and those in general who work in wood. On the day of the Jaupaun all the Hindoos of these trades get their tools blest and as the feast is in honour of the serpents every true Hindoo of whatsoever rank, as long as the feast lasts, leaves at his dinner a little rice in his plate or in the banana leaf which serves him in place of it and deposits it after his meal behind the house, in hopes to attract the serpents by this regale, and that such a voluntary offering will preserve him during the year from these venomous reptiles, whose bite is often mortal.

When the Jaupaun or Munsha poojah is to be celebrated, several Mauls are hired for the purpose and one of their children is drest up in the best manner possible; after which they seat him upon bamboos, and the other Mauls carry him in procession, escorted by an immense concourse of people and many musicians. The Mauls though in general dirty and slovenly in their persons, are on this occassion remarkably well drest. They have often magnificent shawls which they borrowed from their neighbours. To shew that it was the feast of the serpents, every member of the procession carries one in his hand, the child whom they escort has then even round his neck his arms and his body as may be remarked in the print."

গুরু প্রত্যেক দেবতার নাম ধরে ডাকবেন; প্রত্যেক 'বীর' আর অপদেবতার নাম উল্লেখ করবেন; আর ডান পায়ের গোড়ালিকে আসন ক'রে বাম হাঁটুতে বাম হাত জড়িয়ে যে চেলারা গুরুর নির্দেশ গ্রহণের অপেক্ষা করছে—তারা সংগে সংগে ডানহাতের মধ্যমা আঙ্গুলে, সিঁদুরের ফোঁটা তুলে, তাদের ডান দিকের পরিষ্কৃত ভূমিতে, প্রত্যেক দেবতা অপদেবতার নামে এক একটি সিঁদুরের ফোঁটা উৎসর্গ করে দেবে। ডান দিকে যাদের নামে সিঁদুর ফোঁটা দেওয়া হয় তাদের নাম: বাসুক, বসুমতী, ধরমদেবতা, গেরামদেবতা, বঁধকুঁয়ারী, বড়ামবুড়ী, দুয়ারশিনি, শীতলা, আদ্যগুরু, সিদ্ধগুরু, ঝগড়ুগুরু, কেদার গুরু, মাদার গুরু, মনপাটচেলা, হনুমানবীর, জালিয়াবীর, টুনিয়াবীর, রমশন বীর, পবনবীর, বাঘুৎবীর, নরসিংহ বীর, আখড়াপাট, চাবুক সংহার, জালঘরা বুড়ী—। এবারে বামপার্শ্বের ভূমিতে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হবে। গুরু ডাক দিয়ে যাবেন: ডোমগুরু, ডোঙ্গাগুরু, মুসলমানী, বিষচণ্ডী, লোধা-লোধানী, ধোবা-ধোবানী··। তারপব দু হাত সিঁদুরের ফোঁটা নিয়ে, দুটি হাতকে পেছনদিকে আড়াআড়িভাবে ধরে, ফোঁটা দিতে হবে মাটিতে 'ছাঁদনদড়ি-বাঁধনদড়ি'র নামে।

তারপর, যথারীতি গুরু বসবেন পূজায়। বলি দেওয়া হবে পূজাব পরে। বলির রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হবে সিজ গাছে, মডাব মাথায়। তাবপর দেবতাদের আহ্বান করা হবে সমবেতভাবে:

বাসুকী বসমতা বলি বড বীর চেলাকে দিছেন ভর
মেঘ ডাকে ডাকে রে—
করে হুড়ু দুড়ু
মেঘ ডাকে ডাকে রে—।
ধরম দেবতা বলি বড বীর চেলাকে দিছেন ভর
মেঘ ডাকে ডাকে—রে—

এম্নিভাবে বিভিন্ন দেবতার নাম ধরে ডাক দেওয়া হবে গানে। এর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাবে, কয়েকজন চেলা জোরে জোরে মাথা নাডতে আরম্ভ করেছে। থরথর করে কেঁপে উঠছে তাদের সর্বাং' । চোখে রক্ত আভা। গান কিন্তু বন্ধ হয়নি তখনো:

পূজায় যে বাহির হলাম ডালোয়া[১] ধরিয়া
মা মনসা গো—।

১। গাছের ডাল।

বিমি ঝিমি পাণি ববষে পাণিব ভিতবে
আইস না গো সাতবহিন দেবতা
আপন চেলাকে হিলায়্যাঁ দে
আইস না গো মহামায়ী ।

এর মধ্যে পূজাংগনে দাপাদাপি শুরু হয়ে যাবে। তিন চাব জন চেলাব ওপব ভব হবেই। গুরু প্রশ্ন কবে জানতে চাইবেন তাদেব পবিচয়। যথাবীতি পবিচয় তাবা দেবে। তাবপব তাদেব ইচ্ছানুসাবে তাদেব কাছে অর্ঘ্য দেওয়া হবে, মিষ্টি, মুড়কি, মুবগী প্রভৃতি। একটা বাচ্চা মুবগী ছুঁড়ে দেওয়া হবে তাব কাছে যে মুবগীব জন্য আগ্রহ প্রকাশ কবেছে। সংগে সংগে মুবগীব মাথাটাকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে বক্তটা চোঁ চোঁ কবে শুষে নেবে সে। তাবপবে কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ কবে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে অজ্ঞান হয়ে। তাব সর্বাংগে মন্ত্রঃপূত জল ছিটিয়ে দেবেন গুরু। সংগে সংগে অজ্ঞান চেলা জ্ঞান লাভ কবে উঠে বসবে। মুখে তখনো তাজা বক্তেব চিহ্ন। তখন গান শুরু হলো: বিদায়-গীতি :

ওহে বাবা
আমাকে ছাড়িয়া গেলে।
আমাব গুরু বাবা গেলেন ইন্দব ঘবকে
চেলা যে বসিয়া বহিল,
তুলসীব তলায় মাগো।
বেয়ান মাগিছে—

দ্বিপ্রহবেব পবে, এই সব গুণী আব চেলাদেব শোভাযাত্রা বেরুবে, মনসাদেবীব পূজাংগন থেকে, অদূববর্তী কোন নদীতে বা পুকুবে ঘট ভবতে যাওয়া হবে। সাধাবণত অষ্টনাগ বিভূষিতা মনসাব মৃন্ময়ী মূর্তি তৈবী কবা হয় এসময়। বাঁকুড়া অঞ্চলে ঘট-মনসাব বিশেষ বৈচিত্র্য পবিলক্ষিত হয় মৃন্ময়ী মনসাব সম্মুখভাগে। গুণী এবং চেলাব দলই ঘটবাহী, ব্রাহ্মণ পুবোহিতেব কোন প্রয়োজন হয় না।

বেজে উঠবে ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া। দলে দলে লোক এসে সমবেত হবে পূজাংগনে। তাবপব শুরু হবে ঘট আনতে যাওয়া। চেলাদেব হাতে থাকবে পূজোব উপকবণ: সিঁদুব-হলুদ, ধূপ-ধুনো এবং আবো নানা কিছু। কেউ ধববে সাপেব ঝাঁপি, তাবপর সমবেত কণ্ঠে পাঁচালীব সুবে মনসামংগলেব

গান বা 'জাত' গান গাইতে গাইতে অগ্রসর হবে জলাশয়ের দিকে। মূল গায়েন গান ধরবে, আর বাকী সকলে দোহার, ধুয়ো ধরবে তারা। গানের তালে তালে বাজবে ডম্বরু। মূল গায়েন শুরু করবে:

পুণ্য মংগলবারে
উঠিল জালিয়ার ঘরে,
জালিয়া[১] পূজা করে সকল জনে গো।
ও মা দেবী গো—
হরষ মনে দাও মা ফুলপানি গো—

দোহারগণ পুনরাবৃত্তি করবে: ও মা দেবী গো, হরষ মনে দাও মা ফুল-পানি গো।

ধ্রুবপদের পুনরাবৃত্তি শেষ হতে না হতেই মূল গায়েনের গান সুরু হবে:

মা। ভাঙ্গির সিজের ডাল
থাপনা করিব আর—
বারি গো—
ওমা দেবী গো—
হরষ মনে দাও মা ফুলপানি গো।

দোহাররা অনেক সময় পুরো স্তবকটিই গান করে।

আশ্বিন সংক্রান্তিতে মাথার উপর নীল আকাশ আর টুকরো সাদা মেঘ, কাশফুলের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে হয়তো, ঈষৎ তপ্ত রোদের আলো কালো চুলের উপর গড়িয়ে পড়ছে হয়তো। কিন্তু যদি টিপ টিপ করে বৃষ্টিও এসে যায়, তাহলেও শোভাযাত্রা থামবে না। গানের ধুয়ো শুনেই বুঝতে হবে, একটি গান শেষ হয়ে আর একটি গান শুরু হয়েছে। হঠাৎ ডম্বরুর তালে তালে শোনা যাবে নোতুন ধুয়ো উঠছে গানের: 'মাকে আনিতে যাব ক্ষীরাই নদীর কূলে', অথবা 'মাকে আনিতে যাব শংখেশ্বরীর ঘাটে'।

১ বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে জালু-মালু নামক দু ভায়ের কাহিনী আছে। মনসা পুজোয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বিশেষ অংশ গ্রহণের কথা এ প্রসংগে স্মরণ করা যেতে পারে।—মৎস্যজীবী জালু-মালুকে চাঁদ সদাগর পাঠিয়েছিলেন মাছ ধরতে। মনসা এলেন ছলনা করতে। বললেন: বুড়ী বামনী আমি, আমাকে তোমরা নদী পার করে দাও, ওপারে যাবো। জালু-মালু বললো: তা হয় না, মাছ ধরতে দেরী হলে রাজা (চাঁদসদাগর) রাগ করবেন।

ফলে জালু-মালুর জালে আর মাছ ওঠে না কিছুতেই। শংকিত দু ভাই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর শরণাপন্ন হলো। মনসা তাদের বললেন আবার জাল ফেলতে। এবারে উঠলো মনসার স্বর্ণবারি—জোড়া ঘট।

মনসামংগলের কাহিনী হচ্ছে গানের বিষয়বস্তু। গানের একটি চরণ হচ্ছে মূল গায়েনের সম্পত্তি; ধুয়া সর্বসাধারণের। প্রত্যেক চরণ সমিল হতেও পারে, নাও হতে পারে। গ্রাম্য কবিরা অনেক সময় মিলের দিকে নজর দেবার সুযোগ পায় না, মিল খুঁজতে গেলে সুর হানির আশংকা আছে বোধ হয়।[১]

এমনি ভাবে এগিয়ে চলবে গান আর শোভাযাত্রা। গানের সংগে সংগে চোখের সামনে ভেসে উঠবে বেহুলা লখীন্দরের বাসরঘর। মনসা বিদ্বেষী শৈব চন্দ্রধর—চাঁদ বেণে— সেই বাসরঘর তৈরী করিয়েছিলেন স্বর্গশিল্পী বিশ্বকর্মাকে দিয়ে, মনসার আদেশে বিশ্বকর্মা সেই বাসরঘরকে ছিদ্রযুক্ত করে রাখতে বাধ্য হয়েছিল। সেই ছিদ্রপথে কালনাগিনী প্রবেশ করলো বাসরঘরে: তাল প্রমাণ ছিলেন কালি সলিতা হইল, সলিতা হইয়া কালি বাসরে সামাইল। নাগ নয় নাগিনী। লখীন্দরের রূপ দেখে তাই তার ক্রন্দন। গ্রাম্য কবিদের

১ একটি গানের উদাহরণ:

লোহার আচিব লোহাব পাচির লোহার বাসরঘব
(শিশু, চলরে মাকে আনিতে যাবো ক্ষীরাই নদীব কুলে—) (ধ্রুবপদ)
চারি কোণে চারি নাগ বান্ধিয়া রাখিল
শিশু .. ..
আর——প্রথম প্রহবে আইল প্রাণী পংখবাজ
শিশু . .. . .
শিয়াড়িয়া চাঁদাড়িয়া নামে চমৎকাব—
শিশু ... ...
তাল প্রমাণ ছিলেন কালি সলিতা হইল
শিশু ... .
সলিতা হইয়া কালি বাসরে সামাইল
শিশু ... ...
লখীন্দরের রূপ দেখিয়া কান্দিতে লাগিল
শিশু .. ..
এ হেন সোনার অংগে কেমনে দংশিব
শিশু ... ...
যারে যারে চাঁদ বানিয়া তোর মুণ্ডে পড়ু বাজ
শিশু ... .
এত লোক থাকিতে বানিয়ার মনসার সংগে বাদ
শিশু ... ...

পরম রমণীয় কল্পনা। নাগিনী হলেও সে নারী। ক্রূর কুটিল নাগিনী-কন্যারও কি হৃদয় আছে। কিন্তু নিরুপায় সে, মনসার আদেশ তার শিরোধার্য। ঘনিয়ে এল সেই নিষ্ঠুরতম মুহূর্ত। ঘুমে ঢলে পড়লো বেহুলা, সেই সুযোগে কালনাগিনী তাকে বৈধব্য দিয়ে গেল। হাহাকারের অন্ধকারে বাসরশয্যার চাঁদ ডুবে গেল।

শোভাযাত্রা এগিয়ে চলবে বেহুলার করুণ কান্নাকে প্রতিধ্বনিত করে।[১] তারপর এক সময় শোভাযাত্রা এসে থেমে যাবে নদীর বা পুকুরের ঘাটে।

গান শেষ করার পালা এবার :

আয় মা আনন্দময়ী আয় মা আসরে
শিশু
আমার আসবে না আঁসিলে শিবের দোহাই আছে
শিশু
মা মনসার কৃপায় একবার হরি হরি বল—।

হরিবোলে সমাচ্ছন্ন হবে চতুর্দিক। বৈষ্ণবধর্মের আক্ষরিক প্রভাব এ অঞ্চলে অল্প নয়। বিচিত্র ধরণের সংস্কৃতি মিলনের ক্ষেত্র বাঙলা দেশ, সীমান্ত বাঙ্‌লায় তা আরও বিচিত্র। এর পর, যথাবিধি দুটি ঘট নিয়ে দু জন চেলা জলে নামবে। অন্যান্য ব্রতীগণ পরস্পরের হাত ধরে বা হস্তধৃত বেতগাছা ধরে, প্রশস্ত জায়গা সৃষ্টি করে ঘিরে দাঁড়াবে তাদের, জলের মধ্যেই। তারপর মাথায় ঘট নিয়ে এক নিঃশ্বাসে ডুব দিয়ে জলভরা ঘট তুলতে হবে তাদের।

জালু মালুর ঘট বলে এ দুটি ঘট এখানে পরিচিত নয়। কেউ কেউ বলে : একটি ঘট গুরুর, আর একটি চেলার, অন্য মতে একটি ঘট মনসার, একটি বেহুলার। বলা বাহুল্য, এই জোড়া ঘট জালু-মালুর স্মৃতিকেই বহন করছে।

১ গান চলছে। গানের মধ্যে চাঁদসদাগরের গর্জন শুনতে পাওয়া গেল : উচট কপালী বেহুলা চিকন বরণ দাঁত—

শিশু . . . . ..
বিভারাত্রে খাইল স্বামীকে না পোহাইল রাত।
শিশু

চেলার উত্তর : ভাল হইল ওহে শ্বশুর মোরে দিলে বাদ
শিশু

ঘট মাথায় নিয়ে, এবার পুজোমণ্ডপে ফেরার পালা। ঝাঁপানে চড়ে 'গুণী' এবার সশিষ্য শোভাযাত্রায় বিজয়ী বীরের মতো অগ্রসর হবে। দুটো লম্বা বাঁশের ওপব একটি মঞ্চ; এরই নাম ঝাঁপান। ঝাঁপানের ওপর ঘোড়-সওয়ারের মতো চেপে বসবে গুণী। খোলা হবে সাপের ঝাঁপি। ফোঁস্ ক'রে গর্জন ক'রে উঠবে বিষধর গোক্ষুর, খরিস আর কালনাগিনী। মাথা উঁচু করে লক্‌লকে জিভ বার করবে শংখচিতি। উৎসুক জনতা যথাসম্ভব দূরে থেকে প্রত্যক্ষ করবে এদের লীলাচঞ্চল ভয়ংকর সৌন্দর্য। বলা বাহুল্য, এই ভয়ংকর জীবগুলির বিষদাঁত আগের থেগেই ভেঙে রাখা হয়। সাপেব বিষদাঁত ভাঙার কথা ওরা অবশ্য স্বীকার করতে চায় না। সামান্য ভুলে, যদি কোন সাপ নির্বিষ না হয়ে থাকে, তা হলে গুণীর হিম-শীতল পরিণতির কথাও শুনতে পাওয়া যাবে। মনসাব্রতীদের মতে, সাপকে নির্বিষ কবা হয় মন্ত্রের মাধ্যমে, বিষদাঁত ভেঙে নয়। আবার মন্ত্রচালনায় নির্বিষ সাপকে বিষধরও করা যায়। ঝাঁপান আরোহীকে পুষ্পমালো সুসজ্জিত কবে তার সর্বাংগে জড়িয়ে দেওয়া হয় সর্পকুল। সর্পের বলয়, সর্পমাল্য, সর্প-শীর্ষ হয়ে গুণী সমস্ত সাপের পুচ্ছদেশ ধরে থাকে হাতে; না হয় সেগুলি মানুষের সান্নিধ্য এমন ভাবে পছন্দ করতে নাও পারে। বারে বারে তারা গুণীর দেহ-বিচ্যুত হয়ে মাটির বুকে আশ্রয় নিতে চায়; কিন্তু গুণীর হাতে বাঁধা পড়ে নিষ্ফল আক্রোশে জিভ্ বার করে তার প্রতিবাদ জানায় মাত্র; কোন কোন সাপ হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে, ফণা তুলে, দংশন করবার চেষ্টাও করে।

সহযোগী সর্পজ্ঞানী চেলার দল এবারে কাঁধে তুলে নেবে সেই যাপ্যযান—ঝাঁপান। বিজয়ী বীরের মতো শিষ্যপরিবৃত অহিতুণ্ডক গুরুর যাত্রা সুরু হবে জনারণ্যের ভেতর দিয়ে।

এ প্রসংগে একটি কথা স্মরণীয় যে, এই গুরু এবং চেলারা মনসা বিদ্বেষী শংখ এবং তার শিষ্যদেরই প্রতীক মাত্র। কালক্রমে শংখের স্মৃতিও মনসা

আর—তোমার ছয় পুত্র কি রোগে মরিল
শিশু ... ...

(প্রশ্ন শুনে চাঁদ বেণের মুখে আর উত্তর নেই। মনসার প্রতি আক্রোশে সে নিজের চুলদাড়ি ছিঁড়তে লাগলো)

আড় চক্ষে চাহেন বাণিয়া মুচড়িয়া দাড়ী
শিশু ... .
আর——চেংমুড়ীর নাগাল পাইলে ভাঙ্গিব কাঁকাল। ইত্যাদি।

পূজাব সংগে বিজড়িত হয়ে গেছে।[১] শংখ-ধন্বন্তবীব মহাজ্ঞান হবণ কবে মনসাদেবী তাব মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু শংখগুরুর স্মৃতিকে এ কালেও বিলুপ্ত হতে দেয়নি তাব শিষ্যগণ।

নাথবা বনেব স্মৃতিকে বাঁচিয়ে বাখাব জন্য, শিখবভূমেব খাসপোল অঞ্চলেব ঝাঁপান যাত্রায় আজো কলা গাছ বেঁধে দেওয়া হয় 'ঝাঁপানেব' প্রতীক গরুব গাড়ীতে। সেই কলাগাছগুলিকে মন্ত্রপ্রভাবে বিশুষ্ক কবা হয় এবং পুনর্জীবন দান কবা হয় বলে লোক-বিশ্বাস।

---

১ বিপ্রদাসেব মনসাবিজয়ে এই শংখগুরুব কাহিনী আছে। চাঁদ বেণেব দর্পচূর্ণ করার প্রথম ধাপ হিসাবে মনসাদেবী তাব 'নাথরাবন ধ্বংস করে ফেললেন। নানা বৃক্ষ পবিশোভিত এই নাথরা কাননটি চাঁদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। চাঁদ ডেকে পাঠালেন শংখ ধন্বন্তবীকে। পূর্বে ধন্বন্তবী নামেই ইনি পরিচিত ছিলেন। মহাশংখ নামে একজন বিখ্যাত মন্ত্রবিদ্‌কে মন্ত্রজ্ঞানে পবাভূত করে নিজে শংখ ধন্বন্তবী নাম গ্রহণ করেন। 'শংখ জিনি শংখ নাম ধবে ধন্বন্তরী'। মহাতেজস্বী, সর্বমন্ত্রজ্ঞ, শংখধন্বন্তবী শিষ্যদল পরিবৃত হযে নাথরা কাননকে পুনরুজ্জীবিত কববার জন্য ঝাঁপানে চলে এলেন:

একশত শিষ্য সদা শংখেব যোগান।
বান্ধিয়া ছত্রিশবাণা নাগেব ঝাঁপান॥
তথিব উপরে চড়ে নাগ আভরণ।
বিষম শবদ আর ঢাকেব বাজন॥

শংখ এসে 'মহাজ্ঞান' জপ করে নাথরা বনকে পুনর্জীবন দান করেন। শংখের এবং শংখশিষ্যদের প্রতাপে মনসা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন:

কি কব প্রতাপ যত নাগ দেখে তৃণবৎ
গণ্ডুষ কবিয়া পিয়ে বিষ।
ছযমাসের মৃত পায নিমেষে জিয়াযে দেয়
তিলেক না করে বিষবিষ॥
নাগের ঝাঁপানে চড়ে শিষ্যর জয়নেত উড়ে
বাদখাড়ু করেতে ভুষণ।
মহাবুদ্ধি বিচক্ষণ নিরবধি হৃষ্টমন
শত শিষ্য সহিতে সাজন॥

মনসাকে শাস্তিদানের জন্য, শংখধন্বন্তরী, তাব সমস্ত শিষ্যদের আহ্বান করে একত্র করেছিলেন। তারপর সশিষ্যে নগর ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন সদর্পে:

বান্ধিযা বত্রিশ বাণা সর্বাংগে নাগের ফণা
বাদখাড়ু দ্বিভুজে ভুষণ।
বিদ্যাপরীক্ষা পায্যা পবম আনন্দ হয়্যা
আনিল সকল শিষ্যগণ॥

ঝাঁপান আরোহী গুরুকে যখন কাঁধের ওপর তোলা হবে, তখন অন্যান্য শিষ্যগণ ঘিরে দাঁড়াবে তাকে। তারপর শুরু হবে বন্দনাগান এবং সর্প-বন্ধন গীতি।

হাটে গুরু বন্দি, বাটে গুরু বন্দি
আর বন্দি হাটন হাটি।
শিক্ষাগুরু বন্দি, দীক্ষাগুরু বন্দি
আব বন্দি কাঁউরা কামাটি—
গাউনের গাউন বন্দি
নাটুয়ার বন্দি তাল।
শিরে বন্দি যুগী দরশন
হাতে শিবতাল।
পঞ্চদেবে ব্রহ্মা বন্দি, অষ্টদেবে ডান
ছোট বড গুণী সব উল্টে পডে যান।
সাপ খেলে সাপিনা খেলে সাপিনাব চিন্তে
সাপিনাব বিষ নাই সাপিনার দুই দন্তে
থাক সর্পা নিশ্চলে
তোর মুখ বেঁধে দিনু লোহাব শিকলে
উপরে যায় খডকুটা তলে যায় বাণ
বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাঁপান॥

বিষম ঢাক বেজে উঠবে। ঝাঁপান চলবে। জনযাত্রা জয়ধ্বনি তুলবে। নাক ডুডু ডুং বাজবে ডম্বরু। আব ঝাঁপানেব উপর দৃপ্তবক্ষ, দীপ্তচক্ষু, হাস্যমুখ গুণী-গুরু সর্পকুণ্ডলে, সর্পছত্রে, সর্পবলয়ে, সর্পমাল্যে, শোভিত হয়ে, সর্পশীর্ষ হয়ে মা মনসার জয় ঘোষণা কববে: জয় মা মনসাব জয়। শংখগুরুর স্মৃতি পূজা করতে গিয়ে, শংখগুরুকেই এরা বিস্মৃত হয়েছে। মা মনসাব জয়ধ্বনি শুনবে, মাঠের গর্ভবতী

বিষ্ণার বিবাদ কাজে নাগেব ঝাঁপানে সাজে
তথি কুতূহলে আবোহণ।
… … …
বাজায় বিষম ঢাক গর্জিয়া ফুকরে হাঁক
সবলোক আনন্দপ্রবণ।
একশত শিষ্য সংগে নগব ভ্রময়ে রংগে
সদাই মনসা অন্বেষণ॥

ধানেব চাবা। সবুজ শালবনে ফণা তুলে দাঁড়াবে বিষধব সাপ। পথেব ধারে ভিড় কববে হাজাব জনতা। গান চলতে থাকবে। চেলাবা জানে, তাদের গুরুব উন্নত মস্তককে নতশীর্ষ কবে দেবাব জন্য এই ভিড়েব মধ্যেই আছে অনেক বিদ্বেষী। যাবা মন্ত্র আউড়ে সাপকে চেলে দিচ্ছে, যাবা নির্বিষ সাপকে বিষাক্ত কবে তুলছে মন্ত্র জ্ঞানে, গারুড়ী বিদ্যায়। এদেব হাত থেকে গুরুকে বক্ষা কবাব জন্য শিষ্যদেব সজাগ থাকতে হবে, না হয় একা গুরু কতক্ষণ লড়াই চালাবেন ওদেব সংগে: তাই মন্ত্র গানেব ভিতব দিয়েই, উড়ান, হবণ, বাণকাটাব মন্ত্র আউড়ে, তাবা অন্য কোন গুরু-বিদ্বেষী মন্ত্রবিদেব হাত থেকে গুরুকে বক্ষা কবাব ভাব নেয়।[১]

১ উদাহবণ স্বরূপ একটি মন্ত্রগান উদ্ধৃত কবা হচ্ছে:

ওমা বিষহবি বিনোদিনী বিষেব বড় জ্বালা। ধবপদ।
সংকটে পড়েছি মাগো, রাখ মা কমলা ॥
ওমা বিষহবি ... ।
কমলেতে কেলি কবে ভমবা ভমবি।
পদ্মপাতে উপজিল পবমা সুন্দবী।
কন্যা দেখি বাপ তার মদনে মাতিযা।
ধরিবারে চলিলেন বাহু পসারিযা।
হাস বলে হাঁসিনী লো বসে দেখ বংগ।
বাপ-ঝি কমল বনে কবে রংগভংগ ॥
তা দেখিয়া হাসিমনে উপজিল বিষ।
মোর মন্ত্রে ভস্ম হয কালকুটের বিষ ॥ (হবণ-মন্ত্র)
ওমা বিষহাব ... ...
বিক্রমপুবে জন্ম মাযের খর্পর ধাবিণী।
মহিষমর্দিনী মাতা সিংহবাহিনী ॥
যার আজ্ঞায় বাণ আমি কাটি খানি খানি। (বাণকাটা মন্ত্র)
মহাবাণ, জলাবাণ, হিংবাণ, ফিংবাণ মাবে যেই জন
সপ্তরথী বাণ তাব বসাতলে যায়—
ধবল গুণীব সুবাবাণ বাঁযে উড়ে যায ॥
কাব আজ্ঞায—সীতা শ্রীবামের আজ্ঞায—
বাণ উড়ে যায—
——ও মা বিষহার ... ...
ঝিরি ঝিরি মেঘ বর্ষে কচুমূলে পানি (উড়ান মন্ত্র)

ঝাঁপান আবোহী গুণী একবাব উজ্জ্বল দৃষ্টিতে জনতাকে দেখে নেয়, ভিডেব মধ্যে কাকে যেন খুঁজে বেডায। জহুবীই জহব চেনে। গুণী চেনে গুণীকে। ঝাঁপান দেখতে আবো অনেক গুণীই এসে থাকবে। ঝাপান আরোহীর যদি আত্মপ্রত্যয থাকে তা হলে সে আহ্বান জানাবে : কে আছো গুণী, কে আছো বিষ্ঠাধব, তোমাদেব চোখেব সামনে দিয়ে আমি ঝাঁপান চডে যাচ্ছি। কে বোধ কবতে পাবে আমাব যাত্রা। অনেক সময় অশ্লীল ভাষায় তিবস্কাব কবে গুণীদেব সবাসবি ডাক দেওযা হয শক্তি পরীক্ষাব জন্য। এ আহ্বান কোন গুণীই উপেক্ষা করতে পাবে না। বিড বিড কবে মন্ত্র আউডে যায় কেউ কেউ, মন্ত্রপুত ধূলি নিয়ে, কেউ কেউ ছুডে মাবে ঝাঁপানেব উপব। উত্তেজিত হয ঝাঁপানেব সাপ। ক্ষুব্ধ আক্রোশে ঝাঁপান আবোহীব সর্বাংগে একে দেয় দংশনচিহ্ন। গিলে ফেলাব চেষ্টা কবে নাক, কান, আঙ্গুল। আব গুণী সহাস্যমুখে তাদেব টেনে সবিয়ে দেয অন্য দিকে। কিছুক্ষণ পবে সাপগুলি এলিয়ে পডে গুণীব গায়ে।

শোভাযাত্রা চলবে। সংগে সংগে গানও চলবে। সমস্তই মনসা সংগীত। কোন কোন সময শ্রীকৃষ্ণেব কালীয়দমনেব গানও শোনা যাবে।[১]

হঠাৎ থেমে যাবে শোভাযাত্রা। কি :—না প্রশ্ন কবেছে কেউ। তাব উত্তব না দিয়ে যাওয়া চলে না। যে কোন লোক প্রশ্ন কবতে পারে, যে কোন লোক উত্তব দিতে পাবে।

মহাদেব হাঁক দেন বিষ তুহ পানি—
একচোট ছত্রিশ বাকডি
মারো বিষ তোকে ব্রহ্ম চাপডি ডডাও বিষ মহাজ্ঞানে।
হবিহর নামেরে জয় হরিহর নামে।
হরিলাম কালকুটের বিষ ব্রহ্ম জ্ঞানে (হরণ মন্ত্র)
কার আজ্ঞায় :
ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বরের কোটি কোটি আজ্ঞায়।

১ (আমার) গুয়াড ভাঙ্গিযে ধেনু চলিলরে। ধ্রুবপদ।
দশরায় প্রাণধন ডঠ বাছারে।
সকালে গোধন লয়ে গোষ্ঠে যাই আমি
কালিন্দীর জল গোপাল না খাওহে তুমি।
আসিয়ে কালিন্দীর জল সকল শিশু খাইল॥
সকল শিশু খাইয়া বিষ ঢলিয়া পড়িল॥
আসি তবে কৃষ্ণচন্দ্র কি বুদ্ধি করিল
সকল শিশুের বিষ রাধ, উড়াইল॥
। ইত্যাদি ।

প্রশ্ন হলো ঃ

মাথায় লয়ে যাও ভাই কার ঘটবারি।
কোন গুণে সেবা কর জয় বিষহরি ॥
কেবা তার মাতা পিতা সে কোন দেবতা
না জানিয়া সেবা কর অসম্ভব কথা।
উত্তর না বলে যদি ঘট নিয়ে যাও।
শিক্ষা গুরুর দোহাই আছে, মনসার মাথা খাও

উত্তর দেবে কেউ

শুন শুন মহাজন কার নিবেদন।
আমি শিশু মূঢ়মতি অতি অভাজন।
শুন শুন গুণীজন করি নিবেদন।
আচম্বিতে এক কথা হইল স্মরণ ॥
নন্দী নামে অনুচর ছিল শিব সন্নিধান।
শিব আজ্ঞা পাইয়া দেবী বাশলী সাজান
বৃষভবাহনে শিব তপস্যা করেন।
পথে ইন্দ্র অপ্সরীর সাথে দরশন ॥
অপ্সরীর রূপ দেখে বীর্য টলে পড়ে।
খসিয়া পড়িল বীর্য পদ্মের উপরে।
পাতালে পড়িয়া তাহা রসাতলে যায়।
বাসুকী পাইয়া রক্ষা করেন তাহায় ॥
সেই হইতে জন্ম হইলেন জয় বিষহরি।
সেই হইতে পূজা করি মনসার বারি ॥
ইহার উত্তর কথা বলে দিলাম আমি।
ঘরে গিয়া মনসা-মংগল খুলে দেখ তুমি ॥
চৌশব্দে সাক্ষী করি ওস্তাদের শিব ॥
নাগবন্ধনে উড়াও ছকুড়ি সাপের বিষ ॥
উড়াবো গুণীর বাণকে করবো খান খান।
বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাঁপান।

সংগে সংগে গর্জে উঠবে ঢাক ঢোল। ঝাপান চলবে। ওদিকে পশ্চিম আকাশে অস্তোন্মুখ সূর্যদেব যাই যাই করেও সর্পদেবীর ঘট-শোভাযাত্রা উঁকি দিয়ে দেখছেন বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে। লখীন্দর-বেহুলা-নেতাসংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর মাঝে মাঝে ঝাঁপানকে থামিয়ে দেবে। যারা মনসামংগল পাঠ করেনি, তারাও এ ধরণের প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করে রাখে। তা ছাড়া আরো এক ধরণের পদ্য আবৃত্তি করে কেউ কেউ। তার উত্তর দেবার প্রয়োজন হয় না। এর নাম 'সাক্ষীগান'। অনেক সময় এসব গানের অর্থ করা কঠিন হয়ে ওঠে। বাজনা বন্ধ হলেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়,—কে আগে বলবে সাক্ষী গান। গান নয়, পদ্য। হঠাৎ এই সাক্ষী গান শোনা গেল :

ধলভূঁই মলভূঁই হাতে গুরুর বানা।
অষ্টাংগ সুন্দর গুরুর দুই কানে সোনা॥
মা মনসার কৃপায় গুরু বাদ সাধিতে যান।
ছয় কুড়ি শিষ্য তার পশ্চাতে গড়ান॥
বিনন্দ পাগড়ী গুরুর মনোহর বেশ।
বড় বড় গুণীর সংগে লেগে গেল ঠেশ॥
বাণ কেমনে উড়াবো রে দাদা বলরাম।
উড়াব গুণীর বাণকে করবো খানখান॥
খলায় ফুঁটাও ধান বিষকে কল্লাম পানি—।
ছ কোটি ছ' নাগের বিষ ফুঁকে করি পানি॥
উপরে যায় খড়কুটা তলে যায় বাণ।
বাজুক বিষম ঢাক চলুক ঝাপান॥

এমনি করে মনসাদেবীর পুজামণ্ডপে শোভাযাত্রা যখন পৌঁছুবে, তখন হয়তো সন্ধ্যে হয়ে গেছে। পাতলা অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে গেছে চতুর্দিক। ঝাঁপান আরোহীকে তখনো কাঁধ থেকে নামানো চলবে না। আগে মন্ত্রপূত করে দিতে হবে মাটিকে—'ধরণী বাঁধার মন্ত্র' ব'লে। তা না হলে ঝাঁপান আরোহীর জীবনান্ত হতে পারে। কে জানে, হয়তো বা অন্য কোন বিদ্বেষ পরায়ণ গুণী কোন বিষধরকে মন্ত্রবলে আহ্বান জানিয়ে, ঝাঁপান আরোহীর দন্ত চূর্ণ করতে বলবে, তার তীব্র হলাহল ঢেলে দিয়ে। তাই ধরণীকে মন্ত্রপুত করা দরকার, যাতে কোন বিষধর সেখানে না আসতে পারে।

ধবণীবন্ধন মন্ত্র[1] আউড়ে ধবণীব কিছু অংশে গণ্ডী দেওয়া হবে। এবাবে নিভযে ঝাপান থেকে অববোহণ কবতে পাবে ঝাঁপান-আবোহী গুণী। সহযোগী শিষ্যগণ সাপগুলোকে ঝাপিবদ্ধ কবে দেবে এবপব। ঘট নামানো হবে মনসাব মৃন্ময়ী মূর্তিব সম্মুখে।

পুজো শেষ হলে ঝাপান দেখাব জনতা ফিবে যাবে গ্রামে গ্রামে। বাত্রে মনসামংগল পাঁচালীগান অথবা চাঁদসদাগব যাত্রাভিনয।

পবেব দিন ঘট বিসর্জন। করুণ স্বুবে গান গেযে, গুণী চেলা সবাই মিলে নিযে যাবে ঘট। তেম্‌নি কবে ডম্বরু বাজবে তালে তালে। অনেক দূব থেকে গানেব বেশ ভেসে আসবে :

"ওগে ভেসে গেল চাঁদেব বাল॥
অভাগিনী, দাঁড়াইতে নাহি গাছেব তলা॥"

সবুজ শালবনে, ধানক্ষেতে, উদাব আকাশে আছাড় খেযে পড়বে অভাগী বেহুলাব করুণস্মৃতি। ভাসানেব গানে নদীব স্রোত উদ্বেল হযে ফুলে ফুলে কাঁদবে। কলাব ভেলায লখীন্দব কিন্তু নির্বাক, নিশ্চুপ। মাথাব উপব কাক চিলেব কর্কশ চীৎকাবেও তাব ঘুম ভাঙে না। নদীব ভুধাবে মাংসলোভী অগণ্য শৃগালেব ডাকেও সে শিউবে ওঠে না। কালনাগিনী তাকে ঘুম পাড়িযে বেখেছে। আব বেহুলা!

অভাগিনী, দাঁড়াইতে নাহি গাছেব তলা।

ধরণী বাঁধো ধান ফুলকা।
ধবণী বাঁধি গেনু লংকা॥
লংকায যাই দিনু ডাক।
মোব ধরণী বছরে ছমাস থাক॥

———

করম

॥ এক ॥

"আজ ত রে করম রাজা ঘরে দুয়ারে
কাল ত রে করম রাজা কাসাই নদীর পারে ॥"

ভাদ্রমাসের একাদশী তিথি, শুক্লপক্ষ।

আকাশে ছিটে ফোটা মেঘ হয়তো বা আছে, হয়তো বা নেই। কিন্তু যাক সে কথা। আসল কথাটি হলো করম আর ধরমকে নিয়ে। একই মাতৃগর্ভসঞ্জাত যমজ ভ্রাতা এরা। করম দেবভক্ত, ধর্মপ্রাণ, উৎসব চঞ্চল। ধরম ঠিক বিপরীত। ব্যবসা বাণিজ্য করে। কি ক'রে দু পয়সার সংস্থান হ'তে পারে, সেই চিন্তাতেই সে সারা। তাই বলদের পিঠে ছালা চাপিয়ে একদিন সে বেরিয়ে পড়লো দূরদেশে,—লক্ষ্মীর সন্ধানে। তারপর সেই বলদের পিঠে টাকার ছালা নিয়ে একদিন সে ফিরলো তার জন্মভূমিতে—যেখানে করম দিনরাত 'করমরাজা'র পুজা নিয়ে ব্যস্ত। চাষবাস সব ছেড়ে, শুধু হাড়িয়া খেয়ে মাতাল হয়ে সে নাকাড়া বাজাচ্ছে আর বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে নেচে চলেছে। ভিটেতে পৌছুতে না পৌছুতেই করমের কীর্তিকলাপ দেখে রাগে জ্বলে উঠলো সে। করম তখন একটা গাছের ডাল পুঁতে তারই চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচছিল। উঠানের উপর আবছা চাঁদের মোহময় আলো। কে একজন মাদল বাজাচ্ছে: ধি ধিতাং ধিতাং ধিং।

না, আর কোন কথা নয়। একটান দিয়ে ধরম সেই পোঁতা ডালটাকে উপড়ে ফেললো। তছনছ করে ফেললো পূজোর সাজ সরঞ্জাম, অর্ঘ্য-নৈবেদ্য। তারপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে দাওয়ায় বসে হাপাতে লাগলো।

চারদিক স্তব্ধ। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। হঠাৎ কোত্থেকে কালো মেঘ এসে চাঁদের মুখে কালি লাগিয়ে দিল। গুরু গুরু গর্জনে আকাশটা কেঁপে কেঁপে উঠলো। থেমে গেল মাদল-নাকাড়ার তাল। হু হু করে মাতাল বাতাস বইতে লাগলো সারা পৃথিবী জুড়ে। আর সেই দাওয়ার উপর বসে ধরম শুনতে পেলো, কে যেন কোথায় গুমরে গুমরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্নার আর শেষ নেই, বিরাম নেই। কান্না তো

নয় তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা। আর সেই ছুরির ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ছটফট করতে লাগলো ধরম। একি হলো! কে কাঁদে! ঘন অন্ধকারের পর্দার আড়ালে! কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলো ধরম। কে কাঁদে! আকাশ! বাতাস! নয়! কাঁদছে করম।

এ কাহিনী নির্জন স্থানে গিয়ে শুনতে হবে। সীমান্ত বাংলার পরিবেশে একাত্ম হয়ে শুনতে হবে এই উপকথা। শুনতে হবে সীমান্তের চলতি বাঙলা ভাষায়। এ কাহিনী শেষ হয়নি এখানে। অনেক কথা আছে, অনেক ব্যথা আছে।

করমরাজাকে খুঁজতে গিয়ে ধরম সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হলো। অবশেষে এসে পৌঁছালো করম দেবতার দেশে। করম দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন: যাবো আমি আবার। পূজার ব্যবস্থা করে রেখো—ভাদ্রমাসের একাদশী তিথিতে গ্রামের প্রত্যেক ঘরে করমগাছের ডাল কেটে নিয়ে উঠানে পুঁতে রেখে পূজা করবে। তাতেই আমার অধিষ্ঠান।

এই করম কাহিনীর বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ আছে। একই পাবের মধ্যেও আঞ্চলিকতার ছিটে ফোঁটা বর্তমান। মূল কাহিনীর কাঠামোটা কিন্তু একই। সীমান্তবাংলার সর্বত্র ধরম করমের উপকথা প্রচলিত। রাঁচির ওরাওঁ মুণ্ডাদের মধ্যেও এই কাহিনী। মানভূম ধলভূম বা চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভূমিজ মাহাতো ভূঞা বাগালদের মধ্যেও এই কাহিনী। সাঁওতালদের মধ্যেও এর পারম্পরিক উদ্যাপন।[১]

যাদের সংস্কৃতিতে এ কাহিনীর জন্ম এবং উৎসবের বিকাশ পরিবেশে তাদের কাছে এ কাহিনী অকৃত্রিম লোকসাহিত্য। পাহাড় বনের বনফুলের

সাঁওতালী উপকথায় বলা হয়েছে: করম আর ধরম দুই ভাই। করমু চাষী আর ধরমু ব্যবসায়ী। দুভাই কিন্তু পৃথগন্ন। একদিন করমু তার বাড়ীতে এক উৎসবের আয়োজন করলো। তাতে ধরমুকে সে ডাকলো না। ফলে ধরমুও তার বাড়ীতে উৎসবের আয়োজন করলো। তাতে করমকে কোন খবরই দিলো না। করম গোঁসাই ছদ্মবেশে সেই উৎসব দেখতে এসে ধরমুর খিড়কী দরজায় আত্মগোপন করে থাকলেন। বাড়ির অন্ধকারে ভাতের গরম ফেন ফেলতে গিয়ে সেই ফেন করম গোঁসাইর গায়ে ছুড়ে মারলো ধরমু। দগ্ধ দেহের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে অঙ্গ শীতল করবার জন্য তিনি চলে গেলেন গঙ্গায়। করমের অভিশাপে ধরমু নিঃস্ব হয়ে করমুর ক্ষেতেই কাজ করতে বাধ্য হলো। তারপর নানা দুঃখ কষ্ট লাভের পর ধরমু আবার করম গোঁসাইর কৃপা লাভ করলো।

দ্রষ্টব্য: Folklore of Santal Parganas—by C H Bompas

গান আর বন্ধুর লালমাটির স্তব্ধতা মিলিয়েই এই উপকথা। কাহিনীর ভেতর থেকে এ কথা নিশ্চয়ই জানা যাবে যে এর মধ্যে শস্য উৎপাদন এবং শস্যরক্ষার জন্য দেবতাকে সন্তুষ্ট করার কথা বারবার বলা হয়েছে। মুণ্ডারী কাহিনীতেও আছে কেমন করে বর্ষার ধানক্ষেতের সব ধান চারা বানের জলে ভেসে গেল।

করম-দেবতার পূজাকে হিন্দুধর্মসমর্থিত, শাস্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতির পর্যায়ে ফেলা চলে না। মুখ্যত এই ব্রত অন্ত্যব্রতদেরই। ব্রতকথা এবং ব্রত-সংগীত দুইই এর মধ্যে বিদ্যমান।

ব্রতধারার মূল উৎস, বেদ-পূর্বযুগের গুহা-গহ্বর ছাড়িয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রবাহিত। বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে হিন্দু আচার যুক্ত বহু হিন্দু ব্রত পোষাক-পরিচ্ছদে শাস্ত্রীয় বলে মনে হলেও তার দেহ এবং অন্তর বেদপূর্ব আচার-আচরণের সুষ্ঠু রূপ মাত্র। অনেক ব্রতকথা এবং ব্রত গান সেই অতি প্রাচীন স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অনিবার্যভাবে ভাষা বদলেছে বটে, ভাব এখনো অপরিবর্তিত।

আমাদের উৎসব এবং ব্রত উদযাপনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঋতুরংগকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে, কিন্তু এই ঋতুরংগের মধ্যে প্রকৃতির বৈচিত্র্য আর সৌন্দর্যকে অনুভব করার শক্তি আদিম মানুষের ছিল না। সাধারণ মানুষকে ফসল ফলাতে হয় উদরপূর্তির জন্য। বিভিন্ন ঋতু বিভিন্ন ফসলের জন্ম দায়িনী বলেই বিভিন্ন ঋতু-উৎসবের সূত্রপাত। সাধারণ মানুষ যদি বর্ষার আবির্ভাবে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তাহলে তা নিছক প্রকৃতি-সম্ভোগের বাসনা সঞ্জাত নয়, তার মধ্যে ফসলের জন্মবার্তা ঘোষিত হচ্ছে বলেই তার সংগে কৃষী মানুষের একাত্মতা। প্রকৃতি সম্ভোগের রোম্যান্স এসেছে বহু পর্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে। শস্যোৎসবকে অবলম্বন করে অথবা পরিণত শস্যকে অপদেবতার হাত থেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টায় এবং শস্য কামনার থেকেই প্রাচীন ব্রতধারার জন্ম। তাই এই সমস্ত ব্রত একারের নয়, বহুর, ব্যষ্টির নয়, সমষ্টির। মানুষের কল্পনা শক্তি যখন উন্নত হলো তখন ঋতুরংগই আদিম কামনাবাসনার রূপটিকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে, নিজেই স্থান গ্রহণ করলো তার। তাই ফসল সংক্রান্ত উৎসব এবং পূজা-পদ্ধতি চাপা পড়ে গেল। চাপা পড়লেও তা রইলো সংগোপনে, বাইরে রূপায়িত হলো সমষ্টিগত ঋতুসম্ভোগ। এ কথা তো একান্ত রূপেই সত্য যে সমষ্টিগত সব কিছুই সাধারণের, তাই ব্রতও সাধারণের সম্পত্তি। অবনীন্দ্রনাথ বলেনঃ "ব্রত

হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোন ধর্মবিশেষের কিংবা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এটাও বেশ বোঝা যায় যে, ঋতুপরিবর্তনের সংগে মানুষের যে দশা বিপর্যয় ঘটতো সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা ও চেষ্টা থেকেই ব্রত-ক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষ বিচিত্র কামনাকে সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত, পুরাণের চেয়ে নিশ্চয় পুরানো, বেদের সমসাময়িক কিংবা তারো পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।[১]

বহু ব্রতধারা আজ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু যে কয়েকটি ধারা এখনো পরিপূর্ণভাবে শাস্ত্রীয় উপবীত ধারণ করে ব্রাহ্মণ হয় নি, যা এখনো একান্তভাবে বিশেষ একটি সমাজের মধ্যে পরিপুষ্ট, সেই ধারার একটি হচ্ছে করম ব্রত বা করম পূজা। এই অনুষ্ঠান একান্তভাবে ছোটনাগপুরের ওরাওঁ মুণ্ডাদেরই সম্পত্তি। মানভূম ধলভূম প্রভৃতি সীমান্তবাংলায় এর প্রচলনও খুব বেশী। কুর্মী-মাহাতো, ভূমিজ প্রভৃতি সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট উৎসব হিসেবে এর পরিচিতি আছে। বলা বাহুল্য, সর্বদেশে সর্বক্ষেত্রে ব্রতানুষ্ঠানে মেয়েরাই অগ্রগামী। করম উৎসবও মুখ্যত মেয়েদের উৎসব। কোন কোন বর্ণ-হিন্দু পরিবারেও এই ব্রত উদযাপিত হয়। শুধু তাই নয়, সীমান্তবাঙলার বহু জমিদারের বাড়ীতে অনিবার্যভাবেই এই করমপূজা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পশ্চিমপ্রান্তিক রাঢ়ভূমিতে এবং ছোটনাগপুরের অরণ্য পর্বতের উপত্যকায় বর্ষা যখন যাই যাই করছে, শরতের কাশ শুভ্র নির্মলতা যখন উঁকি দিচ্ছে সর্বত্র, ঠিক সেই সময় আউশ বা আশু ধান ঘরে তোলার উৎসব। আউশের মোটা ধানের চাল দিয়ে কোন কোন অঞ্চলে নবান্ন উৎসব হয় এই ভাদ্রমাসে। করমের উৎসব এই ফসল তোলারই উৎসব, শুধু তাই নয় সংগে সংগে আগামী আমন ফসলের কামনায় করমদেবতাকে সন্তুষ্ট করার উৎসব[২] এ সম্পর্কে মতভেদ আছে, কিন্তু মূলত সকলেই স্বীকার করেছেন যে এই উৎসব শস্য উৎসব ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আর্য পূর্ব ভারতবর্ষে যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান ছিল সেই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের গোড়ায় এক ধরণের দার্শনিকতাও যে ছিল না, তা নয়। সৃষ্টিরহস্য

১ বাংলার ব্রত।

২ ছোটনাগপুরের বীর হড় সম্প্রদায় 'করমভূতের' পূজো করে ঠিক এই সময়টিতেই।

সম্পর্কে একরকমের কৌতূহল আদিমসমাজেও ছিল। এই দার্শনিকতাকে কেউ কেউ 'উর্বরতাবাদ' নামে অভিহিত করেছেন। জন্মরহস্য তাদের কাছে তমসাচ্ছন্ন ছিল বলেই তারা বৃক্ষলতা, কীট, পশুপাখি সকলের জন্ম এবং বৃদ্ধির মধ্যে কোন এক অভাবনীয় শক্তির কথা ভেবেছিল। ঘরের চারদিকে অগণ্য গাছপালার জন্ম বৃদ্ধিকে তারা তাই বিস্ময়াভিভূত হয়ে নানা উপচারে পূজা করেছে। হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যেও সেই আদিম বৃক্ষ পূজার আচার-অনুষ্ঠান নিহিত আছে, সন্দেহ নেই। বট, অশ্বত্থ, বেল, পলাশ, তুলসী, শাল, করম, নিম, প্রভৃতি গাছ হিন্দু সংস্কৃতিতে এবং বর্তমানের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও সমানভাবে পূজাপ্রাপ্ত।

করম-উৎসবের ব্রতচারীরা সাধারণতঃ কুমারী কন্যা, তবে, বিবাহিত নারীরাও এতে যোগদান করে। কুমারী কন্যা, শস্য উৎপাদন, প্রজনন-ক্রিয়া প্রভৃতি, উর্বরতাবাদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক। করম উৎসবে এর সহজ প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উৎপাদন সম্পর্ক সংগত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় উড়িষ্যার ভূঞাদের মধ্যে। করম উৎসবে এরা করম রাজা আর করম রাণীর বিয়ে দেয়। দুটি করম গাছকে পাশাপাশি পুঁতে একত্র করে বেঁধে দেওয়া হয়। এই মিলনকে আগামী ফসলের প্রাচুর্যের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়। পূজা প্রাংগণে পাখি এবং সাপ ছেড়ে দেওয়া হয়। সাপের মুখ অবশ্য বন্ধ করা থাকে।' ব্রতচারিণীদের মধ্যে এই সাপ ছেড়ে দেওয়ার প্রথা কি ভাবে এসে গেছে বলা মুস্কিল, তবে প্রজনন শক্তির 'র' নর যৌনাংগের প্রতীক হিসাবে সাপের এই উপস্থিতিকে গণ্য করা যেতে পারে বলে অনেকের অভিমত।

ধলভূম, মানভূম ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে করম পূজার যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তাতেও শস্যোৎপাদন প্রক্রিয়ার অগ্রাধিকার। উৎসবের কয়েকদিন পূর্বেই মেয়েরা নদী বা খাল থেকে বালি নিয়ে আসে। সেই বালিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় পঞ্চশস্য। কোন কোন অঞ্চলে আরো বেশী রকমের শস্যবীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং অপেক্ষা করা হয় চারাগাছের জন্মলগ্নের জন্য। মানভূমের এই অনুষ্ঠানরীতির নাম 'জাওয়া'। যে সমস্ত চারাগাছ আলোকের স্পর্শ লাভ করে উর্ধ্বগতি হতে থাকলো ক্রমশ, তাদেরও নাম 'জাওয়া'। বলা বাহুল্য, 'জাওয়া' মানেই জন্ম, জাত। এই জাওয়ার দেবতা হচ্ছেন করম গোঁসাই। পূজা প্রাংগণে এই চারাগাছগুলিও সযত্নে রক্ষিত হয়, প্রোথিত করমশাখার পাশেই।

বিসর্জনের সময় বালুকাপূর্ণ সরার মধ্যে রক্ষিত এই চারাগাছগুলিকে মেয়েরা মাথায় তুলে নিয়ে যায়। করম শাখাকেও সঙ্গে নিয়ে যায়, তারপর সবকিছুকে ভাসিয়ে দেওয়া হয় নদী খাল বা পুকুরের জলে। বিসর্জনের শেষে ব্রতচারিণীগণ পান্তাভাত দিয়ে পারণ করে। ভ্রাতৃমঙ্গল কামনাই নাকি এ ব্রতের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, ভ্রাতৃমঙ্গলের কামনা এখানে একান্তভাবেই গৌণ। হিন্দুসমাজের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ব্রত কোন না কোন রূপে এর উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে। ছোটনাগপুরের অনার্যভাষী জনগোষ্ঠী করম শাখাকে ক্ষেতে ক্ষেতে প্রোথিত করে, যেমনভাবে পশ্চিমবাংলায় শরগাছ পুঁতে দেওয়া হয় আশ্বিন সংক্রান্তিতে। শস্য উৎপাদন এবং শস্যবৃদ্ধির কামনাই এই উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ছোটনাগপুরের কোন কোন অঞ্চলে ব্রাহ্মণ পুরোহিতকেও আজকাল করমদেবতার পূজারী হিসেবে নিযুক্ত করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ স্বেচ্ছায় এই ভার গ্রহণ করছেন। মুণ্ডা এবং ওরাওঁ সম্প্রদায়ের যে অংশ হিন্দু সমাজের অভিমুখী, সেই অংশে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নিয়োগবৃত্ত।[1]

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র রায় এই উৎসবকে হিন্দু উৎসবের পর্যায়ে ফেলেছেন।[2] তার কারণ বোধ হয় এই যে বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই পূজো প্রচলিত আছে। ঠিক সেই কারণেই অবশ্য প্রমাণিত হয় না যে, হিন্দুদের নিকট থেকেই আদিবাসী জনগোষ্ঠী করম পূজার উৎসবকে গ্রহণ করেছে। করম গাছের কোন মাহাত্ম্য হিন্দু পুরাণাদিতে স্বীকৃত হয়নি। তুলসী, অশ্বত্থ, বেল প্রভৃতি গাছের মাহাত্ম্যকে যে ভাবে স্বীকার করেছে হিন্দুসমাজ সে ভাবে করম গাছকে কোন দিনই গ্রহণ করা হয় নি। যাঁরা একে হিন্দু উৎসব বলেছেন, তাঁরা নজীর দেখিয়েছেন ভবিষ্য

১ রাঁচি জেলার কোন এক মুণ্ডা গ্রামে এমনি এক পুরোহিতের সংগে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। গ্রামের আখড়ায়—যেখানে করমগাছের শাখাকে প্রোথিত করে উৎসবানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়, সেইখানেই পুরোহিতের সংগে আলাপ। এ পূজা যে আদিবাসীদের তা তিনি জানেন। তবুও পূজারী হতে আপত্তি করেন নি এই জন্যই যে তাতে মোটা দক্ষিণাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। তা ছাড়া, নারায়ণ তো সবঘটেই বিরাজমান—বলেই মুচকি হেসেছিলেন তিনি। তাঁরই কাছে শুনেছি যে করমরাজার কাহিনীর সংগে অনন্ত চতুর্দশীব্রতের কাহিনীটি মিলিত করে যে কাহিনী তিনি নিজে সৃষ্টি করেছেন, তাই-ই শুনিয়ে থাকেন ভক্তদের।

২ Mundas and their country

পুরাণের। সেখানে অনুরূপ ব্রত কথা আছে।[১] ব্রতকথায় কর্মগাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বটে, কিন্তু কর্ম-বৃক্ষটি আসলে কোন বৃক্ষ, তা চিনতে না পেরে কেউ কেউ একে শ্রীকৃষ্ণলীলার 'কেলি-কদম্ব' বৃক্ষ বলেই ধরে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই 'কেলি কদম্ব'কে বিশেষ সম্মানদানের কারণ হিসাবে তাঁরা বিষ্ণুপুরাণকে সাক্ষী মেনেছেন। বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে যে কালীয়দমনের জন্য কালীদহের তীরস্থিত কদম্ব শাখা থেকে শ্রীকৃষ্ণ ঝাঁপ দিয়েছিলেন জলে।[২]

যাই হোক, করম গাছ যে কেলিকদম্ব নয় তা না বললেও চলে। কেলিকদম্ব বলে কোন বৃক্ষই ছোটনাগপুরে পাওয়া যায় না। কদম্ব, কইম-বা গুড়ি করম, এবং করম (nauclea parvifolia) একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তিন প্রকার গাছ, শুধু এই তিন প্রকারের গাছই ছোটনাগপুরে পাওয়া যায়। এইসব অঞ্চলে করমগাছের নির্যাসকে রোগ প্রতিষেধক রূপে গ্রহণ করা হয়। তুক্‌তাক মন্ত্রেতন্ত্রেও এর প্রয়োগ চলে। বলা বাহুল্য, উত্তর ভারতে করমগাছের সন্ধান না পেয়েই তাকে কেলিকদম্ব বৃক্ষে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অবশ্য, একথা ঠিক যে হিন্দুসমাজের সবত্র করমগাছের অথবা

---

১ একদিন মহামুনি নারদ নারায়ণের কাছে এসে বললেন: প্রভু, কোন ব্রত আচরণে ধন ও মান পাওয়া যায় কৃপা করে প্রকাশ করুন। নারায়ণ তখন একটি কাহিনী বলে নারদকে অনুগৃহীত করেন। নারায়ণ বললেন: পুণ্য বারাণসীধামে দেবশর্মা নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর দুই পুত্রের নাম ছিল কর্ম ও ধর্ম। দুই পুত্রকে সংসার ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করে দেবশর্মা গেলেন বনে, তপশ্চর্যার জন্য।

ধর্ম সৌম্য, কর্তব্যনিষ্ঠ, আর কর্ম ঠিক তার বিপরীতপন্থী: উচ্ছৃঙ্খল এবং বিলাসী। নিজের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য কর্ম শেষ পর্যন্ত তার সব সম্পত্তি নষ্ট করে দিলে। কর্মের সংসার কিন্তু ধনধান্যে পূর্ণ।

কোন উপায় না পেয়ে কর্ম এবং তার স্ত্রী ধর্মের কাছে গেল। ধর্ম তখন তার ক্ষেতে, মজুরদের নিয়ে ধান্যরোপণ করছিল। কর্মও লেগে গেল কাজে। তবুও মজুরী হিসাবে কিছুই পেলো না। বাড়ী ফেরার পথে দেখলো: একদল লোক কর্ম গাছের পূজা করছে। তাদের কাছ থেকে কর্ম জানতে পারলো যে উপবাস করে কর্মগাছের যথাবিহিত পূজা করলে ধন-মান সবই পাওয়া যায়। কর্মের স্ত্রী সেই ব্রত করলো ভাদ্র মাসে, পূজা করলো বান চারাকে। ফলে কর্মের দরিদ্র দশা দূর হলো।

২ তদেনং নাতিদূরস্থং কদম্বমুরুশাখিনং।
অধিরুহ্যোৎ পতিষ্যামি হ্রদেঽস্মিন্ননিলাসিন॥

(অতএব, নিকটস্থ এই কদম্বতরুর ঊর্ধ্ব শাখা থেকে নাগরাজের হ্রদে পতিত হই।)

কেলিকদম্বগাছের পূজাবিধি প্রচলিত নেই। তবে উত্তর এবং দক্ষিণ বিহারের কোন কোন অঞ্চলে এই ব্রত উদ্‌যাপিত হয় বলে জানা গেছে। তাতে করম গাছের প্রয়োজনই হয় না।[১]

উত্তর বিহারের সারণ জেলায় ব্রতচারিণীগণ ভাদ্রপদী শুক্লপক্ষের একাদশীতে কর্মাধর্মার ব্রত পালন করে থাকে। ছোটনাগপুর এবং সীমান্ত বাঙলার করম উৎসবের সংগে এর বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সারণ জেলার ব্রতচারিণীগণ প্রাঙ্গণে দুটি গর্ত করে, একটি গর্তে দুধ এবং অপর একটিতে জল ভরে দেয়। দুটি গর্তের মাঝখানে পুঁতে দেওয়া হয় কুশঘাস। সন্ধ্যার সময় বিষ্ণুপূজা এবং পরের দিন সকালে কুশ ঘাসের বিসর্জন। এই ব্রত অনুষ্ঠানে ব্রতচারিণীদের ভ্রাতৃবৃন্দ সবপ্রকার বিপদের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে : এই বিশ্বাস।

ব্রত যখন আছে, তখন ব্রতকথাও আছে। উত্তর বিহারের ব্রতকথার কাহিনী হচ্ছে এইরূপ :—সুতজী সনকাদি মুনিকে বললেন, পাণ্ডবগণ যখন বনবাসের সময় দুঃখদৈন্যের মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে যুধিষ্ঠির এই ব্রত উদযাপন করেন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে -পূর্বে গৌড়দেশে দুজন ব্রাহ্মণ বাস করতো : করম আর ধরম। তাদের মধ্যে কে বড—এই নিয়ে তর্ক উপস্থিত হলো। তার মীমাংসার জন্য তারা এক সন্ন্যাসীর কাছে গেল। সন্ন্যাসী বললেন তর্ক ছেড়ে করম পূজা কর, সব দুঃখ দূরে যাবে—'করম বৃদ্ধি হোগা'। তারা করম ব্রত করে ধন-মান সবই পেয়েছিল। দক্ষিণ বিহারের ব্রতচারিণীগণও এই ব্রত উদযাপন করে। ব্রত শেষ হলে কলমী শাক দিয়ে ভাত খাওয়ার প্রথা আছে এখানে। কলমী শাকের চলতি নাম এখানে 'করমীকে শাগ'। কল্‌মী বা করমীর সংগে নামসাদৃশ্যই বোধ হয় কর্মাধর্মের মূল। এদের করম কথার সংগে করম সংক্রান্ত সাঁওতালী কাহিনীর যথেষ্ট মিল আছে।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে, উত্তর বিহারের কর্মা ধর্মাব্রতে, দুটি করম শাখার পরিবর্তে, দুটি গর্তকে প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। করম-গাছ ও অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য, যার ফলে 'কর্ম' অর্থাৎ 'ভাগ্য' শব্দের সংগে 'করম' গাছের নামসাদৃশ্য বজায় রেখে, ব্রতটিকে হিন্দুত্ব দান করা হয়েছে। তাই কর্মা-

১ দ্রষ্টব্য :—Anthropological Papers University of Calcutta, Vol 5)

ধর্মার ব্রত উদযাপন করতে গিয়ে বিষ্ণুপূজাকে তার সংগে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত যথারীতি দক্ষিণা গ্রহণ করেই তাকে জাতে তুলেছেন। দক্ষিণ বিহারে করমের নামসাদৃশ্যেই 'করমীশাগ'ও জাতে উঠে গেছে।

ছোটনাগপুরের অরণ্য অঞ্চল থেকে চলে গিয়ে কিছুসংখ্যক ওরাও উত্তর বিহারের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে বহু কাল থেকে। তাদের নিকট থেকে কর্মাধর্মা ব্রতটি সেখানে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর দক্ষিণ বিহার তো ছোটনাগপুর আর সাওতাল পরগণার গা ঘেঁসেই অবস্থিত।

বাঙলাদেশ বা উড়িষ্যার উপজাতি ছাড়া অন্য কোন হিন্দুর মধ্যে এ উৎসব প্রচলিত নেই। ধলভূম বা ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে যে সমস্ত বর্ণহিন্দু এই উৎসব অনুষ্ঠিত করেন তারা বলেন যে, সেদ্ধ করা ধান যদি অংকুরিত হয় তা হলে করমপূজা করতে হয়। বলা বাহুল্য, বর্ণহিন্দু গৃহকর্তা করম উৎসবের উদ্যোগকর্তা মাত্র। পূজার ভার কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের হাতে ন্যস্ত করা হয় না। বাগাল, ভূমিজ প্রভৃতি প্রায়হিন্দু মানুষেরাই এই উৎসবের ভার গ্রহণ করে।

সীমান্তবাঙলা, ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকটি আদিবাসী গোষ্ঠির মধ্যে এই উৎসব সুপ্রচলিত। ছোটনাগপুরের মুণ্ডা এবং ওরাওদের মধ্যে এই উৎসবের জন্য বিশেষ ধরণের নাচেরও চলন আছে। বলা বাহুল্য, এই উৎসবটি কোন কোন অঞ্চলে হিন্দু তিলক ধারণ করলেও আজও এই ব্রতটি মুখ্যত আদিবাসী জনতার। সীমান্তবাংলার মানুষও ঐতিহ্য হিসাবে একে রক্ষা করে চলেছে। মোটের উপর একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যেতে পারে যে এই ব্রত বর্ষারই উৎসব, শস্যকামনার উৎসব।[১]

ভবিষ্য পুরাণে করম কাহিনী পাওয়া গেছে বলেই একে সনাতন হিন্দু ব্রতের মধ্যে ফেলতেই হবে এমন কোন কারণ নেই। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে রচিত এই পুরাণের অর্বাচীনতা সম্পর্কেও সন্দেহ করবার কিছু নেই। এতে চৈতন্যদেবের কাহিনীও আছে। করম ব্রতকে ভবিষ্য পুরাণ যদি আত্মসাৎও

১ 'মাইকাল হিলস'এর মাঝওয়ারদের মধ্যে শস্য বৃদ্ধি করার জন্য বর্ষাকামনায় 'করমা-নাচ' হয়। খান্দেশের ভীল সম্প্রদায় একটি করম শাখা প্রোথিত করে ইন্দ্রের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে, তার জন্য সারা রাত ধরে নাচ-গান চলে।

করে থাকে, তাও বহু প্রাচীনকাল থেকেই তা করে নি। মাত্র তিন চারশো বছরের মধ্যেই করমব্রত এখানে গৃহীত হয়েছে। বলা বাহুল্য, তবুও তা সাধারণ সুপ্রচলিত হিন্দু ব্রতাদির মধ্যে বিশেষ স্থান গ্রহণ করতে পারে নি।

এ প্রসংগে আরো একটি কথা বলার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভাদ্র শুক্লা একাদশী তিথিতে করম পূজা অনুষ্ঠানের যে রীতি প্রচলিত আছে, তাতে বিশেষ একটি পঞ্জিকাসম্মত তিথিকে গ্রহণ করা হিন্দু রীতিরই সমর্থক। আদিবাসীদের মধ্যে কোন তিথি নক্ষত্র বিচারের সুষ্ঠু প্রচেষ্টা আজো নেই। তাই, এই বিশেষ তিথিতে কর্মাপূজার রীতিকে হিন্দুরীতি বলে মনে করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, আদিবাসীদের মধ্যে সর্বত্রই এই তিথিকে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম হিসাবে গ্রহণ করা হয় নি। সীমান্তবাঙলা এবং ছোটনাগপুর অথবা উড়িষ্যার আদিবাসীদের মধ্যে ঠিক ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশী তিথিকেই করমপূজার একমাত্র নির্ধারিত দিন হিসাবে ধরা হয় না। ভাদ্রমাসের যে কোন দিনেই তার অনুষ্ঠান হয়। অবশ্য অঞ্চলের ভূস্বামীদের মধ্যেই ঐ বিশেষ তিথিতে করম পূজার প্রথা আছে। সেদিন যে করম পূজা হয়, তার নাম 'রাজা করম'। আগে রাজবাড়ীতে 'করম' না হলে প্রজাদের বাড়ীতে হতো না। রাজবাড়ীর অনুষ্ঠান শেষ হবার পর যে কোন একদিন প্রজাবৃন্দ এই অনুষ্ঠান করতে পারে। এ নিয়ম যথাযথভাবে আজ আর পালিত হয় না বটে, তবে সীমান্তবাঙলার বহু ভূস্বামী বা রাজার বাড়ীতে এখনো করম-উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রজাদের মধ্যে যারা একটু অবস্থাপন্ন, তারাও ঐ একাদশীতে করম উৎসবের মোটামুটি একটা দিন স্থির করে রেখেছে, কিন্তু আসলে যে কোন দিনই করম উৎসব অনুষ্ঠিত হতে পারে। যে সব অঞ্চলে ঐ বিশেষ তিথিটির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে সে সব অঞ্চলে হিন্দু প্রভাব অনস্বীকার্য। যে সব রাজবাড়ীতে এর প্রথম অনুষ্ঠান হয়, সে সব রাজবাড়ীর অধিপতিরা অবশ্য অর্থকৌলীন্যে বহুদিন থেকেই বৃহৎ হিন্দুসমাজের মধ্যে পুরোপুরি ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী এবং অধিকার নিয়ে বিদ্যমান। 'করমরাজা' প্রাচীন আদিবাসী সমাজের নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করে অবশেষে উপজাতিক বীর হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন, এমন সন্দেহের অবকাশও আছে। করমপূজার এই একাদশী তিথিটি প্রভাবিত হয়েছে 'ইন্দ্র দ্বাদশী' নামক রাজ-উৎসব থেকেই। ভাদ্রমাসের শুক্লা-দ্বাদশীতে 'ইঁদ পরবের' সূচনা, তার পূর্ব তিথিতে করম উৎসব। করম উৎসব না করে ইঁদ পরব করতে নেই। তাই ইন্দ্রদ্বাদশীর নির্ধারিত তিথি

রক্ষা করতে গিয়ে, শেষ পযন্ত করম পরবও তিথিবদ্ধ হয়ে গেল। ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ীতে এখনো করম এবং ইঁদ অংগাংগিভাবেই বিজড়িত। প্রথম দিনে করম গাছের অর্চনা, দ্বিতীয় দিনে শালবৃক্ষের। ভাদ্রমাসের এই শুক্লা একাদশী তিথিকে হিন্দুমতে পার্শ্বৈকাদশী বলা হয়। অনন্ত নিদ্রাভিভূত ভগবান সেদিন পার্শ্ব পরিবর্তন করেন বলেই এই নামের অবতারণা। বলা বাহুল্য, অরণ্যভূমির অধিপতিগণের কিছু কিছু অংশ বৃহৎ হিন্দু গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচিত হবার পর, তাদেব ব্রাহ্মণ পুরোহিতবর্গ ই এই উৎসবটির তিথি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন ইন্দ্রদ্বাদশীর পুর্বদিনে। 'ইন্দ্রদ্বাদশী' পুরোপুরি শাস্ত্রসম্মত বলে করমেরও একটি শাস্ত্রীয় তিথি নির্ধারিত হয়ে গেল; অবশ্য সে তিথি রাজার করমের জন্যই। অন্য সকলে সেই তিথি গ্রহণ করেছে রাজাকে অনুকবণ কবে, যদিও মুখ্যত এখনো সর্বত্র এই বিশেষ তিথিটির কোন বিশেষ মর্যাদা নেই।

সীমান্তবাঙ্‌লার সর্বত্র এই উৎসবের রীতি প্রায় একই, তবুও একথা মানতে হবে যে অঞ্চল ভেদে কিছু কিছু রূপভেদও আছে।

-দুই-

ভাদ্রমাসের একাদশী শুক্লপক্ষ।

গাঁয়ের মাঝখানে আখড়া, ওই আখড়াতে প্রতিষ্ঠা করতে হয় করম দেবতার,—করমরাজার। ব্যক্তিগতভাবেও এ উৎসবেব অনুষ্ঠান করা যেতে পারে, নিজের গৃহাংগনে। বিকেল হতে না হতেই মাদল বাজবে নাকাড়া বাজবে। যদিও মেয়েদেরই উৎসব এটি তবু ছেলেদের পক্ষে যোগদানের কোন বাধা নেই।

এদিকে সন্ধ্যের আকাশে চাঁদ উঠবে। মেত্তর হিমেল বাতাসে নোতুন শরতের ছোঁয়া লাগবে। অদূরে আউশকাটা ফাঁকা মাঠের বুকে খেঁকশিয়ালের দল ছুটোছুটি করবে। সন্ধ্যে হওযার আগেই সুবেশ তরুণ-তরুণীর দল বনের মধ্যে গিয়ে করম গাছের শাখায় হাতিয়ার বসাবে। একাদশীর আগের দিন বনের ভেতর করমগাছ খুঁজে তাতে হলদে সুতো বেঁধে বরণ করে রাখা হয়। একাদশীর দিনে শুধু গাছ কেটে দুটি ডাল নিয়ে আসা, কাঁধে ফেলে। একটি

শাখা করমের, আর একটি ধরমের।[১] শাখাগুটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে গোটা দলটি প্রত্যাবর্তন করবে মাদল বাজিয়ে, গান গেয়ে। তরুণীকণ্ঠের গান ভেসে আসবে :

আজ ত'রে করমরাজা ঘরে দুয়াবে।
কাল ত'রে করমরাজা কাঁসাই নদীব ধারে॥
করম কাটতে যায়েঁছিলি কবম টলমল।
বাজার বেটি দুলালী টাঙ্গি ঝলমল॥

সব গানই যে করম সংক্রান্ত তা নয়, অন্য ধরনের গানও গাওয়া হয়—অর্থহীন অনর্থক গান :

এ ডুংরি সে ডু'রি খেজুব পাকিল।
খেঁজুব মেজুর খায়েঁ ছুঁড়ির পেট ফাঁপিল॥

ডুংবি অর্থে ছোট পাহাড়। এ গানের ভিতর দিয়ে কোন অবৈধগর্ভা তরুণীকে শ্লেষ করা হয়েছে কি না কে জানে। বিবাহেব পবিত্রতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার গানও শুনতে পাওয়া যাবে :

পাহাড় পর্বতে ঘর
তায় আসিছে সাঙ্গাল বব
আমি সাঙ্গা যাব না—
আমার আছে বেহালি বর।

এ ধরণের গানেব কোন সীমা নেই। আবার গান :

আম পতর জাম পতর পানি-এ ভাসিল।
বড বউর জুডা দেখি তেল ঘডি নাচিল॥

আমের পাতা, জামের পাতা জলে ভাসলো ভাসুক, কিন্তু সুকেশা নারীর বধমানা কৃষ্ণকেশের খোঁপা দেখে তেলের পাত্র আনন্দে নাচছে,—এই ছোট্ট কথার ব্যঞ্জনা অনেক।

সারা পথে এমনি নাচ গানের জলসা চলবে। তারপর গ্রামে পৌছে করম রাজাকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে প্রোথিত করা হবে পূজাপ্রাংগণের

১ ছোটনাগপুরের ওরাওঁ মুণ্ডারা তিনটি করম ডাল কেটে নিয়ে এসে গ্রামের আখড়ায় প্রোথিত করে। এ তিনটি ডাল করম গোঁসাইকে উৎসর্গ করা হয় মুণ্ডা সমাজের তিন প্রধানের তরফ থেকে। এই তিন প্রধান হচ্ছে, পাহান (পুরোহিত), মাহাতো (সামাজিক বিধি ব্যবস্থাপক), এবং মুণ্ডা (গ্রাম-প্রধান)

বেদীতে। বেদীর উপর রক্ষিত হবে সদ্যোজাত শস্যাংকুরের পাত্র। তারপর ধূপদীপ নৈবেদ্যাদি দিয়ে পূজো করা হবে সেই প্রোথিত শাখাদুটিকে। পূজোর পরে বলিদান। তারপর সারারাত ধরে পাঁতা নাচ নাচবে, দাঁড়নাচ নাচবে। করম গাছকে ঘিরে গোল হয়ে নাচ শুরু করবে তরুণী মেয়েরা। ঝুমুর গানে প্লাবিত হবে চারদিক। নাচ শুরু করবার আগে লায়া, দেহরী অথবা কোন একজন করমধরাজার কাহিনী[১] বলবে।

মানভূম ধলভূমের করম উৎসবে, অনেক সময় সারারাত ধরে নাচনী-নাচের সমারোহ হয়।[২]

করম উৎসবের প্রধান অংগ করম-নাচ এবং করম গান। সাঁওতাল ওরাওঁ মুণ্ডাদের সম্মিলিত নৃত্যোৎসবের কথা কে না জানে! শুধু করমের জন্যই তাদের একটি নির্দিষ্ট নাচ আছে। ধলভূম মানভূম ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে এই করম নাচকে কোথাও বলা হয় পাঁতা নাচ, কোথাও বলা হয় দাঁড় নাচ। পংক্তি নৃত্য নাম দিয়ে একে আমরা জাতে তুলতেও পারি। আগে স্ত্রীপুরুষ সম্মিলিত ভাবেই এতে অংশ গ্রহণ করতো। ইদানীং বহু ক্ষেত্রে পুরুষরাই সারারাত ধরে নাচে নারীবিবর্জিত হয়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার নাচনী-নাচানো হয়, কিন্তু নাচনী নাচের কথা পরে আসবে। মোটামুটি ভাবে ধরে নিতে হবে যে সীমান্তবাঙলায় সাঁওতাল ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসী ছাড়া অন্য কোন হিন্দুধর্মী উপজাতিদের মেয়েরা নাচের আসরে যোগদান করছে না আজকাল।

আকাশে চাঁদের আলো। বন পাহাড় মাঠ ঘাট গ্রাম টাঁড় সবকিছু আলোয় আলো হলে তো আনন্দের পরিসীমা থাকবে না। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই বাদ সাধে ঢুকরো মেঘের ছায়া। আকস্মিকভাবে আকাশভাঙা বৃষ্টি না নামলে নাচ গানও বন্ধ হবে না।

প্রদীপ জ্বালার আগে সলতে পাকানোর মতো, নাচ শুরু করবার আগে নেশা করার কথাও আছে। হাড়িয়া হচ্ছে প্রধান, মহুল ফুলের মদও চলতে পারে। আর বাদ্যযন্ত্র হিসাবে চাই মাদল আর ধুমশা বা নাকাড়া।

ভারতবর্ষের সর্বত্র আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সম্মিলিত নৃত্যোৎসব আছে। নৃত্যোৎসবের আনুষংগিক লোকসংগীতও গীত হয় নাচের সংগে সহযোগিতা

১ দ্রষ্টব্য :—করম কথা

২ নাচনী-নাচ, দ্রষ্টব্য

রক্ষার জন্য। সীমান্তবাঙ্‌লার নরগোষ্ঠীর কথা বলতে গিয়ে একথা বলা হয়েছে যে মূলতঃ সেইসব সংস্কৃতিবাহকগণ হয় আদিম উপজাতি, কিংবা হিন্দুধর্মী উপজাতি। ছোটনাগপুরের অরণ্যভূমিতে যে সমস্ত আদিম জাতির বাস, তাদের নাচের মধ্যে এখনো সেই আদিম নৃত্যকলার পুনরাবৃত্তি। একদা যাদুতন্ত্র হিসাবেই এই নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন তারা করতো। পণ্ডিতগণের অভিমত হচ্ছে এই যে নাচ হচ্ছে জীবনসার আহরণ ও সঞ্চার করার একটি পদ্ধতি বিশেষ। তাই আদিবাসীদের প্রত্যেক উৎসবেই নৃত্যানুষ্ঠানের প্রাধান্য। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন পর্যায়ের নাচের অনুষ্ঠান তারা করে।

সীমান্তবাঙ্‌লার করম উৎসবেও নাচ অনিবার্য।

একদল লোক গোল হয়ে, হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে পড়বে পূজা-প্রাংগণে। বেজে উঠবে মাদল আর নাকাড়া। একজন মূল গায়েন শুরু করবে করম গান। মনে রাখতে হবে এই নাচ সবসময় অনুষ্ঠিত হয় না, কেবল করম উৎসবেই এর অনুষ্ঠান। মূল গায়েন গান শেষ করলেই গান ধরবে নাচের দলের সবাই। তারপর বাজনা বেজে ওঠার সংগে সংগেই নাচ শুরু হবে। এ নাচের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে ডান পা'টি যথাসম্ভব উপরে তুলতে হবে, তারপর নিচে নামিয়ে আনতে হবে। সাঁওতাল মেয়েদের নাচের মতো এতে সুষ্ঠু সংযম নেই; তবে তাল আছে নিশ্চয়ই।

যে সব গান এই অনুষ্ঠানে গীত হবে, সে গানের রচয়িতারা আমাদের ভাষায়, কেউ কবিও নয়, শিল্পীও নয়। কিন্তু লোকসংগীত বললে যা বোঝায় তা এই সীমান্তবাঙ্‌লায় যে ভাবে স্থির হয়ে আছে, তা আর বাঙলাদেশের অন্যত্র আছে বলে তো মনে হয় না; থাকার কথাও নয়। যারা এ গান রচনা করে, তাদের ভাব এবং ভাষায় দীনতা আছে, অমার্জিত রুচিবোধও আছে, কিন্তু পরিবেশ-বিচ্যুতি নেই; আত্মবঞ্চনার প্রবৃত্তি নেই।

গোড়াতেই বন্দনা। এ বন্দনায় গজানন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আর অন্যান্য দেবতাদের নামোল্লেখও নেই। এ বন্দনা আখড়া বন্দনা। এ বন্দনায় সর্বজনীনতার উল্লেখ। প্রাচীন কৌম সমাজের সাম্যবাদী পরিচয় এর মধ্যে নিহিত। অবশ্য সংগে সংগেই রাধাকৃষ্ণলীলার ক্ষীণ ইংগিতও অনিবার্য-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সীমান্তবাঙ্‌লার অধিবাসীদের উপর বৈষ্ণব-প্রভাব অল্প নয় মোটেই। যাই হোক, গান শুরু হলো,—একেবারে প্রারম্ভিক গান :—

কবম কাটিকুটি আখড়া বন্দনা কবি,
গোপিনী সব কবে একাদশী
আজবে করম ভেল বাতি।

কোথাও কোথাও গাওয়া হয়:

কবম কাটিকুটি আখড়া থাপনা কবি
সখী সব কবে একাদশী,
আজবে কবম ভেল বাতি।

কবম ঠাকুবকে বসবাব জায়গা দিতে হবে: 'খোলা চাঁছবে দাদা মাচিয়া বুনবে, আসিবেন কবম বাজা বসিবেন বে'। এব পবেও বন্দনা। এবাবে এলেন গেবাম দেবতা, হবি ঠাকুব আব ব্রজনাবীগণ।

আগে বন্দনা করি গাঁয়েব গবাম হবি
তা পবে বন্দনা ব্রজনাবী
আনন্দে ঝুমুব লাগে ভাবী।

যাবা নাচবে তাবা হেলে দুলে এই গানও গাইবে। তাবপর ধুমশা মাদলেব তালে তালে চলবে নৃত্যোল্লাস। বাদকদেব মুখে নানাজাতীয় বোলেব খই ফুটতে থাকবে।

গানেব মধ্যে শেষ পযন্ত এমনও হিন্দু প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে যাব ফলে একটি গানেব মধ্যে কবমপুজাব উৎপত্তিমূলক কথাও শোনা যাবে:—

কবম ধবম দুই ভাই
কবম আছে অযোধ্যা নগবে
সে হ শুনি সবাই কবম কবে।

অযোধ্যা নগবেব দুই ভাই বামলক্ষ্মণেব কাহিনী তো এদেবও অজানা নয়।

পাঁতা নাচেব এই জাতীয় ঝুমুব গানেব বিষয়বস্তু হিসাবে পবিবেশ প্রতিবেশকে এবা এতো বেশী গ্রহণ কবে, যাব ফলে বিসর্জিত হয় না কিছুই। একদা সীমান্তবাঙলাব বিভিন্ন অঞ্চলে দোর্দণ্ডপ্রতাপে বহু বাজা এবং জমিদাব সামন্ততন্ত্রের অবণ্যচ্ছায়া বিস্তাব কবেছিলেন। ধলভূঁই, মলভূঁই, শিখবভূঁই সাঁৎভূঁই, ববাভূঁইতে এঁদেব শেষবংশধবগণ আজও জীবিত আছেন। এই সব বাজাবাজড়ার নানা কাহিনীও গানের মধ্যে স্থান লাভ কবেছে। মল্লভূমেব কোন বাজা কবে দীন প্রজাব কুটিবে এসে মহুলভাজা খেযে গিয়েছিলেন,

সেই সহৃদয় রাজাটি কোন্ কালের, কেউ হয়তো তা জানে না। অথবা সবাই হয়তো জানে। এর মধ্যে এই সব অরণ্যভূমির অধিপতিদের একেবারে গোড়ার কথা সংগুপ্ত আছে, যাঁদের অধিকাংশই সেই সব দীন প্রজাকুলসম্ভূত হয়েও পরে হিন্দুধর্মের ছত্রচ্ছায়ায় এসে ক্ষত্রিয় নাম গ্রহণ করেছিলেন। সে সব দিন আজকে নেই, শুধু তার দীর্ঘশ্বাস ব্যঞ্জিত হচ্ছে গানে। এ প্রসংগে এও জানিয়ে রাখি মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম অঞ্চলকে মলভূঁই বলে। আদি মল্লভূমের সংগে এর কোন যোগাযোগ ছিল নিশ্চয়ই, তাছাড়া রাজার উপাধিও মল্লদেব। এই মল্লরাজার জন্যই দীর্ঘশ্বাস :—

আইলরে মহল রাজা
থাই গেল মহুল ভাজা
সেদিন সকল গেলরে বহিঁযা।

সেই রাজার আগমনে বোধহয় শ্যামসুন্দরপুর, ঘটিডুবা, নেদা-বহড়া, হুকাডুবা প্রভৃতি গ্রামে নৃত্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উপরিউক্ত গানে এদের নামও আছে :—

সে সকল দিন গেলরে বহিয়াঁ
শ্যামসুন্দরপুর মহলরাজার নিয়াঁ।
ঘটিডুবা, নেদাবহড়া,
নাচ লাগে হুকাডুবা
সেদিন সকল গেল রে বহিয়া।

এবারে ধলভূম রাজের কথা।

রাজার স্বভাবচরিত্রের দিকে ইংগিত করেই কথা বলা হয়েছে। রাজা হয়তো কোন গ্রামে নৃত্যোৎসব দেখতে এসেছেন। গাছের তলায় রক্ষিত আছে জোড়া ধুমশা, কিন্তু রাজার চোখ ব্যস্ত আছে কুলনারীদের সন্ধানে। এই কথা গানে বেধে অমর করে রাখা হলো :—

ধলভূমের রাজা বড় জমিদার রে
ঘোড়ার টপে বাঁধা উরুমাল রে
রাজা—বড় জমিদার রে।
গাঁয়ের পথে যাতে যাতে
ইঙ্গিত মারিল রাজা ঘরে হে—
জোড়ারে ধমশা তরু তলে—।

এই সমস্ত গানের শেষে রং দেওয়া হয়। রংয়ের গানে নাচের তালের দ্রুততা দেখা দেয়। একই রংয়ের গান বিভিন্ন গানের পরে ব্যবহৃত হতে পারে। উপরিউক্ত গান গাওয়া হলে এবং আনুষংগিক নাচ শেষ হলে মূল গায়েন রংয়ের গান ধরতে পারে :—

যার ঘরে ননদ নাই
তার বড মজা—।
ক্ষণেক তাতল, ক্ষণেক বাসি
ক্ষণেক চাউল ভাজা।

এবারে নৃত্যোল্লাসে জোয়ার আসবে। নাকাড়া মাদল চূড়ান্তভাবে চাঞ্চল্যপ্রকাশ করবে। প্রয়োজন হলে নাচের দল বিশ্রাম করতে পারে কিছুক্ষণ। কিন্তু হাঁড়িয়া-প্রমত্ত মোষ বিশ্রামের খোঁটায় বাঁধা থাকতে চায় না। সারারাত ধরে নাচ আর গান চলবেই। শ্রোতা অথবা দর্শক কেউ থাকুক বা না থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না। চলুক গান।

কুলি কুলি যাতে ছিলি
বাঁশিটি বাজাই দিলি
তোরা নাকি বডই মনচোরা।
দু কানে দু কদম ফুল ভরা।

তারপর সেই চিরন্তন বেদনাবিধুর বিচ্ছেদ কাহিনী। এই লোকসংগীতের ভাষায় তাও রূপায়িত।

উপর ঘাটে সিনান করি।
নামো ঘাটে বাঁশী বাজায়
অবিশ করে বলে দিবে গো মোর সেয়াঁকে
কি দোষে ছাড়িল আমাকে।

একটি গানের মধ্যে মুসলমান আক্রমণের ক্ষীণস্মৃতি লুকিয়ে আছে বলে মনে হয়। কবে একদিন নৃত্যোৎসবের মধ্যে দুরন্ত বিপত্তির মতো মুসলমান হানাদার এসে পৌঁচেছিল। সামাল সামাল রব উঠেছিল চারদিকে। তারই স্মৃতি আছে গানে :

আখড়া সামাল মুসলমান দেখ ভগবান।
দাড়ি হলো ছাতির সমান
দেখ ভগবান।

অরণ্যভূমির তরিতরকারী আর সাধুসন্ন্যাসীর ফল ভক্ষণের কথায় বলা হয়েছে :—

কাল্লা কুঁদরীর ভাজা
ওই তো তরকারীর মজা।
শাগ ভাজায় রসুন ফোড়ন,
আম পাকায় সাধুর ভোজন।

কোনকোন গানে দরিদ্র কৃষিজীবী সংসারের এক টুকরো ছবির ভেতর স্বামী-স্ত্রীর কথা-বার্তা শুনতে পাওয়া যায় যেন। অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত স্বামী, হালচালনা শেষ করে এসে তার বুভুক্ষু মনের কথা জানাচ্ছে :—

শালডাটার আঁঢাদৌড়ি (=ঘুনসী)
হাল করতে পড়ে মরি,
বাপ মা, আজ আমাকে ভেবে মরালি।

কোথাও শুধু শিশুর ক্রন্দনধ্বনি। -শুধু আমানি খেলে কোন্ শিশু না কাঁদবে।

একবাটি আমানি
তলে দুটি ভাত রে
সেই দেখি ছাইলা, কাঁদে গোটা রাতরে।

ওদিকে গাঁদা ফুল ফুটেছে গৃহাংগনে। গন্ধে ম ম করছে চারদিক। জলকে যাবার কথা তোলা থাক এখন, মাথার বেণী যে গাঁদা ফুলের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো :—

বাড়ীর গেদাফুলে কুলি মহকে
দিদি নাই যাব জলকে।
মাথার বেণী ছলকে।

এমনি করে গানে নাচে সারারাত মত্ত হয়ে থাকবে।

উৎসবের রাত। কঁকর কোঁ করে মুরগী ডাকবে ঘরের চালে। ভোরে হিমেল বাতাসে মাতাল বুড়োবুড়ীর দল ঘুমের ঘোরে গো গো করে চেঁচিয়ে উঠবে। এবারে বিসর্জনের প্রভাত। করম শাখা দুটিকে কাঁধের উপর তুলে, উৎসবরত দলটি পার্শ্ববর্তী কোন নদী বা খালে গিয়ে হাজির হবে। এতে অকল্যাণ আর অপদেবতাকে বিতাড়িত করা হয় বলেই এদের বিশ্বাস।

॥ করম কথা ॥

—তিন—

"এক ছিল সদাগব।....... ."

করমের পুজা অনুষ্ঠানে যে লোককথার প্রচলন আছে, তাব আরম্ভ হচ্ছে 'এক ছিল সদাগর।' কিন্তু একথা বলে রাখা ভালো যে ছোটনাগপুব, উড়িষ্যা আর প্রান্তিক রাঢ়ের যে সমস্ত অঞ্চলে কবম গাছের পুজা-পাবণ প্রচলিত, সে সমস্ত অঞ্চলের সর্বত্রই যে এই কাহিনীব আরম্ভ একই রূপ, তা নয়। মূল কাহিনীটি কোথাও পরিবর্ধিত হয়েছে, কোথাও বা পবিবর্জিত হয়েছে কাহিনীর শাখা প্রশাখা। কিন্তু মূলতঃ কাহিনীটির বক্তব্য সর্বক্ষেত্রে সমান। ধলভূম এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে যে ধরণেব কাহিনী প্রচলিত, তা হচ্ছে : "—এক ছিল সদাগর।"

কৃষিলক্ষ্মী অচঞ্চলা তার গৃহে, সিদ্ধিদাতা গণেশের কৃপালাভেও সে বঞ্চিত হয় নি। কৃষি এবং বাণিজ্যের দৌলতে সে সম্পদবান। তাব উপাস্য দেবতা কিন্তু করম,—করম রাজা। মহা আড়ম্বরে সে করমের পূজা কবে—নির্দিষ্ট তিথিতে—, ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে, একাদশী তিথিতে।

সদাগরের যমজ পুত্র ধরম আব করম। বড়ো হয়ে ধবম গেল বাণিজ্যে। সংগে নিলো একটি বলদ। পিঠে তাব দ্রব্যসম্ভারের ছালা। ছোট ভাই করম গ্রামেই থাকে। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর, তাকেই দেখাশোনা করতে হয় চাষবাসের। দেখতে দেখতে দিন গেল, মাস গেল। জ্যোৎস্না গেল, অন্ধকার গেল, গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা গেল, তবুও দেখা নেই ধরমের। সেই যে গেছে বাণিজ্যে, আজো ফিরলো না সে। ভাদ্রমাস এসে গেছে। কবমেব পূজোর তিথিও এসে গেল। কবম দুঃখ পেলো। ধবমকে বাদ দিয়েই তাকে করম পূজো করতে হবে।

কি আর করে!

অদূরেই অরণ্য। গ্রামেব শেষে ক্ষেত, ক্ষেতের শেষে মাঠ, মাঠের শেষে বন। তাজা শাল গাছের ঘন সবুজ পাতা দূর থেকে কালো কালো মনে হয়। সেই বন থেকে করম গাছের ডাল কেটে নিয়ে এলো আর সেই ডালকে

উঠোনে পুঁতে তার চার দিকে ঘুরে ঘুরে নাচ গান লাগিয়ে দিলো করম। করমের নামেই তারও নাম করম। গাঁয়ের লোকে ডাকে কর্মা বলে।

এমনি দিনে বাণিজ্য থেকে ফিরে এলো ধরম। তার বলদের পিঠে ছালাভরা বস্ত্র। গাঁযের প্রান্তে এসে ধরম শুনলো যে তার ভাই করম চাষবাস ছেড়ে দিনরাত শুধু করমগাছের ডালকে পূজো করছে আর মদ খেয়ে, হাঁড়িয়া খেয়ে, মাতাল হয়ে নাচছে। কথাটা ভালো লাগলো না ধরমের। ধনের অহংকারে সে তখন আলাদা মানুষ। বলদকে পেছনে রেখেই রাগে কাঁপতে কাঁপতে ছুটলো সে বাড়ীতে—যেখানে অকর্মণ্য কর্মা গাছের ডাল পুঁতে নাচছে আর গান গাইছে।

কথাটা মিথ্যে নয় মোটেই। রাগে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল ধরম। একটানে উপড়ে ফেললো সে করমগাছের ডাল। লাথি মেরে চুরমার করে দিলো সে পূজা উপকরণ, তছনছ করে দিলো পূজাংগন। হুঁস যখন হলো, রাগের মাত্রা যখন কমলো, তখন মনে পড়লো বস্ত্র-ছালা-বোঝাই তার বলদটির কথা। কিন্তু কোথায় বলদ। গাযে নেই ক্ষেতেও নেই, মাঠে নেই, বনে নেই, নেই তো নেই, কোথাও নেই। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে ধরম যখন বাড়ীতে ফিরে এলো আবার, তখন যা দেখলো, তাতে আরো স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। কোথায় সেই বিরাট বাড়ী, ঘর দোর গোরু বাছুর-ছাগল-ভেড়া আর দুধালো মোষের পাল। পশু পাখি যা ছিল, তাদের চিহ্নও নেই, দেওয়াল পড়েছে ভেঙে, আগাছায় ভরে গেছে চারদিক, আগের যা কিছু ছিল, সব হাওয়া। স্বপ্ন না সত্যি!

অবাক হয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখছে ধরম। দাঁড়াবার স্থানটুকুও নেই। উঠোনে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে করম—, ধরমের ভাই। যা হবার তাতো হলো। ধরমের পাপে করমরাজা ত্যাগ করলেন ধরম করম দু জনকেই। দু ভাইতে মিলে শেষ পযন্ত যুক্তি করলো যে জনমজুরী করেই সংসার চালাবে ওরা। আর, তা ছাড়া উপায় তো কিছুই নেই, যা হবার তাতো হয়েইছে।

দূরের গাঁয়ে দু ভাই গেল কাজ করতে গেরস্তদের ক্ষেত খামারে। কাজও জুটলো। মজুরদের যখন মুড়ি খাবার সময়, গেরস্ত নিয়ে এলো মুড়ি, সবাই-কার জন্য। পেট তখন চোঁ চোঁ করছে। বেলাও প্রায় দুপুর। ক্ষেতের কাজ করা অভ্যেসও নয় তাদের। তাদের জমিজায়গাতেই কতো মজুর কাজ করতো। সব মজুরই গেরস্তের কাছ থেকে নিজেদের গামছার খুঁটে মুড়ি নিয়ে

এলো। ধরম আর করম এগুতে পারলো না লজ্জায়। তাদের আর মুড়ি খাওয়া হলো না।

দু জনেই দীর্ঘশ্বাস ফেললো : হায় করম রাজা।

উপায় কি। তেমনি খিদে নিয়েই কাজ করতে হলো আবার। কাজ না করলে গেরস্তই বা দাম দেবে কেন,—"মূল" দেবে কেন। কাজের শেষে সন্ধ্যের কিছু আগে সবাই গেল 'মূল' অর্থাৎ মূল্য হিসেবে ধান আনতে। সব মজুরকে দেওয়া হলো, ধরম করমের বেলায় টান পড়লো। গেরস্ত বললে : তোমরা কাল এসে মূল নিয়ে যেও, আজ সন্ধ্যের সময় আর সবাই থেকে ধান আনতে পারবো না। উপায় নেই, বাধ্য হয়ে ফিরে এলো দু ভাই।

তারপর দুজনেরই রাগ হলো গেরস্তর উপর। যুক্তি করে ঠিক করলো রাতে গিয়ে উপড়ে দিয়ে আসবে ধান চারাগুলো—, যেগুলো রোয়া হয়েছে সেই গেরস্তর ক্ষেতে। যেই ভাবা, সেই কাজ। দুজনে মিলে রাতের আবছা জ্যোৎস্নায় উপড়ে ফেলতে লাগলো সেই ক্ষেতের ধান চারা, জলা জমি, তাই একটুও বেগ পেতে হলো না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ধরম করমের অজ্ঞাতে ধান চারাগুলো ঠিকঠাক আবার নিজেদের জায়গায় বসে যেতে লাগলো আগের মতো।

পরের দিন সে গাঁয়ে না গিয়ে অন্য গাঁয়ে গেল দু ভাই। সেখানে কাজ জুটলো আলের উপর মাটি চাপানোর। কিন্তু 'মূলের' বেলায় এ গেরস্তও বললো : কাল এসো : আজ নেই।

মনের দুঃখে, পেটের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বাড়ী ফিরল তারা। তারপর দু ভাই আর দু গিন্নীতে মিলে কপালের দোষ দিতে লাগলো। করম বললো : দাদা, করম রাজা বাম, এ অবস্থায় কিছুই জুটবে না আমাদের। তার চেয়ে এক কাজ করি,—বেরিয়ে পড়ি করম রাজার খোঁজে। যেখানে পাবো, সেখান থেকেই পায়ে ধরে নিয়ে আসবো তাকে।

ধরম বললো : আমিও যাবো।

করম বললো : না, তুমি যেও না, ভাঙা ঘরগুলো দেখা-শোনা করো। এই-না বলে করম বেরিয়ে পড়লো। —কোথায় যে করম রাজা আছেন তা কি সে জানে। তবুও খুঁজে খুজে যেতেই হবে তাকে, মাঠ, ঘাট, নদীনালা, সাগর পর্বত অতিক্রম করে, শত বিপদকে মাথায় তুলে।

পরনে একটি গামছা মাত্র। আর কিছু নেই সংগে। করম চললো

করম রাজার খোঁজে। চলেছে তো চলেইছে। পথের আর শেষ নেই। চলারও আর শেষ নেই। যেতে যেতে পথের ধারে একটা পুকুর দেখে জলপানের বাসনা হলো তার। কিন্তু, হায় কপাল, পুকুরে গিয়ে দেখে—এক ফোঁটাও জল নেই। কপাল চাপড়াতে লাগলো সে। বললো, হায় করম রাজা, আমার ভাগ্যে এক ফোটা জলও জুটবে না। তার আক্ষেপ শুনে পুকুর বললে : কে তুমি ভাই ? করম রাজার নাম বললে কেন ? করম বললো সব কথা। গোড়া থেকেই বললো।*

পুকুর সব কথা শুনে বললো : ভাই, তুমি আমার কথাটি নিবেদন করো করম রাজার কাছে। শুধিও তো, কেন আমার জল নেই কেন আমি শুকনো ? জিজ্ঞেস করো, কি পাপে আমার এত দুর্গতি আর মুক্তিই বা আমার কিসে।

শুকনো পুকুরের কথা করমের কাছে নিবেদন করবার প্রতিশ্রুতি দিল করম।

তারপর এগিয়ে চললো আবার।

চলেছে—চলেছে—, চলেছে তো চলেইছে। দেখলো সামনে এক বিশাল প্রান্তর। কচি কচি দূর্বা ঘাসে ভরা সবুজ মখমলের মতো। মনে হচ্ছে। আর সেই তৃণভূমিতে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে একপাল গাই-গোরু। লাল, কালো, সাদা,—নানাবর্ণের সব হৃষ্টপুষ্ট গোরু। ভাবলো : গোঠের মধ্যে ঢুকে, দুধ দুয়ে খেয়ে যাবো। কিন্তু দুর্ভোগ যখন আছেই, তখন গাই-ই বা দুধ দেবে কেন ? করমকে দেখে এ গাই তেড়ে আসে শিং বাগিয়ে, ও গাই বসিয়ে দেয় চাঁট। আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে :—হায় করম রাজা। করম রাজার নাম শুনে সব গাই স্থির হয়ে দাড়ালো। তাদের মধ্যে যে 'শিব' গাই অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয়া, সে জিজ্ঞেস করলো করমকে : কে হে তুমি করম রাজার নাম করছো ? আবার গোড়া থেকে শুরু করে সব কথা খুলে বললো করম। উৎকর্ণ ধেনুর পাল যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেলো। একবাক্যে তারা করমকে অনুনয় করতে লাগলো : আমাদের দুদশার কথা জানাতে ভুলো না ভাই--

: কি আবার দুদশা তোমাদের ?

: দেখছো বটে এতো বড় গোরুর পাল , দেখছো বটে সুপুষ্টা-সুস্তনা গাভীকুলকে , কিন্তু আমাদের রাখাল নেই কোন—রাখাল নেই। শিব-গাই উত্তর দিল।

* করমের পূজা অনুষ্ঠানে গল্পটিকে আবার গোড়া থেকে সুরু করেই বলতে হয়।

আচ্ছা, মনে থাকবে তোমাদের কথা। বলেই করম আবার মনের দুঃখে প্রান্তর ছাড়িয়ে এগিয়ে চললো। মাথার উপর প্রচণ্ড তাপ, উদরের মধ্যে আগুন, অংগ অবশ, আর পারে না করম। হঠাৎ দেখলো এক পাল ঘোড়া। তেল চুকচুকে দেহ, উন্নত স্কন্ধ, এক একটি উচ্চৈঃশ্রবা যেন। একটি বেগবান তেজস্বী অশ্ব পেলেও কিছুটা স্বস্তি পাবে করম। কিন্তু পেলে তো?

দেখাই যাক—ভেবে, একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হবার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু হায় করম রাজা! এ কি হলো! পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল তাকে সেই ঘোড়া, আর এলোপাথাড়ি লাথি চালিয়ে করমকে প্রায় অর্ধমৃত করে ফেললো। প্রাণপণে করম ডাকতে লাগলো তার দেবতাকে—, করম রাজাকে।

খট খট করতে করতে, কেশর ফুলিয়ে, লেজ উঁচিয়ে ছুটে এলো শিব ঘোড়া, ঘোড়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘোড়া। বললো, কে, কে তুমি? করম রাজাকে চেন নাকি?

কি করে! বাধ্য হয়ে করমকে সব কথা খুলে বলতে হয়। ঘাড় বাঁকিয়ে কান খাড়া করে সব কথা শুনলো তারা, তারপর বললো, তুমি ভাই আমাদের হয়ে একটি কথা জেনে এসো করম রাজার কাছ থেকে।

: না, কি কথা?

: আমাদের সওয়ার নেই, মালিক নেই। বের নেই, এই কথাটাই জানতে চাই শুধু,— আর কি করলে সওয়ার পাবো, মালিক পাবো, সে কথাও অমনি জেনে নিও ভাই।

: আচ্ছা তাই হবে।

আবার চলা। হাঁটতে হাঁটতে এক গাঁয়ের ধারে এসে আশার আলোক দেখতে পেলো করম। কান পেতে শুনলো চিঁড়ে-ঢেঁকির শব্দ। সেই শব্দ ধরে এগিয়ে চললো, অন্ততো দু এক মুঠো চিঁড়ে যদি পাওয়া যায়! ঢেঁকিশালে পৌঁছে দেখলো—, যে মেয়েটি চিঁড়ে কুটছে ঢেঁকিতে পা দিয়ে, তার পা ঢেঁকিতে লেগে আছে তো আছেই, কিছুতেই সে পা সরাতে পারছে না, আর যে মেয়েটি চিঁড়ের ধান ভাজা-ভাজা করছে তার হাতও খোলার ভেতর, কিছুতেই সে খোলা থেকে হাত ছাড়িয়ে আনতে পারছে না। ব্যাপার দেখেই তো চক্ষু চড়কগাছ, চিঁড়ে আর চাইবে কি? এদের অবস্থা দেখে দুঃখ হলো তার। নিজের পেটও অবশ্য বাগ মানছে না। করম রাজার

নাম স্মরণ করা ছাড়া আর কিই বা করবার আছে। বললো : হায়। হায়। করম রাজা।

: কে তুমি গো বিদেশী ? করম রাজার নাম ধরলে কেন ?

তাদের কাছেও খুলে বলতে হলো সব কথা। তাদের অনুরূপ অবস্থার কারণ এবং এই অবস্থার হাত থেকে মুক্তিলাভের উপায়ের কথা জেনে আসার জন্য অনুরোধ জানালো তারা। করম সম্মত হয়েই বিদায় নিলো।

চোখে অন্ধকার দেখছে করম। পা টলছে, মাথা হেলছে, কানের ভেতর ভোঁ-ভো, চোখে সর্ষের ফুল। সামনের পথটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।

কে হে তুমি ? দেখতে পাওনা চোখে ? কানা নাকি ?

সম্বিৎ ফিরে পেলো করম। অজান্তে একজন বুড়োর সংগে ধাক্কা লাগিয়েছে সে। বুড়োর অবস্থাও কাহিল। জরাজীর্ণদেহ, অথর্ব, দুবল। তার ওপর মাথায় এক কাটার বোঝা—, গোদের উপর বিষফোঁড়া।

করুণা হলো করমের। বল্‌লো, হায় করম রাজা।

এই কথা শুনে বুড়ো একেবারে আলাদা মানুষ।

করমকে বললো সে : ভাই, তুমি কি করমরাজাকে চেন ?

আবার খুলে বললো সব কথা করম।

: দেখ ভাই, এই বুড়োর দুদশার কথাটা গিয়েই আগে জানিও ঠাকুরকে।

: কি দুদশা তোমার ?

: কি যে অপরাধ করেছি আমি, কিছুতেই এই কাঁটার বোঝা নামাতে পারিনে মাথার ওপর থেকে। সব সময় কাটার বোঝা নিয়েই থাকতে হয় আমাকে—। হায় হায়—কেন আমার এই দুভোগ।—কাঁদকাঁদ হয়ে বুড়ো তার আবেদন জানাতে অনুরোধ করলো করমকে।

করম বললো : নিশ্চয়ই জানাবো, তোমার কথাই আগে গিয়ে জানাবো।

ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে করমরাজার নামে মগ্ন হয়ে পথ চলতে লাগলো সে। পথেরও কি শেষ নেই ? শেষ নেই কি দুঃখের ? অনেক দূর যাবার পর করম যা দেখলো তাতে তার প্রাণ চলে এলো কণ্ঠায়। বাঁচবার কোন পথ নেই আর। অবধারিত মৃত্যু পাহাড়প্রমাণ দেহ নিয়ে মুখব্যাদান করে পড়ে আছে পথের ওপর। চোখে তার অগ্নিদ্যুতি, নিশ্বাসে ঝটিকা। বিচিত্র বর্ণাবৃত সেই দেহ—, ভয়ংকর একটা অজগর। চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলো করম। বহু বিপদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে

এসেছে সে। আজ আর পরিত্রাণ নেই।—হায় করম রাজা, তোমার দেখা পেলুম না।

: কে তুমি?

: আমি—, আমি করম। চোখ খুললো করম।

: করম রাজার নাম করলে কেন?

: তোমাকে দেখে ভয় পেয়েছি। করম ছাড়া কে বাঁচাবে বল? অভয় দিলো বিরাটদেহী নাগরাজ। বললো: ভয় নেই, কিছু করবো না আমি। তুমি শুধু জিজ্ঞেস করে এসো করম রাজাকে,—কেন আমি পাহাড়ের মতো অনড, কিছুতেই নড়তে পারি নে এই জায়গা ছেড়ে।

করমের ধড়ে প্রাণ এলো।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই জানাবো তোমার কথা।

অজগরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললো করম।

দেখলো, সামনে এক ডুমুর গাছ। পাকা ডুমুর গাছের তলায় পড়ে আছে। —যাক্ বাঁচা গেল, ডুমুর খেয়েই পেটটাকে শান্ত করা যাক্। এই ভেবে কতকগুলো ডুমুর কুড়িয়ে গামছার খুঁটে বাঁধলো। তারপর যে ডুমুরটিকে ভাঙে, সেই ডুমুরেই বীজ্‌বীজ্ করছে পোকা।—হায় করম রাজা—! ডুমুর গাছ শুনলো, করমের দীর্ঘশ্বাস।

বললো: করমের নাম করলে, তুমি কোত্থেকে আসছো, যাবে কোথায়?

আবার গোড়া থেকে শুরু করে সব কথাই বললো করম।

এবারে ডুমুর গাছের আবেদন জানাবার পালা। বললো: তা হলে যাচ্ছোই যখন করমরাজার কাছে, আমার আবেদনটাও জানিও,—কেন আমার ফল অভক্ষ্য? পাকলে পোকায় ভরা কেন?

বেশ, মনে থাকবে তোমার কথা।

আরো বহু পথ বহু প্রান্তর, অরণ্য, নদী-গ্রাম, পর্বত আর নগর অতিক্রম করে সীমাহীন নীল সাগরের তীরে এসে পৌঁছুলো করম। উত্তাল দুর্দমনীয় তরংগ গর্জন করতে করতে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। দিগন্তহীন সমুদ্র, পার হবে কি করে। এই কথা ভাবতে লাগলো করম, সমুদ্রের তীরে বসে। বসে বসে ভাবছে তো ভাবছেই—বেহুঁস হয়ে। হঠাৎ বিরাট এক কুমীরকে দেখে ভাবনা চিন্তা উড়ে গেল। প্রাণ বাঁচানোর জন্য আকুল হয়ে উঠলো সে। হায় হায়, করমরাজা—ব'লে চেঁচিয়ে উঠলো শুধু।

কুমীর বললো : করমেব নাম করছো কেন ?

ভয়ে সন্ত্রস্ত হযে সব কথা খুলে বললো করম।

কুমীর বললো : ভয় নেই তোমার। আমি তোমায় পার করে দোব সমুদ্র, আমার পিঠে চড়িয়ে। শুধু একটি কথা তুমি জেনে এসো, কেন আমি ডুব্‌তে পারি না, রাতদিন শুধু ভেসেই থাকতে হয় আমাকে। প্রতিশ্রুতি দিলো করম আর ভযে ভয়ে শেষ পর্যন্ত কুমীরের পিঠেই চড়ে বসলো। যা থাকে কপালে। হয় কবম রাজাকে খুঁজবো, না হয় মরবো।

তার পর কত দিন কত বাত কেটে গেল সেই কুমীরের পিঠের ওপর। তীরে এসে যখন পৌঁছুলো তখন পুবদিগন্তে নোতুন প্রভাত, লাল হয়ে গেছে আকাশ আর সমুদ্র। অদূরে—এক বিরাট কুণ্ডে করম রাজা হাবুডুবু খাচ্ছেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পাবে না করম। "সাত সমুদ্দুর লংকার পারে" এসে কি সফল হলো তার স্বপ্ন, তার প্রাণের আকাংক্ষা। সেই কুণ্ডের দিকে পাগলের মতো ছুটে চললো করম। একি মর্মান্তিক দৃশ্য! কুণ্ডটা যে বিষ্ঠাকুণ্ড! তাব ভেতরে কবম রাজা হাবুডুবু খাচ্ছেন। প্রাণপণে ছুটছে করম। বিষ্ঠাকুণ্ড থেকে ঠাকুরকে উদ্ধার করতেই হবে—।

কুণ্ডের ধারে এসে শুনতে পেলো করম রাজা বলছেন,—হাঁ হাঁ! করছিস্ কি ? দেখছিস্ না এটা বিষ্ঠাকুণ্ড, কিল্‌বিল্ করছে পোকায়।

কে শোনে কাব কথা। করম ততক্ষণে বিষ্ঠাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, সমস্ত ঘৃণা, সংকোচ বিসর্জন দিয়ে।

ছুঁবি না, খবরদার ছুঁবি না আমাকে। করম রাজা গর্জন করেন। আরো কি কথা শোনে সে! একেবারে বুকের ওপর জাপটে ধরলো করম রাজাকে। আর সে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না তার ঠাকুরকে। করম রাজা সন্তুষ্ট হলেন। একমুহূর্তে বিষ্ঠাকুণ্ডেব কোন চিহ্নও রইলো না। করমের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন করম ঠাকুর। বললেন : কি জন্য এসেছো, বল ; কি চাও, তুমি।

: কিছুই চাইনে, শুধু তোমাকে চাই। তোমাকে নিয়ে যেতে চাই ঠাকুর। করম হাত জোড় করে বললো।

কপট রোষ প্রকাশ করলেন করম রাজা : কিছুতেই যাবো না আমি, কিছুতেই না। তোর দাদা ধরম আমাকে উপড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে ; কিছুতেই যাবো না আমি।

: কিন্তু আমি ছাড়লে তো? তোমাকে যখন পেয়েছি, কিছুতেই ছাডবো না আমি। ধরম তার ভুল বুঝেছে; তোমাকে না পেলে এই খানেই প্রাণ বিসর্জন দোব আমি।

করম রাজা বল্লেন: আচ্ছা, সব অপরাধ ক্ষমা করলুম। আমি যাবো; তবে, তোর সংগে নয়। তুই এগিয়ে গিয়ে আমার পুজোর আয়োজন কর। বন থেকে করমগাছের শাখা নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা কর; আমি যাবো ঠিক সময়ে, ভাদ্রমাসে—শুক্লপক্ষে—একাদশী তিথিতে।

ভক্ত করমকে বহু বছর ধরে অভুক্ত রেখেছিলেন করম দেবতা। বারো বছর পার হয়ে গেছে জানতে পারে নি সে। বারো বছর ধরে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গিয়েছিল করম। করম রাজা তাকে এবারে খাদ্য দিলেন। খাবার খেয়ে করম ফিরলো তার দেশের পথে, যে পথ দিয়ে এসেছে সেই পথে। কিছুদূর যেতে না যেতেই মনে পড়লো পথের ঘটনা। আবার ফিরলো সে।

করম ঠাকুর জানতে চাইলেন: আবার কেন?

: অনেক কথা আছে আমার। উত্তর পেলে আমি যাবো।

: বল, কি কথা।

একে একে পথের সব ঘটনার কথা তাদের আবেদন-নিবেদনের কথা, করম জানালো—করমঠাকুরকে। ঠাকুর একে একে তার উত্তর দিলেন।

সন্তুষ্ট হয়ে ফিরলো করম।

কুমীর তখনো অপেক্ষা করছে সমুদ্র তীরে।

করমকে দেখে বললো: জানতে পারলে আমার কথা?

: জেনেছি। আগে আমাকে পার করে দাও, তারপরে বলবো।

বেশ, তাই হোক্।

করমকে ওপারে নিয়ে গেল কুমীর। তীরে নেমে করম বললে, শোন, করমরাজা বললেন যে, কুমীর অনেক জীবহিংসা করেছে, হত্যা করেছে বহু নরনারীকে; তার পেট বোঝাই গহনাপত্র। সেই গহনাপত্র যদি দান করতে পার সদ্ব্রাহ্মণকে, তা হলেই রক্ষে, তাহলেই তুমি ডুবতে পারবে, সব সময় ভেসে থাকতে হবে না।

কুমীর শুনলো সব। তারপরে বললো: কথাটা ঠিক, বহু নরনারীকে খেয়েছি আমি। গয়নাগাঁটিও আমার উদরে; দান করতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু কোথায় পাবো ভাই বামুন, কোথায় পাবো বোষ্টম, তুমিই আমার বামুন

—বোষ্টম, তুমিই নিয়ে যাও গয়নাগাঁটি।—এই বলে, পেট থেকে উগ্‌রে দিল বহুমূল্যবান অলংকার সমূহ। হৃষ্টচিত্তে সে সমস্ত গ্রহণ করে করম চললো এগিয়ে।

আবার সেই ডুমুর গাছ। প্রশ্ন করলো ডুমুর গাছ : কি ভাই, আমাব কথা জেনেছো তো?

: হ্যাঁ, জেনে এলুম বৈকি। তোমার শেকডের নীচে একটা কলসী পোঁতা আছে—, টাকার কলসী। ওটা সদ্‌ব্রাহ্মণকে দান করো, তা হলেই তোমার দুঃখ দূরে যাবে।

ডুমুব গাছ বললে, ঠিক কথা। কিন্তু কোথায় পাবো বামুন, কোথায় পাবো বোষ্টম। তুমিই আমাব সব, তুমিই নাও টাকাব কলসী।

আর দ্বিরুক্তি না করে টাকার কলসী খুঁড়ে বাব করলো করম। তারপর গোটা কয়েক ডুমুর মুখে দিয়ে দেখে যেন—অমৃত। বেশ মিষ্টি লাগছে।

এবারে দেখা হলো সাপের সংগে।

সাপের পেটে গয়নাগাঁটি : অনেক মানুষ মেবেছে সে, হত্যা করেছে অনেক পশু, তাই এই স্থবিরতা।

সাপও উদ্‌গীরণ করলো অলংকারপত্র। সেগুলিও করমেরই সম্পত্তি হলো।

কাঁটাব বোঝা মাথায় সেই জরাজীর্ণ বৃদ্ধটি ছিল হাড় কৃপণ। অনেক টাকা তার, তবু একটি পয়সাও খরচ করতে বাজী নয় সে।

করম তাকেও জানালো করম রাজার কথা। বুড়োকে দান করতে হবে সব। এক্ষেত্রেও সদ্‌ব্রাহ্মণ হলো করম নিজে।

চিঁড়ে বিক্রী করে সেই দুটি মেয়েও পয়সা জমিয়েছিল। দুর্গতির হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য তারাও সব পয়সাকড়ি তুলে দিল করমের হাতে।

ঘোড়ার পাল তখনো চরে বেড়াচ্ছে সেই প্রান্তরে।

সেখানে গিয়ে করম বললো যে, 'শির ঘোড়াটি' দিতে হবে সদ্‌ব্রাহ্মণকে।

'তুমিই ব্রাহ্মণ, তুমিই বৈষ্ণব'— বলে 'শির ঘোড়া' রাজী হলো করমের বাহন হতে।

সংগে সংগে সব ঘোড়াই চললো তাদের নোতুন মালিক করমের অনুবর্তী হয়ে।

এবার সেই গোষ্ঠ।

করমরাজার নির্দেশ অনুসারে 'শির গাই' ও তার দলবল নিয়ে করমের সংগে চললো।

এবার, শুকনো পুকুর।

: তোমার চার কোণে চারটে পেতলের কলসী পোঁতা আছে—টাকায় ভরা। কোন সদ্ ব্রাহ্মণকে দান করো, পুকুরে আবার কাকচক্ষু জল হবে।—বললো করম।

: তুমিই আমার সব। টাকার কলসী তোমার।

স্বপ্ন সার্থক হলো করমের। করম গোসাঁই—করম রাজা—করমঠাকুরকে সন্তুষ্ট করে সব কিছু ফিরে পেলো সে। ঘোড়াশালে ঘোড়া, গোশালায় গোরু, গোলাভরা ধান আর কলসীভরা টাকা। আর কি চাই![১]

একাদশীর দিনে করমগাছের ডাল আবার আনা হলো কেটে। পূজো হলো ধুমধাম করে। ভোজ হলো, নাচ হলো, গান হলো, বাজনা হলো। হাঁড়িয়া খেয়ে মাতাল হলো সবাই। পরব কিসের তা হলে! সেই রীতি আজও চলছে। বহুদিন ধরে চলবে, যদ্দিন এই পৃথিবী থাকবে।

ধরম করম দুভাই মিলে করমশাখা ছুঁয়ে শপথ করলো[২]:

আমার করম
ভায়ের ধরম—

১ পূজো উপলক্ষে, কাহিনীর সংগে সংগে যথাসময়ে ডুমুর, মাটির ঘোড়া, চিঁড়ে দুধ ইত্যাদি উৎসর্গ করতে হয় করম গোঁসাইকে। শুক্‌নো পুকুরের কথা বলতে গিয়ে করমঠাকুরকে জলদানও করতে হয়।

২ এই শপথ গ্রহণের রীতি এখনও আছে। ব্রতীবৃন্দ করমগাছের ডাল ছুঁয়ে এরূপ শপথ গ্রহণ করে।

॥ ইঁদ ॥

"যখন উঠে ইঁদটি
তখন ভাঙে নিঁদটি
ঝাড়গাঁর গড়ে।
ঠমকি ঠমকি হাতী চলে-
ঝাড়গাঁর গড়ে।"

'ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে, ভারতবর্ষের মধ্যে আর্যেরা যাদের দেখা পেলেন, তাদের ডাকলেন তাঁরা অন্ত্যব্রত বলে। এটা ঠিক যে আর্যেরা আসবার আগে এদেশে দলে দলে এই সব অন্ত্যব্রত—ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী, বুড়োবুড়ী, দলপতি, গোষ্ঠীপতি, যোদ্ধাকৃষাণ—নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান, দেবতা-অপদেবতা, কলা-কৌশল, ভয় ভরসা, হাসি-কান্না নিয়ে বাস করছিল। এবং এটাও ঠিক যে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যারা এলেন, সেই আর্য এবং না আর্য বা অন্ত্যব্রতদের মধ্যে সব দিক দিয়ে এমনকি বিয়েতে এমনকি ভোজেতেও আদান-প্রদান চলেছিল। পুরাণে দেবদেবীর উৎপত্তির ইতিহাস এই আদান-প্রদানের ইতিহাস ধর্মানুষ্ঠানের দিক দিয়ে শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ইতিহাসও তাই।"*

এমন বহু না-আর্য আচার-অনুষ্ঠান আছে, যা বহু প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দুশাস্ত্রের ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। ইন্দ্রধ্বজ অর্চনার মূলতত্ত্বটি আজও একথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। আসল কথা হলো এই—আজও নানা আচার-অনুষ্ঠান, আমাদের সংস্কৃতির অন্তঃপুরে তার বেদপূর্ব রূপটিকে ফল্গুধারার মতো রক্ষা করছে।

ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীর অরুণ প্রভাতে বেদনা-বিধুর পূজার্থী নরনারী করম গোসাঁইকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে। গতরাত্রের পূজা-চঞ্চল নৃত্যগীত-মুখরিত একাদশীর রাত দ্বাদশীর প্রভাতে স্তিমিত হয়ে যাবে কোন এক তটিনীর তটে। সে তটিনী কাঁসাই হলে তো কথাই নেই, কিন্তু যে অঞ্চলে

* বাঙলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ॥

কাঁসাই নেই সে অঞ্চলে যে কোন নদী খাল বিলই কাঁসাই—প্রত্যেক সরোবর-নদী-খালে যেমন গংগার অধিষ্ঠান। তাই, করম গোসাঁইকে যেখানেই বিসর্জন দেওয়া হোক না কেন, বিসর্জনের গানে বলা হবে :

কাল তরে করমরাজা ঘরে দুয়ারে।
আজ তরে করমরাজা কাঁসাই নদীর ধারে ॥

পশ্চিমপ্রান্তিক রাঢ়ভূমির এবং রাঢ়বহির্ভূত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, করম উৎসব পুরোপুরি লোক-উৎসব। ধলভূম, মানভূম, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের ভূমিজ মাহাতো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরেই প্রায় করমের পদধ্বনি শোনা যায়। ইঁদ পরব ঠিক এই ধরণের লোক-উৎসব নয়। এর গায়ে সামন্ততান্ত্রিক গন্ধ আছে। মানভূম, ধলভূম, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, ছোটনাগপুর, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের রাজাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ইঁদ পরব দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, ইঁদ পরবে ইন্দ্রধ্বজের অর্চনা করা হয়। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতীক হিসাবে, ইন্দ্রধ্বজকে তাঁর মর্ত্য প্রতিভূগণ এমনিভাবে পূজা করে। এই অনুষ্ঠানে অরণ্য অঞ্চলের প্রজাবৃন্দও বিশেষভাবে যোগদান করে। নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের বিচারে সীমান্তবাঙ্‌লার অনেক ভূস্বামীই আঞ্চলিক না-আযবর্ণের ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীকে সুর্বস্বীকৃত করার জন্য এই ইন্দ্রধ্বজকে গ্রহণ করেছেন অনেকেই। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা সজ্ঞানেই এ কাজ করেছেন। ক্ষত্রিয় রাজার অবশ্য কর্তব্য হিসেবেই এঁরা ইঁদ উৎসব পালন করে থাকেন। সামাজিক বিবর্তনের ধারাপ্রসংগে ইঁদ ইন্দ্রত্বলাভ করেছে, অথবা ইন্দ্র ইঁদে পরিণত হয়েছে, তা তর্কসাপেক্ষ। ভাষাতত্ত্বের নিয়মে ইন্দ্র নিঃসন্দেহে ইঁদ হতে পারে এবং প্রাচীন পুরাণে ইন্দ্রধ্বজার্চনার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে বলে একে বর্তমানে হিন্দু উৎসবের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

এই ইঁদ পরবটি কিন্তু বাঙ্‌লাদেশের সর্বত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। এ পরব সমতল ভূমির নয়; এ পরব মুখ্যতঃ অরণ্য অঞ্চলের, বন্ধুর কংকরময় ভূখণ্ডের।[১] এ সব অঞ্চলে রাজা আছেন, জমিদার আছেন, এবং তাঁদের অগণিত প্রজাবৃন্দ সেই অন্ত্যব্রতের দল;—হিন্দুধর্মী অন্ত্যব্রতদের দল। করম উৎসবের সংগে এর বিশেষ কোন যোগ আছে বলেই মনে হয়, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে করম-পূজা বিলুপ্ত হয়ে গেছে; টিকে আছে ইঁদ। বিষ্ণুপুর, খাতড়া, ঘাটশীলা, ঝাড়গ্রাম

১। উত্তর বিহারের দ্বারভাঙ্গা রাজবাড়ীতেও এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এবং মানভূমের বহু জমিদার বংশই এই উৎসব উদ্‌যাপন করেন। মানভূমের কোন কোন ভূমিজ ভূস্বামীও বেশ জাঁকজমকের সংগেই ইন্দ্রধ্বজ তোলেন।

বৈদিক দেবতা বর্ষাধিপতি ইন্দ্রের পুজা হিসাবেই এর প্রচলন ; কিন্তু উন্নত শালবৃক্ষ কি ইন্দ্রধ্বজেরই প্রতীক—অথবা বৃক্ষপুজারই নামান্তর ?

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, তাঁর 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থে ইঁদকে ইন্দ্রধ্বজেব পূজা বলেই উল্লেখ কবেছেন। পঞ্জিকাতে 'শক্রোত্থান' নামে এব অভিধা। এই বিশেষ তিথিতে ইঁদ পুজার কারণও তিনি নির্দেশ করেছেন, জ্যোতিষেব প্রমাণস্থত্রে। কোন এককালে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লনবমীতে মহা-বিষুব হয়েছিল। তার তিন মাস তিন তিথি পরে ভাদ্র মাসের শুক্লদ্বাদশীতে স্থর্যেব দক্ষিণাযন আবম্ভ হযেছিল। সেই দিনটিতে কোন কোন দেশীয় বাজো নাকি ইন্দ্রধ্বজ রোপণ কবে উৎসব পালন করা হতো। উৎসবে বাজা প্রজা সকলেই যোগদান কবেন। ধ্বজেব মাথায় একটি পতাকা উডতে থাকে। কোন্ দিনটিতে স্থযেব দক্ষিণায়ন আবম্ভ হবে, তা নির্ণীত হতো ধ্বজের ছায়া দেখে এবং পতাকার উড্ডীযমান গতি দেখে। আচার্য যোগেশচন্দ্র এই কথাই প্রমাণিত কবতে চেযেছেন যে ববিব দক্ষিণায়ন-স্মৃতিকে এমনিভাবে ধরে রাখা হযেছে। এ প্রসংগে মনে বাখা দরকার যে ভারতেব বহু ক্ষত্রিয় রাজবংশেই ইঁদ পববের প্রচলন নেই। যে অঞ্চলে এই উৎসবের আধিক্য, সেই অঞ্চলের বাজাদেব ক্ষত্রিযত্ব নিকষিত নয়। বলা বাহুল্য, ক্ষত্রিয়ত্ব বা অ-ক্ষত্রিয়ত্ব এমন কিছু বডো কথা নয। তাদেব অগণিত প্রজার মন-স্তুষ্টিব জন্য যে উৎসব, সে ইঁদ উৎসবেব ইন্দ্রত্ব লাভ অস্বাভাবিক নাও হতে পাবে।

ইন্দ্রধ্বজপূজাব পৌবাণিক কাহিনী অবশ্যই আছে। চেদিপতি উপবিচরবসু দেবাধিপতি ইন্দ্রের নিকট থেকে ইন্দ্রধ্বজলাভ ক'রে তার পূজা করেন এবং ফলে, প্রচুর বিত্তের অধিকারী হন। সেই ধ্বজাপূজা বাজাদের মধ্যে প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক, এমন অভিমতও অনেকে দিয়েছেন। সম্পদশালী হবার ইচ্ছা সব বাজারই তো আছে। কিন্তু, এ উৎসব এমন এক অঞ্চলে বেঁচে রইলো কেন, যে অঞ্চলের রাজারা কোন দিনই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজশক্তি বলে পরিগণিত হন নি।

এ প্রসংগে 'ছাতা পরবের' উল্লেখ কবাব প্রয়োজনীয়তা আছে। একটু বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হবে যে এই দুটি উৎসব মূলত একই।

এই ছাতা পরব মানভূমের ভূমিজ ভূস্বামীদের বিশেষ একটি অনুষ্ঠান, ভাদ্র-মাসের সংক্রান্তি তিথিতে।[১]

কোন কোন অঞ্চলে দ্বাদশীর তিথিতেই ছাতা পরবের অনুষ্ঠান। আগের দিনটি ছিল করমের, পরের দিনটি ইঁদের বা ছাতার। ইঁদকে সেদিন পূজো করা হবে পাঁঠা বলি দিয়ে। করমশাখাকে বিসর্জন দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক ক্ষেতে শালগাছের ডাল পুঁতে দেওয়া হয়—রোয়া ক্ষেতকে অপদেবতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। একে বলে ইঁদ ডাং।

অরণ্যভূমির লোকে ভালো করেই জানে কত অপদেবতা পথেঘাটে, বনে জংগলে, পাহাড়ের গুহায়, আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকে, তাদের সন্তুষ্ট করতে না পারলে ফসল ফলবে না, আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরবে না। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে করম উৎসবটি যেমন শস্য সংক্রান্ত উৎসব ছাড়া অন্য কিছু নয়, তেমনি ইঁদ পরবটি শস্য বর্ধনের জন্য ইঁদকে সন্তুষ্ট করবারই অনুষ্ঠান।

করম পরবে ছিল করম গাছ, ছাতা পরবে এবং ইঁদ পরবে শাল গাছ। ছাতা পরবের অনুষ্ঠানে বিরাট একটি শালগাছের খুঁটি পুঁতে তার ওপর বেঁধে দেওয়া হয় প্রকাণ্ড এক ছাতা। ছাতাটিকে সজ্জিত করা হয় নানাপুষ্পসম্ভারে। দুপুরে স্থানীয় ভূমিজ ভূস্বামী, ঘোড়ায় চড়ে সাঙ্গোপাঙ্গসহ উপস্থিত হন অকুস্থলে। তারপর, সকলে একত্র হয়ে ছত্রধ্বজকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে পূজো দেওয়া হয় শাল বৃক্ষকে। পূজো শেষ হবার পর, সম্মিলিত নরনারীর নাচ গান সুরু হয়। নাগরা আর কাঁসি নিয়ে আসবে সাঁওতাল সম্প্রদায়; মাদল নিয়ে আসবে ভূমিজ গোষ্ঠী। সাঁওতালদের মধ্যে কোন কোন অঞ্চলে যে ছাতাবোঙ্গা বা ছাতোম পরবের প্রচলন আছে, তাও এই ছাতা-পরবেরই নামান্তর।

এবারে সত্যিকারের ইন্দ্রধ্বজপূজার আচার-অনুষ্ঠানের কথা বলা যাক্। মধুভাষায় এই উৎসবের নাম ইন্দ্রাভিষেক। ঝাড়গ্রামের সাবিত্রীমন্দিরের সামনে যে মাঠ আছে, সেই মাঠে ইঁদকাঠগুলি এখনো প্রোথিত আছে। সীমান্তবাঙ্‌লার প্রায় সর্বত্রই ইন্দ্রধ্বজার্চনার রীতি একই রূপ। উড়িষ্যাতে

---

১ একটি ভাদু গানে ছাতা পরবের উল্লেখ আছে:

সারা ভাদর রাখলম যাকে কুঁচি কপাট দিয়া গো।
আর রাখিতে নারলম যাকে, ছাতা হল বাদী গো॥

'গড়জাত' মহলেও এই রীতি বিদ্যমান। এই তিথি থেকেই রাজারা 'আমলী' সালের ঘোষণা করেন।

দ্বাদশীর দিন বিকালের দিকে ইঁদপূজা হয়। তার আগে থেকেই বৃহৎ দুটি শালগাছ কেটে নিয়ে এসে ইঁদতলায় পুঁতে দেওয়া হয়। সে দুটি কাঠে কাপড় জড়িয়ে তার মাথায় ছাতা বেঁধে দেওয়া হয়। পুরোহিত এসে যথানিয়মে পুজো অর্চনা শেষ করবার পর ঢাক-ঢোল-নাগড়া-মাদল নিয়ে নাচ গান সুরু হয়। ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে সাধারণত সাঁওতাল ভূমিজরাই এই নৃত্যোৎসবে সম্মিলিত হয়। ধলভূমের জমিদারদের তরফ থেকে ঘাটশীলাতে প্রতিবৎসর ঐ দিনেই ইন্দ্রাভিষেক উৎসব হয়। ইঁদতলায় সেদিন পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। সাদা কাপড় দিয়ে মোড়া একটি সুদীর্ঘ শালদণ্ডের মাথায় ছাতা বেঁধে, তারও ওপর দীর্ঘ পতাকার মতো সরু পাতলা বস্ত্রখণ্ড বেঁধে দেওয়া হয়। রাজ-মস্তকের শিরস্ত্রাণের প্রতীক হিসাবে তাদের গণ্য করা হয়। রাজা অথবা রাজপ্রতিনিধি ঐ শায়িত শালদণ্ডকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করেন। এই ইঁদ তোলার পুরো কাজটি সম্পন্ন করে জনসাধারণ, রাজা শুধু দড়ি ছুঁয়েই খালাস। ইঁদ তোলার পর ধলভূম অঞ্চলের খাড়িয়া নামক আদিম অধিবাসীদের দল রাজার মাথায় গোবরজলের ছিটে দেয় আর কাশফুল ছড়িয়ে দেয়।[১] এই প্রথা, নিঃসন্দেহে, ধলভূমের আদিমরাজার রাজ্যাভিষেক স্মৃতি বহন করছে।

মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা নামক স্থানের পাল উপাধিধারী জমিদারদের ইন্দ্রোৎসবের কথা 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' প্রণেতা ত্রৈলোক্যনাথ পাল উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে পুরাণোক্ত বিধান অনুসারে ধারেন্দার ইঁদকুড়ির ময়দানে ইন্দ্রপূজা হয়ে থাকে। একটি সুদীর্ঘ শালবৃক্ষের অগ্রভাগে বাঁশের তৈরী ছাতা বেঁধে দিয়ে তার উপর খৈ দৈ বর্ষণ করা হয়। পুজো শেষ হলে সুরু হয় সাঁওতাল নাচ। সারারাত ধরে নাচ চলে। সেদিন উপোস ক'রে ব্রত পালন করতে হয় রাজাকে। আট দিন উৎসবের পর ইঁদের বিসর্জন হয় সংগোপনে। প্রথা অনুসারে, রাজা সেই বিসর্জন দেখতে পাবেন না, দেখলেই রাজার মৃত্যু অনিবার্য, এ ধরণের লোকশ্রুতি সেখানে প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য, মেদিনীপুরের ঐ অঞ্চলটি আদিম অধিবাসী এবং প্রায়-হিন্দু উপজাতিদেরই বাসভূমি।

১ রাঁচি জেলার মুণ্ডাদের মধ্যে ইঁদের প্রথম প্রভাতে ক্ষেতে ক্ষেতে সপুষ্পক কাশগাছি পুঁতে দেবার প্রথা এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মানুষ্ঠানের অংগ হিসাবে গরুড়ধ্বজ, মীনধ্বজ, ইন্দ্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, কপিধ্বজ প্রভৃতি নানা প্রকারের ধ্বজপূজা এবং উৎসব প্রচলিত ছিল। প্রাচীন-রাজন্যকুলের এক এক গোষ্ঠীর এক এক প্রকার পশু-বা পক্ষী-লাঞ্ছিত পতাকাও ছিল। তাম্রধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, হংসধ্বজ প্রভৃতি নামের রাজাদের কথাও আমাদের অজ্ঞাত নয়।

বলা বাহুল্য, এই ধ্বজাপূজার কোন উল্লেখ নেই বেদে। বৈদিক ঋষিগণ ইন্দ্রদেবতার অর্চনা করতেন বটে, তাঁরা কিন্তু ইন্দ্রধ্বজার্চনার কোন কথা বলেন নি।

দেবীপুরাণে ইন্দ্রধ্বজার্চনার এবং পূজা-প্রকরণের বিস্তৃত বিবরণী আছে। সংস্কৃতি-মিলনের চিহ্ন বহন করে পুরাণগুলি আবির্ভূত হয়েছিল। ধ্বজা-পূজার প্রাক্-বৈদিক রীতি পরবর্তী কালে বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের সংগে সংযুক্ত হয়ে পুরাণের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। দেবীপুরাণের কাহিনী থেকে জানা যায় যে, পূর্বে ব্রহ্মার সাহায্যে বিষ্ণু কেতু প্রাপ্ত হন, শিবের নিকট থেকে। পরে, বিষ্ণুর নিকট থেকে ইন্দ্র সেই কেতু গ্রহণ করেন। ইন্দ্র, আবার সেই কেতু দান করেন চন্দ্রকে, চন্দ্র দেন দক্ষকে। দক্ষরাজ সেই কেতু গ্রহণের পর থেকে সমস্ত রাজাই সেই কেতু বা ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলিত করেন। বলা বাহুল্য, দৈত্যনাশের জন্যই ইন্দ্র কেতু গ্রহণ করেছিলেন, বিষ্ণুর নিকট থেকে। দৈত্যনাশের জন্যই বিষ্ণুও এই কেতু লাভ করেছিলেন শিবের নিকট থেকে। পরে ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করে এই ধ্বজা লাভ করেন। শ্বেতচ্ছত্র এবং মাল্যচন্দন ভূষিত মহাতেজঃ-সম্পন্ন সেই কেতু লাভ করে ইন্দ্র দৈত্যজয়ী হয়েছিলেন।

কেতু উত্থাপন-বিধি প্রসংগে বলা হয়েছে : শুভদিনে, শুভনক্ষত্রে, শুভকরণে, এবং শুভমুহূর্তে রাজ্যাধিপতি অরণ্য অভিমুখে যাত্রা করবেন। সংগে থাকবেন দৈবজ্ঞ এবং সূত্রধার। বনে গিয়ে রাজা ধব, অর্জুন, প্রিয়ক, উডুম্বর এবং অশ্বকর্ণ বৃক্ষের যে কোন একটি বৃক্ষকে বেছে নেবেন।[১] বৃক্ষটি সুলক্ষণযুক্ত এবং সর্বাংগসুন্দর হবে। লতাবদ্ধ, কৃমিব্যাপ্ত, পক্ষিনীড়যুক্ত, বল্মীকাবৃত, শ্মশানসম্ভূত, কোটরযুক্ত, বিদ্যুদাহত, বজ্রাহত বা অগ্নিদগ্ধ বৃক্ষ সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। এ ক্ষেত্রে আরো কতকগুলি প্রথা পালনীয়। বৃক্ষটিকে ঋজু

১ করম উৎসবের প্রাথমিক পর্যায়ে, ইন্দ্রপূজার ঠিক আগের দিনে বন থেকে করমগাছ কেটে আনার প্রথার সংগে ইন্দ্রধ্বজের জন্য বৃক্ষ চয়নের রীতির সামঞ্জস্য লক্ষণীয়।

হতেই হবে, স্বভাববর্ধিত হতে হবে। আর—স্ত্রী-নামা বৃক্ষ হলে চলবে না। উপরিউক্ত পাঁচ প্রকারের বৃক্ষ না পাওয়া গেলে চন্দন, তাম্র, শাল অথবা শাক (সেগুন) বৃক্ষের ইন্দ্রকেতু করা যেতে পারে। অন্য কোন বৃক্ষই ইন্দ্রধ্বজ বা ইন্দ্রকেতুরূপে গণ্য হতে পারে না।

নির্দিষ্ট বৃক্ষের সম্মুখে উত্তরমুখ বা পূর্বমুখ হয়ে রাজা এবারে বৃক্ষপূজা সম্পন্ন করবেন।

রাজা বলবেন: "হে বৃক্ষরাজ, তোমাকে নমস্কার করি, ইন্দ্রধ্বজের জন্য আমি তোমার পূজা করছি, তুমি এ স্থান ছেড়ে ধ্বজার্চনার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে উপনীত হও।"—পূজা শেষ হলে বলিদান। বলিদানের মন্ত্রে বলা হবে: "হে বৃক্ষ, ইন্দ্রোৎসব সম্পন্ন করে তুমি অন্যত্র গমন করো, দেবরাজের ধ্বজের জন্য আমি তোমাকে ছেদন করছি, তুমি ক্রোধ প্রকাশ কর না।" এর পর পুনরায় ভূতের উদ্দেশে বলিদান।

বৃক্ষপূজা এবং ভূতপূজার এই রীতি তো নিঃসন্দেহে অবৈদিক এবং প্রাগার্যসভ্যতাপুষ্ট। শালবৃক্ষের পূজা আদিম জাতিদের মধ্যে আজও সুপ্রচলিত। সাওতালদের সরহুল উৎসব, করণা, এবং 'জাহের থান' শালবৃক্ষ পূজার উৎসব শালবৃক্ষপূজারই স্থান বিশেষ।

বৃক্ষপূজা শেষ করে, রাজা তাঁর সংগীদের নিয়ে ফিরে আসবেন রাজপুরীতে। রাত্রে তাকে শুভস্বপ্ন দেখতে হবে। স্বপ্ন দেখার উপর তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। কি ধরনের স্বপ্ন কি ধরনের ফলদান করে তাও উল্লেখিত আছে দেবীপুরাণে। শুক্ল বস্ত্র পরিধান, সমুদ্রস্নান, নদীতরণ, নম্র ক্ষীরিবৃক্ষে আরোহণ, দেবালয়ে প্রবেশ, দেবপূজা, বিপ্রপূজা, সাধুপূজা প্রভৃতি স্বপ্ন শুভংকর। মৎস্যলাভ, মাংসলাভ, দধিলাভ, রক্তদর্শন, অমৃতদর্শন, রোদন এবং অগম্যাগমনে ইষ্টলাভ অবশ্যম্ভাবী।

এই ধরনের শুভস্বপ্ন দেখে প্রভাতে বৃক্ষছেদন কার্য সম্পন্ন করতে হয়। উত্তরমুখ বা পূর্বমুখ হয়ে হীরকযুক্ত কুঠারের সাহায্যে নির্দিষ্ট বৃক্ষটিকে গোড়ার দিকে আট আঙুল পরিমিত স্থান ছেড়ে কাটতে হবে। অগ্রভাগ কোনক্রমেই জলস্পর্শ করবে না, অর্থাৎ কোন পুকুর বা ঝরণার জলে গিয়ে পড়বে না।

যথাকর্তব্য শেষ করে সেই বৃক্ষদণ্ডকে নিয়ে, নগরের মধ্যে কোন উন্মুক্ত স্থানে প্রোথিত করতে হবে। সুসজ্জিত করতে হবে নগরের পথঘাট গৃহ তোরণ। বৃক্ষদণ্ডটিকে স্থাপন করবার জন্য যখন নিয়ে যাওয়া হবে, তখন

নানা বাদ্যযন্ত্রের শব্দে কম্পিত হবে দশদিক্, ব্রাহ্মণগণ বেদধ্বনি করবেন; বারবিলাসিনীগণ শংখধ্বনি করবে আর গান গাইবে। এমনি শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সেই বৃক্ষদণ্ডকে মহাসমারোহে নির্দিষ্টস্থানে নিয়ে গিয়ে, দণ্ডটিকে আবৃত করতে হবে ক্রমানুসারে ক্ষৌম, কৌষেয় ও শুক্লবস্ত্র দিয়ে। তারপব, বিবিধ বসনভূষণে সজ্জিত করে, যন্ত্রেব সাহায্যে সেই বৃক্ষদণ্ডকে উত্তোলিত করা হবে।

ধ্বজা উত্তোলনের সময় বিশেষ বিশেষ ঘটনায় রাজার ও রাজ্যেব ভবিষ্যৎ জানা যেতে পারে। ধ্বজদণ্ড যদি ভূপ্রোথিত হয় অনায়াসে, তা হলে রাজ্যনাশ অনিবার্য, আর ধ্বজদণ্ড যদি ভেঙ্গে পড়ে অকস্মাৎ, তা হলে রাজাব মৃত্যু অপ্রতিরোধ্য।

এরপর পূজার্চনা বিধি। সমস্ত দেবতাব পূজো কবে, দধি এবং অক্ষত দিয়ে হোম ক্রিয়া করতে হবে, বৈদিক অথবা পৌরাণিক স্তোত্র পাঠ কবে। তারপর পতাকাযুক্ত কদলীদণ্ডকেও উত্তোলিত করতে হয়। ভাদ্রমাসেব শুক্লাষ্টমীতে ধ্বজদণ্ডের প্রবেশন আর শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুক্লাদ্বাদশীতে ইন্দ্রধ্বজের উত্তোলন। ধ্বজা উত্তোলনের সময়, প্রত্যেক নাগরিকই সেখানে উপস্থিত থাকবে। ধ্বজামাতৃকাকে দৃঢভাবে প্রোথিত করে তার সংগে বেঁধে দিতে হয়। পরে, যে দিকে যন্ত্র বা কীলক থাকে সেই দিকে কেতুব অগ্রভাগ নত করে যথাবিধানে নামাতে হয়। এ অবস্থায় ছাতা যদি পড়ে যায়, তাহলে রাজাব মৃত্যু, পতাকা-পতনে রাজমহিষীর, তোরণ পতনে রাষ্ট্রনাশ, কদলীধ্বজা পতনে দুর্ভিক্ষ আর ইন্দ্রধ্বজা পতনে অন্য রাজার আগমন।

এই হচ্ছে দেবীপুরাণোক্ত ইন্দ্রধ্বজাপূজার সমাচার।

বলা বাহুল্য, এই রূপেই ধ্বজা পূজার আর্যীকরণ সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। আসলে, এই ধ্বজাপূজা ও আদিম শস্যোৎসব এবং বৃষ্টি প্রার্থনার উৎসব ছাড়া অন্য কিছু নয়। বৈদিক ইন্দ্র অনেক পরে এসে এই প্রাক-বৈদিক সংস্কৃতির সংগে যুক্ত হয়েছেন। ক্ষেত্রকে অপদেবতার দৃষ্টি থেকে রক্ষা করাও এই উৎসবের উদ্দেশ্য। ইঁদকে সন্তুষ্ট করাই এখানে মূল লক্ষ্য, কিন্তু ইঁদকে যেখানে ইন্দ্রত্বদান করা হয়েছে, সেখানে ছাতা পরবের ছত্র হয়েছে রাজছত্র—রাজ-মহিমার প্রতীক। ভাষাতত্ত্বের বিচারে ইন্দ্র, ইঁদ হতে পারে, কিন্তু ঠিক এই বিচারেই ইঁদের ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তি অসম্ভব নয়।

রাঁচির মুণ্ডাদের মধ্যে "ইন্দি নামক" যে অপদেবতা আছে, সামাজিক

বিবর্তন এবং পরিগ্রহণের মাধ্যমে তার ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তিও কিছু অসম্ভব নয়। রাঁচি জেলার ওরাওঁ মুণ্ডাদের মধ্যে 'ইন্‌দি' নামক যে পর্বানুষ্ঠান, তার কথাই এখন বলছি। 'ইন্‌দি' মানে ইঁদ পরব। 'ইনদি' একটি ভূত বা অপদেবতা যার হাত থেকে ফসল রক্ষা করতে হলে তাকে সন্তুষ্ট করতে হয়। সীমান্তবাঙ্‌লার বহু গ্রাম এই ইঁদ বা ইনদি-র স্মৃতি বহন করছে আজো। রাঁচি সহরের একটি অংশের নাম ইন্দ্‌পিড়ি, বর্তমান উচ্চারণে হিন্‌পিড়ি হয়েছে এবং হিন্দ্‌ শব্দের সাদৃশ্যযোগে কেউ কেউ একে হিন্দ্‌ পিড়িতে রূপান্তরিত করে সন্তুষ্ট হয়েছেন। সীমান্তবাঙ্‌লার ইন্দাডাঙ্গা, ইঁদা, ইঁদাস, ইঁদাপুর প্রভৃতি গ্রামের নাম ইঁদের নামের সংগেই জড়িত।

মুণ্ডাদের ইনদি পূজোর অনুষ্ঠান, ইন্দ্রধ্বজপূজোর অনুষ্ঠান থেকে কোন অংশেই কম নয়, বরং এর মধ্যে যা আদিমতা আছে, যে বেদপূর্ব আচার-অনুষ্ঠান আছে, তা ইন্দ্রধ্বজার্চনার মধ্যে নেই, হয়তো বা পরিবর্জিত হয়েছে।

করম উৎসব-এর পরদিন অথবা ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশীর তিথিতে কোন কোন মুণ্ডাগ্রামে ইনদি ডাং[১] প্রোথিত করা হয় ইনদি পিড়িতে।[২] বলা বাহুল্য, পবিষ্ণু ভূস্বামী ছাড়া অন্য কেউ এ উৎসবের উদ্যোগ-কর্তা হতে পারে না। ইনদি-পিড়িতে সবসময়ই শালগাছের দুটি বড় খুঁটি পোঁতা থাকে। এই দুটি খুঁটিতে আড়াআড়িভাবে দুটি আড়কাঠ সংযুক্ত করা হয়। আড়কাঠের একটি থাকে নীচে, অপরটি একেবারে ওপরের দিকে। এই কাঠামোটাই দীর্ঘ ঋজু এবং সুপুষ্ট আর একটি শালদণ্ডকে ধারণ করে থাকে। দ্বাদশীর দিন সকালে পাহান (মুণ্ডাপুরোহিত) এসে, ইনদিখুঁটার গোড়ায় মুরগী বা ছাগল বলি দিয়ে, চান্‌ডীবোঙার উদ্দেশে পূজো নিবেদন করে। চানডীবোঙা হচ্ছে বনদেবী। চান্‌ডীবোঙাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বনের পশুর গ্রাস থেকে ফসল রক্ষা করা। ঠিক সেই দিন সকালেই আবার, প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীরা তাদের ক্ষেতে ক্ষেতে উদগত-পুষ্প কাশদণ্ড পুঁতে দিয়ে আসে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্‌দি ভূতের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা। ইন্‌দিকে সন্তুষ্ট না করলে ক্ষতির আশংকা আছে, সন্তুষ্ট করলে ফসল বৃদ্ধি। বাঙ্‌লাদেশের নলসংক্রান্তিতে অনুরূপ রীতি বিদ্যমান। ধলভূম অঞ্চলের ভূমিজ সম্প্রদায় সেদিন শালগাছের ডাল পুঁতে দেয় ধানের ক্ষেতে,—তার-ও নাম ইঁদ-ডাং।

১ ইন্‌দি ডাং—ইন্দ্রদণ্ড।

২ ইন্‌দি পিড়ি—ইন্দ্রপীঠ।

সকালে আর কিছু নয়। বিকালে পাহানের বাড়ী থেকে, ছাতার মতো একটি সুসজ্জিত বস্তুকে (যার মাথায় লম্বা আর পাতলা এক ধরনের পতাকা উড়তে থাকবে) নিয়ে আসা হবে ইন্‌দি পিড়িতে। শোভাযাত্রা করেই আনতে হবে ছাতাটিকে। তারপর ইন্‌দি দারু বা ইন্‌দি ডাংয়ের মাথায় ছাতাটি বেঁধে সেই দীর্ঘ শালদণ্ডকে সোজা করে তোলা হবে। শালদণ্ডের মাথায় ছাতা, ছাতার মাথায় পতাকা। মুণ্ডাদের বিশ্বাস, পতাকার গতি ফসলের ভবিষ্যৎ বলে দেয়। যে দিকে পতাকা উড়বে ঠিক সেই দিকেই প্রচুর ফসলের সম্ভাবনা।

এই অনুষ্ঠানটির পর সুরু হবে নাচ। বেজে উঠবে নাগড়া, মাদল আর ঢুলকী। কোন কোন জায়গায় আবার শালদণ্ডটির সঙ্গে একটি ঝুড়ি বেঁধে দেওয়া হয়, ঝুড়ির ভেতরে থাকে মুরগীর ছানা, হলুদ এবং আরো কি কি। এর আগের দিন করমপূজোতে নিম্নোক্ত গানটি গাওয়া হয়েছিল। আর্চার সাহেবের 'ব্লু গ্রোভ' নামক গ্রন্থে গানটি রয়েছে অনুবাদ করলে যার অর্থ দাঁড়ায়:

করম করম ওগো করম রাজা,
তোমার তরে রাজার ছাতা দিব।
করম রাজা করম রাজা ধনদৌলত দাও
ভালো ফসল, গোরু-বাছুর দাও
তোমার তরে রাজার ছাতা দিব।

নৃতত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র রায়, ইদপরবের কথা বলতে গিয়ে, ইন্দ্রধ্বজপূজাকে তো হিন্দু উৎসব বলে স্বীকারই করেন নি।[১] এই উৎসব, প্রথম নাগ বংশীয় রাজা ফণীমুকুট রায়ের রাজ্যলাভের স্মৃতি রক্ষা কল্পেই অনুষ্ঠিত হয় বলে তাঁর অভিমত। এই স্মৃতি রক্ষার জন্যই নাকি রাজা এবং ভূস্বামিগণ বর্তমান (রাতু) বা পরিত্যক্ত রাজধানীতে এই উৎসব পালন করে থাকেন। রাজার স্মৃতিতেই রাজচ্ছত্র। রাঁচি শহর থেকে দশমাইল দূরে সুতিয়ামবে গ্রাম। সেখানে আজও ইন্‌দি অনুষ্ঠিত হয়। সুতিযাম্‌বের ইদ উৎসবের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে দুইটি ছত্রধ্বজ উথিত হয়: একটি মদরা মুণ্ডার স্মৃতিতে আর একটি

১ Mundas and their country —দ্রষ্টব্য।

প্রথম নাগবংশী রাজার স্মৃতিতে। সুতিয়ম্‌বে বর্তমানে আর রাজধানী নয়, কিন্তু এর সংগে মদরা মুণ্ডার[১] স্মৃতি বিজড়িত।

১ মদরা মুণ্ডা কে? আর ফণীমুকুট রায়? ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার প্রয়োজনীয়তা এখানে আছে বৈ কি। এতে আর কিছু না হোক অরণ্যভূমি ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমরাঢ়ের প্রত্যন্ত প্রদেশের রাজা-রাজড়াদের আসল ইতিহাস জানার সুবিধে হবে। কোন্ রাজা আর্য বংশধর, কোন্ রাজা অনার্যভাষাগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত, কোন রাজা কি ধরনের ক্ষত্রিয় তা না জানলে লৌকিক রাজপর্বগুলির অন্তর্নিহিত কথাটি চাপা থেকে যেতে পারে। ছোটনাগপুরের রাজবংশের কুর্শী-নামায় এই মদরা মুণ্ডা এবং ফণীমুকুট রায়ের কাহিনী আছে।

রাজা পরীক্ষিৎ ছিলেন অভিমন্যুর পুত্র, অর্জুনের প্রপৌত্র সর্পাঘাতে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র জনমেজয় সর্পযজ্ঞ ক'রে—পিতৃঘাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। মন্ত্রের প্রভাবে প্রত্যহ অগণিত নাগ যজ্ঞাগ্নিতে ভস্মীভূত হতে লাগলো, নাগকুলে হাহাকার পড়ে গেল। পুণ্ডরীক নাগ শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। বারাণসীতে উপস্থিত হয়ে সেখানে এক ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করলেন তিনি। কন্যার নাম পার্বতী। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলো পার্বতী, তার স্বামীর জিভ্ ঠিক মানুষের মতো নয়, জিভটি সাপের জিভের মতো চেরা। বলা বাহুল্য, পুণ্ডরীক ছদ্মবেশ ধারণ করলেও জিভটি বদলাতে পারেন নি।

কৌতূহল বশে পার্বতী, পুণ্ডরীকের ঐরূপ জিভের কারণ জানতে চাইলো।

পুণ্ডরীক সমস্যায় পড়ে গেলেন। আসল পরিচয় তো আর দেওয়া যায় না। কি আর করেন। শেষ পর্যন্ত অন্য কথায় পার্বতীকে ভুলিয়ে তাকে নিয়ে শ্রীক্ষেত্রধামে বেরিয়ে পড়লেন তীর্থযাত্রায়।

যাত্রাপথে ঝাড়খণ্ডের গহন অরণ্য। সেই অরণ্যরাজ্যে হঠাৎ প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে পড়ল পার্বতী, পুণ্ডরীক নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে তার ব্যথার উপশম ঘটাতে চাইলেন। ঠিক সেই সময়েই পার্বতীর মনে পড়লো যে তার স্বামী দ্বিজিহ্ব। এবারেও কৌতূহল দমন করতে না পেরে পার্বতী জানতে চাইলো এই রহস্য। চূড়ান্ত সমস্যায় পুণ্ডরীক চঞ্চল হয়ে পড়লেন। গর্ভিণী নারীর কোন সাধই তো অপূর্ণ রাখা চলে না। অথচ অন্য কথায় পার্বতীকে আর ভুলিয়ে শান্ত করাও যাচ্ছে না। বারবার সে প্রশ্ন করে চলেছে। পুণ্ডরীককে বলতেই হবে। কিন্তু গোপন কথা প্রকাশ করে দেবার পর পার্বতীকে ছেড়ে যেতে হবে চিরতরে। নাগের সংগে নাগিনী ছাড়া আর কে থাকতে পারে।

নিরুপায় পুণ্ডরীক বেদনা-বিধুর চিত্তে সব কথা বলে আত্মপরিচয় দান করলেন, তারপর নিকটবর্তী জলাশয়ে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। বলে গেলেন, আর দেখা হবে না। প্রিয়-বিচ্ছেদে আকুল হয়ে পড়লো পার্বতী; ঠিক সেই সময়ে এক অপূর্বকান্তি সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো বনপথ আলোকিত ক'রে। একদৃষ্টিতে সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো পার্বতী। তারপর চিতা রচনা করে, চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলো সে। সন্তানের ক্রন্দনে আকৃষ্ট হয়ে নাগ পুণ্ডরীক জলাশয় ত্যাগ করে উঠে এলেন। রৌদ্রতাপের হাত থেকে শিশুকে রক্ষা করবার জন্য তুলে ধরলেন নাগচক্র, ছাতার মতো। নাগছত্রের নীচে শিশুটি

কোন না কোনরূপে—, করম ছাতা-ইদ-পরবের সংগে শস্যোৎসব সম্পর্কিত একটা যোগাযোগ তো আছেই, আবার ছোটনাগপুরের রাজবংশের ঐ দিনেই ছত্র উত্তোলনের কাহিনীও আছে। এই সব নানা কাহিনীর সংগে ইন্দ্র দেবতাও জড়িত হয়ে পড়েছেন।

এর সংগে সীমান্তবাঙলার জমিদারদের সম্পর্ক হয়তো বা অন্যরূপ! তবু একথা অস্বীকৃত নাও হতে পারে যে, ছোটনাগপুরের প্রাচীনতম রাজবংশের স্মৃতি রক্ষার জন্য অন্যান্য রাজবংশেরও কিছু সহানুভূতি থাকতে পারে। ইতিহাস অবশ্য এ সম্পর্কে নীরব। তবু একথা দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে যে সীমান্তবাঙলার অরণ্য অঞ্চলের অধিকাংশ রাজবংশ সম্পর্কে যে উপকথা প্রচলিত, তা মূলত একই এবং তাতে অধিকাংশের পক্ষেই আর্য-ক্ষত্রিয়ত্বের প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য, যদিও হিন্দুত্বের প্রমাণ প্রচুর। এই সমস্ত রাজার সংগে প্রাচীন কালে ঝাড়খণ্ডের অন্যান্য রাজাদের আত্মীয়তা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল নিশ্চয়ই।[১] না থাকলেও সীমান্তবাঙলার আদিবাসী-অধ্যুষিত বিরাট অঞ্চলে সেই আদিবাসী প্রজাদের পূজাপদ্ধতির রীতি-নীতিকে গ্রহণ করে তাঁরা নিশ্চয়ই প্রজাপ্রিয় হবার চেষ্টা করেছিলেন। 'ইদ' যদিও রাজাদেরই উৎসব, তবু আসল আনন্দ-উৎসব তো প্রজাদেরই।

শান্ত হয়ে শুয়ে থাকলো। এমনি সময় ঠিক সেই পথ দিয়ে আসছিলেন এক শাকল-দ্বীপী ব্রাহ্মণ। বুকে তাঁর সূর্য মূর্তি; বাম হাত দিয়ে চেপে ধরে আছেন। সামনে জলাশয় দেখে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তিনি নেমে পড়লেন তাতে; সূর্য মূর্তিকে পাড়ের উপর রেখে জলপান করে ফিরে এসে কিছুতেই তুলতে পারলেন না সেই সূর্য মূর্তিকে। অবাক হয়ে এই অঘটনের কারণ খুঁজতে গিয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন তিনি। দেখলেন, অদূরে বিরাটদেহী নাগ ফণা তুলে তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে। ফণার নীচে হাত পা তুলে খেলা করছে একটি সুন্দর শিশু।

পুণ্ডরীক ডাকলেন সেই ব্রাহ্মণকে। ব্রাহ্মণের কাছে আত্মপরিচয় দান করে তিনি বললেন যে, শিশুটি তাঁরই পুত্র; ঝাড়খণ্ডের ভবিষ্যৎ রাজা। নাম হবে ফণীমুকুট রায়। একে তুমি রক্ষা করো; রাজা হলে তুমিই হবে এর পুরোহিত। এই কথা বলে অন্তর্হিত হলেন তিনি।

ব্রাহ্মণ সেই শিশুকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী সুতিয়াম্বের গ্রামে প্রবেশ করলেন। সুতিয়াম্বের 'মানকি' বা রাজা ছিল মদরা মুণ্ডা। ব্রাহ্মণের নির্দেশ অনুসারে মদরা মুণ্ডা নিজের পুত্রের সংগে নাগপুত্রকে লালন করতে লাগলেন পুত্রস্নেহে। কালক্রমে ফণীমুকুট বড়ো হলো। কিন্তু মুণ্ডা সমাজে লালিত পালিত হয়েও, তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হয়ে উঠলো।

মদরা মুণ্ডা একদিন, অন্যান্য "পাড়হা মানকি" (ক্ষুদ্র ভূস্বামী)-দের ডেকে তাদেরই উপর বিচারের ভার দিলেন, তাঁর নিজের পুত্র অথবা পুত্রবৎ ফণীমুকুট রায়ের মধ্যে কাকে—সমগ্র ঝাড়খণ্ডের রাজা করা যায়।

সর্ববিষয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করায় ফণীমুকুট গৃহীত হলো, ঝাড়খণ্ডের একাধিপতি রূপে। তাঁর কাছে মাথা নত করলো অরণ্য অঞ্চলের সমস্ত রাজা। ফণীমুকুট রায় হলেন, ছোটনাগপুর রাজবংশের আদিপুরুষ।

১ শিখরভূমের রাজা, ফণীমুকুটকে মুণ্ডাবংশধর বলে প্রথমে কন্যাদান করতে রাজী হন নি। পরে, পুণ্ডরীক নাগের মধ্যস্থতায় যখন জানা গেল যে ফণীমুকুট মুণ্ডা নন্‌ তখন তিনি তাঁকে কন্যা সম্প্রদান করেন।

কালের বিবর্তনে 'ইঁদ' ইন্দ্রত্ব লাভ করেছেন অথবা ইন্দ্র দেবতাই এঁদের কাছে নতি স্বীকার করে ইঁদ হয়েছেন, ইনদি হয়েছেন, একথা সঠিকভাবে বলা যায় না।

মানভূম-ধলভূম-শিখরভূম-বরাহভূম-ভঞ্জভূম-মল্লভূম[১]-সামন্তভূম প্রভৃতি অঞ্চলে আদিবাসী এবং হিন্দুধর্মী আদিবাসীদেরই সংখ্যাধিক্য। শিখরভূমের সংগে নাগবংশী রাজাদের আত্মীয়তা সম্পর্কের কথা তো জানাই গেছে, আর প্রাচীন মল্লভূম বললে একটা বিরাট অঞ্চলকেই বোঝাত। বলা হয়েছে যে, মল্লভূমের উত্তরসীমা ছুঁয়ে যেতো সাঁওতাল পরগণার দামিন-ই কোহ, দক্ষিণে এর সীমা ছিল মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অঞ্চল, পূবে বর্ধমানের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত। পাঞ্চেটে প্রাপ্ত শিলালিপির সাহায্যে এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে পশ্চিমে মানভূম সমেত ছোটনাগপুরের অনেকখানি অংশই মল্লভূম বলে খ্যাত ছিল।[২] উপর্যুক্ত ভূমসমূহ মূলতঃ মল্লভূমিরই অংশীভূত ছিল। এই কারণে এই সীমান্ত অঞ্চলের আপাত-বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও এক গভীর মিল আছে। ইঁদ উৎসব এদের মধ্যে এইভাবেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর অর্বাচীন দেবীপুরাণের মাধ্যমে এই উৎসব যে ভারতের অন্যান্য স্থানে সাময়িকভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি, তারও যথোপযুক্ত প্রমাণ কোথায়?

যাই হোক, হয়তো বা এই উৎসবের সংগুপ্ত আদিকথা, কেউ জানবে না কোন দিন। হয়তো বা কালক্রমে বিলুপ্তি ঘটবে এই উৎসবের। জমিদার আর রাজার যুগ যখন শেষ হলো, তখন কে আর ইদ পরবের অনুষ্ঠান করবে। ইদ অবশ্য এখনো সীমান্তবাংলায় সসম্মানেই আছেন। কিন্তু আমাদের মনে বৈদিক দেবতা ইন্দ্রের স্মৃতি জাগরূক থাকবে না, থাকবে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের প্রতীক ইদ পরব। ইঁদকুড়ির মাঠ, ইঁদতলা, ইন্‌দিপিড়ি, ইন্দাস্, ইন্দখুটা প্রভৃতি ভাষাতাত্ত্বিকদের গবেষণার খোরাক জুগিয়ে চলবে হয়তো বা।

কিন্তু এখনো কি কেউ জানে—ইঁদের মাসী কাঁদে কেন? ইঁদের সময় বৃষ্টি হলেই লোকে বলে ইঁদের মাসী কাঁদছে, কেউ কেউ বলে ইঁদমাসী কাঁদছে। কে এই মাসী কে জানে। না-কি অর্থহীন এ কথা।

১ ঝাড়গ্রাম অঞ্চলকেও মল্লভূম বলা হয় এখনো, যদিও মল্লভূম বললে বর্তমানে ছাতনা বাদে বাঁকুড়া থানা, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোটালপুর ও ইন্দাস্ থানাকে বোঝায়।

২ বাঙ্গলার ইতিহাস—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়।

॥ ভাদু ॥

"কাশীপুরের রাজার বিটি
বাগ্‌দীঘরে কি কর।
হাতের জালি কাঁখে লয়ে
সুখসায়রে মাছ ধর॥"

আদিম মানুষের মধ্যে পূর্বপুরুষ পূজার প্রথা ভূত পূজার সংগে সংগেই বিধিবদ্ধ হয়েছিল। বলা বাহুল্য, মৃত মানুষের অজ্ঞাত রহস্যই আদিম মানুষের মনে ভীতি উৎপাদন করেছিল, যার বীজ নিহিত ছিল জীবন্ত মানুষের আকস্মিক নিশ্চলতার মধ্যে। ক্রমে ক্রমে প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে, তার 'আত্মা'-সম্পৃক্ত মতবাদ গড়ে উঠলো এবং মৃত আত্মার সন্তুষ্টির জন্য পূজা প্রদানের প্রথাও দেখা দিল। সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়গণ শেষপর্যন্ত 'ভূত' না হয়ে 'দেবতা'রূপে কল্পিত হলো।[1] মানুষ বিশ্বাস করতে লাগলো যে এই পূর্বপুরুষের আত্মাকে সন্তুষ্ট করলে সকলের মংগল হয়। বর্তমানের আদিম সমাজের মধ্যে পূর্বপুরুষ পূজার প্রথা এখনো বিদ্যমান, হিন্দু সমাজের মধ্যেও কোন না কোন রূপে এই প্রথা জীবিত আছে। শুধু হিন্দুসমাজে কেন, সারা পৃথিবীতে যে নায়ক পূজার (Hero worship) প্রথা বিদ্যমান, তাও পূর্বপুরুষ পূজারই পরিবর্তিত রূপ মাত্র।

সীমান্তবাঙলার ভাদু পরবের মধ্যেও এই একই রহস্য বিদ্যমান। করম উৎসবের প্রচুর প্রভাব সত্ত্বেও এই উৎসবকে ঠিক শস্যোৎসবের পর্যায়ে ফেলা যায় না এবং করম অথবা টুসু-পরবের মতো জনপর্বের সমস্ত লক্ষণও এর মধ্যে নেই।

1 'Anything that transcends the ordinary, a savage thinks of as supernatural or divine the remarkable man among the rest. Being regarded with awe during his life, he is regarded with increased awe after his death, and the propitiation of his ghosts, becoming greater than the propitiation of ghosts which are less feared, develops into an established worship'

Herbert Spencer
(Encyclopaedia of Ethics and Religion)

সীমান্তবাঙলাব জীবনে ভাদ্রমাসটিব বিশেষ গুরুত্ব আছে। বহু পর্ব-পার্বণ-উৎসবের সমাবোহে ভাদ্রমাসটি ভরা নদীব মতো উচ্ছল আব চঞ্চল। আদিম উপজাতিদেব কবম, জিতিয়া, বিঁধা, ইঁদ প্রভৃতি উৎসব ভাদ্রমাসেব আকাশ-বাতাস-বন-পাহাড়কে আবৃত কবে থাকে।

'ভাদু পববটি' অবশ্য আদিমজাতিদেব মধ্যে প্রচলিত নেই। পর্বটি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক পর্ব হিসেবে বিশেষ এক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। উত্তব-পূর্ব মানভূমেব উচ্চবর্ণেব বর্ধিষ্ণু পবিবাবেব মধ্যেই এব প্রচলন বেশী এবং সংগে সংগে সেই অঞ্চলেব বাউবী এবং বাগ্‌দী শ্রেণীব মধ্যেও এব প্রভাব বিদ্যমান। মাহাতো সম্প্রদায়েব মধ্যে এব প্রচলন নেই বললেও চলে। এব বিশেষ কাবণ আছে। কাবণটি হচ্ছে এই যে, ভাদু পববটি প্রাচীন নয়, আধুনিক কালেবই এবং পঞ্চকোটেব বাজবংশেব পৃষ্ঠপোষকতায় এব জন্ম বিগত শতাব্দীব মধ্যভাগেই। ছোটনাগপুব বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেব আদিবাসীদেব মধ্যে ভাদুবাণীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভাদুবাণী : বাজকন্যা। এই বাজকন্যাকে অবলম্বন কবেই টুসু পববেব অনুকবণে এব গতিবেগ এবং এ উৎসব মাত্র কয়েকটি অঞ্চলেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ। উৎসবেব প্রাণ হচ্ছে সংগীত। কোনো পূজা অর্চনাব মাধ্যমে এই উৎসবটি রূপায়িত করা হয় না। সাবা ভাদ্রমাসে ভাদু-মূর্তিব সামনে গান গেয়ে, ভাদ্র সংক্রান্তিব দিনে ভাদুব বিসর্জন।

'ভাদু অঞ্চল' বললেই পূর্ব মানভূম—পশ্চিম বাকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীবভূম জেলাব কিয়দংশকেই বোঝায়। এই সব অঞ্চলেব বাগ্‌দী এবং বাউবীদেব মধ্যেই এব প্রচাব বেশী, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণেব ছোট ছোট মেয়েবাও ভাদুব গান গেয়ে ভাদু-উৎসব কবে। তবে টুসু উৎসবের মতো এই উৎসব ততো বেশী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি।

ভাদ্রমাস দুদিক দিয়ে প্রখ্যাত। ঠিক এই মাসেই কোন কোন অঞ্চলে আউশধান ঘবে তোলা হয়,—আব একদিকে সবুজ ধানেব চাবা আগামী অগ্রাণেব ইংগিত নিয়ে আসে। বোয়া পোতাব কাজ শেষ হয়েছে, আউশধান তোলা হয়েছে, অতএব উৎসব কিছু একটা চাই-ই। উৎসব ছাড়া আব কি নিয়ে থাকবে সাধাবণ মানুষ। নদীপুকুব টলমল কবছে জলে, লালমাটি আব শালবনে বৃষ্টিধোয়া শালীনতা, কাশফুল ফুটতে আবম্ভ কবেছে, আকাশেব মেঘ আব তেমন কবে দিক্‌ভ্রান্ত করছে না, মাঝে মাঝে ভবা ভাদবের

জলোচ্ছ্বাস মেঘ আর মাটিতে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যাচ্ছে, ধানের ক্ষেত সবুজ চাবায় দিশেহারা হয়ে গেছে : এসে গেছে শরৎকাল।

ভাদ্রের প্রত্যেকটি সন্ধ্যায় পাড়ায় পাড়ায় ভাদুমূর্তির সামনে পল্লীগীতির জলসা। পরিবেশ আর প্রতিবেশ নিয়েই সংগীত। সাধারণত কুমারী মেয়েরা এর মুখ্য অংশভাগিনী হলেও অন্য কোন মেয়ের পক্ষে এতে যোগদানের বাধা নিষেধ নেই। কুমারী, তরুণী, বিবাহিতা, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, সবাই এতে যোগ দিতে পারে।

এ প্রসংগে টুসু গানের উল্লেখ করা দরকার—, যেহেতু টুসুগানের অনুকরণেই ভাদুগানের সৃষ্টি। তুষতুষলী, পোষলা বা টুসু যে ভাদুর চেয়ে অনেক প্রাচীন, তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। টুসু পুজোর ছড়ার মতো ভাদু পুজোর কোন ছড়া নেই।

বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়ার এবং পূর্ব মানভূমের বাগ্‌দী বাউরীদের অত্যন্ত আদরের দেবী—এই ভাদুরাণী। ভাদুরাণী অবশ্য, অন্যান্য দেবদেবীর মতো নয়, সে কন্যামাত্র। এর কাছে প্রার্থনা বা আবেদন জানানো চলে না। তবুও ভাদুরাণী দেবত্বলাভ করেছে পুরোপুরি। শিব বিষ্ণু, মারাংবুরু, মন্‌সা, মানসিং, ধরমরাজ, কুদ্‌রাসিনি প্রভৃতি দেবদেবীদের সমপর্যায়ে ভাদুরাণীর আসনও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

ভাদু উৎসবের সংগে আদিম উপজাতিদের করম বা অন্য কোন উৎসবের সংগে এর মৌলিক কোন সম্পর্কই নেই একে বর্ষা-উৎসব বা শস্যোৎসব বলে চালিয়ে দেবার পক্ষেও বিশেষ কোন যুক্তি নেই। বলা বাহুল্য, ভাদ্রমাসের উৎসব বলে উৎসবটির নাম ভাদু হতে পারে। তবে এ সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাতে ভাদু নামের পেছনে ভদ্রেশ্বরী বা ভাদুরাণী নামে এক রাজকন্যার স্মৃতি বিদ্যমান। এই কাহিনী থেকেই বোঝা যায় যে এক্ষেত্রে মানুষের প্রতি দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং ভাদু উৎসব ব্যক্তিপূজা বা স্মৃতিপূজার একটি বিশিষ্ট নজীর মাত্র। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগেই ভাদু পূজার সূত্রপাত হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে, মানুষের প্রতি দেবত্ব আরোপের ঘটনা নতুন নয়। ভাদুরাণীর এমন কোন গুণের কথা অবশ্য জানা যায় না, যাতে করে তাকে দেবত্ব দান করা যেতে পারে। কিন্তু প্রজাবৃন্দ রাজার আদেশ তো আর অমান্য করতে পারে না। রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই

প্রথমে এই উৎসবের রীতি রেওয়াজকে বাড়িয়ে তোলে। সংগে সংগে বাউরী এবং বাগ্‌দী প্রজারাও একে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। পঞ্চকোটের ভাদুরাণী ক্রমে ক্রমে সীমান্তবাঙ্‌লার অনেক অঞ্চলেই মূর্তিরূপা দেবীকন্যা হয়ে দাঁড়ায়।

মানভূম জেলার (বর্তমানে পুরুলিয়া) পূর্বপ্রান্তে পঞ্চকোট রাজ্য। লালমাটি আর শালবনের দেশ। এদিক ওদিকে পাহাড়ের মাথা। সাঁওতালী উপকথায় পঞ্চকোটের আদি রাজাকে বোঙা বলা হয়েছে, যাঁকে গভীর অরণ্যে বুনো মোষ পালন করেছিল। কোন কোন উপকথায় বুনো মোষের পরিবর্তে কপিলাগাভীর কথাও বলা হয়।

এই পঞ্চকোটের এক রাজার নাম ছিল নীলমণি সিংহদেব। সিপাহী যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন তিনি।

এই তো সেদিনের কথা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্বের কথা। পঞ্চকোটের নতুন রাজধানী কাশীপুরে উৎসবের হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেল।

রাণী একটি কন্যারত্ন প্রসব করেছেন। ফুটফুটে চাঁদের আলোর মতো চেহারা, সে সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। রাজপ্রাসাদ, বনপাহাড়, পথপ্রান্তর সব কিছু রূপের ছটায় উদ্‌ভাসিত হয়ে প্রজাদের হৃদয়দেশকে আলোকিত করে তুলল রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরী,—ভাদুরাণী। দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠলো ভাদুরাণী। বয়ঃসন্ধির সমস্ত লক্ষণ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল তার দেহে আর মনে। শিখরভূমের শিখরিণী ভাদুরাণী চিন্তিত করে তুললো রাজা নীলমণি সিংহ-দেবকে। সারাদেশে কোথায় পাত্র আছে ভাদুরাণীর যোগ্য? কার হাতে তুলে দেবেন এই দেবী-নিন্দিত রূপ?

প্রজাপাটক সবাই ভাদুরাণীকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা করে। তার রূপে শুধু পঞ্চকোট কেন, পঞ্চকোটের বাইরের অঞ্চল ঝলমল করে উঠলো যেন। যে একবার ভাদুরাণীকে দেখে, সে তার ভক্তিনম্র মস্তক আনত করে যায় ভাদুর উদ্দেশে। অবাক হয়ে ভাবে সবাই: কে এ? মানবী না দেবী? এদিকে কিশোরী ভাদুরাণী রাজপ্রাসাদের রুদ্ধ পরিবেশে তরুণী হতে থাকে দিন দিন; দিন গুণতে থাকে কবে তার যৌবনের উদ্যানে প্রথম পুরুষের পদপাত ধ্বনিত হবে; কবে তার পুষ্প-সুরভি পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করবে, একটি বিশেষ মানুষকে সুরভিত করে।

এম্‌নি নিবিড় উৎকণ্ঠায় রাজা, রাণী, ভাদুরাণী, সখা-সহচরী, আত্মীয় স্বজন, প্রজাপাটক সবাই যখন দিশেহারা, ঠিক সেই সময় আকস্মিকভাবে ভাদুরাণী

ঝরে পড়লো বৃন্তচ্যুত পুষ্পের মতো। অন্ধকার গ্রাস করলো জ্যোৎস্নাকে। ভাদুরাণীর মৃত্যু হলো। রাজ্যময় হাহাকার পড়ে গেল। বন পাহাড় আঁধার হয়ে গেল। রাজপুরী স্তব্ধ হয়ে গেল পাথরের মতো। ঘরে ঘরে চোখের জলে নদী হয়ে গেল।

কিন্তু দিনের সংগে সংগে শোকেরও সমাপ্তি ঘটে, উর্ধ্বায়ন ঘটে ব্যথা বেদনার।

রাজা নীলমণি সিংহদেব প্রচার করে দিলেন, ঘরে ঘরে বাঁচিয়ে রাখা হোক ভাদুরাণীকে। গানে গানে জীবিত করা হোক্ ভদ্রেশ্বরীকে। উৎসবের মধ্যে দেবী করা হোক ভাদুকে। সমস্ত রাজ্যের দেবী কন্যা হয়ে সকলের বুক জুড়ে সে থাকুক।

রাজার আদেশ না পেলেও প্রজাবৃন্দ বাঁচিয়ে রাখতো ভাদুরাণীকে। বর্ধিষ্ণু প্রজার দল রাজার নির্দেশকে গ্রহণ করলো আন্তরিক ভাবে। সংগে সংগে সুরু হলো গান রচনার পালা। টুসু গানের অনুকরণে জন্ম নিল ভাদু গান। টুসু পরবের অনুকরণে অনুষ্ঠিত হলো সারা ভাদ্রমাস ধরে ভাদুপরব।

ভাদু আজ রাজপ্রাসাদের ভদ্রেশ্বরী নয়, সে আজ ভাদুরাণী, ভাদুমণি, প্রত্যেক ঘরের আদরিণী কন্যা।

তারপর পঞ্চকোট থেকে বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া-বর্ধমান-বীরভূমের কোন কোন অঞ্চলেও ভাদুরাণীর স্মৃতিপুজোর প্রথা ছড়িয়ে পড়লো। সন্ধ্যের সময় মেয়েরা ভাদুমূর্তির সামনে ভাদু-গান ক'রে ভাদুকে স্মরণ ক'রে। ভাদ্রসংক্রান্তিতে ভাদুমূর্তির বিসর্জন। সে দিন মানভূমে ছাতা পরব।[১] ভাদ্রসংক্রান্তির সে প্রভাতটি বিদায় বেদনার একটি করুণ পরিবেশের জন্ম দেয়। মল্লভূমের বাগ্‌দী এবং বাউরী সম্প্রদায়ের লোকেরা ভাদুমূর্তিকে নিয়ে শবযাত্রা করে থাকে।

বলা বাহুল্য কাশীপুরের রাজবাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতাতেই এই উৎসব ছড়িয়ে পড়ে। টুসুর অনুকরণেই এই উৎসব। আষাঢ় শ্রাবণ ক্ষেতের কাজে, আশ্বিনে দুর্গাপুজো; কার্তিকে কালীপুজো, বাঁধনাপরব, অঘ্রাণে ধান কাটা,

১ (ইঁদ ও ছাতাপরবের প্রসংগ ভাদুগানেও পাওয়া যাচ্ছে:)

সারা ভাদর রাখিলাম মাকে কুঁচি কপাট দিয়া গো।
আর রাখিতে নারিলাম মাকে ছাতা হল বাদী গো॥
ইঁদ আইল নিতে ভাদু কাপড় দিলে ধুতে গো।
ছাতা আইল নিতে ভাদু দরিয়ায় ঝাঁপ দিলে গো॥

পৌষে টুসু—, মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র অন্যান্য উৎসবে মুখর ; আর এদিকে আউশ-ধান তোলার সময় ভাদ্রমাসেই ভাদু উৎসবের মাস ; বলা বাহুল্য একে ফসল তোলার উৎসব আমরা বলতে পারি না, যেহেতু মূলতঃ স্মৃতিপূজার অভিব্যক্তি-রূপেই এর প্রচলন। তবে এ কথা ঠিক ভাদ্র ফসলের সংগে এব একটি আন্তরিক প্রীতি বন্ধন নিশ্চয়ই আছে।

এ উৎসবে প্রার্থনা নেই, আবেদন নিবেদন নেই। গানের ভিতর দিয়ে পরিবেশ প্রতিবেশের কথা ব্যক্ত করেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয় মাত্র। টুসু পরবের সমস্ত আংগিকই ভাদুর মধ্যে গৃহীত হয়েছে, একই ধবণের গানও উভয়ক্ষেত্রে গীত হয়ে থাকে। এমনকি একই গান, কোথাও বা টুসুর নাম দিয়ে কোথাএ বা ভাদুর নাম দিয়ে গাওয়া হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি গান উদ্ধৃত করছি :

চল টুসু চল খেলতে যাবো রাণীগঞ্জের বটতলা—
খেলতে খেলতে দেখ্যে আসবো কয়লাখাদের জলতোলা।

ভাদুর গানে, টুসু শব্দটির পরিবর্তে 'ভাদু' শব্দটি বসিযে দিয়েই গানটি গাওয়া হয়। এ ধরণের অসংখ্য উদাহরণ আছে।

ভাদু গানের সুরের সংগে টুসু গানের সুরের মিলও আছে। সাধারণত টুসুগানে দুটি সুর শোনা যায়, একটি দ্রুত-তালিক, অন্যটি ঢিমে। ভাদুগানের সুরটি ঢিমে, দ্রুততালিক নয়।

ভাদ্রসংক্রান্তির তিথির আগের রাতে 'জাগরণ'। সমস্ত রাত ধরে সে দিন গান চলবে, নাচ চলবে, খাওয়া দাওয়ার ধুম চলবে। মেয়ে পুরুষ সবাই গাইবে : আদরিণী ভাদুরাণী এলো আজি ঘরকে।

ভাদু যেন বাড়ীর মেয়ে, পিতৃগৃহে আগমন উপলক্ষে যেন এই উৎসব। বলা বাহুল্য, হরপ্রিয় উমার হিমালয়-মেনকার স্নেহনীড়ে ফিরে আসার চিত্রটি ভাদু গানের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়। সবাই ভাদুকে অভ্যর্থনা জানায় :

ভাদুর আগমনে—
কি আনন্দ হয় গো মোদের প্রাণে
ভাদুর আগমনে।
ভাদু আজ এলো ঘরে গো,
এলো গো শুভদিনে।

মোরা সাজি ভর্তি ফুল তুলেছি গো
যত সব সঙ্গীগণে।
মোরা সারা রাত্তি করবো পুজা গো
ফুল দিব গো চরণে।
আনবো সন্দেশ থালা থালা খাওয়াবো ভাদু ধনে।

কিন্তু তবুও আশংকা আছে, ভয় আছে। ভালবাসার ধন ভাদুকে কি তারা উপযুক্তভাবে যত্ন করতে পারবে। কারণ:

কাশীপুরের রাজার বিটি সোনার খাটে বসন।[১]
রূপার খাটে চরণ দিয়া হীরায় দাঁত ঘষণ॥[২]

কিন্তু সে আশংকাও থাকে না শেষ পর্যন্ত। ভাদু তো এখন রাজকন্যা নয়, দেশকন্যা। কাশীপুরের রাজবাড়ী ছেড়ে ভাদু আজ বাগ্‌দীদের ঘরেও এসেছে— , এসেছে যখন, তখন বাগ্‌দীমেয়ের মতো মাছ ধরতে যাক সে। তাই বলা হলো:

কাশীপুরের রাজার বিটি বাগ্‌দীঘরে কি কর।
হাতের জালি কাঁখে লয়ে সুখ সায়রে মাছ ধর॥
মাছ ধরণে গেলে ভাদু ধানের গুছি ভাঙিও না।
একটি গুছি ভাঙলে পরে পাঁচসিকা জরিমানা॥

এই ধরনের অসংখ্য লোকসংগীতের মাধ্যমে লোক-মনের চিন্তার ধারাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় সহজ ভাষায়, সহজ সুরে। কোন কৃত্রিমতার ছাপে এ সংগীতগুলি লোক-ধর্মকে বর্জন করে না।

ধানের ক্ষেতে বাগ্‌দী মেয়ের মাছ ধরার দৃশ্যটি তো এখানে ছবির মতো ফুটে উঠেছে। নিজেদের তো ক্ষেত নেই, তাই অপরের ক্ষেতে মাছ ধরতে যেতে হয়। অপরের ক্ষেতে মাছ ধরার বারণ হয়তো নেই, কিন্তু একটি ধানের গুছি ভেঙেছো কি পাঁচসিকে জরিমানা। বাগ্‌দী সমাজের হৃদয়-বেদনার প্রকাশ এমনি ভাবেই গানে গানে।

শুধু বাগ্‌দী ঘরেই বা ভাদু থাকবে কেন, সে যখন সকলেরই তখন সে চলে যাবে বেড়ো গ্রামে, চলে যাবে পুরুলিয়া শহরে, চলে যাবে এখানে ওখানে সেখানে। বেড়ো গ্রামে যদি বিয়ে হয়, তা হলে পঞ্চকোটে হবে শ্বশুরঘর, বাসরঘর হবে আসানসোলে।—

---

১ বসেন ২ ঘসেন

কাশীপুরের মহারাজা সে করে ভাদু পুজা।
সন্ধ্যা হলে ঝারল বাজে, থালায় জিলিপ খাজা ॥
বেড়ো বাঁধে বেড়ো বাঁধে বেড়ো বাঁধে কে তুমি—।
শ্যাওড়াগাছে ডগ মেলেছে হরতকি তলায় আমি ॥
আমার ভাদুর বেড়োয় বিহা পঞ্চকোট শ্বশুরঘর।
পুরুলিয়ায় বাজবাজনা আসানসোলে বাসরঘর ॥

ভাদুরাণী যখন ঘরে ঘরে আসন পাতে, তখন সব ভাদু তো এক হতে পারে না। তাই ভাদুর মূর্তি বিসর্জনের সময় এ দলেব ছেলেমেয়েরা ও দলের ভাদুমূর্তির কুৎসা রটনা করবে, ও দলের ছেলেমেয়েবা এ দলের ভাদুর কুৎসা রটনা করবে, আর নিজেদেব ভাদুরাণীর গুণের আব সৌন্দর্যের কথা বলবে জোর গলায়। ও পাড়াব ভাদু দেখে এ পাড়াব মেয়েবা গাইলো হয়তো:

ও পাড়াতে দেখে এলাম চিপ্‌সে ভাদু গড়েছে।
লড়ে না চড়ে না ভাদু সান্নিপাতে ধরেছে।
আমার ভাদুর স্বর্গশোভা লো, তোদের পাতাল ভুবনে।
সত্য মিথ্যা দেখ না চেয়ে, চোখ থাকিতে অন্ধ কেনে ॥

এই সব গানের মাধ্যমে রাজনীতিব কথাবার্তাও ঢুকে পড়েছে অনিবার্য ভাবে।

তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তা মূলত প্রচাবমূলকই। কিন্তু মানুষের দুঃখ-বেদনার কথা রাজনীতি-বর্জিত হয়েও এ সব গানে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ফুটেছে। যেমন:—

ও সোহাগী ননদিনী নীলাম্বরী পরবি,
খোঁপায় সাধের গেঁদাফুলে পেবজাপতি ধরবি,
হায় হায় হায় হায় রে পরনে নাই টেনা।
ভাসুর ঠাকুর অঙ্গনেতে ছেঁড়া কাঁথাটো দেনা ॥
সরম ধরম রইবে কুথায় বিবির হাটে যাব।
কনটোলেতে লাইন দিয়ে ভিখ মাগিয়ে খাব ॥
কনটোলেতে চাল নাইরে কপালে মার ঝাঁটা।
পথের পাশে মানুষ মরে কুকুর বিড়াল পাঁঠা ॥

ভাদ্রমাসের আউশধান ফুরিয়ে যাবে, সংক্রান্তির সংগে সংগে। সারাবছরের প্রতীক্ষার পর প্রথম মোটা ধানের চাল। তাই ভাদু বিসর্জনের করুণ কান্না

যেন ভাদ্রফসল ফুরিয়ে যাওয়ার বেদনামুখর গান। আশ্বিন-কার্তিকের অভাব-রিক্ত দিনের ছায়া পড়ে বিসর্জনের গানে। অঘ্রাণ তো অনেক দূরে—

প্রাণে ধৈর্য ধরে—
প্রাণেব ভাদু বিদায় দি কেমন করে।
সারা বছর কেঁদে কেঁদে গো পেয়েছি বছর পরে
সুখের হাট ডুবাই কেমনে বিপদেরি সাগরে।
পোড়া বিধি নিদারুণ গো পোড়াই তাঁহাব বিচারে।
(মোদেব) সুখেব বাদী হয়ে সদা দুঃখ দেয় কঠিন অন্তরে।
জুড়াইব দুঃখজ্বালা গো কাহাব চাঁদবদন হেবে॥

॥ ঝিঁথ্রা ॥

এক

"রংকিণী বন্দিব যার পুরী ঘাটশীলা।"

সমাজবিন্যাসের ভূমিকায়, উদরপূর্তির আকাঙ্ক্ষা এমনভাবে সংগুপ্ত আছে, যা স্থূল দৃষ্টির লক্ষ্যীভূত হয় না, তবে বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে সেই আকাঙ্ক্ষার রূপটিকে আবিষ্কার করা যায়। প্রকৃতির খেয়াল খুশীর সংগে মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়েছে পদে পদে, আজও তা চল্‌ছে। এই সংগ্রাম কখনো কখনো আপোষের পন্থাও গ্রহণ করেছিল, সেই আপোষের ফলেই জন্ম নিয়েছিল অলৌকিক অপ্রাকৃতিক শক্তিকে মেনে নেবার প্রবৃত্তি। তাই আদিম মানুষের জগতে অপদেবতার সংখ্যাধিক্য, আর সমাজপরিবর্তনের সংগে সংগে অপদেবতার দেবত্ব প্রাপ্তি।

শস্য উৎপাদনের জন্য অনিবার্যভাবে যা কিছু প্রয়োজনীয়, তার প্রাপ্তির পথে যদি প্রাকৃতিক বাধা এসে উপস্থিত হয় এবং তা যদি মানুষের বিচার বুদ্ধির অগম্য হয়, তাহলে মানুষকে শেষ পর্যন্ত আত্মসন্তুষ্টির উপায় উদ্‌ভাবন করতে হয়। ফলে, পুজা-পার্বণ উৎসবাদির সৃষ্টি। আকাশ থেকে বৃষ্টির কণা ঝরে না পড়লে ফসল ফলবে না,—এ অভিজ্ঞতা লাভ করতেও সময় লেগেছে মানুষের। তারপর অনাবৃষ্টি হলে তার পেছনে যে কোন অপদেবতার কারসাজি আছে, এ ধরণের বিশ্বাস আহরণ করতেও সময় লেগেছে মানব-গোষ্ঠীর। শক্তিমান মানুষকে খুশী করবার নানা প্রক্রিয়া যখন আদিম মানুষের জ্ঞানের পর্যায়ে এলো, তখন অপদেবতাকেও সন্তুষ্ট করবার কথা তারা ভাবতে সুরু করেছিল নিশ্চয়ই। আদিম যুগের কোন সমাজের কোন একজন বলশালী পুরুষ বা সমাজকর্তা খাদ্য-উপাদান পেলে খুশী হয়, প্রত্যেক মানুষই খুশী হয়, এ অভিজ্ঞতা আসবার সংগে সংগে, তাদের জ্ঞানের পরিধির মধ্যে যে অপদেবতার বিশ্বাস বাসা বেঁধেছিল সেই অপদেবতাকেও ঘুষ দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। পুজা-পার্বণের মাধ্যমে জীবরক্ত দান করে তারা সন্তুষ্ট করতে চাইলো অপদেবতাদের। শুধু পশুবলি দেওয়ার প্রথাই মাথা তুলে দাঁড়ালো না,—নরবলির প্রথাও অনিবার্যভাবেই নরসমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো।

এই নরবলি প্রথাকে প্রাচীনতম প্রথাগুলির অন্যতম হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, ফসলবৃদ্ধির কামনায় অজ্ঞাত অপদেবতাকে নররক্ত দানের প্রথা পৃথিবীর সমস্ত আদিমসমাজেই প্রচলিত ছিল এবং কোন কোন দেশে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তার অগ্রগমন ব্যাহত হয় নি। নররক্তকে অন্যান্য পশুরক্ত অপেক্ষা অধিক সম্মান দেওয়া হতো বলেই এটা ঘটতো। আদিম মানুষ অন্য জীব অপেক্ষা মানুষ নামক জীবটির জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিল। ফলে, এ বিশ্বাসও দেখা দিয়েছিল যে যা কিছু মূল্যবান, তাই পেলেই অপদেবতা বা দেবতার তুষ্টি।

বলিদান প্রথার উৎপত্তি সম্পর্কে নানাজনের নানা মত অবশ্যই আছে। হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, এর আদিতে পূর্বপুরুষপূজার চিহ্ন বিদ্যমান, মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে খাদ্য-বস্তু উৎসর্গ করার যে প্রথা আদিমসমাজে প্রচলিত ছিল, সেই প্রথাই পরে বলিদান প্রথায় রূপান্তরিত হয়।[১] বলা বাহুল্য, মৃত পূর্বপুরুষের আত্মাকে প্রথমে অপদেবতার দৃষ্টিতে দেখলেও আস্তে আস্তে মানুষ তাকে দেবত্বের পর্যায়ে তুলেছিল। আমাদের পূজাপার্বণ উৎসবাদির মধ্যে আকাঙ্ক্ষাপূর্তির যে ইতিহাস সংগুপ্ত আছে, তার মধ্যে আর্য-পূর্ব দিনের নানা ধ্যান-ধারণা, কর্ম ক্রিয়া আজও বিদ্যমান, বলিদান প্রথাই তার মধ্যে অন্যতম। শুধু পশু বলিদানই নয়, নরবলিদানের প্রথাও হিন্দু-সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল—যে প্রথা, মূলত প্রাচীন প্রাগার্য সমাজেরই স্মৃতিবাহী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি কাহিনীতে নরবলি প্রথার উল্লেখ আছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণ দেবতার নিকটে পুত্র প্রার্থনা করেছিলেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে, যদি পুত্রলাভ করেন, তাহলে সেই জাতপুত্রকে তিনি বলিদান করবেন। পরে, অবশ্য রাজা শুনঃশেফ নামক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পুত্রকে বলিদানের জন্য ক্রয় করেছিলেন। দাতাকর্ণের উপাখ্যানেও নর-বলিদানের প্রথা বিধৃত।

প্রাচীন কালের ইতিহাস বাদ দিলেও, আধুনিক কালের ইতিহাসে নরবলি অজ্ঞাত নয়। বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর কাছে নরবলিদানের প্রথা সে দিন পর্যন্তও

---

১ "The origin of sacrifice is to be found in the custom of leaving food and drink at the graves of the dead as the ancestral spirits rose to divine rank the refreshments placed for the dead developed into sacrifices."

Herbert Spenser

(Encyclopaedia of Ethics and Religion)

প্রচলিত ছিল। শস্যকামনায় মধ্যভারতের খন্দজাতি প্রায়ই নরবলি দান করতো। কথিত আছে, ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কামরূপে কামাখ্যা মন্দির যখন রাজা কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়, তখন দেবীর কাছে তাম্রপাত্রে একশো চল্লিশটি নরমুণ্ড অর্ঘ্য দান করা হয়েছিল। ইতিহাসখ্যাত মারাঠী ব্রাহ্মণ নানা ফাড়নাবিশ— দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে জীবন্ত মানুষকে ভূপ্রোথিত করেছিলেন, লোহাগড় দুর্গে।

সীমান্তবাঙলার অনার্যভাষী মানুষ কেমন করে আর্যভাষা গ্রহণ করেও অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর রীতি-নীতিকে সহজে ছাড়তে পারে নি, সে কথা বলা হয়েছে। আর্যভাষী এবং অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর মিলনের ফলে এই সব অঞ্চলের মধ্যে বিশেষ ধরনের এক আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং আঞ্চলিক আচার-বিচারের প্রচলন হয়েছে। করম, ইদ, বাঁধনা প্রভৃতি উৎসবের মধ্যে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মানভূম-ধলভূম অঞ্চলে সীমাবদ্ধ আর একটি উৎসব প্রসংগে আলোচনা করলে সীমান্তসংস্কৃতির আর একটি রূপ দেখতে পাওয়া যাবে। দেখতে পাওয়া যাবে অরণ্যচারী মানুষের আচার বিচার, দেবতুষ্টি প্রক্রিয়া কেমনভাবে সর্বত্র সমস্ত মানুষের মধ্যে তার স্থান করে নিয়েছে এবং কেমন ভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী তার পরিবর্তনও ঘটেছে।

ইঁদ পরব শেষ হলে জিতিয়া পরব, হিন্দুদের জীতাষ্টমী। ইঁদের ঠিক বারো দিন পরেই এই অনুষ্ঠান। হিন্দুদের ঘরে ঘরে জীতাষ্টমীর ব্রত করে মেয়েরা, ধলভূমের ঘাটশীলাতে ঠিক এই সময়েই সুরু হয় বিঁধা পরব। রংকিণী দেবীর মন্দিরে সেদিন বলিদানোৎসব এবং দ্বি-সপ্তাহব্যাপী মেলার প্রারম্ভ-দিবস। সীমান্ত অঞ্চলের খাড়িয়া, বীরহোড় প্রভৃতি অরণ্যচারী উপ-জাতিদের মধ্যে সেদিন জিতিয়া পরব। এদের জিতিয়া পরবের সংগে কোন কোন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে জীতাষ্টমীর প্রক্রিয়া পদ্ধতিতে। অবশ্য, বৈসাদৃশ্যই বেশী ক'রে পরিদৃষ্ট হয়।

হিন্দুদের ঘরে সেদিন জীমূতবাহনের পুজা, পুরোপুরি মেয়েলী ব্রতের পর্যায়ভুক্ত। জীমূতবাহনের নাম করে এই ব্রত উদযাপনের মধ্যে করে কি ভাবে সন্তান কামনা দেখা দিয়েছে কে জানে, কিন্তু এর প্রক্রিয়া পদ্ধতির মধ্যে তো বৃষ্টিকামনার চিত্রই ফুটে ওঠে। সেদিন গৃহাংগনে ছোট্ট পুকুর খুঁড়ে, তাতে জল ভরে দেয় মেয়েরা, দু একটা ছোট মাছও ছেড়ে দেওয়া হয় জলে। পুকুরের চারপাশে পুঁতে দেওয়া হয় কলাগাছ। তারপর সন্তান কামনায় জীমূতবাহনের পুজো করা হয়।

ছোটনাগপুরের বীবহোড় (=অরণ্যবাসী মানুষ) নামক উপজাতির মধ্যে ঠিক এই দিনটিতেই জীতাভূতেব পুজো কবা হয়। "জিতিয়া পিপুব"—অর্থাৎ অশ্বত্থগাছেব ডালের সংগে আবও কয়েকপ্রকার গাছের ডাল একত্র বেঁধে প্রোথিত করা হয় গৃহাংগনে এবং সেই প্রোথিত শাখাসমষ্টিকেই পুজো করা হয়। জিতাভূতকে সন্তুষ্ট করাব জন্য সবাই সেদিন উপবাস কবে থাকে। জিতাভূতকে সন্তুষ্ট না কবলে বৃষ্টি হয় না বলেই তাবা বিশ্বাস কবে থাকে। আগামী ফসলের জন্য, ঠিক এই সময়েই পর্যাপ্ত বৃষ্টিব প্রয়োজন, সে সময় বৃষ্টি না হলে ধানের শীষে দানা বাঁধে না।

ধলভূমেব খাড়িয়া (শবব) নামক উপজাতিও জিতিয়া পিপুবেব অর্চনা কবে। অনাবৃষ্টির হাত থেকে বক্ষা পাবার জন্যই এই জিতিয়া পবব। খাড়িয়া মেয়েবাই এ বিষয়ে অগ্রণী। পূজা শেষ হলে খাড়িয়া পুরুষেব দল, তীব-ধনুক নিয়ে শিকাবে বেবোয় দল বেঁধে। ভয়ঙ্কব বাঘ থেকে সুরু কবে নিরীহ শশক পর্যন্ত এদেব লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পাবে না সেদিন, ময়ূবভঞ্জেব বনপাহাড ছাড়িয়ে বুনো হাতীব পাল মাঝে মাঝে ধলভূমেব খাড়িয়াদের শস্যক্ষেত্র তছনছ কবে দিয়ে যায়, পাতাব কুঁড়েগুলোকে গুঁড়ো করে দিয়ে যায়। নীল পাহাড়েব উপত্যকায় দাঁড়িয়ে, মাঝে মাঝে শুঁড তুলে, তারা নিরীক্ষণ করে পাহাড়তলীব শস্যক্ষেত্র। বুনো মোষ, বুনো শূয়োব আব কালো কালো ভালুক ক্ষুব্ধ আক্রোশে ভেঙে ফেলে বন পাহাড। এদেব নিয়েই লোধা আব খাড়িয়াদের সংসাব। বর্ষার জন্য প্রার্থনা জানাবাব পর, বুনো জন্তুকে সাবধান কবে দেবাব জন্যই যেন এই শিকারোৎসব। জীতাপববের দিনে তাই দলে দলে খাড়িয়া আর লোধা অরণ্যরাজ্যের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দেয়,—তীব দিয়ে, কুড়ুল দিয়ে, টাঙ্গি দিয়ে।

এই খাড়িয়া জনতাই আবার ভূমিজ, সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সংগে দলে দলে সমবেত হয় ঘাটশীলাব বংকিণী দেবীর মন্দির প্রাংগণে। বনের পশুকে তীরবিদ্ধ করার পব, বিঁধা পবব উদ্‌যাপিত করে রাজপৃষ্ঠপোষকতায়। মানভূমের ভূমিজদের মধ্যেও এই বিঁধা পরব প্রচলিত, তবে ধলভূমের এই জনপর্বের সংগে তার মিল ততো ঘনিষ্ঠ নয়। মানভূমের ভূমিজরা 'ভেজাবিঁধা' নামক উৎসবে তীরন্দাজদের লক্ষ্যভেদ কৃতিত্বের যাচাই করে।

ধলভূমের বিঁধাপরব ক্রমশঃ বিলুপ্ত হতে চলেছে। জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির সংগে সংগে জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতাও ক্ষীণ হয়ে আসছে।

ধলভূমকে আজও বলা হয় বংকিণীভূমি। দেবী রংকিণী রক্ষিত ভূমিতে কালনাগিনী পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস করে না, এ ধরনের লোক-বিশ্বাস ধলভূমের সর্বত্র। এই দেবীর প্রতাপ সম্বন্ধে ভুলেও সন্দেহ প্রকাশ কেউ করে না। ধলভূম রাজবংশের কুলদেবী বংকিণী। বাঙলার মধ্যযুগীয় বহু কাব্যে এঁর নাম আছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চণ্ডীমংগল কাব্যে দেবদেবী বন্দনায় পশ্চিমবংগের অসংখ্য গ্রামদেবীর নাম করেছেন। বংকিণীর নামও বারবার উল্লেখ করেছেন তিনি।* বলা বাহুল্য, এককালে বংকিণীদেবীর প্রভাব যে পশ্চিমরাঢ় অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। সেই সংগে ধলভূমের 'মহুলিয়া' গ্রাম-ও অন্যান্য অনেক অঞ্চলে এতো বেশী পরিচিত হয়েছিল যার ফলে যেখানেই বংকিণী দেবীর মন্দির বা স্থান পাওয়া গেছে, সেই স্থানই মহুলিয়া বা মৌলা নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

যতদূর জানা গেছে, বর্ধমানের মৌলায় বংকিণী-স্থান আছে, চন্দ্রকোণার মৌলা নামক স্থানেও বংকিণীর অধিষ্ঠান আবার নন্দীগ্রাম-এর মৌলা নামক স্থানেও বংকিণী বিরাজিতা। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের শিলদা নামক স্থানেও বংকিণীর কাহিণী সুপ্রচলিত। শিলদাতেই বংকিণীর ভৈরব বিরাজিত। শিলদাতে এখনও 'বেঁদা' বা বিঁধা পরব অনুষ্ঠিত হয়। সীমান্তবাঙলার প্রায় সর্বত্রই এই 'রক্তমুখী' বংকিণীর অখণ্ড প্রতাপ ছিল। বর্তমানে, ঘাটশীলার বংকিণীই বিখ্যাত। ঘাটশীলাতে যে বিঁধা পরব অনুষ্ঠিত হয়, তার ক্রিয়াচারের আদিমরূপটি পরিবর্তিত হয়েছে কালক্রমে, না-হয় একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, বংকিণীদেবী নররক্ত পান না করে তৃপ্ত হতেন না। মহুলিয়ার নিকটবর্তী রংকিণী ডুংরি নামক ছোট্ট এক পাহাড়ে, বংকিণীদেবীর নামে নরবলি উৎসর্গ করা হতো। ধলভূমের আদিম উপজাতিদের সংগে এই দেবীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রাজ্যের সামাজিক ইতিহাসের সংগেও এই দেবীর যোগাযোগ অস্বীকৃত নয়। ধলভূমের এই জনপর্ব বংকিণী-কে তুষ্ট করার পর্ব।

---

*"রংকিণী বন্দিব যাঁর পুরী ঘাটশীলা।"
"মৌলায় রংকিণী বন্দো মস্তকের পাগে।"
"ইলিপুরের রংকিণীকে জোড় করি পাণি।"
"রক্তমুখী রংকিণী যে রক্ত পিল বসি।"

বলা বাহুল্য, বংকিণী সীমান্তবাঙ্লার গ্রামদেবী ছাড়া অন্য কিছু নয়, অরণ্যভূমিব রক্তমুখী এই দেবী, আদিম অধিবাসীদেরই, অসংখ্য গ্রামদেবতাদের অন্যতম এবং প্রসিদ্ধতম। মুকুন্দরাম চণ্ডীমংগল কাব্যে, পলাসাই, হিঙ্গুলাই, কালুরায়, মেলাই, বাশুলী, বারাহী, কামাববুড়ী, ডাকিনী-যোগিনী, বেতাই, খেপাই, হিডিমাই প্রভৃতি গ্রামদেবতাদেব সংগে বংকিণীব নামও উল্লেখ করেছেন। ধলভূমবাজবংশেব যে শাখা ঝাডগ্রাম মহকুমাব চিল্‌কীগডে বসবাস কবেন, তাঁদেব কুলদেবীও বংকিণী। চিল্‌কীগডেব বংকিণী-স্থানটি সাঁওতালদেব জাহেব স্থানেবই মতো। এখানে বংকিণীব কোনরূপ মূর্তি নেই, সিঁদূবলিপ্ত মাটিব হাতি ঘোডাতে বংকিণীব স্থান পূর্ণ। সীমান্তবাঙ্লাব প্রত্যেকটি গ্রামদেবতার থানেই এই ধবণেব হাতি ঘোডা বিদ্যমান এবং এ প্রসংগে এ কথাও মনে বাখা দবকাব যে সীমান্তবাঙ্লাব গ্রামদেবতাদেব অধিকাংশই গ্রামদেবী।

বংকিণী মোটেই শাস্ত্রসম্মত দেবী নয়। বংকিণী শব্দেব অর্থ হচ্ছে দবিদ্রা অথবা লুব্ধা। বংক (নির্ধন অথবা লোভী) শব্দেব সংগে স্ত্রী-লিংগ-বাচক ইনী প্রত্যয় যোগ কবে বংকিণী শব্দটি প্রতিপাদিত হয়েছে। ধলভূম ঝাডগ্রাম অঞ্চলে বাঁকা এবং বাঁকনী নামে 'লুব্ধ' এবং 'লুব্ধা' বাচক যে দুটি শব্দ পাওযা যায় তাও এই বংক-শব্দ-জাত।

বলা বাহুল্য, বক্তমুখী, বক্তলুব্ধা দেবী বংকিণীব বক্তভৃষ্ণা সম্পর্কে সীমান্ত-বাঙ্লায় অসংখ্য কাহিনী বিদ্যমান। এককালে নরবলি দিয়ে দেবীর তৃষ্ণা নিবাবণ কবতে হতো, আজকাল পশুবক্ত দিয়ে কবতে হয। এই অবণ্য-দেবীকে বাজবংশের কুলদেবী কবতে গিয়ে, ধলভূমেব বাজবংশ নিজেদেব ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ কবাব সংগে সংগে এই দেবীকেও হিন্দুদেবীতে পবিণত কবেছেন। বলা বাহুল্য সীমান্তবাঙ্লাব অনেক বাজবংশই উত্তবভাবতেব ধারা নগরকে তাঁদেব আদি বাসভূমি বলে নির্দেশ কবেছেন পববর্তী কালে। পঞ্চকোটেব রাজবংশও নাকি ধাবা নগবীর অধিবাসী। যাই হোক, বংকিণী দেবীকে ধারানগর থেকেই নিয়ে আসা হয বলে জনশ্রুতিও আছে[১], যদিও তা পুরোপুরি বানানো কথামাত্র।

১ কথিত আছে, বাংলা ৬৩৮ সালে, ধলভূমের আদিরাজা জগদ্দেব প্রমার জগন্নাথদেব, ধারানগর থেকে এসে, ধলভূম অধিকার করে ঘাটশীলায় রাজধানী স্থাপন করেন। সীমান্ত-বাঙলার অধিকাংশ রাজবংশের আদিকথায় যেমন, শ্রীক্ষেত্র গমনের কাহিনী আছে, জগন্নাথদেবের

একদা, সীমান্তবাঙলার বিভিন্নস্থানে রংকিণীদেবীর মন্দির ছিল। বর্তমানে ঘাটশীলার মন্দিরটিই সুপ্রসিদ্ধ ; অন্যান্য অনেক স্থানের মন্দিরের চিহ্ন আজকাল আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি প্রবাদ বাক্য আজও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মল্লভূম, শিখরভূম এবং ধলভূমের সর্বত্রই রংকিণীর প্রভাব ছিল অসামান্য।

ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পুরীতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, নীলাম্বর-পরিহিতা এক ষোড়শী যুবতী তাঁকে বলছে,—'তুমি আমার সঙ্গে এসো আমি তোমাকে এমন এক দেশের রাজা করে দোব, যে দেশে সোনার নদী (সুবর্ণরেখা) বয়ে যাচ্ছে। জগদ্দেব প্রমার (প্রথম জগন্নাথ ধবলদেব), স্বপ্ন দেখে, সেই সোনার দেশ খুঁজতে খুঁজতে ধলভূমে এসে সেই সোনার দেশকে দেখতে পান। পূর্ব ধলভূমের বহড়াগোড়া থানার বরাগাড়িয়া নামক গ্রামে এসে শ্যামচাঁদ ঘোষ নামে সদ্‌গোপ সমাজের এক বর্ধিষ্ণু কৃষকের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং শ্যামচাঁদের সহায়তায়, অভিরাম নামে এক রজকের সংগে যুদ্ধ করে তার অধিকৃত ধলভূম রাজ্য জয় করেন। তারপর ঘাটশীলায় রাজধানী স্থাপন করে তিনি আত্মীয়স্বজনদের সংগে মিলিত হবার জন্য পুনরায় ধারানগরীতে গমন করেন। তারপর সেখান থেকে ধলভূম আগমনেব সময় কুলদেবী কংকালীর মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা জানান, দেবী যেন তাঁর সংগে ধলভূমে আগমন করেন। ধলভূমের স্বর্গত কবি কৃষ্ণচন্দ্র রাউল তাঁর "ধলভূম বিবরণ" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন

দেবী বলে যাব আমি সংগেতে তোমার।
কিন্তু মম অগ্রে এক কর অংগীকাব॥
চলিতে চলিতে মোবে ফিবি না চাহিবে।
চাও যদি তথায় মোর বিগ্রহ বহিবে॥
মন্দির বানাযে মোর দিবে সেই স্থানে।
নিত্যপূজা হবে মোর তন্ত্রাদি বিধানে॥
এত বলি মৌন হইলেন মহেশ্বরী।
যাত্রা কৈলা নবপতি শুভ যাত্রা ধরি॥
অগ্রগামী হইয়া রাজা গমন করিলা।
কংকালী বালিকা বেশে পশ্চাতে চলিলা॥
কিছুদিনে ধলভূমে হৈলা উপস্থিত।
ঘাটশীলা হৈতে তিনক্রোশ দূরান্বিত॥
বিজন অরণ্য মধ্যে ছিল এক সর।
তথায় হৈল এক শব্দ ঘোরতর॥
শব্দ শুনি নরপতি পশ্চাতে ফিরিলা।
কংকালী দেবীর মূর্তি দেখিতে পাইলা॥
মহাবেশে মহাকালী মহুল তলায়।
বৃক্ষ অন্তরালে আছে উলংগিনী প্রায়॥

রংকিণীর 'রা' শোনা যেতো মল্লভূমে, পদচিহ্ন দেখা যেতো শিখরভূমে এবং সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হতো ধলভূমে : 'মল্লে রা, শিখরে পা, সাক্ষাৎ দেখবি তো ধলভূমে যা।' "ভৈরব-রংকিণী মাহাত্ম্য" নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ঝাড়গ্রাম (মলভূঁই নামক খ্যাত) অঞ্চলের শিলদা নামক গ্রামে (সাঁতভূঁই বা সামন্ত ভূমি শিলদা) রংকিণী-ভৈরবের অধিষ্ঠান, ভৈরবী রংকিণী থাকেন ধলভূমে। এককালে এই সমস্ত অঞ্চল যে একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে কথারও উল্লেখ আছে গ্রন্থটিতে।[১]

ঘাটশীলার রংকিণী মন্দিরে রংকিণীর মূর্তি আছে। একটি প্রস্তরখণ্ডকে অপটুহস্তে অষ্টভূজা মূর্তিতে রূপায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। সিঁদূরের প্রলেপ ভেদ করে অনেক চেষ্টায় দেবীকে খুঁজে নিতে হয়। দুর্গামন্ত্রে পূজা হয় দেবীর।[২] পাশে শিবঠাকুরও অবস্থান করছেন। এমনিভাবে অরণ্যভূমির রক্তমুখী গ্রামদেবী, হিন্দুদের শাস্ত্রীয় সিংহাসনে চেপে বসেছেন।

রংকিণী সম্পর্কে ধলভূম-মানভূমে অনেক লোক-কাহিনী সুপ্রচলিত। পুরুলিয়া জেলার 'পাড়া' গ্রামের সংগে এইরূপ একটি কাহিনীর স্মৃতি জড়িত। পাড়ার নিকটবর্তী 'বাগালিযার বন' আজো বিজয়ী বাগালের (রাখালের)

দেবী বলে নরপতি শুন মোর কথা।
আর না যাইব আমি রহিলাম হেথা॥
মন্দির বানায়ে মোর দাও ত্বরা করি।
দাসদাসী দেহ আর ব্রাহ্মণ পূজারী॥
মহুল বৃক্ষের তলে বিশ্রাম আমার।
মহুলিয়া নামে গ্রাম হইবে প্রচার॥
এখানে রহিব আমি প্রত্যক্ষ হইয়া।
ছয়শত পঞ্চত্রিংশ বৎসর ধরিয়া॥
আজি হইতে মোর নাম হইল রংকিণী।
যাও রাজা এবে তুমি নিজ রাজধানী॥

১ অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত 'ভৈরব-রংকিণী মাহাত্ম্য' গ্রন্থে বলা হয়েছে :
একই সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল ঘাটশীলা।
শিলদা-সাঁতভূঁই কালে পৃথক হইলা॥
ঘাটশীলা শিলান্তরে উৎপত্তি শিলদার।
সাঁতভূয়ে শ্রীকৈলাসে বসতি বাবার॥

২ ধ্যানমন্ত্রের একটি চরণ : "রক্তাঙ্গীং শববাহনাং সদম্ভুজাং ধ্যায়েৎ সদা রঙ্কিণীম্।"

উপাখ্যান স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। রংকিণী পূর্বে নাকি পঞ্চকোট রাজ্যেই অবস্থান করতেন: মানভূমই তাঁর আদি প্রতিষ্ঠা-ভূমি। 'পাড়া' গ্রামে অনেক পুরানো জৈন ও হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজও বর্তমান। একটি মন্দিরের ধারে বৃহৎ দুটি প্রস্তর স্তম্ভকে "রংকিণী-ঢেঁকির" অংশ হিসাবেই দেখানো হয় আজও। কথিত আছে, রক্তমুখী রংকিণী দেবীর সংগে পঞ্চকোটের রাজার এক চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুসারে প্রতিদিন একটি করে মানুষ রংকিণীর ভোগের জন্য উৎসর্গ করা হতো। অন্যথায় সমগ্র রাজ্যকেই বিনষ্ট করার ভয় দেখিয়েছিলেন রংকিণী। রংকিণীর কাছে প্রতিদিন যে মানুষ পাঠানো হতো, সেই মানুষকে ঢেঁকিতে পিষ্ট করে রংকিণী আত্মসাৎ করতেন। একদিন এক গৃহস্থের পালা এলো। নিরুপায় গৃহস্থ কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে পড়ল। গৃহস্থের কান্নায় বিগলিত হয়ে তার বাগাল বললো: কেঁদোনা কর্তা; আমিই যাচ্ছি তোমার বদলে। বলা বাহুল্য, গৃহস্থ খুশীই হলো। বাগাল তার প্রিয় দুইটি কুকুর নিয়ে এগিয়ে গেল বনপথ ধরে। বনের ধারেই রংকিণী রাক্ষসীর বাসা। যাবার সময় কোঁচড়ে করে ভাজা কলাই নিয়ে খেতে খেতে গেল। খুঁটের একপাশে কিছু লোহার কলাইও বেঁধে নিল। রংকিণীর মুখোমুখি হতে না হতেই, বাগালকে উদরস্থ করবার জন্য তেড়ে এলেন রংকিণী। বাগাল বললো: থামো, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন; আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না, স্বেচ্ছায় যখন এসেছি, তখন ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই, ধীরে সুস্থেই আমাকে খেও। —তার আগে বরং দুটি কলাই ভাজা খাও।— এই বলে, সেই লোহার কলাই রংকিণীর হাতে তুলে দিল বাগাল; আর নিজে কুড়মুড় করে আসল কলাই চিবুতে লাগল। রংকিণী সেই লোহার কলাই চিবুতে গিয়েই 'বাপ্' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ভয় হলো বাগালকে দেখে। নিশ্চয়ই অসীম শক্তিধর লোকটা, না হয় এতো শক্ত কলাই কুড়মুড় করে চিবুচ্ছে কি করে। রংকিণীর অবস্থা দেখে বাগাল বললো: কেমন! কলাই খেতে পারো না, মানুষ খাবে কি করে; বলেই তার তেজী দুটো কুকুরকে লেলিয়ে দিলো রংকিণীর দিকে, আর সংগে সংগে কুকুর দুটো ঝাঁপিয়ে পড়লো। এর পর বাগাল, সেই ঢেঁকির পাথর তুলে তাড়া করলো রংকিণীকে। ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাল রংকিণী; বাগালও পিছু ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত রংকিণীকে মানভূম সীমান্ত পার করে দিয়ে বিজয়ী বাগাল ফিরে এলো ঘরে। দেশের

বুক থেকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা রংকিণীভীতি চিরতরে দূরীভূত হলো। 'বাগালিয়ার বন' নাকি সেই বিজয়ী বাগাল বীরের স্মৃতিকেই রক্ষা করে চলেছে আজও।

এদিকে রংকিণী দেবী প্রাণভয়ে পালিয়ে এসে, ধলভূমের এক রজকের গৃহে আত্মগোপন ক'রে থাকেন। প্রবাদ আছে, ধলভূমের এক পাহাড়ী পথে, 'কাপড়গাদি ঘাটের' এক গুহায় রংকিণীকে সেই রজক লুকিয়ে রাখে।[১]

উপরিউক্ত কাহিনী থেকে অন্তত এই কথাই প্রমাণিত হবে যে রংকিণী আসলে ডাকিনী জাতীয়া অনার্য গ্রামদেবী। এই গ্রামদেবীর কাছে অসংখ্য নরবলি হতো। ধলভূম রাজবংশের কোন এক পুর্বপুরুষ অথবা রাজবংশেব সংগে সম্পর্কহীন কোন এক ব্যক্তি রংকিণী-মূর্তিকে মানভূম থেকে নিয়ে এসে 'মহুলিয়া' গ্রামের নিকটে এক পাহাড়ী গুহায় প্রতিষ্ঠিত করে, পরে গ্রাম সীমান্তে দেবীর মন্দিবও তৈরী করা হয়। ঘাটশীলা ও টাটানগরের মধ্যবর্তী গালুডি স্টেশনের অদূবে মহুলিয়া গ্রামে রংকিণীদেবীর যে মন্দির আছে সে মন্দিব অবশ্য খুব প্রাচীন নয়। পরে কোন এক সময় হয়তো মন্দিরটির সংস্কার করা হয়েছে। মন্দিরের মধ্যে কালীমূর্তি বিরাজিতা। মূর্তিটিও

১ রংকিণী সম্পর্কে কথিত আর একটি লোক-কাহিনীতে-ও রংকিণীর নররক্ত-প্রীতির কথা জানা যায়। মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর শহরের অনতিদূরে শ্রীক্ষেত্রগামী রাজপথের উপর পীর লোহানী নামে এক ফকিরের আস্তানা ছিল। পীর লোহানীর সমাধি সেখানে আজও বর্তমান। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এই সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। এই সমাধিস্থানের কিছুদূরে একটি ভাঙা মন্দির এখনো আছে। মন্দিরটি রংকিণীদেবীর। মন্দিরে এখন অবশ্য কোন দেবীমূর্তি নেই।

প্রবাদ আছে রংকিণীর তুষ্টিবিধানের জন্য প্রত্যেক গৃহস্থকে পালা করে এক একটি মানুষ পাঠাতে হতো। প্রেরিত মানুষটির ঘাড় মট্‌কে রংকিণী তার রক্ত পান করতেন। একদিন এক বিধবা নারীর পালা পড়ল; তার একমাত্র সন্তানকে পাঠাতে হবে রাক্ষসী দেবীর কাছে। আকুলভাবে বুক চাপড়ে মাথার চুল ছিঁড়ে কাঁদতে লাগল সে। পীর লোহানী সাহেব তার দুঃখে বিগলিত হয়ে, নিজে গিয়ে হাজির হলেন রংকিণী মন্দিরে। পীরের ধর্মবল আর বাহুবল সহ্য করতে না পেরে রংকিণী পালিয়ে গেলেন; যাবার সময় মন্দিরের চুড়োটা ভেঙে দিয়ে গেলেন। খড়্গাপুরের অরণ্য অঞ্চল ছেড়ে রংকিণী এসে আরও পশ্চিমের অরণ্যভূমিতে এক রজকের গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। রজককে রংকিণী পরে সেই দেশের রাজা করে দেন। ধোপার নাম অনুসারে সেই দেশের নাম হয় ধবলভূম বা ধলভূম।

এ কাহিনী থেকে এইটুকুই গ্রহণ করা যেতে পারে যে, পীর লোহানী সাহেবের প্রচেষ্টায় সে দেশে নরবলি প্রথা বিলুপ্ত হয়।

প্রাচীন নয় মোটেই। মহুলিয়ার পাশে বংকিণী ডুংরিতে তখন বংকিণীর নামে নরবলি দেওয়া হতো বলে জনশ্রুতি আছে।

এই বংকিণীকে অবলম্বন করে এককালে সারা সীমান্তবাঙলাতে যে সংখ্যাহীন নরমুণ্ড দেহচ্যুত হতো সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। আদিমজাতির প্রাধান্য এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে, তাদের প্রবর্তিত প্রথাকে হিন্দুধর্মী রাজারাও অমান্য করতে পারেন নি। অবশ্য নৃতাত্ত্বিক বিচারে সীমান্ত-বাঙলার অধিকাংশ রাজাই স্থানীয় অধিবাসীদের নায়ক হিসাবে বিধৃত।

কত প্রাচীনকাল থেকে যে বংকিণীকে নরবলিদানে পরিতৃপ্ত করা হতো, তার কোন প্রমাণ আজ ইতিহাসের পাতায় নেই, তবে নানা লোক-কথার ভেতর থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে অরণ্যভূমির এই ভয়ংকরী অনার্য দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য সংখ্যাহীন নরবলি সংঘটিত হয়েছে, অনেক শিশুর কচি মাথাও দেহচ্যুত হয়ে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে এবং উর্বরতা-বাদের (fertility rites) প্রথাকে টেনে নিয়ে এসেছে এই সেদিন পর্যন্ত।

অরণ্যপরিবেশে সীমান্তবাঙলার বুকে এই অরণ্যদেবীর প্রভাব মানুষের মনে দৃঢ়বদ্ধ ছিল অনেকদিন ধরে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই নরহত্যা অনিবার্যভাবে সংঘটিত হয়েছে। আদিম মানুষের বিশ্বাস নিয়ে এই সেদিন পর্যন্ত দেবীর তুষ্টিবিধান করা হয়েছে নররক্ত দিয়ে। এর মূলে ছিল রাজ্যব্যাপী প্রচুর ফসলের আকাঙ্ক্ষা। মানুষের তাজা রক্তে ভূমি-দেবতার তুষ্টিবিধান করলে ভূমি থেকে পর্যাপ্ত ফসল পাওয়া যাবে, এ বিশ্বাস বহু উপজাতির মধ্যেই শুধু বিদ্যমান নয়, হিন্দুধর্মী অনেক মানুষের মনেও তা সংগুপ্ত বিশ্বাস।

ঊনবিংশ শতকের কোন এক সময়, সিংভূমের জিলা-অধিকর্তা ডঃ উইলিয়াম হেজ মহুলিয়া থেকে বংকিণীকে ঘাটশীলাতে নিয়ে যাবার নির্দেশ জারী করেন। ধলভূম রাজবংশের একজন রাজা অষ্টম জগন্নাথ ধবলদেব তাই বাধ্য হয়ে বংকিণী মূর্তিকে ঘাটশীলার মন্দিরে স্থাপন করেন। তবে, ঘাটশীলার মন্দিরে বর্তমানে যে মূর্তি আছে, তা মহুলিয়ার আসল মূর্তি নয়, এ মূর্তিটি নির্মিত হয়েছে ১২৭৩ বঙ্গাব্দের পরে। জনশ্রুতি আছে, মহুলিয়ার মূর্তিটি ম্লেচ্ছস্পৃষ্ট হয়ে মহুলিয়া ত্যাগ করে চলে যায়। জনশ্রুতি যাই হোক্ না কেন, এই কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে ঘাটশীলার মন্দিরে নতুন মূর্তিস্থাপনের সময় মূর্তিটিকে অষ্টভূজা রূপে প্রকীর্তিত করার ইচ্ছা অষ্টম

জগন্নাথ ধবলদেবের মনে জাগরূক হয়েছিল। রংকিণী যে বন-পাহাড়ের অনার্য দেবী নন, তা প্রমাণ করতে হলে এ ধরনের কাজ করতেই হতো। ম্লেচ্ছ স্পর্শের কথা রটনা করলে, আসল মূর্তিকে অর্থাৎ একখণ্ড প্রস্তরকে পরিত্যাগ করার পক্ষে কোন বাধা থাকবে না, এ কথা জগন্নাথ দেব ভালো করেই বুঝতেন। ম্লেচ্ছস্পর্শ বলতে হেজ সাহেবের স্পর্শই বোঝায়। কয়েক জন প্রজা একবার হেজ সাহেবের কাছে রাজার বিরুদ্ধে নরবলিদানের অভিযোগ উপস্থিত করেছিল। ফলে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার জন্য হেজ সাহেব সদলে মহুলিয়া গ্রামে আসেন। রাজা অষ্টম জগন্নাথ দেব অভিযোগ অস্বীকাব করেন এবং হেজ সাহেবও নাকি রাজার বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রমাণ পান নি। তবে হেজ সাহেবকে নাকি বলা হয়েছিল যে, রংকিণী এমন জাগ্রতদেবী যে তাঁর কাছে নরবলি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, বংকিণী নিজেই খড়্গাঘাতে মানুষকে হত্যা কবেন।[১] অর্থাৎ কিনা, নরবলি দেওয়াব কথাটা বাজে কথা। হেজ সাহেব একথা শুনে একজন লোককে মন্দিবের মধ্যে সারারাত তালাবন্ধ কবে বাখেন। পরেব দিন সকালে লোকটাকে জীবিত অবস্থাতেই পাওয়া যায়।

—দুই—

এই রংকিণী দেবীর মন্দিবে জীতাষ্টমী তিথিতে জিতিয়া পববেব দিনে যে অনুষ্ঠান হয় তারই নাম বিঁধা পরব। আদিম জনমগুলীব শিকাব পবেব অভিনয় দিয়ে এর উদ্বোধন কিন্তু সত্যিকাবেব শিকার এতে নেই। একদা অরণ্যের মধ্যে মঞ্চ নির্মাণ কবে ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা-মহারাজা-লাল-ঠাকুর-সাহেবরা শিকার পর্ব উদ্‌যাপন করতেন। ভূমিজ-সাঁওতাল-হো-বীরহোড়-লোধা-খাড়িয়া-বাগাল প্রভৃতি উপজাতীয় জনমণ্ডলীর হট্টগোলে এবং নাকাড়ার নির্ঘোষে বন্যপ্রাণীরা যখন প্রাণভয়ে অরণ্য প্রকম্পিত ক'রে ছুটোছুটি করত, তখন মঞ্চ থেকে তীর নিক্ষেপ ক'রে অথবা বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে পশু হনন করা হতো। এ নিয়ম কোন ক্ষেত্রে আজও চলছে। কিন্তু বিঁধা পরবের উৎসব অরণ্যে নয়, লোকালয়ে, রংকিণী মন্দিরের প্রাংগণে। তবুও একে

১ আগে যে জনশ্রুতি বলা হয়েছে, তাতেও নরবলিদানের কথা বলা হয় নি বলা হয়েছে, রংকিণী নিজেই মানুষ ভক্ষণ করতেন।

অরণ্য-উৎসব ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করা চলে না। এ উৎসবের বর্বরতা শিকারে পশুবধ করার নৃশংসতা হতে পৃথক। অরণ্যে পশুবধ করার মধ্যে তবু একটা বীরত্বের দিক আছে; কিন্তু বিঁধা পরবে মোষকে তীরবিদ্ধ করার পরে নৃশংস হত্যা করার মধ্যে আরণ্য হিংস্রতা-ই সংগুপ্ত ছিল। বর্তমানে হত্যার রূপান্তর ঘটেছে বলিদানে।[১]

মন্দিরের অদূরে সুবর্ণরেখা নদী। বনপাহাড়ের বুক চিরে ভাটাইজোড়ের প্রণতি গ্রহণ করে নদী সুবর্ণরেখা উভয় তীরের বালুবেলায় সোনার রেখা ছড়িয়ে ধলভূম ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে মেদিনীপুরের দিকে, তারপর মেদিনীপুর ছাড়িয়ে উড়িষ্যার সীমান্ত ঘেঁসে নীলসমুদ্রের দিকে। নদীর দক্ষিণ তীরে সবুজ বনের কুঞ্জ-বীথি; আরও দক্ষিণে অচল শৃংখলে আবদ্ধ চলমান পাহাড়শ্রেণী, বামে বন্ধুর মাটির বুকে প্রাচীন ঘাটশীলা। শরতের সুবর্ণরেখা, কাশফুলের চামর দোলাচ্ছে উভয় তীরে। এমনি পরিবেশে লোকারণ্য পথঘাট, হাটতলা, মন্দিরের প্রাংগণ। হাজার হাজার ভূমিজ, লোধা, খাড়িয়া, আর সাঁওতাল, নাকাড়া আর মাদলের বোলে কাঁপিয়ে তুলছে সারা ধলভূমের মাটি। মন্দিরের একপাশে নির্মিত হয়েছে মঞ্চ। মঞ্চের চারিদিকে অসংখ্য মানুষ আগ্রহের সংগে অপেক্ষমাণ। জনতার হাতে ঝকঝকে ধারালো কুড়ুল আর চকচকে তীর।

দুটি পুষ্টদেহ 'কাড়া'কে (পুরুষ মোষ) এবারে নিয়ে আসা হবে, তারই জন্য প্রতীক্ষা করে আছে সবাই। উদ্দাম, বীর্যবান, রক্তচক্ষু, শক্তি-ধৃত মোষ গর্জন করছে ফোঁস ফোঁস করে। খুরের চাপে মাটি প্রায় টলমল; সাক্ষাৎ মহিষাসুর। ধুয়ে, মেজে, তেল মাখিয়ে মোষ দুটিকে চকচকে করে তোলা হয়েছে, গলায় ফুলের মালা, মাথায় সিঁদুর।

কিছুক্ষণ পরে দারুণ উল্লাসে বেজে উঠবে ঢাক ঢোল, কাড়া-নাকাড়া—

১ এই উৎসবে ছাগ বলিদানের প্রথা নেই; বলশালী পুরুষ মোষকে (কাড়া) দেবীর কাছে উৎসর্গ করা হয়। ভারতের বহু আদিম উপজাতির মধ্যে মহিষকে 'টোটেম' রূপে স্বীকৃতি দানের প্রথা বিদ্যমান। দক্ষিণ ভারতের 'টোড়া' উপজাতিদের কথা এ প্রসংগে স্মরণ করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, আদিমজাতির বিশ্বাস অনুসারে ছাগল বা মহিষ পাপহরণ করতে পারে।

প্রাচীন ভারতের হিন্দু সমাজে মহিষমাংস যে অভক্ষ্য ছিল না, মনুসংহিতা থেকে তা জানা যায়। 'দশমাসাংস্তু তৃপ্যন্তি বরাহমহিষামিষৈঃ'', মনুসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়।

ধুমসা-মাদল-সানাই-কাঁসি- বামশিঙা। বাজা আসছেন, বাজপুবোহিত আসছেন। জনতা উদ্বেল হয়ে উঠবে, ঢেউ দেখা দেবে জনসমুদ্রে।

মন্দিবে পূজা শেষ কবে বাজা আব পুবোহিত মঞ্চে আবোহণ কববেন। মঞ্চের কিছুদবে জনমণ্ডলীব বেষ্টনীতে আবদ্ধ হযে শূন্যদৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকবে দুটি মোষ।

তাবপব !

তাবপব, সাঁই কবে একটা শব্দ হবে। বাজা এবং পুবোহিত মঞ্চ থেকে তীববিদ্ধ কবেছেন মোষ দুটিকে। তীববিদ্ধ হবাব সংগে সংগেই ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত মোষ দুটি পবস্পবকে আক্রমণ কববে শিং বাগিয়ে। সংগে সংগে মেঘগর্জনে বেজে উঠবে নাকাড়া, আব জনমণ্ডলী থেকে ঝাকে ঝাকে তীব এসে লাগবে মোষ দুটিব কৃষ্ণাংগে। খুবই বিপজ্জনক খেলা সন্দেহ নেই। সতর্ক থাকতে হয় সবাইকে। পবিসব বাড়াতে হয় বংগভূমিব, না হয কখন কিভাবে বিপদ এসে পড়বে কে জানে। শিংয়েব আঘাতে অপঘাত মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে হতে পাবে। মোষ দুটিব গায়ে যত বেশী তীব এসে লাগে তত বেশী ক্ষিপ্ত হযে ব্যথাজর্জব বোষে আক্রমণ কবে পবস্পবকে, আসল শত্রুকে খুঁজে নিতে পাবে না কিছুতেই। তাবপব নিস্তেজ হয়ে কোন একটি মোষ হযত বা পথ খোঁজে পলাযনেব। কিন্তু কোথায় পথ ! চাবিদিকেই জনসমুদ্রেব বেষ্টনী। তাবপব একসময় নৃশংস আবেগে জনমণ্ডলীব একাংশ ঝাপিয়ে পড়ে মোষ দুটিব উপব। কুঠাব এবং টাঙ্গিব কোপ বসিযে, বণক্লান্ত হৃতশক্তি দুটি শৃংগীকে মৃত্যুব সীমানায় এগিয়ে দেয়। আহত প্রাণী দুটি অল্পক্ষণেব মধ্যেই গতপ্রাণ হযে লুটিয়ে পড়ে বংকিণীব মন্দিব প্রাংগণে। সাওতাল আব খাড়িযাব দল আনন্দধ্বনি কবতে কবতে মৃত মোষ দুটিকে প্রায় টুকবো টুকবো কবে ছিঁড়ে নেয় বংকিণীদেবীব প্রসাদী মাংস। হত্যালীলাব বীভৎস উল্লাসে সুবর্ণ বেখাব জল একবাব সাবিস্ময়ে থমকে দাড়ায়। অনেক দূবেব 'বংকিণীডুংবি', বিগত দিনেব নববলিব স্মৃতি বোমন্থন কবে বোধ হয়।[১]

১। বোম্বাই অঞ্চলের 'মহর'দের মধ্যে ঠিক এই জাতীয় প্রথা আছে—

"The Mihars of Bombay sacrifice a buffalo at the Dashera festival they lead it before the temple of Bhawani and the chief strikes it on the neck with a sword, thereupon it is hunted and struck with the hand or with a weapon in this way it is laden with the sins of those who succeed in touching it After being driven round the wall its head is struck off at the gate, a single stroke must suffice if the sacrifice is to be efficacious Then they fall upon the victim and tear it into pieces.

—Encyclopaedia of Ethics and religion

এই ধরনের অনুষ্ঠান অবশ্য এখন আর হয় না। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে অনুষ্ঠান রীতির পরিবর্তন হয়েছে। জিলা অধিকর্তার আদেশে এই হত্যা-লীলার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বর্তমানে, রাজা বা রাজপ্রতিনিধি অথবা রাজবংশীয় কেউ এসে তীর নিক্ষেপ করেন অর্গলবদ্ধ দুটি মোষের দেহে। তীরবিদ্ধ করার পর খড়্গাঘাতে তাদের স্কন্ধ দেহচ্যুত করা হয়। একটিমাত্র আঘাতেই মোষকে হত্যা করতে হয়। এক কোপে মুণ্ডচ্ছেদ না হলে বুঝতে হবে দেবী রংকিণী অসন্তুষ্টা হয়েছেন, যার ফলে রাজ্যের অমংগল ঘটতে পারে। কাটা মাথা নিয়ে তার রক্ত উৎসর্গ করা হয় দেবীকে। রক্তরঞ্জিত মন্দির এই বলির চিহ্ন বহন করে বহুদিন ধরে। মোষ দুটির মুণ্ডদেহকে যথারীতি সাঁওতাল এবং খাড়িয়া সম্প্রদায় ভোজের উদ্দেশ্যে নিয়ে যায়।

এরপর সন্ধ্যার আকাশ থেকে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার নেমে আসে। শালবনের বুকে একটা থমথমে ভাব জেগে ওঠে। দূরে একটা কালো ফিতার মতো নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে স্বর্ণরেখা, তার বুকের মধ্যে নিথর হয়ে থাকে বড় বড় পাথরের খণ্ড। সারা ধলভূম রাজ্য বোধ হয় রক্তমুখী রংকিণীর বীভৎস চেহারাকে মানসচক্ষে দেখে ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

॥ বাঁধনা পরব ॥

—এক—

"বড গংগায় আছে ভালা গোরু তোব বাপ গো -
ছোট গংগায় আছে গোক ভাই বে—
পাহাড পর্বতে আছে বাঁধনাবই পবব —
পবব কবে আনা গোনাবে—"

কবে, কোন প্রাচীন কালে ভাবতবর্ষে গো-অর্চনা প্রচলিত হয়েছিল, তাব হদিশ পাওয়া খুব সহজ নয়। অবশ্য এ কথা ধবে নেওয়া যেতে পাবে যে প্রাচীন ভাবতেব অনাযভাষী সমাজেই এব সূত্রপাত হয়েছিল। শুধু ভাবত বর্ষেই নয়, প্রাচীন ইবানে-ও যণ্ডপূজাব বীতি প্রচলিত ছিল বলে জানা গেছে।

ভাবতবর্ষেব সর্বত্রই গো-বন্দনাব উৎসব সুপ্রচলিত, তবু বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে এই উৎসব অনুষ্ঠানেব বিশেষ বিশেষ রূপ আছে। মানভূম ধলভূম ঝাডগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলেব মাহাতো বা কূর্মক্ষত্রিয সম্প্রদায অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর সংগে গো-বন্দনা এবং গো অচনাব মাধ্যমে বিশেষ একটি আঞ্চলিক উৎসব উদযাপিত কবে। এই উৎসবেবই প্রচলিত নাম 'বাঁধনা পবব', কোন কোন জায়গায় বলে কাডাখুঁটা বা গোকখুঁটা।

শুধু মানভূম-ধলভূম কেন, পশ্চিমবাঢেব পশ্চিমপ্রান্তেব সর্বত্র জুডে এই উৎসবপরিমণ্ডল। উত্তব-পশ্চিম মেদিনীপুব, মযবভঞ্জ-ধলভূম-মানভূম, পশ্চিম-বাঁকুডা, বিষ্ণুপুব, আসানসোল আব সীমান্ত বীবভূম নিয়ে এই উৎসব। কংকবময় রুক্ষ ভূমি, মাঝে মাঝে সবুজ দ্বীপেব মত শালবন আর অবাবিত স্বল্প-তৃণ প্রান্তব। এই প্রান্তভূমিব মধ্যে প্রাণস্পন্দন জাগবে কার্তিকী-অমাবস্যায়। নাকাডা আব মাদলেব নির্ঘোষে আগামী দিনেব ঘুমন্ত ফসলেব ঘুম ভাঙবে মাঠে মাঠে।

কঠিন মাটিব বুক চিরে এসব অঞ্চলে ফসল ফলাতে হয়। এ ব্যাপাবে শক্তিশালী গোরু এবং বজ্রদেহী কাডা (পুরুষ মোষ) হচ্ছে একমাত্র সহযোগী। তাই ঘবে ফসল থাকুক আব না থাকুক, 'বাঁধনা পবব' তাব জন্য আটকে থাকবে না। গোরু মাত্রেই ভগবতী। ভগবতীব অর্চনাব প্রকৃষ্ট তিথি হচ্ছে

দীপালী উৎসবের তিথি। রেনো মদ, হাঁড়িয়া অথবা মহুয়ার নির্যাস এই উৎসবের প্রধান উপকরণ। চাল গুঁড়ো করে রুটি তৈরী করা হবে অনিবার্য ভাবে, যার নাম হবে রুটি পিঠা। তারপর প্রত্যাশিত তিথিতে সুরু হবে বাঁধনা পরব। 'হামাদের বাঁধনা পরব আসিয়াঁছে।' ধিং ধিতাং ধিতাং দিং।

ভারতবর্ষে গো-বন্দনার রেওয়াজ যে অত্যন্ত প্রাচীন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হিন্দুশাস্ত্রসম্মত পঞ্জিকাকৃত গোপাষ্টমী তিথি, গো-বন্দনার জন্ম নির্দিষ্ট হয়ে থাকলেও বাঁধনা পরব এই তিথির অপেক্ষা করে না। কার্তিকী অমাবস্যাই একমাত্র নির্ধারিত তিথি।

'বাঁধনা' বা 'বাঁদনা' শব্দটি দু দিক থেকে বিশ্লেষিত করা যেতে পারে। এর মূলে বন্ধন এবং বন্দনা দুই থাকাই স্বাভাবিক। গোরু বা মোষকে খোটায় বেঁধে নাচানো হয় বলে এ উৎসবের নাম 'গোরু-বাঁধনা' হওয়া অস্বাভাবিক নয়, তবে সম্ভাব্য আরও একটি দিক দিয়ে বিচার করলে গো-বন্দনা বা গোরু পূজার কথাই মনে পড়বে।

সীমান্তবাঙলার কূর্মক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উৎসবের একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য আছে। বলা বাহুল্য, আর্যপূর্বযুগেও গো-খাদক জাতিগুলির মধ্যে গো বন্দনার রেওয়াজ ছিল, পরবর্তীকালে গো খাদক আর্যগণের মধ্যেও এর প্রচলন হয়েছিল। কোন কোন অভিমতে গোরুপূজাকে যাদু ক্রিয়াচারের অঙ্গীভূত বলে মনে করা হয়েছে।[১] পঞ্চগব্য, গোমূত্র প্রভৃতি যাদুক্রিয়ার সহায়ক বলেই পরিগণিত হতো। গোরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হওয়ার কল্পনার মধ্যেও কোন যাদু প্রভাবের ইংগিত আছে বলে অনেকে মনে করেন।

শুধু হিন্দু সমাজের মধ্যেই নয়, হিন্দুগোষ্ঠী-বহির্ভূত আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেও এই গো বন্দনার যে রূপটি বিদ্যমান তা মূলত একই উৎসবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সীমান্তবাঙলার নৃতাত্ত্বিক পর্যায়গুলির কথা স্মরণ রেখে, এ প্রসংগে সাওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে যে ধরণের গো-অর্চনার

১ 'The origin of the Hindu respect for the cow is an unsolved problem. Unlike Egypt it is clear that India developed a respect for the animal in historic times Of actual worship there is little to record ; but the Panchagabya are important factors in exorcism and magic."

Encyclopaedia of Ethics and Religion

রীতি বিদ্যমান, তার কথা অনিবার্যভাবেই এসে যাচ্ছে। এদের মধ্যে এ উৎসবের নাম 'সোহরাই'। 'সোহরাই' শব্দের অর্থ—কার্তিক মাস ঃ হিমঋতু। হিমঋতুর উৎসব বলেই এর নাম সোহরাই।

সাঁওতাল-পরগণা এবং সীমান্তবাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের, সাঁওতালদের মধ্যে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, কার্তিক মাসে নয়,—পৌষমাসে। কোন এক অজ্ঞাত অবলুপ্ত ইতিহাসের পাতা যদি খুঁজে পাওয়া যেত, তা হলে দেখা যেত যে, এই উৎসব সোহরাই বা কার্তিক মাসেই অনুষ্ঠিত হতো সাওতালদের মধ্যেও। 'কার্তিকেটান' অর্থাৎ কার্তিক মাসে স্বাভাবিক অন্নাভাবের কারণেই হয়ত, পৌষের শেষার্ধে এই উৎসবের প্রকৃষ্ট সময় বলে ধরে নেওয়া হলো। ফসল তোলার শেষে ঝাড়াই-মাড়াইয়ের শেষে গোরুকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দেওয়ার সুযোগ হয় বেশী, তা ছাড়া উৎসবের আদি উপকরণ খাদ্য সম্পর্কে ততখানি চিন্তিত হতে হয় না তখন। একদিকে পৌষসংক্রান্তির জন্য প্রস্তুতি পর্ব, অন্যদিকে সাওতালদের সোহরাই। ক্ষারমাটি দিয়ে মোটাকাপড়কে আর মোটা শাড়ীকে ধবধবে করা হবে। ওড়ক বোঙ্গা অর্থাৎ গৃহদেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য বলি দেওয়া হবে মুর্গী আর ছাগল। সাওতাল তরুণের দল নাকড়া আর মাদল নিয়ে সারারাত ধরে গ্রামের প্রত্যেকটি গৃহের গোয়ালে গিয়ে জাগিয়ে আসবে গোরু আর মোষকে। সাওতালী ভাষায় এর নাম 'জাগোয়া'। বাড়ীর মেয়েরা যে যার গোয়ালে পূজো করবে গোরু মোষ ছাগলকে। তারপর, উৎসবের তৃতীয় দিনে গ্রামের রাস্তার উপর বড় বড় খোটা পুঁতে বেঁধে দেওয়া হবে সুসজ্জিত সুমার্জিত গোরু মোষকে। এ কদিন নাচ গানের আর বিরাম থাকবে না। তরুণ-তরুণীর দল গাঁয়ের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত 'সোহরাই বাড়' বা 'সোহরাই' পর্বের বিশেষ নাচে উদ্বেল করে তুলবে সারা গ্রাম। শোনা গেছে, গ্রামের প্রধান নাকি এ সময়ে সবাইকে ডেকে নানান কথা বলে এবং সংগে সংগে অবাধ যৌন-মিলনের অনুমতি দান করে। অবশ্য, কয়েকটি অগম্যাক্ষেত্র সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞাও জারী করা হয়। গ্রামপ্রধানের কাছে যারা সমবেতভাবে কথা শোনে, অবাধ যৌনমিলনের অনুমতি লাভের পর তারা বলেঃ আমরা কানে দিয়েছি তুলো, এ সব কিছু শুনবো না, এসব কিছু বলব না, এ সব কিছু দেখব না। বলা বাহুল্য, সাঁওতাল সমাজের অনেকেই একে সামাজিক কলংক বলে মনে করেন এবং বর্তমানে তা রীতি-বিরুদ্ধ বলেও গণ্য হচ্ছে।

অরণ্যপর্বত-বেষ্টিত রাঁচির মনোরম উপত্যকায় এই সোহরাই পর্ব অনুষ্ঠিত হয় কার্তিক মাসেই। সীমান্তবাঙলায় কার্তিকী অমাবস্যাকেই যেমন গো-অর্চনার প্রকৃষ্ট তিথি বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, রাঁচির ওরাওঁ মুণ্ডাদের মধ্যেও এই তিথির প্রচলন বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার করে। এ প্রসংগে একথা জানা দরকার যে হিন্দুদের মতো এরা গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিমান নয়, গোমাংস এদের কাছে সুখাদ্য রূপেই গৃহীত এবং এই কারণেই এদের গো-বন্দনায় হিন্দুদের মতো গভীর ভক্তিশ্রদ্ধার অভাব-ও পরিলক্ষিত হয়। তবে গোরুকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত না করলেও গোরুর প্রতি এদের যে স্বাভাবিক প্রীতি আছে তা সহযোগী শ্রমিকের প্রতি প্রীতি। ফসল ফলানোর জন্য গোরু মোষের প্রয়োজনীয়তার কথা এরা বোঝে এবং সংগে সংগে উর্বর ক্ষেত্রে বীজবপনের জন্য যাদু ক্রিয়াচারের প্রতীক হিসাবেও এরা গোরু মোষকে সম্মান দেয়। এই তিথিতে গোরু মোষের সেবা শুশ্রূষা করাও এদের ধর্ম হয়ে ওঠে আর গো-স্বামী "গোরেয়া ভূতের" নিকট মংগলকামনা করা সোহরাই পর্বের প্রাবস্তিক অংগ রূপেই দেখা দেয়। সমস্ত গোরুর ভালমন্দের হর্তাকর্তা হচ্ছে গোরেয়া ভূত। এই গোরেয়া ভূতের পূজার্চনার রীতি যে অত্যন্ত প্রাচীন আর্য পূর্বযুগেও যে প্রচলিত ছিল, এমন কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। কারণ একথা তো সম্পূর্ণ সত্য যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে গো-বন্দনার রীতি ব্রাত্যধর্মেরই অংগীভূত ছিল। বৈদিক আর্যগণ যে গো-পূজক ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ আমরা পাই নি। পরবর্তীকালে আর্যগণ ব্রাত্যধর্মীদের নিকট থেকে গো-বন্দনা গ্রহণ ক'রে তার সংগে অনেক পৌরাণিক আখ্যান সংযোজিত করছেন বলে মনে হয়।

ওরাওঁ মুণ্ডাদের অরণ্য-পাহাড়ে গোরেয়া ভূতের অবস্থান। রাঁচি জেলার অরণ্যময় ভূভাগ, পর্বতবেষ্টিত অঞ্চল। শালবনের বুক কাঁপিয়ে এখানে বাঘ ডাকে। ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে থাকে বিষধর সাপ। এই পরিবেশেই শাল-বনের পাশে গোরু মোষকে আহার খুঁজে বেড়াতে হয়। কখন যে রক্তচক্ষু বাঘ এসে এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, কে জানে! এদের অজান্তে কখন যে এদের সর্বাংগে মৃত্যুবিষ ছড়িয়ে দেবে বিষধর সাপ, তাও বা জানা আছে কার! কে এদের বাঁচাবে বিপদ থেকে! একমাত্র গোরেয়া দেবতাই ভরসা।

বিহারের গয়া হাজারীবাগ প্রভৃতি অঞ্চলের দোসাদ এবং গোয়ালারাও

এই গোবেয়া দেবতাকে মানে। না মানলে গোরু বাঁচবে না, মোষ বাঁচবে না, এই তাদেব বিশ্বাস। ওবাও মুণ্ডা এবং অন্যান্য কয়েকটি সম্প্রদায়েব প্রত্যেক গোয়ালে তাই গোবেয়া দেবতাব প্রতীক হিসাবে গোবেয়া-খুঁটো পুঁতে, সেই খুঁটোব পুজো কবা হয়। উত্তব মানভূম অঞ্চলে বর্ণহিন্দুবা-ও এই প্রথাকে গ্রহণ কবেছে। মানভূম ধলভূম ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে এই পর্বটিব অন্যতম নাম কাড়াখুঁটা বা গোরুখুঁটা। এই খুঁটা গোবেয়া খুঁটাবই প্রতীক ছাড়া অন্য কিছু নয়। উন্মুক্ত প্রান্তবে অথবা গ্রামপথেব উপব যে খুঁটি পুঁতে গোরু বা মোষকে বেঁধে দেওয়া হয়, সে খুঁটিব উৎস বয়েছে ওবাওঁ মুণ্ডা গোষ্ঠীব মধ্যেই। এ-সব অঞ্চলে গোবেয়া নেই, খুঁটি আছে। তবে ধানবাদ অঞ্চলে গোবেয়া দেবতাব নাম পাওয়া যায়।

মুণ্ডা সমাজেব যে কোন উৎসবে 'পাহান' বা পুবোহিতই কর্মধাবক, ধর্মধাবক। সোহবাই উৎসবে কিন্তু পাহানেব বিশেষ কোন অধিকাব নেই। প্রত্যেক বাড়ীব কর্তাই নিজেদেব গোয়ালে পৌবোহিত্য কবে থাকে।

গোবেয়া পূজোব ঠিক এক সপ্তাহ পূব থেকেই গোরু-বাছুব ছাগল-ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুব উপব বিশেষ যত্ন নেওয়া আবম্ভ হয়। বলা বাহুল্য, সাবা বছব ধবে এই সব তৃণভোজী প্রাণীগুলি নিজেদেব চেষ্টায মাঠ থেকে খাদ্য আহবণ কবে এসেছে, এই কদিন এদেব আব বাইবে যেতে হবে না, গৃহকর্তাই খাদ্যযোগানব জন্য সচেষ্ট হবে। এ কদিন কোন কাজ দেওযা হবে না তাদেব। যদিও বা দেওযা হয়, পূজোব ঠিক তিন দিন আগে থেকে তো সম্পূর্ণ কর্মবিবতিব পালা। এব মধ্যেই ভাঙা গোযালে নতুন খড় চাপান হবে, মেবামত কবা হবে দেওয়াল, লেপেপুঁছে তকতকে কবে দেওযা হবে গোরু-মোষেব আবাস। সন্ধ্যেব সময় জ্বেলে দেওযা হবে মৃৎপ্রদীপ। মৃৎপ্রদীপে ঢেলে দেওয়া হবে সুবগুজা তেল, অভাবে কুজুবী তেল। এই তিন দিন ধবে তেল মাখানো হবে, গোরু মোষ ছাগল-ভেড়ার পিঠে, কাঁধে আব কপালে। জোয়ালক্ষত কড়াপড়া কাঁধ তেলে জবজব কববে। কাঁচাধানেব শীস্ ছিঁড়ে তৈবী হবে মুকুট আব সিঁথলী। পবিয়ে দেওয়া হবে গোরুব মাথায় আর কপালে। অমাবস্যাব তিথি শেষ হলে প্রতিপদের প্রভাতে, গৃহকর্তা গোয়ালে প্রোথিত করবে গোবেয়া খুঁটো। সেই খুঁটোকে পূজো কবে মুর্গী বলি দিয়ে গৃহকর্তা প্রার্থনা কববে :

হে গোবেয়া, একটি বছব পরে আবাব তুমি এলে।
তোমাব পূজো কবছি আমি,
তোমাকে উৎসর্গ কবছি মুবগীব বক্ত।
এক বছব ধবে বক্ষা করেছ তুমি—
আমাব গোরু-মোষ-ছাগল আব ভেডাকে,
এ বছব তুমি তাদেব বক্ষা কবো।
যখন তাবা জলপান কবে, তাদেব গলায় যেন কিছু না
আটকায়।
বন-জংগলেব কাঁটা যেন তাদের পায়ে না ফোটে,
বাঘ আব সাপেব
আক্রমণ থেকে তাবা যেন বাচে।

প্রার্থনাব পব মুবগী কেটে সেই বক্ত ছডিয়ে দেওযা হবে গোবেযা খুঁটোব উপব। মবগীব হৃৎপিণ্ড আব যকৃৎ মিশিযে চালেব পিঠে তৈবী কবে, সেই পিঠেও নিবেদন কবা হয। এব পব গোরুব ভোজ। বিকেলে সব গোরু-মোষকে সুসজ্জিত কবে নাকাডা আব মাদল বাজিয়ে গ্রামপথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিযে যাওবা হবে, শোভাযাত্রা সহকাবে।

এই প্রসংগে গযা জেলাব গোয়ালাদেব মধ্যে অনুষ্ঠিত অনুরূপ উৎসবেব কিছুটা জেনে বাখা ভালো। এদেব উৎসবও কার্তিক মাসে। পূজোব দিনে এবা 'বাসাওযা' নামক দেবতাব পুজো কবে। ককুদ থেকে জটা বেবিয়েছে বা পঞ্চপদ বিশিষ্ট বা দু তিনটি গলকম্বল বিশিষ্ট এক ধবনেব ষাঁডকে নিয়ে বাস্তাঘাটে, গ্রাম নগবে, এক শ্রেণীব লোকে জীবিকা নির্বাহ কবে পোষ মানিয়ে, তাকেই বলে "বাসোয়া বলদ"। বাসোয়া শব্দেব আদিরূপ কিন্তু বৃষভ। 'বাসওয়াঁ' ও সেই 'বৃষভ' দেবতা। কার্তিকেব সেই পূজোব বাত্রে 'বাসওযাঁ' কে দুধেব ক্ষীব উৎসর্গ কবা হয। সকালে সব গাই বাছুব বলদ গোরুব শিঙে তেল মাখানো হয, গায়ে দেওযা হয বং বেবংয়েব ছাপ। বিকেলে সমস্ত শৃঙ্গীকে একত্র কবে নিয়ে যাওযা হয় কোন এক উন্মুক্ত প্রান্তবে। সেখানে সেই পালেব মধ্যে ছেডে দেওয়া হয একটি শকব, যাকে শিঙেব আঘাতে জর্জবিত কবে হত্যা কবে তাবা।

—দুই—

প্রত্যন্ত রাঢ়ের বাঁধনা পরবের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

আগেই প্রস্তুতি পর্ব।

গো-বন্দনার জন্য দরকার হবে গুড়পিঠে, তেল, সিঁদুর, হলুদ। ক'দিন ধরে ঘাস খড়-খোল-ভূষি খাইয়ে গোরু মোষকে চরম তৃপ্তিদান করতে হবে, পেটের একটি কোণও যেন খালি না থাকে। শালুক ফুল তুলে আনতে হবে ডাঁটাশুদ্ধ। শালুক ফুলের মালা চাই-ই। ঝুলিয়ে দিতে হবে গোরুর গলায়, বেঁধে দিতে হবে শিঙের দুপাশে, কপালের উপর একটি শালুক কুঁড়ি যেন দুলতে থাকে। ধুয়ে মুছে চকচকে করে দিতে হবে সর্বাঙ্গ। তেলে চুপিয়ে দিতে হবে শিং আর কাঁধ। কপালে হলুদ আর সিঁদুরের ফোঁটা। গায়ে বিচিত্র বর্ণের ছাপ।

দৈন্যের দায়ে বন্ধক রেখেছ গরু মোষ? যে কোন উপায়ে, হাতে পায়ে ধরে অন্তত দুটি দিনের জন্য নিয়ে এসো। লক্ষ্মীছাড়া হয়ে থাকতে নেই এ সময়। গো লক্ষ্মী। মেয়ে-জামাইকে ডাক দাও আদর করে। ওদের নতুন জামাকাপড় দাও। দিতেই হবে। মেয়েরা পাড় দিক ঢেঁকিতে চালের গুঁড়ো তৈরী করুক।

পারো তো গৃহিণীর জন্য লালপেড়ে শাড়ী নিয়ে এসো একখানি। সেই যে হ তো এ উৎসবের পূজারিণী। গো-সেবা, গো-বন্দনার ভার গৃহিণীর। না হলে গৃহে লক্ষ্মী থাকেন না। পুরুষরা তো মদ খেয়ে মাদল বাজিয়ে নাচবে আর গান গেয়ে হৈ হুল্লোড় করবে দিন কয়েক।

অমাবস্যার রাত, জাগরণের রাত।

গান গেয়ে, মাদল বাজিয়ে, নাকাড়া বাজিয়ে গোরুকে অভিনন্দন জানান হবে। এ কাজ যুবকদের—গো-বন্দনাকারীদের।

সূচীভেদ্য অন্ধকারে ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সেদিন আলোকসজ্জা আর কালীপুজো। এখানে কিন্তু ঠিক তা নয়। সন্ধ্যের আগেই সেরে নিতে হবে 'গেরাম দেবতার' পুজো, 'বড়ামঠাকুরের পুজো'। 'গেরাম দেবতার' পুজো সর্বাগ্রে। গ্রামের ভালমন্দের অনেকখানি নির্ভর করে তাঁর ওপর। গেরাম দেবতা যেন সিদ্ধিদাতা গণেশ্বর। এঁর পরে অন্য সকলের পুজো। এ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তেই 'গেরাম-থান'। বড়াম ঠাকুরও থাকেন বিশেষ করে সাওতালদের গ্রামে।

দুধ-গুড়-আতপচাল-সিঁদুর-ঘি-ধূপ-ধুনো সবই লাগে এই পুজোয়। পুজো করবে 'লায়া'। কেউ কেউ দেহুরিও বলে। দেবগৃহ থেকে দেহরি বা দেহুরি। লায়া শব্দের অর্থও পূজারী। পুজোর উপকরণের সংগে একটা ডিমও থাকবে, হাঁস বা মুরগীর, অভাবে চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী করা ডিম্বাকৃতি একটা পদার্থ। পুজো শেষ হলে সেই ডিমটিকে কিছু দূরে ফেলে রেখে গোরুর পালকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। যে গোরুটি সেই ডিমটিকে মাড়িয়ে যাবে, সে গোরু হচ্ছে ভাগ্যবানের গোরু। সেই গোরুকে পরানো হবে কাঁচা ধানের মুকুট—ক্ষেত থেকে ছিঁড়ে আনা নোতুন ধানের মৌড়। এরপর প্রসাদ বিতরণ। মুড়কি আর গুড়ের মিষ্টি। এবারে ভাগ্যবান কে? যার গোরু ডিম মাড়িয়েছে। ঘাড়ে তুলে হৈ চৈ করতে করতে গাঁয়ের দিকে পা বাড়াবে সবাই—চলো ভাগ্যবানের বাড়ী। যথারীতি সকলকে হাঁড়িয়া, পিঠে ইত্যাদি সামর্থ্য অনুসারে পরিবেষণ করবে সে।

অমাবস্যায় আলোকসজ্জা হবে না, তবে দীপ জ্বলবে গোয়ালে গোয়ালে। আর সারারাত ধরে মেঘ নির্ঘোষের মতো বাজতে থাকবে নাকাড়া, কাঁসি, বাঁশি, মাদল। নাচ চলবে সূক্ষ্ম পদব্যঞ্জনায়। দলে দলে তরুণ বেরিয়ে পড়বে গাঁয়ের প্রতিঘরে গোরুকে জাগিয়ে তুলতে হবে। উরর—ধিং রিতাং ধিতাং তাং। টিং টিং টিটিং টিং। গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম গুম। মাদল—কাঁসি আর ধুমসা বা নাকাড়া।

প্রত্যেকের গোয়ালের সামনে সারারাত ধরে জ্বলবে মাটির প্রদীপ, অন্ধকার আকাশে যেন তারা জ্বলছে। 'দিকু'[১] প্রতিবেশীদের গোয়ালেও জ্বলবে প্রদীপ যেমন জ্বলবে অহিন্দু বা হিন্দুভাবাপন্ন আদিবাসীদের গোয়ালে। গোটারাত ধরে অক্লান্তভাবে নাড়া ও তাজা সবুজ ঘাস চিবিয়ে রোমন্থন করতে থাকবে গো-পাল। তেল চকচকে শিং গুলো পিদিমের আলোতে চিকচিক করে উঠবে। গলায় ফুলের মালা, মাথায় পুজোর সিঁদুর। গোরু আজ দেবতা সহযোগী বন্ধু যেন অতিথি নারায়ণ।

কিন্তু এত বিশেষ দিনটিতেই বা কেন এই গো-বন্দনা? রোদে জলে অক্লান্তভাবে গোরু মোষের দল সেবা করেছে মানুষের, তাদের ফসল ফলিয়েছে নিজেদের কাঁধে জোয়াল বহন করে। লাঙল টেনেছে, গাড়ী টেনেছে আর এই সেবার ফলস্বরূপ যা পেয়েছে তাতো সকলেরই জানা। তা পুরস্কার নয়

১ হিন্দু, বিদেশী

তিরস্কার ; হার নয় প্রহার। এমনি ভাগ্য গোরুদের, তবুও খাটতে হবে মানুষেরই ঘরে। ধনবাদী মানুষ ধন সঞ্চয় করে, শ্রমজীবী গো-কুলের শ্রম কুড়িয়ে। কিন্তু এমনি অকৃতজ্ঞ তারা, শরীর ভেঙে পড়লে বুড়িয়ে গেলে বিক্রি করে দেয় গো-মাংসভোজীদের কাছে। এই তো তাদের জীবন—!

এই উৎসব সম্পর্কে সুন্দর একটি লোক-কথা প্রচলিত আছে।

"বহু প্রাচীন কালের কথা, সে কালের গাছ পাথরও নেই আজ, সেই কালের কথা। গোরু-মোষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর দল একদিন ধর্মঘট করে বসলো। কি ? না,—আমরা আর মানুষের ঘরে খাটবো না।

তা হলে তো সৃষ্টি অচল। তাও কি হয় নাকি ? না খাটলে মানুষ বাঁচবে কি করে। সৃষ্টি যে রসাতলে যাবে।

তা যাক্ গে সৃষ্টি রসাতলে, আমাদের খাটুনির কে-ই বা দাম দেয়। দিনরাত ধরে খাটি আমরা, রোদে-জলে হিম্‌সিম খেয়ে লাঙল টানি আমরা, পেটের খিদে আর পিঠের বাড়ি দুইই সহ্য করে কাজ করে যাই আমরা, পরিবর্তে কি পাই ? পাই একমুঠো শুক্‌নো খড়, বড় জোর কুঁড়ো ভূষি। সারাদিন খাটুনির পর যখন ঝিমিয়ে পড়ি তখন কি ঐ সব বস্তু মুখে তুলতে ইচ্ছে করে ? শুক্‌নো খড় তো দাঁতে কাটতেও কষ্ট হয়। বোঝার পর বোঝা চাপিয়ে গাড়ীতে জুড়ে দেবে আমাদের, না হয় ছালা চাপিয়ে দেবে পিঠের ওপর। নিরুপায় হয়ে সবই সহ্য করি আমরা। এও না হয় হলো, কিন্তু বেঁধেছেদে সবটুকু দুধ দুয়ে নেয় ওরা আমাদের, বাচ্চারা দুধ না পেয়ে শুকিয়ে প্যাকাটি হয়ে যায়।—নাঃ, আমরা কিছুতেই খাটবো না মানুষের ঘরে। আজ থেকে সব বন্ধ, সর্বাত্মক ধর্মঘট।

কথাটা শুনতে পেলেন মহাদেব।

সবাই মিলে সেই একই অভিযোগ পেশ করলো মহাদেবের দরবারে। মহাদেব বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললেন : এতো অধীর হলে চলবে কি করে বাছারা ! এই দেখোনা, আমার বাহনও তো তোমাদেরই জাত ভাই, সে কেমন ধীর স্থির শান্ত। তোমাদের সব কথাই তো আমি শুনলুম। তবে, আমি একবার সরেজমিন তদন্ত করতে চাই। অমাবস্যার রাতে গভীর অন্ধকারে লুকিয়ে আমি যাবো। নিজের চোখে তোমাদের অভিযোগের সত্যতা আমি দেখে আসব। কথাটা সত্য কি মিথ্যে, তা নিজের চোখে না দেখলে কি করে বিশ্বাস করি বল ; আর খামোখা না-জেনে না-শুনে না-দেখে মানুষকেই বা

শাস্তি দিই কি করে বল, ওটা তো দেবতার কাজ নয়। ধর্মঘট স্থগিত রাখ তোমরা। মানুষ যদি অপরাধ করে থাকে, তা হলে নিজে আমি তাদের শাস্তি দোব।

মহাদেবের কথামত যে যার কাজে যোগ দিল আবার।

গোরুদের ফিসফিসানি কানে গেল মানুষের। বুদ্ধিমান জাত কি না, কি করে পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙে খেতে হয়, বেশ ভাল করেই জানে তারা। মতলব আঁটলো মানুষ, জব্দ করতে হবে গোরুর ধৃষ্টবুদ্ধিকে। স্পর্ধা তো কম নয়, নালিশ করলো কিনা খোদ মহাদেবের কাছে! আর মহাদেব যদি রাগেন, তা হলে কি আর রক্ষে আছে!

অমাবস্যার রাতে, ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করা হলো গোরু-মোষকে, ছাগল-ভেড়াকে পর্যন্ত। মাথায় সিঁদুর, শিঙে তেল, গোয়ালে প্রদীপ, তাতে জাব্‌না। প্রাণভরে উদরপূর্তির কাজে লেগে গেল ওরা, মনেও পড়লো না যে মহাদেব আসবেন তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণে।

গভীর রাত্রে, অন্ধকারে গা ঢেকে মহাদেব এলেন ষাঁড়ের পিঠে চড়ে। এসে যা দেখলেন, তাতে অকৃতজ্ঞ গোরুদের ওপর রাগ বেড়ে গেল তাঁর। রাগলে কি আর রক্ষে আছে! মাথার জটা পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠলো পশুপতির। হিস্ হিস করতে লাগল গলার সাপ।

অভিশাপ দিয়ে ফিরে গেলেন কৈলাসে: চিরকাল তোদের খাটতে হবে মানুষের ঘরে। মানুষকে আশীর্বাদ করে গেলেন: লক্ষ্মীলাভ হোক।

সেই দিন থেকে গো-সেবা, গো-বন্দনার রেওয়াজ চলে আসছে অমাবস্যার অন্ধকারে। মানুষের কূটনীতির বিজয় স্মৃতি।'

এ তো গেল কাহিনী।

অমাবস্যার অন্ধকার রাতে মিট মিট করে প্রদীপ জ্বলছে গোয়ালে। সারারাত ধরে গান গেয়ে গো-লক্ষ্মীকে জাগিয়ে তুলবে বন্দনাকারীর দল, বাড়ী বাড়ী ঘুরে। এর জন্য পয়সা পাবে, সিধে পাবে তারা।

এসে গান ধরবে তারা:—

জাগো মা লক্ষ্মীনি জাগো মা ভগবতী
আজি তো অমাবস্যা রাতি
জাগেকা প্রতিফল দিবে গো মহাদেবে
পাঁচপুতায় দশধেনু গাইবে—।

তার পর মাদলের বোলে আর ঢোলের আওয়াজে গমগম করে উঠবে গ্রাম। উচ্চকিত, উৎকর্ণ হয়ে উঠবে গোয়াল। মহুয়াব নেশায় হেলেদুলে, বিচিত্র ভঙ্গীতে, কানে হাত দিয়ে, ও সুরে টান দিয়ে—আবাব তাবা গেয়ে উঠবে ঃ

ঈশ্বরে —মহাদেবে কহি না পাঠাল গো
গোয়ালে গোয়ালে গেয়া জাগাতে—
জাগেকা প্রতিফল দেবে গো মহাদেবে
পাঁচপুতায দশধেনু গাইবে—

উ র্ র্ র্—ধিং ধিতাং ধিতাং তাং।

কি অর্থ এ গানের! এ গানে শুধু গো-লক্ষ্মীকেই যে জেগে থাকতে বলা হচ্ছে, তা নয়, এতে বোধ হয় গৃহস্বামী এবং গৃহকর্ত্রীকেও জেগে থাকতে বলা হচ্ছে। তা হলেই পাওয়া যাবে ঈশ্বব মহাদেবেব আশীর্বাদ: পাঁচ ছেলে থাকলে পাওয়া যাবে দশটি গাভী। জাগবণেব রাত্রে শুধু যে প্রত্যেক গৃহস্থেব গোয়ালেই গান গাওযা হয়, তা নয, এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী যাওয়ার পথেও বিরতি হয না গানের। এমনি কবে কেটে যাবে রাত, মুরগী ডাকবে ঘরের চালে ককর্ কোঁ কবে। অন্ধকারের পর্দা পাতলা হয়ে যাবে ক্রমশ। সকালে গোয়াল পুজো। মাহাতো সম্প্রদায়েব পুজো তুলসী তলায় আগে, তাবপব গোয়ালে। সাঁওতাল ভূমিজদের মুবগী বলি 'বড়াম' থানে বা 'জাহের' থানে। বেলা বারোটাব মধ্যে চুকে যাবে পুজো পাট। এবার ডাক দিতে হবে আশে-পাশের ভাই বন্ধু আত্মীয়স্বজন—পাড়া প্রতিবেশীদেব। ধুমধাম কবে ভোজ হবে। মহুযার নির্যাস আব পেনো মদেব ছড়াছড়ি পড়ে যাবে। মুর্গী বা পাঠার মাংস আর চালেব গুঁড়ো থেকে তৈরী রুটি পিঠে, গুড় পিঠে, ছাকা পিঠে, প্রভৃতি প্রধান খাদ্য সেদিন। অবিশ্যি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারেব খাদ্য। মদ আর মাংসই হচ্ছে আসল। ইচ্ছে করলে মালপো-ও পাওযা যাবে, আব পাওয়া যাবে 'গাইপিঠা'। চালের গুঁড়ো আব গুড় মিশিয়ে বড়ার মতো কবে তৈবী কবা এক জাতীয় পিঠে, গোরুকে খাওয়ানো হয।

গড়িয়ে যাবে দুপুব। আসবে বিকেল। বিকেলেই আসল পরব। উদ্দাম উৎসব। নাচগানেব ধুম পড়ে যাবে। উৎসব কয়েকদিন ধরেই চলবে, একদিনে শেষ হবে না। এ কদিন গোরু মোষের পরিপূর্ণ বিশ্রাম। যত্ন আত্তির চূড়ান্ত। পুজো করা হবে, আরতি করা হবে সন্ধ্যায়। পুজো

করা হবে লাঙল জোয়ালেরও। পুজো শেষ করে তুলে রাখা হবে ঐ আদিম যন্ত্রগুলি। এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ পর্ব 'মকর সাঁকরাত' বা পৌষ পার্বণের তিথি পার না হওয়া পর্যন্ত লাঙল জোয়াল আর ছোঁয়া চলবে না।

ঘরে বাইরে সর্বত্র উৎসব।

গ্রামের প্রান্তে সুপরিসর মাঠে ভীড় জমবে। এইখানেই তো আসল বাঁধনা। বেজে উঠবে কাড়া নাকাড়া, ঢোল, মাদল কাঁসি। জড়ো হবে ছেলে বুড়ো মেয়েমদ্দ। দেখা যাবে—, বেশ শক্ত বড়ো বড়ো খুঁটিতে এদিক ওদিক বাঁধা আছে সুপুষ্ট, তেজী বলদ আর উদ্দাম, দুদম কাড়া—পুং মোষ, বেশ মজবুত দড়িতে বাঁধা। বাজনার শব্দে কানে তালা পড়ে যাবে মানুষের, আর নির্বাক রোষে ফুলতে থাকবে ঐ মূক প্রাণীগুলি। গলায় মালা, মাথায় সিঁদূর, শিঙে তেল, গায়ে ছাপ— , নানা রংয়ের ছাপ। শিং বাগিয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকবে ওরা, নাক দিয়ে নিশ্বাস ছাড়বে ফোঁ ফোঁ করে, খুর দিয়ে মাটি খুঁড়বে পায়ের তলায়, সে এক ভয়ংকর দৃশ্য। হঠাৎ যদি দড়ি ছিঁড়ে ফেলে, তা হলে আস্ত রাখবে না সামনের মানুষকে, ছুঁচোলো শিংয়ের অগ্রভাগ আমূল ঢুকিয়ে দেবে দেহাংশে। গোরুর হাত থেকে যদিও বা রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, মোষের হাতে নিস্তার নেই, সাক্ষাৎ যমের বাহন কিনা।

যথেষ্ট ব্যবধান রেখে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াবে জনতা। আসবে এবার গোরু-নাচানোর দল। টকটকে লাল চোখ, মাতাল ভালুকের মতো টলস্ত দেহ, হাতে গোরুর বা ছাগলের শুকনো হড়হড়ে চামড়া অথবা লাল সালুর টুকরো।

রিং রিতাং ধিতাং তাং—রিতাং ধিতাং ধিতাং তাং, দলটি নাচতে নাচতে এগিয়ে আসবে। তারপর জনতা ঘিরে দাঁড়াবে তাদের, গোরু-মোষের খুঁটিকে কেন্দ্র করে। সামান্য ব্যবধান থেকে গান ধরবে একজন, কানে হাত দিয়ে— , অনুবৃত্তি করবে অন্য সকলে :

ওরে ঐ রে—
কোন্ দেশেরে ররদা তোহরি জনম রে
কোন ভূমে আসিনা পৌছল রে—
কোনে কা দুব্‌লা খেয়ে হলে বলীয়ান গো
কোনে কেরি রাখি যাত নাম রে—

গান শেষ হতে না হতেই উদ্দাম বাদ্য আর বদ্ধ বলদ বা মোষকে উত্তেজিত

করার জন্তে তার নাকের ওপর সালু বা চামড়া ছুঁড়ে মারা। একে তো উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে পশুগুলি, চামড়ার গন্ধে এবং লাল সালুর রঙে একেবারে পাগলের মতো খুঁটির চারদিকে ছুটে বেড়ায় আর শিং বাগিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে নাগাল পেতে চায়, শান্তিভঙ্গকারী মানুষ জাতের যে কোন একটির। এ গানের উত্তরে গাওয়া হবে :—

পশ্চিম দেশে বরদা তোহরি জনম রে
মধ্যভূমে আসিনা পৌছলরে
আর বনে কেরি দুবলা খেইয়ে
হলে বলীয়ান গো
রাখি যাত গিরিহাকেরি নামরে।

গানের কথা যখন এসেই গেল, তখন তার ভাষা সম্বন্ধেও দু একটি কথা বলা দরকার। গানের ভাষাটা ধলভূম মানভূম ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের নয়। মগহী বা মৈথিলীর প্রভাব আছে ভাষায়। এ তো ঠিক সীমান্ত রাঢ়ী ভাষার গান নয়। মৈথিলী ভাষায় ঠিক এমনি গানও পাওয়া গেছে। যাই হোক্, ঐ কৃত্রিম ভাষাতেই গান চলে আসছে। গানেব মধ্যে প্রশ্নও আছে, উত্তরও আছে; একজন যদি প্রশ্ন করে গানে, আর একজন কেউ উত্তরও দেয় গানে, অথবা স্ব প্রশ্নের উত্তর নিজেও দেওয়া চলে।

ভালা—অঁহি—রে—
আর, সব দিন চরাই তোরে বনে জংগলে বে
আজি তোব দেখিব মর্দানী।
আজিকার রণে ভালা জিতি যদি যাবে গে।
চারিপায়ে নুপুর ছাহাবো।

অহি রে— 'অর্থাৎ 'ঐ রে'—বলে টান। তারপর দুর্দান্ত গোরু-মোষের শক্তি পরীক্ষার জন্য যেন বলা হলো, "মর্দানী" দেখিয়ে বীরপনা দেখিয়ে ওরা যদি সেদিনের যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে, তা হলে চাব পায়ে নূপুব পরিয়ে দেবে তারা। যতক্ষণ পর্যন্ত গোরু বা মোষ চরম পরিশ্রান্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে ঐ গান, আর গানের শেষে প্রান্তর-বিধ্বংসী বাজনা।

চলো এবার অন্ত কোথাও, যেখানে আর একটি 'কপিলাপুত্র' অথবা 'যমরাজার বাহন' অপেক্ষা করছে গর্জমান অবস্থায়।

সেখানে গিয়ে প্রশ্ন করা হলো গানের মাধ্যমে :—

ভাল।——ঐ রে——
কোনেকা পুতা ভালা শিশু বালক গো
কোনেকা পুতাবে ডামাল
আর কোনেকা পুতা ভালা
অতি বলবান গো
বগড়ি ধবত ধেনু গাই বে—এ—এ—

গানেব শেষে বাজনা আব গোরু মোষেব ওপব চামড়া ছুড়ে মাবা। এম্‌নিভাবেই একটিব পর একটি দুর্দান্ত পশুকে উত্তেজিত কবা হবে, যতক্ষণ না সন্ধ্যাব অন্ধকাব ঘনিয়ে আসে বিস্তীর্ণ প্রান্তব জুড়ে। পূর্ববর্তী গানেব উত্তব দেওয়া হবে :—

ভাল্লা——অহি বে——
আব, কঁপিলাকা পুতা ভালা
শিশু বালক গে।
মহিষাকা পুতাবে ডামালবে
আব বাঘেকা পুতা ভালা অতি বলীযান গে।
বগড়ি ধরত ধেনু গাইবে।

ওদিকে অপেক্ষা কবে আছে আব একটি দামাল গোরু। সেখানে গিয়ে হয়তো গান গাওয়া হলো প্রশ্ন কবে আব উত্তব দিযে :

প্রশ্ন : কোনে তো চাঁছয়ে কোনে তো ছুলয়ে
কোনে তো গাড়ে মাল থামাবে
আব কোনেকা পুতা বেঁধে কব নানা বঙ্গ গো
কোনে তো হলো ধূলাময় বে—

উত্তব : ঈশ্ববে চাঁছয়ে মহাদেবে ছুলয়ে
মানবী-এ গাড়ে মালথামবে
আব—কপিলাকা পুতা বেঁধে
কবি নানা রঙ্গ গো
স্ববগে পাতালে ধূলা উড়ে রে—।

সত্যি ধূলো উড়ছে ওদিকে। কান খাড়া কবে ফোঁস ফোঁস গর্জন

কবতে করতে কপিলার পুত্র মাটি খুঁড়ছে পা দিয়ে। এবারেই তার পালা। 'আবা আবা' ধ্বনি করতে করতে এগিয়ে আসছে উৎসুক জনতা, সামনে বিচিত্র ভঙ্গীতে মাতাল নাচে টলে পড়ে যাচ্ছে গোরু-নাচানোব দল। নাকাড়াব আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শালবনে। পদোৎক্ষিপ্ত ধূলি উড়ছে আকাশে। এবাবে রূপ বর্ণনা কবা হচ্ছে প্রশ্নোত্তবেব মধ্য দিয়ে :—

কি-আ ববণ ববদা তোহবি না অংগবে
কি-আ ববণ দুই কান বে—
কি-আ ববণ বরদা তো-বি দুই চক্ষু গো
কি-আ ববণ দুই শিং—অ—বে—

না,—

ধবলা ববণ ববদা তোহবি না অংগ গো
মুকুতা বরণ দুই কানবে—
আব কাজল ববণ বরদা তোবি দুই চক্ষু গো
কালিয়া ববণ দুই শিং—অ—বে—

গানেব সময়টাই একটু বিশ্রামেব অবকাশ পায় কপিলাপুত্র। গানেব শেষে বাজনাব উচ্ছ্বাসের মধ্যে ডুবে গিয়ে 'মর্দানি' প্রকাশ কবতে হয় তাকে। যাব যতো তেজ, তাব ততো নাম। গানেব ভেতব দিয়ে যেমন গোরু মোষেব রূপ বর্ণনা কবা হয়, তাব ভেতবে তেমনি ফুটিয়ে তোলা হয় পবিবেশ। এই পল্লীকবিদেব অখ্যাত গানেব মধ্যেও কাব্য-সুব যে পাওয়া যায় না, তাও নয়। রিমঝিম কবে বৃষ্টি পড়ছে, পিচ্ছিল পথে পা টিপে টিপে চলতে হয় মানুষকে। একটি গাভীব ওপব এই রূপাবোপ কবা হয়েছে। অপূর্ব তাব ব্যঞ্জনা :

বিমি ঝিমি বিমি ঝিমি পানি ববষা গো
আঙিনায় ও পড়ি যায় কায়া—রে
ধীরে চল ধীবে চল শিবোমণি গেয়া গো
পড়ি যায় সিঁথের সিঁদুব হে—

আবার হয়তো নিজেদের দুঃখদারিদ্র্যের কথা গোরুর ওপর আরোপিত করে ব্যক্ত করা হচ্ছে :—

প্রশ্ন :

কোনে হি বিনে ভালা অঙ্গ দুর্বল হে
বাবু হো—
কোনে বিনা কেশ মলিনাবে
কোনে হি বিনা ভালা মুখ তোব মলিন
কোনে বিনে সংসাব আঁধাব বে—।

উত্তব

অন্ন বিহনে ভালা অঙ্গ দুর্বল হে
। বাবু হো। তেল বিনে কেশ মলিন বে।
পান হি বিনে ভালা মুখ তোব মলিন
পুত্র বিনে সংসাব আঁধাব বে—

—ডঃ গ্রীয়াবসন তাব 'লিংগুইস্টিক সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থে পশ্চিম এবং মধ্য পূর্ণিযাব মৈথিলী ভাষাব নমুনা হিসেবে একটি লোকসংগীত উদ্ধৃত কবেছেন। সেই গানেব প্রথম চাবিটি পংক্তি উদ্ধৃত কবছি এখানে। উপবি-উক্ত গানেব সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাবাব জন্যে :—

'কথি বিনু মুহমা মলিন ভেল সখীয়া হে
কথি বিনু দেহিযা বে ঝমবি গেল না—
পান বিনু মুহমা বে মলিন ভেল সখীয়া হে
পিয়া বিনু দেহিয়া বে ঝমবি গেল না—।'

এ দুটি গানেব মধ্যে বৈসাদৃশ্য যাই থাকুক না কেন, একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র স্পষ্ট।

এম্‌নি প্রশ্নোত্তবে গান চলবে। প্রযোজন হলে দুবন্ত 'কাডাকে' বশীভূত কবাব জন্য দু দুবাব নাচানো হবে তাকে। সবল বলদকেও তাই কবা হবে। এক অশান্ত উন্মাদনায় গোরু-মোষ, নবনাবী-মাঠঘাট-শালবন সবই যেন থবথব কবে কাঁপতে থাকবে। আবো প্রশ্ন কবা হবে :

কোনে হি আছে ভালা গোরু তোব বাপ গো
কোনে হি আছে তোর ভাইবে
কোনে হি আছে ভালা বাঁধনাবি পবব
পরব কবে আনা গোনা বে—।

উত্তর :

বড় গঙ্গায় আছে ভালা গোরু তোর বাপ গো
ছোট গঙ্গায় আছে গোরু ভাইরে—
পাহাড় পর্বতে আছে বাঁধনারি পরব—
পরব করে আনা গোনারে

সত্যি ছোটনাগপুর আর পশ্চিমরাঢ়ের অরণ্য-পর্বতময় ভূভাগ ছাড়া অন্য কোথাও তো বাঁধনা পরব নেই। এ পরবের আসল রূপটি কেমন তাও বলা হয়েছে :—

প্রশ্ন :

কিসে করি আনব গোরু তোব বাপ গো
কৈসে আনব গোরু, ভাইরে—
কৈসে আনব ভালা বাঁধনারি পরব
পরব করব আনা গোনারে—

উত্তর :

দোলায় চঢ়াই আনব গোরু তোর বাপ গো
ঘোড়ায় আনব গোরু, ভাইরে—
মাদল ধম্‌শায় আনব বাঁধনারি পরব
পরব করব আনা গোনারে—

গোরুর বাপ দোলায় চড়ে আসুক, গোরুর ভাই ঘোড়ায় চড়ে আসুক এতো কৃষকজীবনের গো-ভক্তির কথা। সহযোগী শ্রমিকদের প্রতি সহযোগী শ্রমিকদের দরদ। তাই মাদল আর ধুম্‌সা বাজিয়ে মহাসমারোহে পালন করতে হয় এই উৎসব।

সারাবছর ধরে ফসল উৎপাদনের সহযোগিতা করে, দুগ্ধ প্রদান করে, সেই সেবার বিনিময়ে কিছু কি চায় না ঐ সমস্ত গৃহপালিত প্রাণীরা? হয়তো বা অভিমানে কাঁদে-ও। কিন্তু তাদের বেদনা যে মানুষ বুঝতে পারে না, তাও নয়। আশ্বিন মাস শেষ হলে কার্তিকের আগমনী গান শিশির-কণার রূপ ধরে আসে। মানুষ সান্ত্বনা দেয় শিরোমণি গাইকে :—

আশ্বিন যাইতে কার্তিক সামাতে,[১]

বাবু হো

কাঁদেতো শিরোমণি গাই হে।

না কাঁদ না কাঁদ সুরধুনী গেয়া হো

মাথাব শিং ভরি তেল রে—।

তারপর দুর্দান্ত কপিলাপুত্রের দিকে তাকিয়ে তাকে উৎসাহ দান করা হবে :—

অরুণ বনে ভালা—তরুণ লতা

বাবু হো

সেই লতে জোত ভাঙ্গাবো

সেই জোতে কপিলাকা পুতাকে বাঁধব

ন্যাচে তোব ধুলা উড়ি যায়—।

কি ভাবে কপিলাপুত্র নাচবে, তাও তাকে বলা হলো :—

কচা-কঁধা চবায়ে গা তোর মোটা কর্যে

আজ তোকে মালখোঁটায় বাঁধবে।

চাবি পায়ে জাঁকবে

তুই শিঙে মারবে

উড়ি যাউ তোব টিকলি সিন্দুব বে—।

১ [মানভূম জেলার উত্তরসীমান্তে, হাজারীবাগ এবং সাঁওতাল পরগণার গোয়ালাদের মধ্যে খোট্টা বাঙলায় অথবা মগহী ভাষায় অথবা মিশ্র মৈথিলীতে এই ধরনের গান প্রচলিত। মানভূম-ধলভূম প্রভৃতি অঞ্চলের বাঙলা ভাষায় ঐ সমস্ত গান কোন-কোন ক্ষেত্রে যথাযথ রূপেই গৃহীত হয়েছে, কিন্তু লোকমুখে, ক্রমশ গানগুলি বাঙলাভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও উক্ত গানগুলির উপর খোট্টা বাঙলা মগহী এবং মৈথিলীব প্রভাব সহজেই পরিদৃষ্ট। বাঁধনা পরবের গান (বা অহিরা গান) সীমান্তবাঙলাব সর্বত্রই প্রায় একই। তার কারণ এ গান প্রত্যেক উৎসবে রচিত হয় না। পূর্বে যা প্রচলিত ছিল, তাই-ই আজও প্রচলিত। সীমান্তবাঙলার মাহাতো সম্প্রদায়ই মূলত এই সমস্ত গানের প্রচলন করে। কুর্মালী-উপভাষিক অঞ্চলেই এই সব গানের জন্ম, একথা নিশ্চিত. কুর্মালী-ভাষীদের সংগে বাঙলাভাষী মাহাতো সম্প্রদায়ের যোগসূত্র একদা বর্তমান ছিল এবং সেই সূত্রেই এই উৎসবের গান এবং অনুষ্ঠান-রীতি এদের মধ্যে পরিগৃহীত এবং গানগুলি প্রায় মন্ত্রের মতোই রক্ষিত। এ গান নতুন ক'রে কেউ রচনা করে না।

জাগেকা=জাগরণের, দুবলা=দূর্বাঘাস, কোনেকা=কোথাকার,

গেয়া=গাইয়া, গাই কোনে-কেরি=কা'র, মানবী-এ=মানুষে

বর্দা=বলদা, বলদ, গিরিহা কেরি=গৃহস্থের, জোত=দড়ি

অরুণ বনের তরুণ লতার দড়ি তৈরী করে কপিলাপুত্রকে বাঁধবে ওরা মালখোঁটায়। তার নাচে ধুলো উড়বে আকাশে। এতোদিন ধরে বনে মাঠে চরিয়ে, কপিলাপুত্রের দেহকে পুষ্ট করা হয়েছে। আজ সে চার পা দিয়ে চেপে ধরবে মাটি, দুই শিং বাগিয়ে তেড়ে আসবে ফোঁস ফোঁস্ করে, তাতে যদি মাথার টিকলি আর সিঁদুর উড়েও যায়, ক্ষতি নেই, বীরপনা তাকে দেখাতেই হবে।

শুধু গোরু নয়, ছাগল ভেড়া মোষ প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুদেরও পুজো করার রেওয়াজ আছে। গোরুকে যে ভাবে নাচানো হয়, পুং মোষকেও সেই ভাবে নাচাবার কথা বলেছি। তার জন্য আলাদা গান :

প্রশ্ন : কতিখনে রে কাড়ওয়া মালমাটি মাখবে
কতিখনে করবে সিনান রে
কতিখনে রে কাড়ওয়া মাল খুঁটায় ঘুরবে
কতিখনে করবে শিঙ্গার রে।

উত্তর : সকাল বেলায় কাড়ওয়া মালমাটি মাখব
বাসিযাম বেলায় করব সিনান রে
আড় বেলায় কাড়ওয়া মালখুঁটায় ঘুরব
না চিনব আপন কিষাণ রে।

এরারে দিগন্ত ছেয়ে আসবে অন্ধকার। দু একটি তারা জ্বলবে আকাশে। শালবনকে মনে হবে এক পোঁচ কালির আঁচড়ের মতো। প্রতিপদের বাঁকা চাঁদ কখন উঠলো, কখন ডুবলো, কেউ পাবে না জানতে, আঁধারের মধ্যে মুখ লুকোবে সে। ঈষৎ শীতল বাতাসে বাঁশবনের পাতা কাঁপিয়ে, সবুজ ধানের ক্ষেত ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়বে গ্রামান্তরে। ক্লান্তদেহ গোরু-মহিষগুলিকে

কচা-কঁধা=দুর্গম বন-প্রান্তর
জাঁকবে=চেপে ধরবে
কাড়ওয়া=কাড়া, পুং মোষ
বাসিয়ামবেলা=পান্তাভাত খাবার সময়,—সকাল এবং দুপুরের মাঝামাঝি সময়।
(বাসিয়াম=পান্তা)
আড় বেলা=বিকাল, দুপুরের পর।
ছাহাবো=সাজাবো।
সামাতে=প্রবেশ করতে

ধুয়ে মুছে নিয়ে আসা হবে গোয়ালে। খেতে দেওয়া হবে প্রচুর পরিমাণে। এম্‌নি করে রাঢ় প্রান্তের পশ্চিম অরণ্যভূমির গো-বন্দনা উৎসব মিলিয়ে যাবে গাঁয়ের অন্ধকারে। বিকালের উচ্ছ্বাস বিলীন হবে সন্ধ্যায়, কিন্তু আরও আছে, আরও আছে পরপর কয়েকটি দিন। মদ আর মাংস, পিঠে হাঁড়িয়া—, নাচ-গান-বাজনা—ঢোল-মাদল-কাঁসি।

এরপর অঘ্রাণের পাকা ধানের প্রতীক্ষা

॥ টুস্থ ॥

—এক—

'আদাডে বাদাডে পদ্ম পদ্ম বৈ আব ফুটে নাই।
হামদেব টুস্থব পায়ে পদ্ম গো ভমব বৈ আব বইসে নাই।'

সাবা বছবেব আশা আকাঙ্ক্ষা : অঘ্রাণেব ফসল। অঘ্রাণ মাস : লক্ষ্মী মাস : আনন্দেব মাস : সংগ্রহেব মাস। শ্রমের সার্থকতা সোনা হয়ে গেছে ক্ষেতে ক্ষেতে, খামাবে খামাবে। কিন্তু তাহলেও অঘ্রাণ মাস কাজেব মাস। অঘ্রাণে লক্ষ্মী পুজো, কিন্তু উৎসব নেই। উৎসবেব প্রস্তুতি মাত্র। এলো পৌষ। এই পৌষ মাসই উৎসবেব মাস। অন্তত এই একটি মাস, বোধ হয় পেট ভবেই খেতে পায় গ্রামেব মানুষ। তাবপব মাস ফুবোতে না ফুবোতে ধানেব গোলা ফুবোয়। মাত্র একটি মাস। সবাই বাজা, সবাই বাণী। এই মাসটিই টুস্থ পববেব মাস।

অতি প্রাচীন লৌকিক ব্রত বলেই টুস্থ অচনাব মূলসূত্রটি এলোমেলো হয়ে গেছে। এই ধবনেব লৌকিক ব্রত,—যাব রূপ বদলেছে বাববাব বহুবাব, বহু পবিবর্তনেব মাধ্যমে যা বহন কবে চলেছে প্রাচীনতম ঐতিহ্যকে, তাব সম্পর্কে একেবাবে সোজা কথা বলা হয়তো সম্ভবপব নয়। বহু স্তবেব অতিক্রান্তিব শেষে, আজ হযতো এই ব্রতেব ভিতব থেকে এক ধরনেব ইংগিত আমবা পেতে পাবি। কাবণ সমাজ পরিবর্তনেব সংগে সংগে আমাদেব অন্দবমহল সব সময় সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে নি। চলতে পাবে নি বলেই বক্ষা, তাই হয়তো এই ধরনেব ব্রত আচাবের মধ্যে প্রাচীনত্বেব ছাপ কিছুটা বেঁচে আছে। মেয়েলী ব্রত সম্পর্কে বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ এই কথাই বলেছেন : 'আমাদেব সদব অংশটা যতটা বদলে গেছে, আমাদের অন্তঃপুরটা তার সংগে সংগে তো বদলে যায় নি। সেটা—কাল, তার পুর্বে এবং তাব-তাব-তারও পুর্বে যা আজও তা। অন্তত বেশীর ভাগ মেয়েলী

কাণ্ডই এইরূপ। সেখানে ঠাকুরমার সংগে নাতনীর এবং ঠাকুরমাতে ও তাঁর ঠাকুরমাতে খুব তফাৎ নেই।[১]

কুমারী ব্রতগুলির ছড়ার মধ্য দিয়ে আদিমতম কাব্য-কলিকার রূপায়ণ। ছড়া অবশ্য কাব্য নয়; কিন্তু কাব্যকেও কাব্য হতে সময় লেগেছে ঢের, তাকেও আসতে হয়েছে হাঁটি হাঁটি পা পা করে, আসতে হয়েছে নানা জাতীয় ছড়া এমন কি প্রবাদের ভিতর দিয়ে-ও। তেমনি এই লৌকিক মেয়েলী ব্রতগুলির অধিকাংশই যদি বা রূপ বদলেছে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে গেরুয়া রূপ ধারণ করে হিন্দুয়ানীর আভিজাত্য প্রকাশ করেছে, এমন কি যার বিধিপদ্ধতি অর্বাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রেও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, সেগুলির চর্চা এবং আনুষ্ঠানিক কামনার ভাষা থেকেই, প্রমাণ না হোক্, আভাস নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে যে আর্যসভ্যতার বহু পূর্ব থেকেই ভারতের বুকে এদের প্রচলন ছিল। বাংলার এই লৌকিক মেয়েলী ব্রতগুলিকে বিচার করে দেখতে গেলেও এই একই সত্যের ইংগিত পাওয়া যাবে। আর হিন্দু সংস্কৃতির অনেকখানি আর্যেতর, একথা কে না জানে।

অঘ্রাণ মাসের সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পুরো একটি মাস। পুরো একটি মাস ধরেই টুসু পুজো। টুসু পরবের গোড়ার কথা বলতে গিয়ে নানা মুনি নানা মত দিয়েছেন। কেউ বলেন পৌষ লক্ষ্মী, কেউ বলেন আদিম শস্যোৎসব। কেউ বলেন সারমাটি দিয়ে ক্ষেত্র উর্বর করার প্রতীক হচ্ছে টুসু। ডক্টর সুকুমার সেন বলেন টুসু বা তুষু (তোষলা) পুষ্যা বা তিষ্যা নক্ষত্রের সংগে সম্পৃক্ত এবং তিষ্যানক্ষত্রে অনুষ্ঠিত শস্যোৎসবেরই প্রবহমান ধারা।

বাঙ্লাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তোষ-তোষলা, তোষলা বা তুষু নামক ব্রতের প্রচলন আছে। পূর্ববংগে, পশ্চিমবংগে—দু জায়গাতেই কুমারী মেয়েরা এই ব্রত করে থাকে। তোষ-তোষলা বা তুষুর ব্রত তার প্রাচীনতম রূপটি শাস্ত্রের বিধিনিষেধের চাপে হারিয়ে ফেলে পুরোপুরি 'হিঁদু' হয়ে যায় নি।

কবে, কোন্ যুগ থেকে এই ধরনের ব্রতগুলি চলে আসছে, ইতিহাস খুঁজেও তা পাওয়া যাবে না কিন্তু এগুলি যে, বেদপূর্ব যুগেরও হতে পারে সে সম্পর্কে বহুলোকই সুচিন্তিত অভিমত দান করেছেন।

তোষলা ব্রত উদ্‌যাপনের রীতি-পদ্ধতি মূলত মানভূম ধলভূম ঝাড়গ্রামের

১ বাঙলার ব্রত

টুসু পূজারই অনুরূপ। বাঁকুড়া অঞ্চলে এই ব্রতেব নামই তুষু। ভাষাতত্ত্বেব আইনে দন্ত্য বর্ণেব মূর্ধন্য বর্ণে পবিণত হওয়াব নজীব আছে। এই আইন অনুসারে তুষু নিশ্চয়ই টুসু হতে পাবে,—অন্তত হওয়াব পক্ষে কোন বাধা নেই। তুষু বা তোষলাব ব্রতপদ্ধতিব সংগে টুসুব ব্রতপদ্ধতিব গবমিল মোটে নেই, তবে অঞ্চল বিশেষে এই ব্রত এক এক ধরনেব বৈশিষ্ট্য লাভ কবেছে।

এই ব্রতেব ছড়াগুলিব ভিতবে, অবনীন্দ্রনাথ মেকসিকো মেয়েদেব বীতি বেওয়াজেব কিছুটা আভাস পেয়েছেন।[১]

তুষু বা তোষলা পববেব একপ নামকবণেব মূলে তিস্তানপত্রেব প্রভাব থাকা কিছু অসমীচীন নয়, তবে এ কথাও স্বীকাব কবা যেতে পাবে যে মূলত 'তুষ'-শব্দেব সংগেই এব যোগাযোগ, ধানেব তুষ, তুষু ব্রতেব একটি অপবিহায উপকবণ। গরুব গোবব, সবষে ফুল নতুন ধানেব তুষ প্রভৃতি উপকবণকে আদিম মানুষেব যাদু-প্রক্রিযাব উপকবণ হিসাবেও গ্রহণ কবা চলে। বলা বাহুল্য এব সংগে উবববতাবাদেব যোগসূত্রটি সুস্পষ্ট। গোববেব নাড়ুব উপব তুষ ছড়িয়ে শূন্যগর্ভ তুষেব ভেতব থেকে পূর্ণশস্য ধানেব কামনাটি অস্বাভাবিক নয। তুষু বা তোষলা ব্রত সম্পর্কে বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ এব বিশদ বিববণ দিযেছেন। বলেছেন: 'প্রতিদিন পৌষ মাসেব সকালে মেয়েবা এই ব্রতটি কবে। ব্রতেব বিধি এই: অঘ্রাণেব সংক্রান্তি থেকে পৌষেব সংক্রান্তি পযন্ত প্রতি সকালে স্নান কবে গোববেব ছ-বুড়ি ছ গণ্ডা বা একশো চুয়াল্লিশটি গুলি পাকিযে, কালোদাগশূন্য নতুন সবাতে বেগুনপাতা বিছিয়ে তাব উপবে গুলি কটি বাখতে হয। তাব উপব নতুন আলোচালেব তুঁষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, সবষে, শিম, মূলো ইত্যাদিব ফুল দিযে ছড়া বলা হয়। ব্রতেব নাম এবং উপকবণগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটি সাব-মাটি দিয়ে ক্ষেত উর্বব কবে তোলাব ব্রত।"

অঘ্রাণ সংক্রান্তিব দিন এই ব্রতেব উদযাপন। সবাটিকে কোন এক ঘবেব

'গাইয়েব গোবর, সবষে ফুল,
আসন পিঁড়ি এলোচুল,—
গেয়ের গোবর সরষে ফুল
ঐ কবে পূজি আমরা মা-বাপেব কুল।'— 'আসনপিঁড়ি এলোচুল'। এখানে আমরা সেই মেক্সিকোর মেয়েদেব এলোচুলে ব্রত করার প্রতিচ্ছবিটি পাচ্ছি (বাংলার ব্রত।)

কোণে আল্‌পনা-মণ্ডিত জায়গায় অথবা ঘরের কোন কুলুঙ্গীতে তুলে রাখা হয়। গোটা পৌষমাস ধরে সন্ধ্যের সময় কুমারী মেয়েরা তুষ-তোষলার কাছে নানাবিধ ছড়া আবৃত্তি করে। এই ছড়া বলার রীতিই এই ব্রতের প্রাচীনতার একটি প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই ছড়াগুলির ভিতর দিয়ে কুমারী মনের বহুবিধ আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল প্রকাশ।

একদা যে ব্রতের মূলে ছিল সারমাটি দিয়ে ক্ষেত উর্বরা করার ইচ্ছে, বহু রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আজকে তাই-ই দাড়িয়েছে, কুমারী জীবনের সমষ্টিগত কামনাপূরণের দেবী রূপে। এই দেবী কিন্তু পুরাণোক্ত অন্য কোন দেবীর মতো নন, এর সংগে কুমারী মেয়েদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘরোয়া। ছড়ার মধ্যে, তুষলীকে 'ভাই' সম্বোধনেও ভূষিত করা হয়। এই দেবীর কাছে প্রার্থনা জানায় মেয়েরা—

কোদালকাটা ধন পাবো।
গোহাল আলো গরু পাবে।
দরবার আলো বেটা পাবে
সভা-আলো জামাই পাবো
সেজ আলো ঝি পাবো।
আড়ি মাপা সিঁদুর পাবো।
ঘর করবো নগরে—
মরবো গিয়ে সাগরে,
জন্মাব উত্তম কুলে,
তোমার কাছে মাগি এই বর—
স্বামীপুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।

ব্রত পালনের সময় তোষলার স্তুতিও করা হয়:

তুষ তুষলী তুমি কে।
তোমার পূজা করে যে
ধনে ধানে বাড়ন্ত
সুখে থাকে আদি অন্ত।
তোষলা লো তুষ কুন্‌তি
ধনেধানে গাঁয়ে গুন্‌তি
ঘরে ঘরে গাই বিউন্তি।

পৌষ সংক্রান্তির শীতার্ত দিনের প্রভাতটি পিঠে পার্বণের প্রভাত। সেই প্রভাতে তোষলাকে মাথায় করে দলে দলে কুমারী মেয়েরা কোন নদী, খাল বা অন্য কোন জলাশয়ের দিকে এগিয়ে চলে। সেখানে তোষলাকে ভাসিয়ে দেওয়া হয় জলে, আর ছড়া বলা হয় :—

তোষলা গো রাই, তোমার দৌলতে মোরা ছ-বুড়ি পিঠে খাই।
ছ বুড়ি, ন বুড়ি,—গাং সিনানে যাই,
গাঙের বালি গুলি দু হাতে মোড়াই,
গাঙের ভেতর লাড়ুকলা ডব্ডবাতে খাই।
তুষলী গো রাই, তুষলী গো ভাই—
তোমার ব্রতে কিবা পাই ছ বুড়ি ছ গণ্ডা গুলি খাই—
তোমাকে নিয়ে জলে যাই।
তুষ তুষলী গেল ভেসে, বাপমার ধন এলো হেসে।
তুষ তুষলী গেল ভেসে, আমার সোয়ামীর ধন এলো হেসে।

তুষ তুষলী ব্রত পালনের নির্দেশনামাতে আরো কিছু ছড়া পাওয়া যায়।[১]

১ তুষ-তুষলী ব্রত পালনের যে নির্দেশনামা আছে 'মেয়েলী ব্রতকথায়, তাতে বলা হয়েছে :— প্রথমত নতুন ধানের তুষ একটা কালো গাভীর গোবর, সরষে ফুল মুলো ফুল ও দুর্বা ঘাস সংগ্রহ করতে হবে। তারপর গোবরের সংগে আলোধানের তুষ মিশিয়ে ১৪৪টি নাড়ু তৈরী করতে হবে। নাড়ুগুলির মাথায় গুঁজে দিতে হবে পাঁচপাঁচটি দুর্বাঘাস। এবার ঐ নাড়ুগুলিকে সযত্নে রাখতে হবে কোন নতুন মাটির গামলায় বা হাঁড়িতে। তারপর প্রত্যেকদিন চারটি নাড়ু নিয়ে পুজোর বসতে হবে। নাড়ু হাতে করে, সরষে আর মুলোর ফুলে পুজা করতে হবে। ছড়ার মন্ত্রে বলা হবে :

তুষতুষলী কাঁধে ছাতি
মা বাপ হোক লক্ষপতি
স্বামীধনে যাচাযাচি
পুত্তের ধনে দরজায় বাঁধবো হাতী,
ঘর করবো সহরে, মরবো গংগার কোলে,
জন্ম হয় যেন উত্তম কুলীন ব্রাহ্মণ কুলে—
নিয়ে গোরুর গোবর ফুল, পুজি আমার তিনকুল।

আবার বলতে হবে :—

তুষলী গো রাই, তুষলী গো মাই
তোমার পুজে কি বর চাই,
অমর-গুরু বাপ চাই, ধন সাগরে মা চাই,

বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে তু-'তুষ' পুজার যে রীতি আছে কুমারী মেয়েদের মধ্যে, তাতে এই ধরনের অনুষ্ঠান ও ছড়ার সন্ধান মেলে। ছড়ার মধ্যে সাধারণত সেখানে, কুমারী মনের আকাঙ্ক্ষা তু-বুড়ি পিঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

—দুই—

বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত তুষ-তোষলার ব্রতই মানভূম, ধলভূম এবং ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের টুসু বা টুসলি। এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাঙলাদেশের তোষলাব্রত সীমান্তবাঙলার 'টুসু' হয়ে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সীমান্ত-বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলেও আবার কোন না কোন দিক দিয়ে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। বলা বাহুল্য, বৈশিষ্ট্য শুধু অনুষ্ঠানগত ই। তবে টুসু পূজোর সাধারণ রীতি রেওয়াজ মূলত একই।

রাজ্যেশ্বর স্বামী চাই, সভা-আলো জামাই চাই,
সভাপণ্ডিত ভাই চাই, দরবার শোভা বেটা চাই,
রূপ ফোটা ঝি চাই।
সিঁথের সিঁদুর দপ্‌দপ করে
হাতের নোয়া ঝক্‌মক্ করে
আলনার কাপড় দলমল করে
ঘটিবাটি ঝকঝক করে
সিঁথের সিঁদুর মরাইয়ের ধান
সেই যুবতী এই বর চান।

পূজো শেষ হলে নাড়ুগুলিকে একটি নতুন মালশায় তোলা হবে। পৌষ সংক্রান্তির দিনেই শেষ পূজো। সেদিন অবশিষ্ট নাড়ুগুলিকে পূজো করতে হয়। ময়দা বা চালের তৈরী ছোট ছোট আকারের ১৪৪টি নাড় গোরুর দুধে সেদ্ধ করে, সেইখানে বসেই খেতে হবে। খেতে খেতে মন্ত্র বলতে হবে :

তুষতুষলী সুখে ভাসালি,
আধা জলন্তি পাথা জলন্তি
চন্দনকাঠে রন্ধন করে
খাবার আগে তুষ পড়ে
খড়কের আগায় ভোজন করে—

অঘ্রাণের সংক্রান্তিতে টুসুর[১] প্রতিষ্ঠা। সাধারণত ঘরের কুলুঙ্গীতে একটি মাটির সরা রাখা হয়। সরার মধ্যে থাকে কতকগুলো গোবরের নাড়ু। নাড়ুর উপর পিটুলীগোলা ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তার উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয় গাঁদাফুল। এই সবাটি টুসুর প্রতীক। কোন কোন অঞ্চলে আবার টুসুর ঘট পাতা হয়। যত ব্রতচারিণী, তত ঘট। কোন কোন জায়গায় ছোট্ট একটি কুণ্ড তৈরী করা হয়, তার মধ্যে গোবর দেওয়া হয়। শস্যোৎপাদন রীতিটিই এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। পৌষের প্রত্যেকটি সন্ধ্যে বেলায় কুমারী অ-কুমারী নির্বিশেষে তরুণী এবং কিশোরী মেয়েরা একত্রে সম্মিলিত হয় পাড়ার কোন এক বিশেষ বাড়ীর টুসু পুজোর ঘরে। গ্রামের প্রত্যেক ঘরেই টুসুর পুজো হয় না, পাড়ায় পাড়ায় টুসুর প্রতিষ্ঠা। সন্ধ্যের সময় গান গেয়ে টুসুর ঘুম ভাঙাতে হয়। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত টুসু গানের অবিশ্রাম মহলা চলে।

প্রাণ সুখেতে নতুন বসন্ত
কাল কাটাবো আমি জন্মান্ত।

খাওয়ার পর আগুনের হাঁড়িটি মাথায় নিয়ে পুকুরে ভাসিয়ে দেবার জন্য যাত্রা শুরু করে ছড়া বলতে হবে:

তুষলী গো রাই, তুষলী গো মাই
তোমায় পুজে কি ফল পাই
তোমার দৌলতে মোরা ছ-কুড়ি পিঠে খাই।
তোমার দৌলতে খাই একশ চুয়াল্লিশটি ক্ষীরের নাড়ু
আমার যেন হয় শাঁখার আগে সোনার খাড়ু।

এর পর ঘাটে নেমে, মাথা থেকে নামিয়ে জলে ভাসিয়ে দিতে হবে। বলতে হবে:

তুষলী গেল ভেসে, আমার বাপ মার ধন এলো হেসে—
তুষলী গেল ভেসে, আমার শ্বশুর শাশুড়ী স্বামীপুত্র এলো হেসে হেসে—
তুষলী গেল ভেসে, আমার ধনদৌলত টাকাকড়ি এলো ভেসে।

ব্রতকথায় আগে নির্দেশ দেওয়া আছে যে চারবৎসর এই ব্রত করার নিয়ম। উদ্‌যাপনের বছর ব্রাহ্মণকে ক্ষীরের নাড়ু, লুচি, সন্দেশ প্রভৃতি ভোজন করাতে হবে, বস্ত্রাদি দক্ষিণাও অবশ্যদত্ত। এই ব্রত পালন করলে:

ধনেধানে বাড়ন্ত,
সুখে থাকে আদি অন্ত
ধনেধানে গাঁয়ে গুনতি
ঘরে ঘরে গাই বিউন্তি

১ টুসু সম্পর্কে একটি লোককথা প্রচলিত আছে মানভূমের কোন কোন অঞ্চলে। লোককথাটি বহু-প্রচলিত নয় বলেই এর মৌলিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। লোককথাতে

মানভূম ধলভূমের কূর্মক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের কুমারী মেয়েরা ছাড়া অন্য মেয়েরাও এতে অংশ গ্রহণ করে। ফসল সংগ্রহের শেষে, পিঠে পার্বণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলে এম্‌নি দিনের পর দিন। মানভূমে প্রায় সর্বত্র সরার সংগে রঙীন কাগজের তৈরী একটি চৌদোল থাকে। সাধারণত চৌদোলগুলি পৌষের গোড়া থেকেই থাকে না; পৌষসংক্রান্তির দিন টুসুর বিসর্জনের দিন কয়েক আগে থেকেই সুসজ্জিত চৌদোলগুলিকে টুসুর সরার পাশে রাখা হয়। বিসর্জনের দিনে ঐ চৌদোল নিয়েই দলে দলে মেয়েরা নদী খাল বা বড দীঘির পাড়ে সমবেত হয়। কোন কোন অঞ্চলে কয়েকটি শাল-কাঠি বা দাঁতন কাটা একটি ঠোঙার মধ্যে রেখে ফুল দিয়ে পুজো করা হয়।

কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে টুসুরাণীর মূর্তিও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ঘরে ঘরে সরা ও চৌদোল থাকবেই, কিন্তু ঘরে ঘরে টুসুর মূর্তি নাও থাকতে পারে। মূর্তি থাকবে পাড়ায় পাড়ায়। এক একটি পাড়ার জন্য এক একটি মূর্তি। টুসুরাণীর মূর্তি বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে দক্ষিণ-পশ্চিম মানভূমে, আরও বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ধলভূম এবং

বলা হয়:—কুর্মী সমাজে এক রূপবতী কন্যার ডাক নাম ছিল টুসু, ভালো নাম রুক্মিণী। কন্যাটি রূপে গুণে লক্ষ্মীর মতো। এক কুর্মীযুবকের সঙ্গে তার বিবাহের কথা নির্ধারিত ছিল। রুক্মিণী আর সেই কুর্মী যুবক পরস্পরকে গভীরভাবে ভালোবাসত আগে থেকেই। এদের বিবাহ উৎসবের তিথি যত ঘনিয়ে আসে, তত খুশী হয় সমগ্র কুর্মী সমাজের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—সবাই। কিন্তু বিবাহ তিথিতে বিবাহ কার্য শেষ হবার পুর্বেই মুসলমানরা এসে অন্যান্য ধন সম্পত্তির সঙ্গে লুঠ করে নিয়ে যায় তাদের। মুসলমানদের অভক্ষ্য শূকরমাংসে এদের প্রীতি আছে শুনে, শেষপর্যন্ত তা'রা এদের অস্পৃশ্য জ্ঞানে বর্জন করে। রুক্মিণী এবং সেই কুর্মী যুবক যখন গ্রামে ফিরে আসে তখন কুর্মীযুবকের অভিভাবকেরা রুক্মিণীর সঙ্গে তার বিবাহে বাধা দেয়। যে মেয়েকে মুসলমান ছুঁয়েছে, সে মেয়ের সঙ্গে কারুরই বিয়ে হতে পারে না। কিন্তু এর ফলে তাদের পারস্পরিক প্রেম মোটেই ব্যাহত হয় নি। কুর্মী যুবকটি অভিভাবকদের মত পরিবর্তন করতে না পেরে মনের দুঃখে বনে যায়, সন্ন্যাসী হয়ে। এদিকে রুক্মিণী অনাহারে অনিদ্রায় দিনাতিপাত করতে থাকে, আর, কি ক'রে তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হবে এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। একদিন সবাই শুনলো টুসুমণি ঘর থেকে নিরুদ্দেশ। কথাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। রুক্মিণীর ডাক নামটাই বেশী প্রচলিত ছিল দেশে। ফলে ঘরে ঘরে শুধু টুসুর আলোচনা। ভালোবাসার ধনকে ফিরে পাবার জন্য টুসুর গৃহত্যাগের কাহিনী কুমারী মেয়েদের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো। টুসু তাদের 'আদর্শ' হয়ে উঠলো। অবশেষে একদিন সবাই শুনলো' টুসু তার বরকে খুঁজে পেয়েছে। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে। টুসুর একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে। এই দুটি অঞ্চলে এও দেখা যাচ্ছে যে সরা বা চৌদোলের অস্তিত্বও অনেক ক্ষেত্রে বিলুপ্ত; শুধু টুসু মূর্তিই টুসুরাণী নামে পরিচিতি লাভ ক'রে বিরাজিত। অঘ্রাণ-সংক্রান্তির কয়েকদিন আগে থেকেই হাটে বাজারে ছোট বড় নানা আকৃতির নারীমূর্তি বিক্রি করতে নিয়ে আসে গ্রাম্য মৃৎশিল্পীব দল। মূর্তি কিনে নিয়ে যায় মেয়েরা। বাড়ীতে নিয়ে অঘ্রাণ সংক্রান্তির দিন টুসুব প্রতিষ্ঠা কবে; টুসুকে হলদে কাপড দেয়, আর সারা পৌষমাস ধরে সাঁঝ সকালে আরতি। ভোগ দেওয়া হয়—চিঁডে-গুড়, গুড়-মুড়ি, কোন কোন দিন ময়বার দোকানের মিষ্টি। আব এই মূর্তিকে ঘিরে সাঁঝের প্রদীপ জ্বেলে স্বরু হয় গান। নানান ধরনেব গান; প্রেমের গান, কামনাব গান, সুখের গান, দুঃখেব গান—কত কি গান। গানে শুধু যে কুমাবী মেয়েরাই অংশগ্রহণ কবে তা নয়, বিবাহিতা, যুবতী এবং প্রৌঢারাও অনেক ক্ষেত্রে টুসুগানেব অংশীদার হয়। পৌষসংক্রান্তিব পূর্বের দিনটি 'বাউনী' বা 'বাঁউড়ী'। সেদিন সাবারাত ধরে জাগবণেব গান। এ পাডাব মেয়েরা ও পাডায় যায়, ও পাডার মেয়েরা আসে এ পাডায়—গান গাইতে; সমস্ত রাতটিই সংগীতমুখর, শীতার্ত কিন্তু গীতোষ্ণ।

ভোর হলে পিঠে-পার্বণের বহু প্রত্যাশিত তিথি।

কিন্তু বিদায়করুণ এই প্রভাত। বিসর্জনেব বেদনায় এ যেন পৌষালী বিজয়া। ভোর বেলায় দলে দলে মেয়েবা সরা মাথায়,—চৌদোল মাথায় কিংবা টুসুরাণীকে মাথায় নিয়ে, বিভিন্ন গৃহ থেকে বিভিন্ন পাডা থেকে বেরিয়ে পড়বে নিকটবর্তী কোন নদী বা অন্য কোন জলাশয়ের উদ্দেশে। এক দল হয়ত আর এক দলের টুসু সম্পর্কে কুৎসার গান গাইবে; নিজেদের টুসুর গুণগরিমা প্রকাশ করবে গানে। আব এক দল জবাব দেবে মুখের মতো। কবির লড়াই বেধে যাবে পথপরিক্রমাতেই, নদীব বা পুকুরের ঘাটেও তার

চারদিক থেকে সবাই ছুটে চললো টুসুকে দেখতে, ইচাগড থানার সতীঘাটায়। সুবর্ণরেখার একটি ঘাটে তারা দেখতে পেল টুসুকে আর সেই সন্ন্যাসীবেশী বরকে। লোকের আনন্দের অবধি রইল না। কিন্তু এত আনন্দ সইল না। অনাহারে অনিদ্রায় টুসুর স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছিল। বাঞ্ছিতকে পাবার পরেই তার মৃত্যু ঘটে সেইখানে।

বাঞ্ছিতের জন্য টুসুর এই আত্মবিসর্জনকে কুর্মী বা মাহাতো সম্প্রদায়ের মেয়েরা গভীর শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করে চলেছে আজও। ইচাগড় থানায় (বর্তমানে সিংভূম জেলার অন্তর্গত) সতীঘাটায় আজও টুসু উৎসব উপলক্ষ্যে বিরাট জনসমাবেশ হয়।

অনুবৃত্তি চলে। তাবপব ভাসিযে দেওয়া হবে প্রদীপ সহ সবা এবং চৌদোল, বিসর্জিত হবে টুসু মূর্তি। মেয়েবা ডুব দিয়ে স্নান কববে: মকব স্নান। নতুন কাপড চোপড পবে—বাড়ী ফিবে পিঠে খাবে ঝোলাগুড দিয়ে।

ধলভূম এবং ঝাডগ্রাম অঞ্চলে টুসু মূর্তিবই বিশেষ প্রাধান্য—, গোববেব নাডু ভবা সবা বা চৌদোল কিছুই থাকে না। মূর্তিটিকে মেযেব আদবে, বোনেব স্নেহে মণ্ডিত কবে সকাল সন্ধ্যে দু বেলাই ফুল দিয়ে অচনা কবা হয।

কিন্তু আদিম শস্যোৎসবেব বিবর্তন শেষ পযন্ত মূর্তিতে এসে স্থিতিলাভ কবল কি কবে। মূর্তিপুজোব প্রভাব এ প্রসংগে মনে পডা স্বাভাবিক।

ধলভূম-ঝাডগ্রামেব টুসু অচনাব সংগে মানভূম-বাঁকুডাব টুসু এবং তুষু ব্রতেব মিল-ও আছে, গবমিল-ও আছে, কিন্তু টুসু মূর্তিব প্রাবান্য শুধু বিশেষ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকল কি কবে' লোকসাহিত্যবসিক অধ্যাপক আশুতোস ভট্টাচায বলেন যে মানভূমেব ভাদু মূর্তিব অনুকবণেই টুসু মূর্তিব প্রচলন। কথাটি খুবই গুরুত্বপুর্ণ এবং সত্যসম্ভূত বলেই মনে হয়। ধলভূমে বা ঝাডগ্রামে ভাদুবাণীব স্মৃতি উৎসব একেবাবেই নেই, তবুও একথা বলাব পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে যে ভাদুবাণীব প্রভাব পডেছে টুসুবাণীব ওপব।

দক্ষিণ পশ্চিম মানভূম এবং বাঁকুডাব কোন কোন অঞ্চলেও টুসু মূর্তিব চলন আছে, তবে তা ততখানি প্রাবান্য বিস্তাব কবে নি। কিন্তু ভাদু মূর্তি এ সব অঞ্চলে সুপ্রচলিত। একথা ইতিহাস-স্বীকৃত যে ধলভূম ঝাডগ্রাম এবং ময়ুবভঞ্জেব মাহাতো সম্প্রদায একদা মানভূম থেকেই নিজেদেব লোক-সংস্কৃতি নিয়ে ঐ সব অবণ্যভূমিতে বাসস্থান কবেছিল। কালে কালে টুসুব বিবর্তনও ঘটেছে ঐ সব অঞ্চলে, মূল মাতৃভূমি মানভূম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াব ফলে। তাই আজ কোথাও বা সবা নেই, মূর্তি আছে, কোথাও বা ছডা নেই, গান আছে, কোথাও বা প্রার্থনা নেই পুজো আছে। সবকিছুকে ছাডিযে সংগীতই লাভ কবেছে আত্মবিকাশেব সুযোগ। হয়ত একথাও ঠিক, ভাদু-বাণীব অনুকবণে টুসুবাণী পববর্তীকালে বাণী হয়েছেন, পুর্বে তিনি টুসুই' ছিলেন। ভাদুবাণীব স্মৃতি উৎসব মানভূম (বিশেষ কবে পুর্ব-মানভূম) বাকুডা, বীবভূম, প্রভৃতি জেলাব কোন কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত, এ ক্ষেত্রে ভাদুব মূর্তি ছাডা উৎসবই চলে না।

এ কথা ঠিক, ভাদু উৎসব টুসুব চেয়ে পুবোনো নয়। এব লোকশ্রুতিমূলক ইতিহাস অবিশ্বাস্য মোটেই নয। বীবভূমেব পোযলা, বাকুডাব তুষতুষলা

বা তুষু এবং মানভূম ধলভূমের টুসুর বয়সের গাছপাথর নেই, কিন্তু হলে কি হবে, ভাদুরাণীর দৌলতেই প্রাচীন টুসু রাণীগিরি করছেন। এও দেখা গেছে যে টুসুগান ও ভাদুগানের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে যথেষ্ট, এমন কি একই গান সামান্য অদলবদল করেই উভয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। টুসুব ওপর আর একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রভাব পড়েছে ভাদুর। যার ফলে মানভূম ধলভূম ঝাডগ্রাম থেকে, টুসুর কাছে মনোমত স্বামী চাওয়া, গংগার জলে মরণ হওয়া, ধনেধান্যে লক্ষ্মী পাওয়ার কামনা বাসনা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। টুসুকে কামনা পুরণের দেবী রূপে আর দেখা হয় না, পরিবর্তে টুসু এখন মাতা-কন্যা-ভগ্নী-সহচরী-বান্ধবী-রূপা, সমাজেরই একজন অন্তরংগা নারীমাত্র। আর এই অন্তরংগা নারী, কুমারীকুলের ছোট্ট গণ্ডী ছাডিয়ে নারীকুলের সর্বস্তবে ছডিযে পডেছেন। তাই টুসুকে অবলম্বন করে যে সমস্ত গান কামিনীরা রচনা কবেছেন, লোক-কবিবাও মাঝে মাঝে যে রচনায় অংশগ্রহণ করেছেন, সে গান কুমারীদেব কামনা বাসনাকে ছাডিয়ে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাই এ সব গানের মধ্যে টুসু উপলক্ষ্য মাত্র, আসল লক্ষ্য হচ্ছে আত্ম-প্রকাশনাব দিকে, অবচেতন মানসের রূপবিকাশের দিকে। এ আত্মপ্রকাশ কোন কোন ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমান্ত অতিক্রম করেছে,—কিন্তু তার ভেতরেও প্রকাশভংগীর অভিনবত্ব আছে। তা'কে অশ্লীল বলে উডিয়ে দেওয়া চলে না। দশ বাবো বছরের কুমারী মেয়েদেব মুখে সে গান অশোভনীয়, তাই বোধ হয় বিবাহিতা চপলা তরুণী বা রসিকা প্রৌঢাদের কণ্ঠেই সে গান বাসা বেঁধেছে। সাধারণত তাদের গৃহস্থালীর কথা, সমাজেব কথা, পরিবেশ-প্রতিবেশের কথাই গানের ভেতব দিয়ে ব্যক্ত করা হয়। আজকাল রাজনীতির ক্ষেত্রেও টুসুগান অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। পৌষসংক্রান্তির পুর্বরাত্রির জাগরণ এবং পৌষসংক্রান্তির টুসুভাসানের উৎসব পুবোপুরি সংগীতমুখব, টুসুগানের অধিকাংশই ঐ সময় গীত হয়। অন্যান্য দিন সন্ধ্যের সময় খুব বেশী গান যে গাওয়া হয়, তা নয়, গান গাওয়ার মাত্রা তত বাডে যত পৌষসংক্রান্তির দিন এগিয়ে আসে।

টুসুগানের আকার খুব বড়ো নয়, দু চার কলির ভেতর দিয়েই হাজারো কথার প্রকাশ সেখানে। অনেক ক্ষেত্রে এই গ্রাম্যগানগুলি কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। নারী-কণ্ঠের কাকলী, ছোট্ট কলিগুলোকে প্রাণবন্ত করে তোলে, সহজ সুরে, সহজ ভাষায়। গানের শেষে 'ধুয়ো' অর্থাৎ ধ্রুবপদও

আছে, যার সংগে মূল গানের কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। টুসু ত উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে আত্মপ্রকাশনা। দেখতে পাব টুসুর ওপর আরোপিত হচ্ছে সব কিছুই, যা একান্তভাবে তাদের নিজের কথা। তাই গানের মধ্যে টুসু কখন-বা তাদের ঘরের মেয়ে, কখন-বা সহচরী কখন-বা মাতা। আর গানের বিষয়বস্তু তো সব কিছুই। গোটা একটা সমাজের রূপরেখা: প্রেমের গান, প্রীতির গান, সুখের গান, দুঃখের গান, হাসি-ঠাট্টা আনন্দের গান, এমনকি অশ্লীল গানও। গানের মধ্যে পরিবেশ আছে, প্রতিবেশ আছে, বিধিনিষেধ, কর্তব্যবোধ আছে, পুরাণ আছে, কাহিনী আছে, কটাক্ষ আছে, ঈর্ষা আছে, অভিসার আছে, অভিমান আছে, রাজনীতি আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, এ গানের মধ্যে পল্লী হৃদয়ের কাব্য আছে। পশ্চিমপ্রান্তিক রাঢ়ভূমির মতো এই গান। ঝর্ণাধারার মতো সহজ, স্বচ্ছ এর সুর। ঝর্ণার মতো চঞ্চল আর অনাবৃত এর গতি। এর ভাষায় পাহাড় বনের আদিমতা, পলাশ ফুলের মাধুর্য এর প্রকাশে, শালবনের ঘন জমাট নিবিড় ভাব এর কথায়। আর আছে পাথরের কুচির মতো, লাল রংয়ের কাঁকরের মতো প্রকাশভংগী—যা আঘাত দেয় রুচিবানদের। এ গান সম্পূর্ণরূপে প্রান্তভূমির মাটির গান, মাটির একান্ত কাছাকাছি আছে যে মানুষগুলি, তাদের গান। সহজ গান, সবল গান, স্বচ্ছ গান।

—তিন—

পৌষের শীতার্ত সন্ধ্যা। মোটা শাড়ীতে ভালো করে গা ঢেকে নেয় মেয়েরা। এ-পাড়ার মেয়েরা ও-পাড়ায় যায় টুসু দেখতে। এদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য গান ছাড়া আর কি আছে, গানের মধ্যে রস রংগ, হাস্য পরিহাসই আসল, এতে দুঃখ পায় না, ব্যথাও পায় না কেউ। মেয়েরা হয়ত রসিকতা করে গাইল:

টুসু দেখতে আলি[১] তোরা বস্‌লি লো ঢেঁকিশালে
যাবার বেলা খাতে[২] দিব লো পাটুবার্কুড়া জল খাতে।[২]

১ এলি। ২ খেতে।

খিল খিল কবে হেসে মেয়েগুলি গডিয়ে পডবে এ ওব গায়ে। কুঁডোব মতো গো-খাদ্য বস্তুকে-ও এবা অখাদ্য বলে মনে কববে না। বব' দল বেঁধে ধুয়ো ধববে সবাই ঃ

বল ভালবাসা
যেন ডামিনদহে হয় দেখা
বল ভালবাসা।

সীমান্তবাঙলাব মাহাতো, (কূর্মক্ষত্রিয়) বাগাল, বাউবী, ভুঞা প্রভৃতি সম্প্রদায়েব মধ্যে টুসু মোটেই কুমাবী ব্রত হিসাবে উদযাপিত হয় না। নিছক আনন্দ উৎসব রূপেই একে দেখতে পাওয়া যাবে। কুমাবী, বিবাহিতা, তরুণী, প্রৌঢ়া নির্বিশেষে সকলেই এতে অংশ গ্রহণ কবে। শুধু তাই নয়, ছেলেবাও এব থেকে দূবে সবে থাকে না। ছেলে-ছোকবাব দল যদি ভীড কবে টুসু দেখতে যায় তা হলে টুসু গানেব ধুযোতে অম্লমধুব কথাও শোনা যেতে পাবে, যা নিছক গালাগালি বলেই মনে হবে। হয়তো বা বলা হলো ঃ

শালা উঠে পালা
তোব গলাতে লাগাব বব্‌হাই দডা[১]
শালা উঠে পালা।

টুসুকে ঘিবে যে সান্ধ্য পবিবেশটি গডে উঠে, সে পবিবেশটি সীমান্তবাঙলাব ভূপ্রকৃতি ও জনপ্রকৃতিব সংগে একটি মধুব সাদৃশ্য বচনা কবে। মিট্‌মিট্ কবে মাটিব প্রদীপ জলছে টুসুব পাশে। মেয়েদেব পাশে কেবোসিন তেলেব ডিবি। তাব কালো শিখা উপবেব দিকে ঠেলে ঠেলে উঠছে। হয়ত বা চাঁদেব আলোই কোন কোন ক্ষেত্রে আলোকশিখাব প্রয়োজনকে দূবে সবিয়ে দিয়ে উপভোগ করছে টুসু গানেব মিঠে সুব। ন্যাডা ক্ষেত, বন্ধ্যা প্রান্তব, শালবন, বিশুষ্ক পাহাড, গ্রামেব সীমান্তে হয়তো বা স্তব্ধ হয়ে হিম খাচ্ছে। হয়ত বা ঘন অন্ধকাবকে ভেদ কবে একটিমাত্র আলোকশিখাব দীপ্তি ফুটে উঠছে কোথাও। মন দিয়ে শুনলে অনেক ধবণের গানই তখন শোনা যাবে। টুসু সংক্রান্ত গানই নয়, যে কোন সংক্রান্ত গানই শোনা যাবে। প্রচলিত গান ছাডাও অনেক মেয়ে মুখে মুখেই সহজভাবে সহজ কথায় টুসু গানেব সুব বসিয়ে দিতে পারে। অনেক সময় এই সব গানেব মধ্যেও নানা ধরনেব ইঙ্গিত ফুটে ওঠে। প্রেম-ভালোবাসার ইংগিত, অবৈধ দেহদানেব ইংগিত।

১ মোটা দডি

প্রান্তবেব বাখাল বাগালদেব সংগে মাঠে ঘাটে কাজ-কবতে-যাওয়া মেয়েদেব যে প্রীতিব সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাব কথাও অনিবার্যভাবে গানেব মধ্যে পাওয়া যাবে।[১] টুসুব সংগে যে কোন ধবনেব সম্পর্ক পাতিয়ে মেয়েবা আত্মসন্তুষ্টি চরিতার্থ করে। মেয়েদের দৈহিক গঠনেব জন্য ভূমিকর্ষণ কবা তাদেব পক্ষে সম্ভবপব না হলেও টুসুবাণীকে দিয়ে হাল চালনা কবাতেই হবে। বলা হবে,—

হামদেব টুসু হাল বাহে
ডাইনে বাঁয়ে লাল গোরু
বাছ্যে বাছ্যে কামিন[২] কববে গো—
দাঁত কালো কাঁকাল সরু।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কৃষক পল্লীব কোন এক তরুণেব উপব আবোপিত কবা হচ্ছে টুসুকে। বলা বাহুল্য, এই সব গানেব ভেতব দিয়ে তরুণী মেয়েবা তাদেব এক ধবণেব কামনা পবিতৃপ্তিব উপায় খুঁজে নেয়। কত কামনা বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষা যে ভবা থাকে মেয়েদেব মনে, তাব কি কোন হিসেব আছে। সমাজেব উচ্চ মঞ্চে যাঁবা বসে আছেন তাঁদেব বাড়ীব মেয়েদেব সঙ্গে সই পাতানব আকাঙ্ক্ষাও যে তাদেব থাকে তাও গানেব মধ্যে বলা হয়।[৩]

১ টুসুর চালে লাউ ফলেছে
লাউ তুলেছে বাগালে,
আবে বাগাল ধরা যাবিবে—
বড়বাবুব মহালে।
গেলি গেলি গেলি বাগাল
গেলি অনেক দূর রে—
মনে করে আনবি বাগাল—
লাল শালুকের ফুলরে।
লাল শালুকের ফুলে বাগাল
বড় বাঁধ ভরাবো রে
হেলে দুলে জল ডুবাবো
মাথায় তুলে লিব রে।

২ শ্রমিকা

৩ সরডিহার সরু চিড়া লাউদহতে ভিজাবো
রোহিনী গাঁয়ের ছুঁড়ির। [ছুঁড়িব] সংগে লো
গুরগুজ্ঞা ফুল পাতাবো।

ক্রমে শীতেব বাত আরও জমাট হয়ে আসবে। প্রদীপেব আলো আসবে ক্ষীণতব হয়ে। কেবোসিনেব ডিবে নিবুনিবু হয়ে আসবে, ঠাণ্ডা একটা বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে যাবে সর্বদেহ-মন। আগামী কাল সন্ধ্যেবেলায় মিলিত হবাব দুর্বাব কামনা নিযে যে যাব ঘবে ফিবে যাবে। এমনি কবে কাটবে সন্ধ্যেব পব সন্ধ্যে।

একদা যা ছিল কিশোবী, কুমাবী মেয়েদেব আকাঙ্ক্ষা পুবণেব জন্য প্রার্থনামূলক ছড়া মাত্র নানা পবিবর্তনেব স্তব অতিক্রম কবে সেই ছড়া হয়েছে গান এবং সেই গানেব বিষয়বস্তুতে আজ আব প্রার্থনাব লেশ মাত্র নেই।

অবশ্য এ কথা কিছুতেই জোব কবে বলা যায় না যে এদেব মধ্যেও ছড়াব অস্তিত্ব ছিল। ছড়াব অস্তিত্ব এদেব মধ্যে ছিল এমন কোন ইংগিত আমবা পাচ্ছি নে। তবে সীমান্তবাঙ্‌লাব বিশেষ কযেকটি সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়েব মধ্যেও (যাবা মূলত বাঙলাদেশেব বর্ণহিন্দুগোষ্ঠী) টুসুব ছড়া প্রচলিত আছে। মাহাতো প্রভৃতি সম্প্রদায়েব মধ্যে গানেবই প্রাচুয, ছড়া নেই। গানেব মধ্যে এমন সব বিষয এবং ভাব পাওয়া যাচ্ছে যা অপবিণত-বয়স্কা কুমারী মেয়েদেব মুখ থেকে আশা কবা যায় না। বলা বাহুল্য, সীমান্তবাঙ্‌লাব টুসু কেবল কুমাবীদেবই নয়, তরুণী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা সকলেবই। ফলে বযসেব স্তবভেদে টুসু গানেব স্তবভেদও পবিলক্ষিত হয় সবত্র। কযেকটি প্রেমেব গান দেওয়া হচ্ছে :

(১) কালো দেখে নামলম জলে জল হৈল মোব একগলা—
কে আছ গুণেব বঁধু তুলে ধব এই বেলা।

(২) গাড়ী এলো হুদা হুদা ও গাড়োয়ান তোব ঘব কুথা।
সুজন দেখে ফুল পাতাবো ঐ যে বাস্তা কইলকাতা॥

(৩) ওবে ওবে কালো ছোকবা তোব সংগে কি হাট যাবো,
পাড়াব লোকে জিগাস কবলে গো কি বলে জবাব দিব।

আবাব, প্রেমের একটা অসামাজিক রূপও আছে, গানেব মধ্যে তাব ইংগিত পাওয়া যায়। নিছক 'পলা-পৈঁচা'ব লোভেও প্রেম কবা যায়, কিন্তু এই সামান্য পলা-পৈঁচাও না পেলে প্রেমিককে "খালভবা" বলে তিবস্কাব কববাব অধিকাবও প্রেমিকাব আছে।[১]

১ কৈ দিলিরে পলা পৈঁচা কৈ দিলিরে আগবালা
লুলুক দিবার কবুল ছিল রে, কৈ দিলিরে খালভরা॥
[লুলুক=নোলক ; খালভরা=মড়া]

এমনি করে গানে ভরা এক একটি সন্ধ্যে রাতের ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। প্রত্যহ। আঁধার মিলিয়ে যাবে জ্যোৎস্নায় অথবা জ্যোৎস্না হয়ে যাবে অন্ধকার। এদিকে এগিয়ে আসছে মকরসংক্রান্তি। পিঠে পরব। 'বাঁউড়ীর' সারারাত ধরে অগ্ন্যুৎসব করবে ছেলে ছোকরার দল। বাজি পুড়িয়ে আকাশ-বাতাসের রূপ-গুণ বদলে দেবে তারা। ভোর হতে না হতে স্বরু হবে মকর স্নানের শোভাযাত্রা। সীমান্তবাঙলার শ্রেষ্ঠ উৎসব মকরপরব, সমতলবাঙলার দুর্গোৎসবের মতো। কোথাও বাজবে খোল আর করতাল। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে নাকাড়া-মাদল আর ঢাক ঢোলের গর্জনে চঞ্চল হয়ে উঠবে বন-পাহাড় মাঠঘাট নদীনালা আকাশ-বাতাস।

সরা মাথায়, চৌদোল মাথায়, টুসুরাণীর মূর্তি মাথায়, দলে দলে ছেলেমেয়ে যুবকযুবতীর দল বেরিয়ে পড়বে টুসুকে বিদায় দিতে, বিসর্জন দিতে। বিদায় দেবার পূর্ব মুহূর্তে গৃহের প্রাংগণে গান ধরবে:

আরে আরে বাজনদরিয়া ঢাকে থাড়ি দেনা রে—
শেষ বাইতে কোকিল ডাকেরে,
টুসু বিদায় দেনা রে।

তারপর অগণিত মানুষের ভীড় এগিয়ে যাবে বিভিন্ন পাড়া থেকে, বিভিন্ন গ্রাম থেকে কোন এক স্রোতস্বিনীকে লক্ষ্য করে। গানে গানে ছয়লাপ হবে পথঘাট। বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও টুসু গানের মাধ্যমে তাদের মতবাদ প্রচার করে চলেছেন। বাঙলাভাষাকে বিলুপ্ত করার চক্রান্তকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে মানভূম জেলায়, লোকসেবক সংঘের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তারই নাম খ্যাত হয়ে আছে টুসু সত্যাগ্রহরূপে। এই সমস্ত রাজনৈতিক গানের মধ্যে লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না, তবু গণসংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবেও এই টুসু গান ঐতিহ্য রচনা করেছে।[১]

১ টুসুর বিবর্তনের সংগে সংগে পুরাণকাহিনীও তার মধ্যে কিছু কিছু অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে। ঘাটশীলার স্বর্গত কবি কৃষ্ণচন্দ্র রাউল যে সব টুসু গান রচনা করে গেছেন, বর্তমানে তা সাধারণের সম্পত্তি হয়ে গেছে। তাঁর টুসু গানে লোকায়ত-ভাবের প্রকাশ তেমন দানা বাঁধেনি। রাধাকৃষ্ণের কথা এনে আসল টুসু গানের মূল স্পন্দনটিকে তিনি ব্যাহত করেছেন। তাঁর একটি গান উদ্ধৃত করছি:—

ও সই দলে দলে
মেয়েরা সব যাচ্ছে গো যমুনার জলে।

এমনি করে সারা পৌষের উৎসব শেষ হয় পৌষ সংক্রান্তিতে। এ কালের কবিরা টুসুকে পুরোপুরি হিন্দুয়ানীর পোষাক পরাতে গিয়ে প্রচলিত সংস্কৃত মন্ত্রের অনুকরণে সংস্কৃত মন্ত্রও রচনা করেছেন,[১] কিন্তু সীমান্তবাঙলার টুসুকে সংস্কৃতমন্ত্রে পাওয়া যাবে কি করে। দেব ভাষাতে টুসুর রূপ বর্ণনা করা যায় না। সীমান্তবাঙলার ভাষাতেই তা সম্ভব :

আদাড়ে বাদাড়ে পদ্ম পদ্ম বই আর ফুটে নাই
হামদের টুসুর পায়ে পদ্ম গো
ভমর বৈ আর বৈসে নাই।

শাঁখা হাতে মিশি দাঁতে গো পান খেয়ে সবাই চলে
দুলছে পাছা কলপ কাচা আচল শাড়ি আঁচলে।
গায়ের সুবাস লক্ষ্মীবিলাস গো কেউ মেখেছে কুন্তলে
নাকের মাঝে নথ বেসরা বক্ষেতে হার ঝলমলে
পায়ের নূপুর ঝুমুর ঝুমুর গো বাজিছে তালে তালে।
বলে বাউল নাগরী কুল খাবি শ্যাম কদম তলে।

১ (১) গৌরবর্ণাং সুরূপাঙ্গ নানালংকারশোভিতাং।
সর্বলক্ষণসম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাং ॥
দিব্যবস্ত্রপরিধানাং শংখপদ্ম-ধরাং শুভাং।
প্রসন্নবদনাং দেবীং ধ্যায়েৎ তুষলাং সর্বসিদ্ধিদাং ॥
. ...
(২) আগচ্ছ দেবী তুষলে শুভদে সুরসুন্দরী।
পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য প্রতিষ্ঠস্ব মমাঙ্গনে ॥
নমামি তুষলে দেবী সর্বসৌভাগ্যদায়িনি।
তুষলে ত্বং জগন্মাতঃ হস্তসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে ॥

(ঘাটশিলা-নিবাসী স্বর্গত কবি
কৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল কর্তৃক রচিত।)

অনুপর্ব

॥ সীমান্তবাঙলার নৃত্যগীত ॥

—এক—

আদিম শ্রেণীহীন সমাজের রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণ, আচার-আচরণ প্রভৃতি ঠিক যেমনটি ছিল, বর্তমানের শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে তেমনটি আর পাওয়া যাবে না। অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর ভিত্তি করে সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো বদলেছে বারবার, এবং সভ্যতার বর্তমান স্তরে পৌঁছুতে সময়ও লেগেছে অনেক। কিন্তু একথা ঠিক, প্রত্যেকটি আদিম শ্রেণীহীন সমাজ সমানভাবে সমানতালে পা ফেলে অগ্রসর হয়নি। ফলে, নানানভাবে বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ পৃথিবীর ইতিহাসে একই সময়ে যে বেঁচে থাকতে পারে এই সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। এই সব বিভিন্ন সমাজের প্রকৃতি মোটামুটি উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং এই উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেই মানুষের শিল্প সংস্কৃতি আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম ও ক্রমবিকাশ।

সমাজ-ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, সে পরিবর্তনের গতি কখন শম্বুকতুল্য, কখন দ্রুতপদী। কিন্তু যে-কোন সমাজের ধর্ম, কর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্পকলা প্রভৃতি বিচার ক'রে দেখলে অনেক সময় তা'র মধ্যে অতি আদিম যুগেরও খোঁজ পাওয়া যাবে। বাঙালী সমাজের দিনচর্যার মধ্যে অনেক প্রাচীন প্রথার আত্ম-গুপ্তি আজ আর কারুরই অজ্ঞাত নয়, যদিও বাঙালী শিল্প-সংস্কৃতি ধর্ম-আচার প্রভৃতির বাহ্যিক প্রকাশের মধ্যে প্রগতির ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে অঞ্চলভেদে সামাজিক বিবর্তনের ধারাও ঠিক সমানতালে অগ্রসর হতে পারে নি।

বাঙলাদেশের পশ্চিমসীমান্তে আর এক বাঙালী সমাজ গড়ে উঠেছে। সে সমাজ বাঙলাভাষীদের, কিন্তু সমতল বাঙলার সামাজিক কাঠামো তা'র মধ্যে এখনো পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি। সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে একই সময়ে, একই দেশে, একই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেও যে পার্থক্য থেকে যেতে পারে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সীমান্তবাঙলার বর্তমান সমাজ এবং এর পুরোভাগে আছে ধলভূম-মানভূমের কুর্মক্ষত্রিয় এবং ভূমিজ সম্প্রদায়। আরও কয়েকটি ছোট-

খাটো গোষ্ঠীও এই পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু কূর্মক্ষত্রিয় (মাহাতো) বা ভূমিজ গোষ্ঠী এ বিষয়ে অগ্রগণ্য। বলা বাহুল্য এই দুটি গোষ্ঠীই কৃষিজীবী। ভূমিনির্ভর এই সব গোষ্ঠী আজও ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দু সম্প্রদায়ের পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি বটে, কিন্তু গতি এদের অব্যাহত।

ভূমিজ গোষ্ঠী, বাঁচির মুণ্ডাগোষ্ঠীর রক্তসম্পর্কিত এবং এদের মধ্যে বর্তমানে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, অথচ উনিশ শতকেও বাঁচির মুণ্ডাদের মধ্যে আদিম সাম্যতন্ত্র নিশ্চিতরূপেই ছিল।

কূর্মক্ষত্রিয় বা মাহাতো গোষ্ঠী কৃষিকার্যকে অবলম্বন করে ভূমিজদের চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এদের রীতিনীতির মধ্যে বিশেষ করে ধর্মচর্চার মধ্যে, অন্-আর্যভাষীদের বহু প্রথা জীবন্ত। সীমান্তবাঙলার এই সব গোষ্ঠীর নৃত্য এবং সংগীতের মধ্যে, যৌথ প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে আজও। বলা বাহুল্য, লোকসংগীত এবং লোকনৃত্যের আদিমছন্দ আজও আছে, মানভূম ধলভূমের অরণ্য পাহাড়ে, অনুর্বর বন্ধ্যা মাঠের সীমায়, পাহাড়ী নদী আর ঝর্ণা ধারার কোল ঘেঁসে—গ্রামের সহজ পরিবেশে।

আদিম সাম্যতন্ত্রে যখন উৎপাদন পদ্ধতি অনগ্রসর ছিল, নানাবিধ প্রাকৃতিক বিঘ্ন যখন কৃষির অগ্রগতিকে ব্যাহত করছিল প্রতি পদে, তখন অলৌকিক উপায়ে, যাদু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তখনকার মানুষ বিঘ্নের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিল সন্দেহ নেই, এবং সেই সময়েই নৃত্য-সংগীতের অনুষ্ঠান আদিম ধর্মব্যবস্থার—অর্থাৎ যাদু বিশ্বাস এবং ভূত উপাসনার অংগীভূত হয়েছিল। অবশ্য এই যাদু বিশ্বাসের পূর্বেও আর একটা স্তর ছিল যখন না ছিল দেবতা, না ছিল বলিদান প্রথা।[১] কিন্তু সেই আদিম সাম্যতন্ত্রের মধ্যেই যখন স্তর পরিবর্তনের সূচনা হল তখন ধর্মবিশ্বাসের আদিমতাও এসে পড়েছিল সন্দেহ নেই। সীমান্তবাঙলার জনজীবনের সংগে এমন এক আদিম ধর্ম বিশ্বাস আজও বাসা বেঁধে আছে, তাদের নাচে গানে অনুষ্ঠানে এমন কিছু স্বকীয়তা বিদ্যমান, যা' সেই প্রাচীনতম সমাজের মধ্যেও ছিল।

১ Religion is characterised by belief in God and the practice of prayers and sacrifice The lowest savages known to us have no Gods and know nothing of prayers or sacrifice Similarly whenever we can penetrate the pre-history of civilised peoples, we reach a level at which again there are no Gods and no prayers or sacrifice.'

—Dr S N. Dasgupta

একটি জিনিস লক্ষণীয় যে, সীমান্তবাঙলার এই অঞ্চলে যে ধরনের যৌথ-নৃত্য আছে, তা শিল্পচর্চার অবকাশের মধ্যে স্বপরিকল্পিত নয়, তার মধ্যে সহজ প্রচেষ্টার এবং সহজ স্ফূর্তির এক অস্পষ্ট চেতনা এবং এর মধ্যেও কৃষিকার্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাই ঋতু হিসাবে নাচ এবং গান পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন যৌথনৃত্য এবং যৌথসংগীত এই অঞ্চলে ধ্বনিত হয়। অবশ্য এই নাচ আর গানের মধ্যে পুরোপুরি সব কিছুই যে আদিম ধর্মবিশ্বাসের অংগীভূত হয়ে আছে, একথা জোর করে বলা যাবে না। কারণ, নানাভাবে নানা প্রভাব এবং পরিবেশ প্রতিবেশের নানা স্পর্শ এর মধ্যে কিছু কিছু প্রবেশ করেছে অনিবার্যভাবে। ঝুমুরের কথাই ধরা যাক। ঝুমুর বললে অনেকে শুধু নাচই বোঝেন, আসলে কিন্তু ঝুমুর নাচ এবং ঝুমুর গান এমন অংগাগি-ভাবে জড়িত যে একটিকে বাদ দিলে আর একটি চলে না। চলার পথে অবশ্য আজকাল আর তেমন বাধা নেই। সীমান্তবাঙলাতে কিন্তু ঝুমুরের অর্থ—'ঝুমুর গান' এবং সে গানের সংগে যে নাচ তাকেই বলা যেতে পারে ঝুমুর নাচ। তাই ঝুমুর নাচ মানে বিশেষ এক ধরনের নাচ নয়, ঝুমুর নাচ মানে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের গানের সংগে যে নাচ, তাই-ই ঝুমুর নাচ।[১] প্রাচীন সমাজে গান আর নাচকে আলাদা করে রাখা যেত না. কথা দিয়ে এবং অংগভংগী করে সে যুগের মানুষ নিজেদের কামনা-বাসনাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিল। সীমান্তবাঙলার জনগোষ্ঠী সমাজ-বিকাশের প্রত্যেকটি পর্যায়ে সমানতালে এগিয়ে চলতে পারেনি বলে তাদের মধ্যে এই নাচ-গানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটুকু আজও বিলুপ্ত হয় নি। তা বলে এ কথা বলি না যে সব গানই নাচের সংগী অথবা সব নাচেই গান অপরিহার্য। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাচ এবং গান সহযাত্রী এবং অনেক ক্ষেত্রেই নাচের ভঙ্গিমা যাদু বিশ্বাসের শেষ পর্যায়। আদিম বর্বর সমাজে নাচের ভঙ্গি দিয়েই প্রকৃতিকে বশীভূত করার চেষ্টা চলত।[২] সীমান্তবাঙলার জনগোষ্ঠীর এই

১ ঝুমুর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২ "When a savage wants sun or wind or rain he does not go to Church and prostrate himself before a false God: he summons his tribe and dances a sun dance or a wind dance or a rain dance. When he would hunt to catch a bear he does not pray to his god for strength to outwit and to outmatch the bear; he reherses his hunt in a bear dance"

Jane Harrison

(Ancient Art and Ritual)

লোকনৃত্যের মধ্যে সাঁওতাল এবং মুণ্ডা লোকনৃত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। সাঁওতাল অথবা মুণ্ডা সমাজে একক নৃত্য একেবারেই নেই, তবে, তাদের মধ্যে যৌথ-সংগীতেব প্রাধান্য থাকলেও, একক সংগীতের প্রচলনও আছে। তেমনি—মানভূম ধলভূমের লোকসংগীত মূলত যৌথসংগীত হলেও ঝুমুরের কয়েকটি শাখায় একক প্রচেষ্টা বর্তমানে সুপরিস্ফুট।

এই সব যৌথ নৃত্যের মধ্যে গোল হয়ে অথবা অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে সহজ ভঙ্গিতে পদ-চালনা করার রীতি মুণ্ডা-সাঁওতাল সমাজেও যেমন আছে, সীমান্ত-বাঙ্‌লার জনসমাজেও তেমনি রীতি বিদ্যমান। এই ধরনের নাচ গানেব গোড়ার কথাতেই যাদু বিশ্বাস অথবা কৃষিসংক্রান্ত অনুষ্ঠান আছে বলে অনেকের অভিমত।[১]

সীমান্তবাঙ্‌লার জনজীবনে ঝুমুরের প্রভাব অপরিসীম।

বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের ঝুমুর (নাচ ও গান) মুণ্ডা সমাজের উৎসব নৃত্যের সংগে সম্পর্কিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পাবে। মুণ্ডাদের মধ্যে যেমন, বিভিন্ন ঋতুর শস্য-উৎসবের সংগে জড়িত জার্গা বা মাগে, যতুরা, জাপি এবং লহুয়া বা করম নাচ আছে, সীমান্তবাঙ্‌লার দাঁড়শাল নাচ, পাঁতা নাচ, কাঠিনাচ, ছোনাচ প্রভৃতিও ঋতুভেদে অনুষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য সীমান্তবাঙ্‌লার পুরোনো সমাজের সব কিছুই অবিকৃতভাবে আজ আর নেই, তাই অনেক ক্ষেত্রে নাচের বিলুপ্তিও ঘটেছে। কূর্মক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠানের নৃত্যচর্চা বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়, বৃহত্তর হিন্দু গোষ্ঠীর অনুকরণ করতে গিয়েই যে এটা হয়েছে তা অবিসম্বাদিভাবে সত্য। কিন্তু গান বেঁচে আছে আজও, এবং লোকসঙ্গীতের সমস্ত আদিমতা এই অঞ্চলের গানের মধ্যে নিহিত।

করম নাচের মধ্যে ধান্যরোপণ পদ্ধতির ভঙ্গিমা আছে। সীমান্তবাঙ্‌লার এইসব উচ্চভূমিতে সে সময় আউশধানের সমারোহ, আর পাহাড়-বনের প্রান্তদেশে 'কানালী' বা 'শোল' এবং 'বহাল' জমিতে তখন আমন রোপণের পালা। করম উৎসব মূলত শস্য-উৎসবই, শস্য-সংগ্রহের উৎসব, শস্য-উৎপাদনের উৎসব। ফলে, নাচের মধ্যেও ধান্যরোপণ এবং ধান্যচ্ছেদনের

১ "Dance songs are in one sense on the borderline of functional folksong. They come from two general sources. The simpler dances such as round dances are apt to be rather old. Many of them must have ritualistic connotations which to-day are usually forgotten."

—Standard Dictionary of Folklore, page 1005

ভঙ্গিমা সুস্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হয়। মুণ্ডাদের লহুয়া নাচ এবং সীমান্তবাঙ্লার দাঁড়শাল বা পাঁতা নাচের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নেই। তবুও স্বীকার করতে হবে যে সীমান্তবাঙ্লার সমাজ এবং ছোটনাগপুরের মুণ্ডা বা ওরাওঁ সমাজ আর পাশাপাশি অবস্থান করছে না। ফলে বৈসাদৃশ্য কোনও না কোন দিক দিয়ে এসে পড়া অসম্ভব নয়। তবে নাচের ভঙ্গিমায়, উভয় সমাজেই আদিমতা আছে এবং পদক্ষেপের রীতিতে ওরাওঁ এবং মুণ্ডা সমাজের লহুয়া বা করম নাচের রীতির সংগে সীমান্তবাঙ্লার নাচের মিল আছে। পণ্ডিতদের মতে এই নৃত্যভঙ্গিমা শস্যোৎসবেরই ইংগিতবাহী, প্রচুর শস্য কামনার জন্য যাদুক্রিয়া।[১]

আগেই বলেছি সীমান্তবাঙ্লায় ঝুমুর নাচ বলে কোন বিশেষ ধরনের নাচ নেই। যদিও বীরভূমের ঝুমুর নাচ বা খেমটা নাচ দেখে অনেকের পক্ষেই ধারণা করা অসম্ভব নয় যে ঝুমুর মানেই এক বিশেষ ধরনের নাচ, যাতে কোন নর্তকী অংশ গ্রহণ করে। সীমান্তবাঙ্লায় ঝুমুর গানের ছড়াছড়ি এবং বিভিন্ন ধরনের ঝুমুরের সংগে যদি বিভিন্ন ধরনের নাচও থাকে, তাহলে তাকে ঝুমুর নাচ বলা যেতেও পারে। মুণ্ডাদের মধ্যে ঝুমুর বা ঝুমির নাচ আছে। মুণ্ডা সমাজের গানের সুর—সীমান্তবাঙ্লার বহু ঝুমুরের মধ্যেই নিহিত আছে আজও। যাই হোক্ ঝুমুর নাচ নয়, তার জন্য কোন তর্কের অবকাশ নেই। মানভূম-ধলভূম-ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে যে 'নাচনী-নাচ' আছে, বীরভূমে তাকেই বলে ঝুমুর নাচ। কিন্তু এ অঞ্চলে ঝুমুর মানেই গান। দাঁড় ঝুমুর, টাঁড় ঝুমুর,

১ "Karam dances performed during this season are rude representatives of the occupation of the people. The posture of the dancer is very graceful and the movements slow. The young men at times kneel down and each girl stooping low sways one arm backwards and forwards as if the imitation of reaping paddy crops. This movement of the hands may not improbably be intended as a magical operation calculated to ensure an abundant harvest."

—The Oraons of Chhotanagpur
(by S. C. Roy)

"The women in this dance (Karam) follow the men and change thair positions and attitudes in obedience to signals from them. When the movement called 'hoja' is asked for, the women all kneel and pat the ground with their hands in time to the music, as if coaxing the earth to be fruitful."

—E. T. Dalton
(Descriptive Ethnology of Bengal)

ঝাড়খাঁড়িয়া (ঝাড়খণ্ডী), ভাদুরিয়া ঝুমুর, পাঁতা নাচের ঝুমুর, নাচ্‌নী নাচের ঝুমুর, কাঠি নাচের ঝুমুর—আরও কত কি ঝুমুর, এ-ছাড়া আছে সাধারণ ঝুমুর যা সব সময় গাওয়া যেতে পারে এবং অনেকগুলিই কিছু কিছু লেখা-পড়া-জানা লোকের রচনা ; যার মধ্যে আসল লোকসংগীতের আদিমতা ততখানি সংহত নয়। সব ঝুমুর গানে আবার নাচ নেই। দাঁড় ঝুমুরের নাচের নাম দাঁড়শাল নাচ , করম উৎসবে যে ঝুমুর গান, তার নাচের নাম কোথাও পাঁতা নাচ এবং কোথাও দাঁড়শাল নাচ। তাছাড়া অন্যান্য নাচের সংগেই ঝুমুর গান তো আছেই। এদিকে ভাদুরিয়া ঝুমুর, টাঁড় ঝুমুর, ঝাড়খাঁড়িয়া ঝুমুর বা সাধারণ ঝুমুরে নাচ চলতেই পারে না। ক্ষেতে, মাঠে, বনে বাদাড়ে, পথ পরিক্রমায় এ ঝুমুর একক বা সংঘবদ্ধ ভাবে গীত হতে পারে মাত্র।

বলা বাহুল্য, সংগীত-দামোদর নামক গ্রন্থে ঝুমুর বা ঝুমুরিকে রাগিণী বলেই অভিহিত করা হয়েছে[১] , কোন এক ধরনের নাচ বলে নয়। এবং এ রাগিণী একান্তভাবেই লৌকিক। ছয় রাগ—ছত্রিশ রাগিণীর মধ্যে এ রাগিণীর স্থান নেই।

দাঁড়শাল বা দেঁউড়া নাচ, বর্তমানে শুধু পুরুষদেরই নাচ। মেয়েরা, বিশেষ করে মাহাতো সম্প্রদায়ের মেয়েরা নাচ প্রায় বর্জনই করেছেন। কর্মক্লান্ত দিবসের শেষে মাদল এবং ধুমশা নিয়ে গ্রামীণ শ্রমজীবী এবং কৃষি-জীবীদের আখড়ায় এই নাচ হয় আর গান চলে। পাঁতা নাচে স্ত্রী পুরুষ সবাই নাচে। হাত ধরাধরি করে বৃত্ত রচনা করা এ সমস্ত নাচেরও অংগীভূত। এসব গানের বিষয়বস্তু সমগ্র পরিবেশ প্রতিবেশ। ভগবান বা অন্য কোন দেবদেবীকে অকারণে গানের মধ্যে টেনে আনা হয় না। দাঁড়শাল নাচের ঝুমুরের একটি উদাহরণ দিচ্ছি :—

আমার বঁধু হাল করে কেঁদকানালীর[২] ধারে
হায় হায় মাথার ঘাম চোখে পড়ে
দেখে হিয়া ফাটে
ননদিনী লো, আমি নিজে যাবো বাসিয়াম[৩] দিতে।

---

১ প্রায়শৃংগারবহুলা মাধ্বীক মধুর মৃদু।
একৈব ঝুমরির্লোকে বর্ণাদি নিয়মোজ্‌ঝিতা॥"
—সংগীত দামোদর।

২ এক ধরনের জমি

৩ পান্তা ভাত।

বলা বাহুল্য, এ গান এক কৃষকবধূর বেদনামাখা গান।

টাঁড ঝুমুর মাঠে ঘাটে গাইবাব গান এবং তার জন্য সতর্কতার প্রয়োজন। কাবণ আদিম সমাজেব প্রেমনিবেদনেব সমস্ত পর্যায় এ গানের মধ্যে পাওয়া যায়। মাঠের মধ্যে কর্মরতা তরুণীদলকে লক্ষ্য করে তরুণেরা এ গান গাইতে পাবে: তরুণদলকে লক্ষ্য করেও তরুণীরা এ গান গাইতে পাবে। কিন্তু এ গান ততখানি সামাজিক বলে গণ্য নয়। উদাহরণ অচল।

ভাদ্রমাসে মাঠঘাটে ভাদুরিয়া ঝুমুরের ঐ ঋতুসংক্রান্ত কথা এবং সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ তার পশ্চাৎপট। সিংভূমের সেরাইকেলা থেকে সংগৃহীত একটি গান উদ্ধৃত কবছি, কৃষকদের দুঃখ বেদনার গান:

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে
নবীন মেঘে ঘেবলি—
ও-হোরে পানিকে বুঁদা না ববিষে
ও প্রাণ দিন ধরম[1] কেইসে।
চাষী-এ বুনিল ধান
ধান গেল অকাডান
কেযসে বাঁচম্ রে প্রাণ দারুণ আকালে
সিকি পুয়া চাউল নাহি মিলে।

অথবা—

বাইদে বুনিলাম ধান
ধান হল মানুষ পরমাণ,
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে না গেল কাড়ান
দাদা, কেমনে বাঁচিবে পরাণ।
ইত্যাদি।

মোটেব উপব এ কথা বলতেই হবে যে, ঝুমুব গান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তৎসহ নাচ সীমান্তবাঙলার জনজীবনে অংগাংগিভাবে জডিত এবং এইসব গান ও নাচের মধ্যে সমাজবিবর্তনের বিশেষ একটি স্তরের কাহিনী সংগুপ্ত। উপরিউক্ত গানগুলিতে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা বটে, কিন্তু পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুণ্ডাদের মধ্যে ঠিক এই ধরনের গানই শুনতে পাওয়া যায় যার মধ্যে একটি আদিম

১ ধরিব।

বিশ্বাসের সমুজ্জ্বল ছাপ আছে। সে গান যৌথ প্রার্থনার, যৌথ সংগীতের এবং যৌথ নৃত্যের, তার মধ্যে সেই আদিম যুগের কামনা। সমগ্র গানটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :—

নোতে হো দুদুগর
সিরমা হো কোয়াসি
নিমিন দিগ দা-গে বা নোয়া
চিমেন্তে কাগে গামাইয়া :
আষাঢ় শাঙ্গন ময়োদরাতি হো রানোয়া
ভাদোরগে ধরতী নোরে জানা।
চিমেন্তে কাগে গামাইয়া :
সিরিমারে সিংবোঙ্গা
ওতেরে মারাং দেওতা
চিমেন্তে কাগে গামাইয়া।
লাই বেননে দা তেতন
জিগে সোনাতানা।[১]

অনুবাদ :

শূন্যে উড়ছে শুকনো ধূলির কণা,
আকাশ, বাতাস পৃথিবী উঠছে ভরে,
ধূসর ছায়ায়, হায়গো বৃষ্টি কোথায় :
আষাঢ় শাঙন এই দুটি মাসে হায়
একটি ফোঁটাও ঝরে পড়লো না ভাখো।
এলো তারপর ভাদর, তবুও হায়
বৃষ্টি কোথায়। বৃষ্টি, বৃষ্টি, কোথায়।
মাথার উপর সিঙবোঙা, আর নীচে
ধরতীতে বোঙা মারাং দেবতা জাগেন
তবুও বৃষ্টি, হায়গো বৃষ্টি কোথায়।
পেটের জ্বালায় মৃত্যু বেঁধেছে বাসা
পিয়াসায় ছাতি ফেটে যায়,—যায়,—যায়
হায় গো—বৃষ্টি কোথায়।

১ Mundas and their Country—by S. C. Ray. (p. 533)

দাঁড়ালাম এসে মৃত্যুর সীমানাতে
হায় গো বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি কোথায়।[১]

—দুই—

(ক)

সাঁওতাল গোষ্ঠীর লোকযান এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়, তবুও সীমান্তবাঙ্‌লার নৃত্যগীত প্রসংগে এদের নৃত্যগীতের কথা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়, কারণ, সীমান্তবাঙ্‌লার সংস্কৃতির সংগে সাওতাল গোষ্ঠীর সম্পর্ক ক্ষীণ নয়।

সাঁওতাল শব্দটি 'সামন্তপাল' থেকে উদ্ভূত বলে পণ্ডিতদের অভিমত। পশ্চিম সীমান্তবাঙ্‌লায় সাঁ'ভূঁই নামে একটি অঞ্চল আছে। শুদ্ধ করে অঞ্চলটিকে সামন্তভূম নামেও অভিহিত করা হয়। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত এই অঞ্চলটিতে সাঁওতালদের সংখ্যা অল্প নয় এবং অনেকের মতে সামন্তভূমই হচ্ছে সাঁওতালদের আদি বাসস্থান। সীমান্তবাঙ্‌লার প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'ভূমি' স্থান অনেক। ধলভূম, মল্লভূম, শিখরভূম, মানভূম, তুঙ্গভূম, সামন্তভূম, বীরভূম, বরাহভূম, প্রভৃতি নামগুলি সীমান্ত অঞ্চলে খুবই পরিচিত। অবশ্য, আধুনিক মানচিত্রে এক একটি অঞ্চল হিসাবে এদের অনেকের অস্তিত্বই বিলুপ্ত। অষ্ট্রিকভাষী এই প্রাচীন সম্প্রদায়টিকে কবে কে সামন্তপাল আখ্যায় ভূষিত করেছিল, কে জানে। তবে নিজেদের বংশের ইতিহাস বলতে গিয়ে তারা "খেরওয়াল" বা "খেরওয়াড়" নামে নিজেদের অভিহিত করে। কিন্তু এ নামও এদের সকলের কাছে তত বেশী পরিচিত নয়। সাঁওতাল নামই এরা সহজ ভাবে গ্রহণ করেছে। [সাঁওতালদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে লিখিত একটি গ্রন্থের নাম : খেরওয়াল বংশা ধরম পুঁথি, রচয়িতা, ৺রামদাস টুডু, ঘাটশীলা, ভূমিকা লিখেছেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।]

সীমান্তবাঙ্‌লায় অষ্ট্রিকভাষী মুণ্ডা প্রভৃতি সম্প্রদায়ও বসবাস করে। মুণ্ডারা মূলত ছোটনাগপুরের রাঁচি জেলার অধিবাসী। ধলভূম মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে যে মুণ্ডা সম্প্রদায় বাস করে তাদের কিছু কিছু অংশ অষ্ট্রিকভাষাকে একেবারে পরিত্যাগ করেছে। সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ইতিহাসে এদের নাম করা

১ মুন্ডারী ভাষার এই গানটির ইংরাজী অনুবাদ থেকে বাঙ্‌লা অনুবাদ, আমার।

যেতে পারে সর্বাগ্রে। সাঁওতাল এবং ভূমিজ শব্দ দুটি এক সংগেই উচ্চারিত হয় সীমান্তবাঙ্‌লায়। ভাষাগত, সংস্কৃতিগত এবং নৃগোষ্ঠীগত একাত্মতাই এর কারণ। তবু এদের মধ্যেও যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাতে স্বতই প্রতীয়মান হবে যে সাঁওতাল সম্প্রদায় অন্য কোন হিন্দুধর্মী সম্প্রদায়ের প্রভাবযুক্ত নয়। আর প্রভাব যদি কিছু পরিমাণে পড়ে থাকে, তাও একান্তরূপে বাহ্যিক। বহুদিন ধরে 'দিকু' নামধারী হিন্দুদের কাছাকাছি অবস্থান করেও এরা নিজের ভাষা বর্জনের দিকে নজর দেয়নি, নিজেদের সংস্কৃতির মধ্যে ভেজাল কিছু আমদানী করেনি। ভূমিজ সম্প্রদায় এদিক দিয়ে তত রক্ষণশীল নয়। তারা গো-মাংস বর্জন করেছে, বিভিন্ন অঞ্চলে মুণ্ডা ভাষা পরিত্যাগ করে স্থানীয় আর্য ভাষা গ্রহণ করেছে এবং হিন্দুদের বিভিন্ন উৎসবাদিকে নিজেদের অংগীভূত করেছে। সীমান্তবাঙ্‌লার ভূমিজ ভূস্বামীদের অনেকেই ক্ষত্রিয় নামেও পবিচয় দিচ্ছেন।

সারা বাঙলা বিহার ওডিস্যায় সাঁওতালদের সংখ্যা অনেক। বর্তমান পশ্চিম বাঙলাতেই তাদের সংখ্যা প্রায় ন' লাখের মতো।[১] বিহারের অন্তর্গত ধলভূম এবং সাঁওতাল পরগণার দাম্‌নেকোহ্‌ এলাকায় এদের সংখ্যা-ও অনেক।

নিজেদের ভাষায় কোন সাহিত্যচর্চা এরা কবে না। বাঙ্‌লা দেবনাগরী বা রোমান লিপিব সাহায্যে বর্তমানে কোন কোন জায়গাতে সাঁওতালী ভাষায় লেখাপড়া করার সূত্রপাত হয়েছে বটে, কিন্তু তাও তেমন কার্যকবী হতে পারে নি। তার বিশেষ কারণ বোধ হয়, এদেব ভাষায় শব্দ-সংখ্যাব অপ্রতুলতা, যদিও এরা প্রাচীনকাল থেকেই বেশ কিছু আর্য শব্দ গ্রহণ কবে আসছে। আর্যভাষীদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে পারে নি বলেই এদের ভাষাও এগিয়ে যেতে পাবে নি। সীমান্তবাঙ্‌লায় এদের দ্বিতীয় ভাষা বাঙলা। বিহারের অন্তর্ভুক্ত বাঙ্‌লা-ভাষী অঞ্চলে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাইরের ভাষা আঞ্চলিক বাঙ্‌লাই। বাঙ্‌লাভাষার মাধ্যমেই এরা শিক্ষালাভও করে এসেছে। ইদানীং বাইরের ভাষা বাঙ্‌লা হলেও নানা কারণে এদের হিন্দীব মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু ঘরের ভাষা এদের নিজস্ব সাঁওতালী ভাষা।— সারা সাঁওতাল অঞ্চলে এই একই ভাষা ব্যবহৃত হয়, যদিও অঞ্চল ভেদে তা'র মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

১ Census 1951, West Bengal (The Tribes and Castes of West Bengal)
—by A. Mitra, I. C. S.

পশ্চিমবাঙলার মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়াতেই এদের সংখ্যা সর্বাধিক। তারপরেই বর্ধমান, দিনাজপুর, মালদহ, বীরভূম এবং হুগলীতে এই সম্প্রদায়ের বেশ কিছু সংখ্যক লোক বসবাস করে।

অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাই বোধ হয় একমাত্র কারণ, যার ফলে সাঁওতাল সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও ঘোরতর রক্ষণশীল। এদের মধ্যেও লোকনৃত্য ও লোকসংগীত তাই আজও আদিম-ধারাকেই সযত্নে রক্ষা করে চলেছে। বিশেষ কয়েকটি ঋতুনৃত্য এবং বিশেষ কয়েকটি সুরের ঋতুসংগীতই এদের একমাত্র মূলধন। লোকসংগীত এবং লোকনৃত্যের মধ্যে কোনরূপ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার প্রয়াস আজও এদের নেই। পশ্চিম সীমান্তবাঙলার লোকনৃত্য এবং লোক-সংগীতও কিছুটা প্রাচীনপন্থী, কিন্তু তাহলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, মাহাতো, ভূমিজ, ভূইঞা বাগাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে লোকসংগীত এবং লোকনৃত্য ক্রমশঃ অগ্রসরমাণ। বাঙলাভাষী এইসব জনগোষ্ঠী রক্ষণশীলতার গণ্ডীকে ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করে চলেছে বলেই, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কিছু বৈচিত্র্য দেখা দিচ্ছে। বাঙলা ভাষাকে সংগীতের বাহক করলে সাওতাল সমাজের মধ্যেও কিছুটা বৈচিত্র্য দেখা দিত। এ প্রসংগে বিশেষ একটি সাওতাল গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে এমন একটি ঘটনা দেখেছি, যাতে আমার একটি ধারণা প্রমাণিত হয়েছে যে সাঁওতালরা যদি পুরোপুরি পার্শ্ববর্তী হিন্দুজনতার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে থাকে, তা হলে তাদের নৃত্যে এবং সংগীতে উপরি পাওনা জুটে যাবে। সেরাইকেলার গোবিন্দপুর নামক একটি সাওতাল গ্রামে সাঁওতাল যুবকদের ছো-নাচ দেখে বিস্মিত হয়েছি। ছো-নাচ পুরোপুরি শিক্ষা সাপেক্ষ। সাঁওতালী, মুণ্ডারী বা দাঁড়শালী নাচের মতো তা সহজ নয় এবং অশিক্ষিত পটুত্বের মধ্য দিয়ে তা লাভ করা যায় না। শুদ্ধ তালকে আয়ত্ত করেই এ নাচে পা ফেলতে হয়। গোবিন্দপুরের সাঁওতালরা এমন যথাযথ ভাবে সে নাচ শিখেছে যে তাতে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না। অথচ সাঁওতালী নাচের মধ্যে না আছে বৈচিত্র্য, না আছে শিক্ষণীয় কিছু। একটি সহজ আদিম তালের ছন্দে পা ফেলা ছাড়া আর কিই বা আছে! এই পদক্ষেপ শৈশব থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাচতে নাচতে সবাই শেখে।

সাঁওতালী লোকসংগীতের ক্ষেত্রেও ঠিক এই কথাই প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য, সাঁওতালদের সব সংগীতই লোকসংগীত। সাঁওতাল কবিরা কিছু কিছু সহজ এবং অকৃত্রিম ভাবগর্ভ গান রচনা করেছেন এবং আধুনিক কালে তার মধ্যে

সাহিত্যরস কোন কোন ক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মূলত সাঁওতাল সমাজের মতোই সাঁওতালী সংগীত সেই আদিমধারাকে জীবন্ত করে রেখেছে। সুর সৃষ্টির কোন প্রয়াসই এরা করে না। শুধু নিছক আনন্দে মনের সহজ ও অকৃত্রিম কথাকে একটি তানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে মাত্র। সে তান কোন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে না। শুধু একটি রেশ, শুধু কণ্ঠস্বরের ঈষৎ আরোহী-অবরোহী স্পন্দনই সাঁওতালী সংগীতকে বেঁধে রাখে। সাঁওতালদের বাদ্যযন্ত্র এবং বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিও বৈচিত্র্যহীন এবং আদিম।

সাঁওতাল মেয়েরা দল বেঁধে যখন ক্ষেত-খামারের কাজে বেরোয়, অথবা মাটি বইতে যায় পুরুষদের সংগে, তখন সুরের একটি রেশ তাদের শ্রমের সংগী হয়ে থাকে। এই মেয়েদের গানে একেবারে প্রাচীনতার রেশ। কোন কবির রচনা করা গান এদের গাইতে হয় না; তার প্রয়োজনই হয় না। তাই কবিত্ব করার দিকে কোন আগ্রহ এখানে নিরর্থক। পদের মিল নিয়ে এদের কোন মাথা ব্যথাই নেই। কোন একজন মেয়ে সুরের রেশ টেনে কথা বললেই তা গান হয়ে জন্ম নেয়। গানের বিষয়বস্তু, পরিবেশ এবং প্রতিবেশ। রাস্তায় কোন 'দিকু' যুবককে দেখে কোন মেয়ে হয়তো গেযে উঠলো: 'কুথা যাও গাঁয়ের লোক বটে; আমিও যাবো।'—এই কথাটি শুনেই আব সবাই সেই সুরে এক সঙ্গে গলা মিশিয়ে গাইতে গাইতে এগিয়ে যায়, যতক্ষণ পযন্ত গানের বিষয়বস্তুর কোন পরিবর্তন না হচ্ছে। বাঙ্‌লা ভাষায় এমন গান ওরা নিজেরাই তৈরী করে। এবং সাধারণত তা বাইরে গায। আব ঘবে-বাইরে সাঁওতালী ভাষাতেই গলা খোলে বেশী।

সাঁওতালী ঝুমুর নামে কোন গানই নেই। তবে একথা ঠিক কোন কোন অঞ্চলে ঝুমুর গানের আবহাওয়াপুষ্ট সাঁওতাল সম্প্রদায় নিজেদের গানের নামও ঝুমুর রাখতে পারে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সাঁওতালী ঝুমুরের কথা উল্লেখ করেছেন—'বাঙ্‌লার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে। কিন্তু মূলত সাঁওতালী গান ঝুমুর নয়।[১] বিভিন্ন ঋতুতে এবং বিভিন্ন উৎসবে সাঁওতালী সঙ্গীত পুরুষরাও গেযে থাকে। মেয়েদের মুখে হাটে-বাটে-মাঠে যে গান শোনা যায়, সে গানের সংগে এসব গানের একটু পার্থক্য আছে বৈকি। এসব গানে কথা কিছু বেশী থাকে আর ঋতু অনুসারে সুরবদল ঘটে। কিছু বেশী অর্থাৎ চারটি বা পাঁচটি কলিই সমগ্র ভাবকে ধারণ করে। আদিবাসী সংগীতের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে,

১ ঝুমুর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

এ সংগীতের কথাও সহজ ও অকৃত্রিমভাবে পুষ্ট। রূপকের দিকে আদিবাসী সংগীতের ঝোঁক আছে বলে ডঃ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন। এ কথা মেনে নিয়েও বলা যেতে পারে যে, রূপকহীনতাও বিশেষ করে সাঁওতালী সংগীতের একটি ধর্ম।

বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন সুর প্রযুক্ত হয় সাওতালী গানে। সুরের নাম সাধারণত ঋতুর নামেই কথিত। 'রাড-সহরায়'-এর অর্থ হচ্ছে সুর-হৈমন্তী। সাওতালদের উৎসব অনুষ্ঠানগুলি যখন যে ঋতুতে হয় তখন সেই ঋতুর সুরেই গান চলে। অন্য সুরের মধ্যে বিবাহ গীতির সুর এবং আরো কয়েকটি সাধারণ সুরও এদের আছে। এইসব সুরের সংখ্যা দশ বা তার চেয়ে কিছু বেশী। যাই হোক সাঁওতালী সংগীতকে ঋতু সংগীত না বলে ঋতু সুরের সংগীত বলাই সঙ্গত। ঋতুভেদে গানের ভাষা ঋতুর সংগে জড়িত নাও হতে পারে, কিন্তু সুরটি বিশেষ ঋতুর অনুগামী হতে বাধ্য। নাচ এবং বাজনাও ঋতুভেদে কিছুটা পৃথক।

গ্রীষ্মকালের সুর হচ্ছে রাড-বির্। যার মানে হয়, সুর-আরণ্যক। জংলী সুর বললেও চলবে। এই আরণ্যক সুরে প্রেমের গানই গাওয়া হয়। একটি গানের উদাহরণ দিচ্ছি, বলা বাহুল্য বন-পাহাড়ের দেশের মানুষ এই গানে রূপক ব্যবহার করে নি। মূল সংগীতগুলি সাঁওতালী ভাষাতেই রচিত। অনুবাদ করে দিচ্ছি। নায়ক এবং নায়িকার জবানীতে গানের মধ্যে বলা হয়েছে।

নায়িকা: কত যে বন হলাম পার
বনের পর বনের ধার
বারোটি বন হলাম পার
মাইরি, তুমি আমাকে তবু
বললে না তো কিছু।

নায়ক:— বলবো কি গো, করবো কি গো,
তোমার ঐ শরীর কচি,
আফোটা দুটি বুকের কুঁড়ি, আজো।
যদি না হতো তা—

তা হলে আমি স্বর্ণরেখা নদীর জল যেন
তোমাকে পান যেতাম করে
বনের পর বনে।

'মাইরি' শব্দটি মূল গানের মধ্যেই আছে 'হুডম মাইরি জালি গেতাম।' গানটি যে আধুনিক এই শব্দটি তার প্রমাণ দেয়। আর 'জালি' মানে কচি। বাংলাভাষাতেও 'জালি' শব্দটি প্রচলিত।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের বর্ষাধারায় ভিজে ভিজে মেয়েরা ধান রোপণ করে। এই বর্ষাধৃত মাসগুলিতে গানের সুর: বাড-হেডহেং। হেডহেং মানে, ক্ষেতে আগাছা উপ্‌ড়ে ফেলা। এই সুরের একটি বর্ষার গানে বিরহিণী নায়িকার হৃদয়-বেদনা প্রকাশিত হয়েছে।

সিংবোঙা তুমি আয়নার মতো,
আমাকে সৃষ্টি করে—
পাঠিয়েছো পৃথিবীতে।
মাথার উপরে এখানে আকাশ ঝরছে।
এমন সময় প্রিয়তম নেই পাশে।
জ্বলে পুড়ে মন। এত নিদারুণ দুঃখ কোথায় রাখব!

মূল গানে—'সিরজাও' সৃজন করেছো এবং 'আরসিলেকা' মানে আয়নার মতো। এ ছাড়া আরো দু' একটি অ-সাওতালী শব্দ আছে।

আশ্বিন মাসের সুর হচ্ছে বাড দশাঞঃ, সুর-দশমী। বিজয়া দশমী তিথিতে নাচের সংগে এই সুর ব্যবহৃত হয়। এই সুরের একটি গানে রূপকার্থ থাকতেও পারে:

হায় গুরু গো।
গোবর গাদায় লাউয়ের বিচি পু তে
গাছ করেছি, ফলিয়েছিও লাউ।
সে-লাউ থেকে বুআং তৈরী করে
দেশ বিদেশে বাজিয়েছিলাম ঘুরে
কি পাওয়া যায় তাতে?
দেশে পাবে সিঁদুর তেল
বিদেশ গেলে, কাজল।

বুআং একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম। গুরু শব্দটি এ ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে।

আর দেশ বিদেশের প্রতিশব্দ হচ্ছে দিশম্-বিদেশ। তেলের প্রতিশব্দ সুনুম্। সিঁদুর মূলত অস্ট্রিক বলেই তো পণ্ডিতদের অভিমত। কাজল শব্দটি গৃহীত। দেশে পাবে সিঁদুর তেল, বিদেশ গেলে, কাজল :

'গুরু : দিশমরে : গুরু : সুনুমে সিঁদুর।
গুরু : বিদেশরে : গুরু : আয়নমে কাজল।'

সহরায মাসে অর্থাৎ কার্তিক মাসে গো-বন্দনার উৎসব। সারা সীমান্ত-বাঙলার একটি বিশিষ্ট উৎসব : বাঁধনা পরব, সাঁওতালেরা বলে সহরায়। এই হিমঋতুতে গানের সুর হচ্ছে হৈমন্তী : রাড-সহরায়। গানের বিষযবস্তুতে গো-মহিষের কথাই মুখ্য। এই সুরের একটি গান বোধহয় সখী-সংবাদ।

পাঁচেৎবূরু চেদানরেদ পান্‌তেতেলাং ডুড়ুর আকাম্
চেদাম্ মাইরি মেৎদা জ্বরঃ কাম্?
দিঁশায়ে দাঞ গাই গড়া দিশায়ে দাঞ কাডা গডা
সাদম্ চেতান কলেব তিরিঞ দিশাযেকানা।

অন্বার্থ :—

: পঞ্চকোটের পাহাড়ে
আমবা দু জন বসে।
মাইবি, তুমি কাঁদছো কেন বল?
: ভাবছি আমার গোরু-মোষেব গোয়াল ঘবের কথা
পডছে মনে ঘোডায চডা কোলেব স্বামীব কথা।

। গাই গডা—গোরুর গোয়াল, কাডা গডা—মোষের গোয়াল, সাদম—ঘোডা, বুরু—পাহাড, তিরিঞ—স্বামী।

মাঘ-ফাল্গুনে বাপলা সুর। বাড-বাপলা : বিয়ের সুর। সুব-মিলনী। সংখ্যাহীন গান আছে যা বাপ্‌ল সুরে গাওয়া হয়। এখানে একটি গানের অনুবাদ তুলে দিচ্ছি। মিলনী সুরে বিরহের কান্না দিয়ে এই গানটির আরম্ভ। বিয়ে করতে যাচ্ছে একটি যুবক। সেই যুবককে তার পুরোনো ভালোবাসার নায়িকা বেদনা জানাচ্ছে, আর যুবকটি স্পষ্টভাষায় তার উত্তর দিয়ে মেয়েটিকে আশ্বাস দিচ্ছে।

যুবতী : তোমার বিয়ে দিচ্ছে ওরা,
এবার কাকে দেখে
খোঁপার পাশে ফুল গুঁজবো বল!

যুবক ঃ ভয় নেই গো মেয়ে—
এই বৌ-কে রাখবো নাকো ঘরে ;
আমায় দেখে খোঁপাতে ফুল নিও।

সাঁওতালদের আর একটি সুরের নাম রাড়-পাতা বা পাঁতা। পাতা বা পাঁতা নাচের সংগে এই সুরটি প্রযুক্ত হয় গানে। সাধারণত উৎসবে বা মেলার জন্য পাঁতা নাচ। পংক্তি নৃত্য॥ ছেলে মেয়ে দু দলেই নাচে। আমাদের অনেকের কাছে সাঁওতালদের যে নাচটি সুপরিচিত, তা এই পাঁতা বা পাতা নাচই। এ নাচের মধ্যে মেয়েদের এমন একটি সহজ প্রাণস্পন্দন ফুটে ওঠে, বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যেও যা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাল্কা তালে একঘেয়ে নাকাড়া মাদলের বোল আর মেয়েদের কোমল পদক্ষেপেব অগ্রপশ্চাৎ গতি লোকনৃত্যের গোড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মুখে-চোখে কোন ভাবান্তরই পরিলক্ষিত হয় না। মেয়েরা যেন নাচ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন হয়েই একটি বিশেষ সুর আর তালকে অনুসরণ কবে এই যৌথনৃত্যে অংশ গ্রহণ করে। এই পাতা সুরে-গীত—একটি গানে আজকালকাব লেখাপড়া-শেখা ছেলেদের সম্পর্কে গ্রাম্য-সাঁওতালী তরুণীদের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। যারা লেখাপড়া শিখছে তারা গ্রামের মেয়েদের সংগে প্রেম করতেই চায়, বিয়ে কবে ঘব বাঁধতে চায় না। বলা বাহুল্য গানটি একান্তভাবেই একালেব।

'শিখলো যাবা লেখাপড়া
মিষ্টিমুখো সে সব ছোঁড়া
বলবে কথা প্রাণ জুড়ানো সুরে।
কিন্তু জেনো এ সার কথা
মোদের তরে নেইকো ব্যথা—
বিয়ে করে রাখবে না তো ঘরে।'

আর একটি সুরের নাম—বাড-লাঁগড়ে।

গভীর রাতে যুবক যুবতীর দল একত্র হযে যখন নাচে তখন এই সুবে গান গাওয়া হয়। অবশ্য দিনের বেলাতেও এই সুর অচল নয। এই সুরেব একটি গানে 'সতীন বড জ্বালা'-র কথা বলা হয়েছে।

হাড়াং হাডাং নিম্‌ হাডাং
হাড়াং হাডাং হিরম্‌ হাড়াং।

নিম হাডাং সাহাঃআ
হিরম্ হাডাং বাং সাহাঃআ

অস্যার্থ ঃ-—

নিম তিতো, সতীন তিতো,
নিমের তিতো ভালো।
সতীন তিতো সইতে নারি
হাড-মাস জ্বলালো।

হাডাং—তিক্ত, হিবম্—সতীন, বাং—না, সাহাঃআ—সহ্য করা।

সরহুল বা বাহা পরবে বাহা সুব। সুব-বাসন্তী। শাল ফুল যখন ফোটে তখন এই উৎসব।

(সাঁওতালী সংগীত, তাব সুব আব সাঁওতালী নাচ-গান সম্বন্ধে অনেক বলবার আছে। কিন্তু এখানে নয়।)

এদের নাচ আর গান এদের জীবন-চর্যার আলাদা একটি ধারা বলে মনে হয় না। মনে হয় নাচে-গানে এদের সহজ সরল জীবনটি বিধৃত হয়ে আছে। নাচ গানে কোন জটিলতা নেই, কোন শিল্পকৃতিত্ব নেই, কিন্তু এমন স্বতঃস্ফূত জীবনপ্রবাহ আর কোথায় পাওয়া যাবে! কিন্তু তাও ভাঙছে। অনিবায ভাবেই ভাঙছে। তাব ভালো-মন্দেব প্রশ্ন নাই বা তুললাম।[১]

—তিন—

ঝুমুর প্রসঙ্গ

বাংলা দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন পরিবেশ প্রতিবেশের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ধবনেব লোক-সংগীতের জন্ম এবং পরিপুষ্টি। অবশ্য লোক-সংগীতের প্রচার এবং প্রসার যে অঞ্চল-বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কিছু কথা নয়, তবু মূলত একথা স্বীকার করতেই হবে যে লোক-সংগীত যদি আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে না উঠতে পারে তাহলে তাকে গণ্ডীবদ্ধ হয়েই থাকতে হবে। জন-বিন্যাস, ভূমি-বিন্যাস এবং জাতিগত একাত্মতাই লোকসংগীতের 'অঞ্চল' সৃষ্টি করে। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্নতাই লোকসংগীতের পরিপোষক হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং পুর্ববঙ্গের লোকসংগীত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যেরই ধারক।

১ মূল গানগুলি···সংকলিকায় দ্রষ্টব্য।

পশ্চিম-সীমান্তবাঙ্লায় যে ধরনের লোকসংগীত প্রচলিত, তা পাহাড়বন-টাঁড় ভূমির পরিবেশে জাত। আর্যভাষী এবং অনার্যভাষী মানুষের এমন একটি স্পষ্ট-সমন্বয় এখানে যা সমতলবাঙ্লায় অদৃশ্য। ফলে পশ্চিমবাঙ্লার সমতল অঞ্চলের লোকসংগীতের সংগে সীমান্তবাঙ্লার লোকসংগীতের একটি মূলগত এবং জাতিগত পার্থক্য আছে। শুধু তাই নয়, লোকসংগীতের পর্যায়-বিভাগে সীমান্তবাঙ্লার লোকসংগীত অনেক পরিমাণে অকৃত্রিম। টুসু, ভাদু, করম, বাঁধনা প্রভৃতি উৎসবে যে লোকসংগীত গীত হয় অথবা বিভিন্ন ধরনের ঝুমুরের মধ্যে যে ভাব প্রকাশিত হয়, তা কাব্যজগতের মধ্যে কোন আসনের দাবী করে না। তবু মাঝে মাঝে আকস্মিক বিদ্যুৎ-দীপ্তির মতো এই সব গানের কাব্যরূপও হঠাৎ আলোর ঝিলিক নিয়ে আসে।

সীমান্তবাঙ্লার লোকসংগীতের মধ্যে ঝুমুরের স্থানই সর্বাগ্রে। পূর্বেই বলেছি যে, 'ঝুমুর' শব্দটি এ অঞ্চলে প্রায় গানেরই প্রতিশব্দ। অর্থাৎ ঝুমুর ছাড়া এত বেশী প্রচলিত লোকসংগীত আর কিছুই নেই এখানে। টুসু এবং ভাদুর গান বিশেষ উৎসব সংগীত। এ গানকে ঝুমুর নামে অভিহিত করা হয় না। ঝুমুরের সুরগত বৈশিষ্ট্যও এ সব গানে একেবারেই নেই। সাওতাল পরগণা থেকে শুরু করে পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম বাঁকুড়া, ধানবাদ, পুরুলিয়া, ধলভূম এবং উত্তর-পশ্চিম মেদিনীপুর অঞ্চলেই এই সব গানের প্রাধান্য। তবে একথা ঠিক মানভূম-ধলভূম বাঙলা ঝুমুর গানের জন্মভূমি। ঝুমুর শব্দটি যেখান থেকে যে-ভাবেই আসুক না কেন, সীমান্তবাঙ্লার ঝুমুরের যা' বৈশিষ্ট্য তা' এই অঞ্চলেরই নিজস্ব।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য ঝুমুর গানকে সাঁওতাল জাতির গান বলে উল্লেখ করেছেন। সাঁওতাল পরগণাতেই নাকি এ গান খুব বেশী জনপ্রিয়। তাঁর মতে সাঁওতালদিগের মধ্যে প্রচলিত বাংলা ঝুমুর গানই কালক্রমে সীমান্ত-বাঙলার লোকসংগীতের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হয়েছে।[১] ছোটনাগপুরের অন্যান্য আদিবাসী সমাজেও ঝুমুরের প্রচলন তিনি লক্ষ্য করেছেন।

মানভূম অঞ্চলের ঝুমুর গানের সুর বেশ কিছু পরিমাণে প্রাচীনত্ব রক্ষা করে চলেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভণিতাযুক্ত ঝুমুর ছাড়া অন্যান্য ঝুমুর গানের ভাবে, ভাষায় ও সুরে উন্মুক্ত অরণ্যপ্রকৃতির ছাপ। সুরের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার দিকে ঝোঁক এখানে অল্পই। সাওতালী মুণ্ডারী গানের

১ বাঙলার লোকসাহিত্য।

মধ্যে যেমন বেশী রাগিণী অনলভ্য, মানভূমের ঝুমুরেরও তাই। তবে একথা ঠিক, সাঁওতালী বা মুণ্ডারী সংগীতের সুর যথাযথভাবে এতে নিশ্চয়ই নেই। কিছু কিছু আভাস আছে মাত্র। কিন্তু একথা বেশী জোর করে বলা যায় না যে, ঝুমুর সংগীত মূলত সাঁওতাল জাতির। শুধু তাই কেন, সাঁওতালদের মধ্যে ঝুমুর নামে কোন গানই প্রচলিত নেই। তোপচাঁচি, হাজারীবাগ, থানাতে শ্রদ্ধেয় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচায যেসব গান সাঁওতালী ঝুমুরের নামে সংগ্রহ করেছেন, সেগুলির অধিকাংশই মানভূম অঞ্চলে প্রচলিত দাঁড়শালী ঝুমুর। দাঁড়শাল নাচের সংগে দাঁড়-ঝুমুরের সুরে ঐসব গান গাওয়া হয়। দাঁড়শাল নামে কোন সাঁওতাল নাচও নেই। বাংলাভাষী কূর্মী, ভূমিজ, বাগাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অবস্থান করে সাঁওতাল সম্প্রদায় কিছু কিছু বাঙ্‌লা হয়তো গ্রহণ করেছে। ঝুমুর গান যদি সাওতাল জাতির নিকট থেকে পরিগৃহীত হত তা হলে সারা সাওতাল সমাজে ঝুমুরের দেখা পাওয়া যেত নিশ্চয়ই। আসলে, ঘটনাটি বিপরীত। সাঁওতালদের নিজস্ব গীতিধারার মধ্যে রাড়-বীর্ রাড়, হেড়হেৎ, রাড-দাঁসায়, রাড়-সহরায়, রাড়-বাপ্‌লা, রাড়-পাতা প্রভৃতি সুর ছাড়া অন্য কোন সুরই নেই। শুধু তাই নয়, অন্য কোন ধরনের গানও পুরোপুরি সম্প্রদায়গত ভাবে প্রচলিত নেই। তবুও মাঝে মাঝে সাঁওতাল মেয়েদের মুখে যে বাঙ্‌লা গান শোনা যায়, তা আকস্মিক এবং ব্যক্তিগত। মোটের উপর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝুমুর গান এবং সুর সম্প্রদায়গত লোকসংগীত হিসাবে শুধু অপ্রচলিত নয়, অপরিচিত। যদি কোথাও তা থাকে, তবে তা গৃহীত হয়েছে মাত্র। এবং গৃহীত হয়েছে বলেই, রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত গান তাদের মুখে শোনা যেতে পারে। সাঁওতাল জাতির সাংস্কৃতিক আবেষ্টনীতে রাধাকৃষ্ণের কোন স্থান নেই। সাওতালী ঝুমুর প্রসংগে তিনি 'রসিক' শব্দটিকে সাওতাল মাদল-বাদকের উপর প্রয়োগ করেছেন। আসলে, রসিক— (মানভূমে রসক্যা) তাকেই বলা হয় যে 'নাচনী'নাচে গান গেয়ে নাচ্‌নী নাচায়। সাঁওতালদের মধ্যে নাচ্‌নীনাচের কোন ছিটে-ফোঁটাও নেই।

বলা বাহুল্য, ডক্টর ভট্টাচার্য ঝুমুর গানকে যে সাঁওতাল জাতির 'মৌলিক প্রেরণাজাত' বলেছেন, তার কারণ তাতে সমতলবাঙ্‌লাদেশের সাংস্কৃতিক প্রভাব নেই বলেই। আসলে, কিন্তু সীমান্তবাঙ্‌লা দেশ, বাঙ্‌লা দেশেরই

একটি আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশভূমি। সমতলবাঙ্‌লার সংগে নানা কারণে, নানা ভাবে, এই উচ্চাবচ অরণ্যভূমির সংস্কৃতির দারুণ পার্থক্য। সীমান্ত-বাঙ্‌লার জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে, সীমান্তবাঙ্‌লার ভূপ্রকৃতিতে সেই পার্থক্যের বীজ নিহিত।

সংগীত-দামোদরে 'ঝুমরি' নামে একটি রাগিণীর উল্লেখ আছে। রাগিণীটি শৃঙ্গাররসাত্মক। বঙ্গীয় শব্দকোষেব মতে, এই গান প্রায় অশ্লীল এবং ইতর-জাতীয়া স্ত্রীলোকেরাই ঝুমুর গান করে থাকে।

সংগীত-দামোদর অন্ততপক্ষে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকের রচনা। শ্রীখণ্ড-নিবাসী দামোদর এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি ছিলেন বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস কবিরাজের মাতামহ।[১] ঝুমুর রাগিণী যে ষোড়শ শতাব্দীর পুর্বেও বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, সংগীত-দামোদরই সে সাক্ষ্য দেয়।

ঝুমুর শব্দের উৎপত্তি নিয়ে নানা লোকে নানা অভিমত প্রকাশ করেছেন, সাধারণত পদালঙ্কারেব শিঞ্জনজাত অনুকাব শব্দটির উপর-ই এঁদের দৃষ্টি বেশী। এঁরা মনে করেন, ঝুমঝুম অথবা ঝুমুর ঝুমুব ঝুম শব্দ থেকে 'ঝুমুরের' উদ্ভব। নৃত্যের তালে তালে পদালঙ্কাবের এই জাতীয় শব্দ অবশ্য উপরিউক্ত অভিমতকে সমর্থন করে, কিন্তু ঝুমুর কি আসলে নাচ? গান হিসেবেই তো এর খ্যাতি। ঝুমুর গানের সংগে যে নাচ প্রচলিত আছে, তা কোন কোন জায়গায় হয়তো ঝুমুর নাচ নামে পরিচিত হয়েছে, কিন্তু মানভূমে এবং সীমান্ত-বাঙ্‌লার প্রায় সর্বত্রই 'ঝুমুর' গানের পরিচয়েই মুখ্য। এমনকি বিভিন্ন নাচের সংগে যে ঝুমুর গান প্রচলিত সে 'ঝুমুর'-ও বিশেষ বিশেষ 'নাচের ঝুমুর' বলে পরিগণিত। আসলে ঝুমুর আদিরসাত্মক গানই। শুধু তাই নয়, বিশেষ একটি রাগিণীও। সংগীত-দামোদরের ব্যাখ্যাই সুসংগত। এই বিশেষ রাগিণীর কিছু কিছু সুর বৈচিত্র্য সীমান্তবাঙ্‌লায় শোনা যায় বটে, তবে সে বৈচিত্র্য খুব বেশী সুর সৃষ্টির বাহন নয়।

সংগীত-দামোদরের মতে ঝুমুর যদি শৃংগার রসাত্মক গানের একটা রাগিণী বিশেষ হয়, তা হলেও নাচের সংগে না জড়িয়ে 'ঝুমুর' শব্দটির একটি অর্থ পাওয়া যেতে পারে। ঝুম্‌ঝুম্ শব্দকারী খনজনী বা ঘুঙুর-বাঁধা অনুরূপ কোন যন্ত্র (যথা, ডম্বরু) সহযোগে যে গান গাওয়া হতো, তাকেই হয়ত ঝুমুর

১ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (ডক্টর সুকুমার সেন)

গান নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং সে সব গান হয়ত বিশেষ এক ধরনের ভাব প্রকাশেরই বাহন।

আচার্য সুকুমার সেনের মতে, নাট-গীতের এক ধারার নাম ছিল ঝুমুর। এই নাট-গীতি পালায় সবই গান ; গদ্য সংলাপের কোন স্থানই এতে ছিল না। ঝুমুর শব্দটি প্রাচীন মৈথিলীতে 'ঝুমুব' রূপে প্রচলিত ছিল বলেও তিনি অভিমত দিয়েছেন। সংস্কৃতে বলত জম্ভালিকা।[১]

এই প্রসংগে 'ঝুমুব খেলা' কথাটি বিবেচ্য। বিহার প্রদেশের ভোজপুরী ভাষায় একটি গানে কথাটি আছে। ভোজপুবী-বিহুলা কথা প্রসংগে আচার্য সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে' বিষহবি কা রোদনা শিবোনামায় গানটি উদ্ধৃত করেছেন।

—'কমল দিং এ মাতা ঝুমরী খেলএ, কান্দে দেবী মনসা হায় রে।'

সীমান্তবাঙলায় প্রচলিত একটি মনসাব গানেও আর একটি চরণ পেয়েছি : 'ঝুমঝুমরি ঝুমরি ঝুমুর খেলি আয়।'[২] এই গানের সংগে ঘুঙুর বাঁধা ডম্বরু বা ডুমুব বাজান হয়। এটি একটি আনদ্ধ যন্ত্র। বাঁহাতে ক্ষীণমধ্যা যন্ত্রটি ধরে, ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাজান হয়। মনসার গানে এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। সীমান্তবাঙলায় সর্পক্রীডকরাও এই যন্ত্রই ব্যবহার করে, তুবড়ী নয়।

নাচ্‌নী নাচের একটি ঝুমুরে বলা হয়েছে :

এসো মাগো সরস্বতী কণ্ঠে
এসো মোর।
তোমার চবণ বন্দি খেলিব
ঝুমব।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের সুপরিচিত গ্রন্থ 'বাংলাব লোকসাহিত্যে' সাঁওতালী ঝুমুর হিসাবে একটি গান উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে 'ঝুমুব খেলার' কথাটি আছে :

আখড়া বন্দিয়া গুরু ভালা
গীতা গাই।
গুরু রাম-লক্ষ্মণ মাদরে বাজাই।

১ বাঙলা সাহিত্যের কথা।
২ দ্রষ্টব্য—'ঝাঁপান'।

সীতামণি ঝুমুরে খেলাই।

সীমান্তবাঙ্‌লাতে তাহলে গান শুরু করার প্রসংগেই ঝুমুর খেলার কথা সব চেয়ে আগে। এ খেলা নাচের খেলা নয়, গানেরই খেলা।

সীমান্তবাঙ্‌লার ভণিতাযুক্ত ঝুমুর প্রচলনের পূর্বেও যে ঝুমুর ছিল তার প্রমাণ এই অঞ্চলের লোকসংগীতেই আছে। লোকায়ত ঝুমুরকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। দাঁড ঝুমুর, টাঁড ঝুমুর, কাঠিনাচের ঝুমুর এবং নাচ্‌নী নাচের ঝুমুর। কাঠিনাচের ঝুমুরগুলি সাধারণত রাধাকৃষ্ণ লীলা কাহিনী। এগুলিকে ঠিক লোকায়ত বলা যায় না। টাঁড ঝুমুরের মধ্যে নগ্নতা একটু বেশী পরিমাণে প্রকট। এগুলি লোকসমাজের বাইরে, ক্ষেতে মাঠে, বনে বাদাড়ে গান করা হয়। টাঁড ঝুমুর আসলে দেহমিলনেরই গান এবং এর মধ্যে কোন শালীনতা বজায় থাকে না।

দাঁড় ঝুমুরের আরও নাম আছে। কোথাও বলে দাঁডশালিয়া, কোথাও বলে পাঁতাশালিয়া। আসলে দাঁড়শাল বা পাঁতাশাল একই ধরনের নাচ। মূলত করম-উৎসব উপলক্ষে এই নাচ নাচা হয়, অন্য সময়েও চলে। স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে এতে অংশ গ্রহণ করে। আজকাল অবশ্য মেয়েরা নাচের আসরে ক্রমশ অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে উঠছে। দাঁডশাল ঝুমুর সংখ্যাহীন, কারণ এর সীমা দুটি চরণের মধ্যে। রাধাকৃষ্ণ লীলার কোন ছিটেফোঁটাও এতে নেই, পরিবর্তে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথাই এসব ঝুমুরের উপজীব্য বিষয়। সুর দ্রুতলয়যুক্ত এবং বৈচিত্র্যহীন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি গান উদ্ধৃত করছি।

১। আকরাডীর শিয়াল রাজা
বনের রাজা বাঘ হে।
বিহাঘরে মায়া রাজা
সমান সমান ভাগ হে॥

২। ভাদর মাসের গাদর
জনাব আড়ে বসে খাব হে।
যে আসবেক ছাতা ফুটাই
তার সঁগে যাব হে॥

৩। বাঁধ বাঁধালে বঁধু
না বাঁধালে ঘাট হে।

ডালিম লাগাই বঁধু
গেলে পরদেশ হে ॥

৪। পাকিল ফাটিল ডালিম
চোবে তুলে খায় হে।
এমন সময়ে বঁধূ ঘবে
আমাব নাই হে ॥

৫। আম গাছে আম নাই
ঢিল কেন ছুড হে।
তোমাব দেশেব আমি নহি
আঁখি কেন ঠাব হে ॥

সীমান্তবাঙ্লায় নাচ্নী নাচেব ঝুমুব বিশেষরূপে খ্যাত। এ অঞ্চলে নাচ্নী নাচেব প্রচলন কতদিনেব কে জানে। নাচ্নীবা পুরোপুবি গ্রাম্য এবং অসংস্কৃত বাইজী। ঢোল, নাকাডা এবং মাদল হচ্ছে এ নাচে সহযোগী যন্ত্র। একজন 'বসিক' ব্যক্তি সাধাবণত গানেব সূচনা কবে দেয়। তাবপব নাচ্নীবা সেই সব গানেব পুনবাবৃত্তি কবে অথবা জবাব দেয়। গান শেষ হলেই নাকাডা এবং ঢোল বেজে ওঠে আব 'নাচ্নী' তালে তালে নাচতে থাকে। নাচ্নী নাচেব ঝুমুবেব দু একটি উদাহবণ দিচ্ছি :

১। যখন ফুলটি কলি ছিল
তখন ভমব এল গেল—
এখন কেন চাইবে হে ভমব
আমাব সুখেব সময় গেছে।

২। খুলখুল বাতাস বহে
ও তোব গুলাব বাগানে।
ঝুমুবিয়া দাদাব মন ভুলাব
জোডা পান খিলিতে।

৩। হাঁডি ভাঙলে হয় খপ্‌বা
মন ভাঙলে হয় চপ্‌রা—
আব না যাব ঐ কদমতলা
পথ ছাড কালা।

—————

—চার—

সীমান্তবাঙ্‌লার গানে বৈষ্ণব-উত্তরাধিকার

বাঙ্‌লাদেশের আদি বৈষ্ণব কবি জয়দেব। চৈতন্যপূর্ব যুগেব বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসেব কাব্য মূলত ভারতীয় শৃঙ্গার রসশাস্ত্রের অনুগামী, সে সম্পর্কে মতভেদ নেই। বিখ্যাত পদকর্তা দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পর্কে দ্বিমত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস যে নানাভাবে জয়দেবের কাছে ঋণী, তা স্বীকৃত সত্য। চৈতন্যপূর্ব যুগের এই বৈষ্ণব কবিরা দণ্ডী, বাৎস্যায়ন প্রভৃতি রসশাস্ত্রকারদের অনুসরণ করে রাধাকৃষ্ণের শৃংগার বর্ণনা করেছেন। এঁদের কাব্যরস ভক্তিরসের অন্তর্ভুক্ত নয়। ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের আদিরসেরই অনুসবণ করেছেন জয়দেব-বিদ্যাপতি-বড়ু চণ্ডীদাস।

রূপগোস্বামীকৃত 'উজ্জ্বলনীলমণি'-কে অবলম্বন করে চৈতন্য-পরবর্তী কবিরা পদাবলী রচনা করেছেন। তাঁদের কাব্যরস মুখ্যত ভক্তিবস। এই বসই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে অলৌকিক, অন্য সমস্ত রস লৌকিক। অবশ্য ভারতীয় রসশাস্ত্র অনুসারে রস মাত্রেই অলৌকিক। কিন্তু বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের সংগে প্রাচীন ভারতীয় রসশাস্ত্রেব প্রভেদ আছে এইখানে।

যোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈষ্ণব কবিগণ বিবিধ বৈষ্ণব কাব্য এবং পদাবলী রচনা করেছেন। তবে, যোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীই বৈষ্ণবপদাবলী কাব্যেব স্বর্ণযুগ।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্‌লাদেশে যে নবজাগরণ ঘটে, তাতে কাব্য-সাহিত্যের জগতেও আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। মাইকেল মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য রচনা করলেন, কিন্তু তা বৈষ্ণব কাব্য নয়। রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী'-ও বৈষ্ণব কাব্য নয়। বৈষ্ণব কাব্য রচিত হবার মতো যুগ তখন আর নেই।

কিন্তু বাঙ্‌লাদেশের কোন কোন অঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আবার বৈষ্ণব কবিতা রচনার কার্যক্রম সুরু হয়ে যায়। গ্রামাঞ্চলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবশ্যই কীর্তনের মাধ্যমে বহুল প্রচলিত ছিল এবং এখনো তা অপ্রচলিত হয় নি। কিন্তু একথা ঠিক, নতুন পদ রচনার দিকে কবিদের দৃষ্টি পড়ে নি। দেব-লীলা তাই পুরাতন ঐতিহ্যের বাহক হিসেবেই প্রচলিত

থাকল না। নর-লীলার গানই মুখ্য আসন গ্রহণ করল। কিন্তু রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত পদ রচনা কোন কোন ক্ষেত্রে অব্যাহত থাকল।

সীমান্তবাঙ্লায় (মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে) বাধাকৃষ্ণবাদ প্রবিষ্ট হবার আগেই লোকসংগীতের একটি বিশেষ ধারা প্রবাহিত ছিল। এ সব লোক-সংগীত দেব-নির্ভর ছিল না। বিভিন্ন পুজা-পার্বণে গীত হলেও এ সব লোক-সংগীত দেবতার সম্পর্কিত নয়, পুবোপুরি জীবন-সম্পর্কিত। দেবতার সম্পর্ক কোন কোন ক্ষেত্রে থাকলেও তা একান্তভাবেই গৌণ।

বিভিন্ন ধরনের ঝুমুবের মধ্য দিয়ে লোক-কবিরা লৌকিক কথাই প্রকাশ করতেন এবং এখনো কবেন।

সীমান্তবাঙ্লার অধিবাসীদেব মধ্যে বাধাকৃষ্ণেব গান যে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল সে-কথা বলাব মতো যথেষ্ট যুক্তি আমাদের নেই। তবে 'ঝুমুর গান' যে বাধাকৃষ্ণলীলা-বিবর্জিত হয়েও বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রবহমান ছিল, তা আঞ্চলিক লোক-সংগীতেব সংগে পরিচিত হলেই বোঝা যায়। বর্তমানে অবশ্য 'ঝুমুব' বলতে বাধাকৃষ্ণেব গানই মুখ্যত বোঝায়, কিন্তু একথাও ঠিক যে, দাঁড়শাল নাচে, নাচনী নাচে, জাওয়া নাচে যে গান গাওয়া হয় তাকেও বলে ঝুমুব। মাঠে ঘাটে যে-গান গাওয়া হয় তাকেও বলে ঝুমুর।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে মুখ্যভাবে গ্রহণ কবে মানভূম অঞ্চলে যে সমস্ত গান রচিত হয়েছে এবং বর্তমানে বহু-প্রচলিত হয়েছে, সে সব ঝুমুরকে বৈষ্ণব সাহিত্যেব উত্তরাধিকাবী বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু এই বৈষ্ণব উত্তরাধিকার আসলে রূপগত, ভাবগত নয়। বিংশ শতাব্দীর গোডার দিকে কিংবা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এই সব গানের অধিকাংশ রচিত। বৈষ্ণব ভক্তিবসেব উত্তবাধিকার এ সব ঝুমুরে অপ্রাপ্য। শুধু রাধাকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করে অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক-কবিগণ বৈষ্ণব পদাবলীর গতানুগতিকতার বাহ্যরূপটি রক্ষা করার প্রচেষ্টা করেছেন। যে সব কবির ভণিতায় এই সব ঝুমুর পাওয়া যায়, তাঁরা কেউই প্রাচীন কবি নন। এঁদের অনেকেই বর্তমানে জীবিত।

সীমান্তবাঙ্লার এই ঝুমুরকে দুভাগে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথম ভাগে অল্পশিক্ষিত, শিল্প-সম্বন্ধে স্থূলভাবে সচেতন লোক-কবি সম্প্রদায়; দ্বিতীয় ভাগে অশিক্ষিত লোক-কবি সম্প্রদায় যাঁরা প্রথমোক্ত কবিদের অনুকরণ করবার

চেষ্টা করেছেন। ভবপ্রীতানন্দ ওঝা, এবং পীতাম্বর দাস এই প্রথম ভাগের শ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিগণিত। ভবপ্রীতানন্দ ওঝা বৈষ্ণব নন, শৈব।[১] ভক্তি-রসের প্রেমমার্গ অবলম্বন করে তিনি রাধাকৃষ্ণের গতানুগতিক প্রবাহকে তাব মধ্যে নিহিত কবেছেন। ঐ সব গানের মধ্যে আন্তরিকতাও প্রধান নয়, অনুকরণই প্রধান। পীতাম্বর দাস শিক্ষিত মানুষ ছিলেন বলেই জানা যায়, কিন্তু তিনিও একজন সুষ্ঠু অনুকারী মাত্র।

ভবপ্রীতানন্দ ওঝা-ব 'ঝুমুরই' সীমান্তবাঙ্‌লায় বেশী প্রচলিত। সীমান্ত-বাঙ্‌লাব ঝুমুর জগতেব গুরুরূপেই এঁর স্বীকৃতি। কিন্তু মূলত তিনি একজন লোক-কবি। তবে যে ধবনেব আদিমতা, অকৃত্রিমতা, ভাব ও ভাষাগত শিল্পহীনতা সীমান্তবাঙ্‌লাব লোকগীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সে ধরনেব বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি আব এক বৈশিষ্ট্যে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁব গানেব ভাব লোকায়ত, কিন্তু ভাষা শিক্ষালব্ধ। গানেব সুরও মূলত লোকায়ত এবং নাকাড়া-মাদলেব তালেই অধিক সুশ্রাব্য। ভাদুরিয়া সুবে তাঁব যে সব ঝুমুর গীত হয়, সেই সব ঝুমুরই অধিক জনপ্রিয়। ভবপ্রীতাব ঝুমুবেব সংখ্যা অনেক। ঝুমুব গানেব কয়েকটি সংকলন গ্রন্থও তিনি প্রকাশ কবেছেন। একটি উদাহবণ :

আঁধাবি ভাদব বাতি দেখিয়ে তড়পে ছাতি
পতি নাহি পালঙ্ক উপরে।
সখী রে, প্রাণ দহে মদনেব শবে। (বং বা ধ্রুবপদ)
একে ত অবলা বালা দোসবে যৌবন জ্বালা
কেমনে বহিব শূন্য ঘবে।
শুন শুন সহচরী তোদিগে বিনয় কবি
বাঁচাহ আনিয়া সে নাগবে।
বিনা সেই শ্যামধন না বাখিব এ জীবন
ভবপ্রীতা হবিপদ ধবে।

গতানুগতিক ব্রজবুলির অনুকবণেও তিনি পদ বচনা কবেছেন। একটি উদাহরণ :

১ মহুপাধ্যায় ভবপ্রীতানন্দ ওঝা বৈদ্যনাথধামের প্রধান পুরোহিত বা মোহান্ত। তিনি এখনও জীবিত আছেন।

স্বপন সগুণা দেখি হরখি উঠলি সখী
দূতী সে কহতি বাতিয়া,—
ফরকি উঠলি বাম আঁখিয়া
আজুরে আওত কালিয়া। (রং)
উরেখি বাঁধলি জুড়া লাগায়লি পান বিড়া
বিছায়লি ঝারি সোজিয়া।
জাগি রহলি ধনী রাতিয়া।

শ্যাম শবদ শুনি চমকি উঠলি ধনী
মিলনি আগু লাজিয়া,
প্রেমে ছলছল বারি আঁখিয়া।
অঙ্গ পরশ সুখে মুরছিতা পতিবুকে
মুখ সে না ফুটে বাতিযা।
ভবপ্রীতা ভাবে বনমালীয়া।

"স্বপ্ন দেখে রাধিকা উল্লসিতা, বাম আঁখি কেঁপে উঠছে: এই সগুণ (শুভলক্ষণ) দেখে রাধিকা বুঝতে পাবল যে শ্যাম আসছে'। মাথার খোঁপা বাঁধল উঁচু কবে, পানেব বিড়ে সেজে বাখল, শয্যা রচনা করল নতুন করে ...."

এই সব দৃশ্য বৈষ্ণব পদাবলীব রাধিকাকে স্মরণ কবায় না, সীমান্ত-বাঙ্লার যে কোন প্রেমিকা নাবীকেই স্মবণ করায়। মোটের উপর একথা ঠিক যে রাধাকৃষ্ণেব অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলার প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন নি ভবপ্রীতানন্দ ওঝা। বৈষ্ণব উত্তবাধিকারেব মর্যাদা বক্ষা করার জন্যও তাঁর কাব্য রচনা নয়। নিছক শৃংগাবরসাত্মক লৌকিক প্রেমলীলার গান করাই তাঁব উদ্দেশ্য ছিল। তাই তাঁর অধিকাংশ গানেই সহজ লোকায়ত ভাব।

ভবপ্রীতাকে অনুসরণ করে যাঁরা ঝুমুর রচনা করেছেন সেই সব কবিদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। এদের মধ্যে যাঁরা ভবপ্রীতার প্রভাবে বেশী প্রভাবিত তাঁদের পদ কোন দিক দিয়েই সুষ্ঠু হতে পারে নি। ভবপ্রীতাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না, লোক-কবির সারল্যও তাঁদের নেই। এঁদের মধ্যে মানভূম-ধলভূমের অনেক রাজা জমিদারও রয়েছেন, যাঁরা ঝুমুর গান রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই যে সব লোক-কবি রাধাকৃষ্ণের গান রচনা করেছেন

তাঁদের মধ্যে ভবপ্রীতার প্রভাব বাহ্যিক মাত্র। ফলে এই সব কবিদের ঝুমুরে লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিস্ফুট। কবিত্ব করার নামে আত্মবঞ্চনা করতে হয় নি এদের। লোকায়ত ভাবে ভাষায় এবং সুরে এই ঝুমুরগুলি সত্যিকারের লোকসংগীতই। বৈষ্ণব প্রভাব এর মধ্যে খুঁজতে যাওয়াই নিরর্থক। শুধু রাধা ও কৃষ্ণনামকে বাদ দিলে যা বাকী থাকে, তা হচ্ছে গ্রাম্য যুবক-যুবতীর প্রেম। সে প্রেমে যেমন বেদনা আছে তেমনি ভর্ৎসনা আছে। তবে মূলত এই সব ঝুমুরের মধ্যে বিরহের সুরই প্রবল। অথচ লোকায়ত দিক থেকে বিচার করলে, এই সুরের কোন ভিত্তি এখানে নেই। রাধাকৃষ্ণের বিরহমূলক পদাবলী এক্ষেত্রে কোন-না-কোনরূপে প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয়। না হয়, ঝুমুর গানে মিলনাত্মক শৃংগাররসই ফুটে উঠত বেশী। অন্যান্য লৌকিক গানে প্রেমের এই মিলনাত্মক রূপটাই বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। বঞ্চনাত্মক রূপও বিশেষভাবেই পাওয়া যায়।

যাই হোক, রাধাকৃষ্ণ-লীলা সম্পর্কিত এই সব লৌকিক গানে লোক-কবিরা ভক্তিরস পরিবেষণ করতে চান নি। পূর্বরাগ এবং বিরহ-কে অবলম্বন করে এই লৌকিক গানগুলি পরিস্ফুট হয়েছে।

দ্বিজ হরি রচিত কোন-কোন পদ লোকসংগীতের ভাব ও ভাষাকে পরিস্ফুট করেছে সার্থকভাবেই। উদাহরণ :—

লালশালুকের ফুল ফুটে আধারাতে
যার সংগে যার ভাব বঁধু, মরিলে না টুটে
বঁধু এত রা'ত কিসে। । রং।
মেঘ আঁধার রাতি বিজলী চমকে।
এমন সঙ্কট পথে আইলে কি মতে
বঁধু এত রাত কিসে।
এস এস বঁধু বসহে পালঙ্কে
চরণ ধুয়াব তোমার মুছাইব কেশে
বঁধু এত রাত কিসে।
যখন তোমার কাছে থাকি কথা বল হেসে
সকল জ্বালা যাই গো ভুলে, তোমার পরশে,
বঁধু এত রাত কিসে।

দ্বিজ হরি ভাবে চিতে ভাবে দিনে রাতে—

এমন স্থন্দর কন্যা পাইলে কি মতে—
বঁধু এত রাত কিসে।

এই ঝুমুরটিতে কৃষ্ণের অভিসার বর্ণনা কবা হয়েছে। আসলে কিন্তু এ সব গান রাধাকৃষ্ণের গণ্ডীর মধ্যে মোটেই আবদ্ধ নয়। আর একটি উদাহরণ দিয়ে এ প্রসংগ শেষ করছি। এই উদাহরণটি পুরোপুরি লৌকিক। খাঁটি লোকসংগীত। শুধু রাধাকৃষ্ণের ছিটেফোঁটা দেওয়া আছে। কিন্তু ভাবে ভাষায় এবং প্রকাশ-রীতিতে এর বৈষ্ণব-উত্তবাধিকার কোন ক্রমেই গ্রাহ্য নয়। তবুও চোরের নাম নীলমণি এবং কালো-সোনা এবং কদমতলাতেই তার আস্তানা। এই চোরটি রাধিকার ঘরে 'কালরাতে' প্রবেশ করেছিল।

বল দূতী গো, দূতী গো—
কালরাতে হামার ঘরে চোব সাঁধাইছিল।
.চাবের নাম লীলমণি, চুরি কব্যে খায় ননী
আবাব দৈ-টাও খাঁযে ভাঁডটাও ভাঙ্যে দিল,
দূতী গো কালরাতে হামাব ঘরে চোর সাঁধাইছিল।
চোরের নাম কেল্যাসোনা কদমতলায় করে থানা
আমায় চিন্‌হাপ[১] চোরে পরাণে মাবিল।
দূতী গো কালবাতে হামাব ঘরে চোর সাঁধাইছিল।
দ্বিজ গদাধরে বলে জনম সাঁতাইল[২] চোরে—
আমায় ভাবের ঘবে দুঃখিনী কবিল।
দূতী গো কালরাতে হামাব ঘবে চোর সাঁধাইছিল।

এই ঝুমুরটির মধ্যে সীমান্তবাঙ্‌লাব লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য যথার্থই রক্ষিত।

—পাঁচ—

বিভিন্ন ধরনের ঝুমুর

এবারে, বিভিন্ন ধরনের ঝুমুর সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। আগেই বলেছি যে সীমান্তবাঙ্‌লার প্রাণ হচ্ছে এই ঝুমুর গান। উৎসবভেদে, ঋতুভেদে এই ঝুমুরের পরিবর্তনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এর সঙ্গে যে আনুষংগিক নৃত্যকলার ব্যবস্থা আছে সে কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১ চেনা ২ যন্ত্রণা দান করল

সুর বা রাগ-রাগিণীর শিল্প কলাকে অবলম্বন করে লোকসঙ্গীত জন্মগ্রহণ করেনি। লোকসঙ্গীতেব জন্মমুহূর্ত শ্রমচর্যার সংগে বিজড়িত।[১] আদিম শ্রেণীহীন সমাজের মধ্যে এ ধবনের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেখানে যৌথশ্রম, যৌথসংগ্রহ এবং যৌথভোগকে স্বীকৃতি দেওয়া হতো। সেই শ্রেণীহীন সমাজের আদিম আর্থিক অবস্থার ভিতর থেকেই মানুষেব সংস্কৃতি-সভ্যতারও উন্মেষ হয়েছিল।

প্রাচীনকালে প্রায় সব দেশেই এই যৌথ শ্রমচর্যার সংগীত বিদ্যমান ছিল এবং বিশেষ কবে যাদের বলা হয় বিশ্বেব শ্রমিক (toilers of the world), তাদেব মধ্যেই এব প্রাধান্য ছিল। বিশ্বেব সর্বত্র মৎস্যজীবী, নৌজীবী, ধোপা, কামাব, কুমোব, ছুতাব, তাঁতিদেব মধ্যে যৌথ-সংগীতেব বহুল প্রচলন ছিল। প্রাচীন গ্রীসে তো বাড়ী তৈবী কবাব গান, জলতোলাব গান, গম পেষাই, গম

১ ঠিক কি ভাবে মানুষের মধ্যে সুরের আবির্ভাব হলো তা বলা খুব সহজ নয়। নানাবিধ পশুপাখীর ডাককে নকল করার প্রবৃত্তি থেকে কিছুটা স্বরবোধ এবং সুরবোধ আসা অস্বাভাবিক নয়। শিকার পর্বে পশু বা পাখীকে বিভ্রান্ত করার জন্য এরও প্রয়োজন হতো বোধ হয়। পরবর্তীকালে কৃষিক্ষেত্রের কর্মে বা অন্যান্য কর্মে লিপ্ত থাকাব সময় যৌথশ্রমচর্যাব মধ্যেই সংগীতের জন্মলাভ হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এ কথা ভাববার যথেষ্ট কারণ আছে যে সংগীতের জন্মকথার আদিপর্বে যৌথসংগীতই ছিল একমাত্র সংগীত এবং তাও অবসর বিনোদনের জন্য অঁথবা আনন্দপ্রাপ্তির জন্যই নয় শ্রমেব ক্লান্তিকে দূরীভূত কবাব যৌথপ্রচেষ্টাই এর মূলে বিদ্যমান।

এই প্রচেষ্টাব ধারা আজও জনসমাজে অব্যাহত। একদিক যেমন অবসর বিনোদনে সংগীতচর্চার সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা, আব একদিকে তেমনি একত্রভাবে শ্রমের ক্লান্তিকে সমানভাবে গ্রহণ কবে কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যেও সংগীত চর্চা। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য যে, সংগীতের কোন সুষ্ঠু সংজ্ঞার মধ্যে পাল্কী বেহারাদেব হঁাই-হুই বা ধোতাগাবের ধোপাদের হিস্ হিস্ কবাকে আনা যাবে না, কিন্তু তা ছাড়াও যৌথসংগীতের রেওয়াজ এখনো বিলুপ্ত হয নি। এ বিষয়ে সাঁওতাল মুণ্ডা প্রভৃতি সম্প্রদাযের উদাহবণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। কৃষিকার্যে বা অন্য কোন কার্যে এদেব মেয়েরা যখন একক ভাবে কর্মলিপ্ত থাকে তখন গলা থেকে সুর ফোটে না কিন্তু দুজন থাকলেই তা সংগীতে পরিণত হয়। এ ধরনের গানে কাজেব পটুতা বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমেব মাত্রাকে হ্রাস প্রাপ্ত মনে হয়। নৌকা বাওয়া, ছাদপেটা, পাল্কী বওয়া প্রভৃতির মধ্যে ঠিক এই প্রচেষ্টাই আছে। যৌথশ্রমচর্যার একত্ব প্রমাণিত হয় যৌথসংগীতে। ধান্যরোপণের সময় মেয়েরা একত্র গান পায়। ঘরের ছাদপেটার সময়, ধানকাটার সময়ও যৌথসংগীত চলে। এর ফলে, কর্মে একাত্ম অনুভূতি অবশ্যম্ভাবী। আদিম সাম্যতন্ত্রে এই একাত্ম অনুভূতি বিদ্যমান ছিল বলেই সকলে একসংগে ভোগও করতে পারত। অবশেষে শ্রমের অবশিষ্ট ক্লান্তিকে দূরীভূত করার একত্র প্রচেষ্টাতে এদের সন্ধ্যাকালীন নাচ গানের আসর বসে।

ঝাড়াই প্রভৃতির গান, আঙুর পেষাই গান, মেষ পালকের গান—আরও নানাধরনের যৌথ সংগীত ছিলই।[১]

এদিক দিয়ে ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশগুলির কথা বর্তমানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২] অবশ্য এ কথা ঠিক যে, পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য সমাজেই এই যৌথশ্রমসংগীত বিলুপ্ত হতে চলেছে বা হয়ে গেছে। যন্ত্র সভ্যতার গর্জনে শ্রমসংগীত নিথর হয়ে গেছে।[৩]

কোন কোন অনগ্রসর সমাজে, যেখানে যন্ত্রসভ্যতার গর্জন আজও ক্ষীণ, সেখানে এই যৌথ শ্রমসংগীত বিদ্যমান। সীমান্তবাঙলার বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যৌথ শ্রমসংগীত বিদ্যমান। যে ক্ষেত্রে যৌথ শ্রমসংগীত বিলুপ্ত হতে চলেছে, সেখানে একক সংগীতের মধ্যে শ্রমসংগীতের স্মৃতি বিরাজ করছে আজও। ধলভূম-মানভূম-ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত নানান কৃষিমূলক শ্রমসংগীত যৌথভাবে বা এককভাবে—বিভিন্ন পর্ব পার্বণের মধ্যে—গীত হয়।[৪] সুর বা রাগচর্চার উদ্দেশ্য এ ক্ষেত্রে গৌণ, গান গাওয়ার আনন্দই

১ দ্রষ্টব্য :—Standard Dictionary of Folklore Worksong

২। কোরিয়া যুদ্ধের সময়, এই সেদিনও ভারীযন্ত্রসমূহ টেনে নিয়ে যাবার সময় বা উপরে তোলার সময় উত্তর কোরিয়া সৈনিকরা শ্রমসংগীতের আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

৩। "Their (work song') sound silenced in the roar of machines, their purpose outmoded by such invention and devices as the pneumatic drill, the bulldozer the power loom "
Standard Dictionary of Folklore Worksong.

৪ সীমান্তবাঢ়ের কঠিন অনুর্বর মাটিতে রৌদ্রদগ্ধ হালকের প্রিয়ার কণ্ঠে যে গান জাগে তা হচ্ছে :

আমার বঁধু হাল করে কেদ কানালির ধারে,
হায় হায় মাথার ঘাম পায়ে পড়ে, দেখে হিয়া ফাটে—
ননদিনী লো আমি নিজে যাবো বাসিযাম দিতে।

ধান্যরোপণের গান হিসাবে প্রচলিত একটি গানে বোধহয় সৌখীন এবং কিছুটা অলস প্রকৃতির বঁধুকে বলা হচ্ছে :

বাঁধের নামর হে বঁধু
হালে উঠে চিটা মাটি।
আর ত তোকে সাজেনা বঁধু আলম্বা[১] ধুতি। ১=আলম্বিত

এই সব গানের যৌথচর্চা সেই সেই পরিবেশে অবশ্য হয় না। চাষের কাজ করবার সময় এ গান গাওয়া না হলেও কৃষির স্মৃতিবাহী এই সব সংগীতে যৌথ কর্মের চিত্রটিকে অংকিত করা হয়েছে। উদাহরণ :

যেন মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এ গান স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ, সরল, এবং কারুকলা-বর্জিত। লোকায়ত যে সুরেব মাধ্যমে লোকসংগীতেব আত্মপ্রকাশ, সে সুর কৃত্রিম নয়, চর্চাসাপেক্ষ নয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের স্বাভাবিক প্রভাবকে এড়িয়ে যাবার কোন প্রচেষ্টাই তার মধ্যে নেই। গভীর তত্ত্বের কথা অথবা মহৎ কোন ভাবেব কথা প্রচাব করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাব আবির্ভাব হয় নি, সমস্ত দিবসের কর্মক্লান্ত জীবনকে গভীর আবেগে বেঁধে, অবসর মুহূর্তে তার আগমন। এর জন্য প্রয়োজন নেই সাধনাব, আবশ্যক নেই দীক্ষাব, দবকাব নেই আচবিত শিক্ষাব। লোককণ্ঠে অপ্রত্যাশিতভাবে এব জন্ম। এই লোকসংগীতই আদি কবিব প্রথম কবিতা।

কিন্তু, তা'বলে একথা আমবা বলতে পাবি না যে গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টায় লোকসংগীত জন্মগ্রহণ কবে। বিশেষ বিশেষ লোককবিব সৃষ্টিই এমনভাবে জন-মানসে স্থান কবে নেয়, যা বিশেষ লোককে ছাড়িয়ে গোষ্ঠী অথবা অঞ্চলেব মধ্যেই পবিব্যাপ্ত হয়। সময় সময় ভূ-প্রকৃতি এবং নবগোষ্ঠীর একাত্মক দেশেব মধ্যেও তাব প্রভাব বিস্তৃত হয়। লোককণ্ঠে সে সংগীত যখন ধ্বনিত হয়, তখনই সে সংগীত সর্বলোকেব, বিশেষ কোন কবিব অধিকাবকে সে কোন-দিনই স্বীকাব কবে না। তাই লোকসংগীতেব ভণিতায় কবিব নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত। এ হচ্ছে লোকসংগীতের গোড়াব কথা। তাবপব, এখও পরিবর্তন ঘটে, বিবর্তন ঘটে বিশেষ পরিবেশে। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত সমাজে সেই আসল, খাঁটি, মৌলিক লোকসংগীত আজ আত্মবিলুপ্তি ঘটিয়েছে শিল্প-কলাকে অবলম্বন কবে,—বাগ বাগিণীব সুবচর্চাকে মুখ্য কবে। আধুনিক কালে লোকসংগীতেব পরিবেষণ বীতি অন্তত এই কথাই প্রমাণ কবে যে, লোকসংগীতেব মৌলিকতা নষ্ট হতে চলেছে। লোকসংগীত পবিবেষিত হচ্ছে রুচিমান্ শিল্পকলা-উচ্ছ্বাসী একদল মানুষের জন্য। এর সুব বদলেছে, রূপ বদলেছে, কারুকৃতিব দক্ষতা দিয়ে একে ভদ্রসমাজে সম্মানিত কবা হয়েছে এবং লোকসংগীত বচিত হচ্ছে নগব পবিবেশেব মধ্যে-ও। এ ভালো কি মন্দ, তার বিচাব কবতে বসছি না, একে অনিবার্য বলেই মেনে নিতে

হালোয়ায় হাল বাহে
কদ্‌ল্যায়[১] কদাল[২] পাড়ে
মইদিয়া[৩]-য় মিলে মজা মারে রে
এই ক্ষেতকে দিল কাদা করে।—

১ কোদালধারী ২—কোদাল
৩—যে মই দেয়

হবে। বিবর্তনের ধারায় মূল জিনিসের অস্তিত্ব এম্‌নি করেই বিলুপ্ত হয়; আর যদিও বা তার অস্তিত্ব থাকে, নতুন সৃষ্টির বহু অলংকারের আড়ালে তা ঢাকা পড়ে যায়।

অবশ্য একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, গোষ্ঠীর বা সমাজের পরিবর্তনের সংগে সংগে গোষ্ঠী বা সমাজের শিল্পরীতি এবং মৌলিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক উন্নতির সংগে সংগে মানসচর্চাও উন্নতস্তরে পদক্ষেপ করে। শিক্ষা-দীক্ষার বহুল বিস্তৃতির সংগে গোষ্ঠী যদি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয় তা হলে লোকসংগীত, এমনকি লোকসংস্কৃতিও নতুন পরিবেশে নিজেকে আবার নবরূপে প্রকাশিত করতে পাবে। একদা যা হয়তো মৌলিক লোক-সংগীত ছিল, নানা অলংকাব-অনুপ্রাসে কণ্টকিত না-হয়ে যা' ছিল অবিস্মৃত-পরিবেশ, যাব স্থূলরূপের নগ্নপ্রকাশেব মধ্যেও সহজ এবং স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের রেশ আকাশ-বাতাস, পথঘাট-প্রান্তব, নদী-পাহাড়-বন এবং গ্রাম জীবনকে প্লাবিত কবত, সেই লোকসংগীত কালে কালে বিবর্তিত হয়ে মার্গসংগীতের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পাবে। অবশ্য এ বিষয়ে কেবল সংগীত-বিদ্যায় পারদর্শীরাই বিশেষভাবে আলোকপাত কবতে পারেন। আজকাল লোকসংগীতকে লোকেব গণ্ডী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুন ভাবে নতুন ভাষায়, নতুন অলংকার অনুপ্রাসে সাজিয়ে তার মৌলিকত্ব বিসর্জন দিয়ে লোকসংগীতের নামেই প্রচার কবা হচ্ছে। সেখানে বাইরের লোকেব প্রবেশ-অধিকার অবাধ। সংগীত-বিবর্তনের এও এক নবরূপ।

সীমান্তবাঙ্‌লায় ঝুমুরের বৈচিত্র্যেব দিকে এবারে দৃষ্টিপাত করা যাক্‌।

—ছয়—

সীমান্তবাঙ্‌লার বাইজী ও ঝুমুর

লোকচর্যার অনেক কিছুর মধ্যেই উক্ত অঞ্চলসমূহে 'নাচ্‌নী' নাচের চর্চাও পড়ে। এই 'নাচ্‌নী'নাচানো চর্চা কতো পুরোনো, তা ঠিক বলা মুস্কিল। তবে মনে হয়, মানভুম-ধলভূমের অনেক ভূমিজ জমিদারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় 'নাচ্‌নী'নাচানোর রেওয়াজ গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এই নর্তকীদের সংখ্যা কমে গেছে বটে, তবে বিলুপ্ত হয় নি। ভূমিজ, খাড়িয়া,

কামার, মাল, ভূঞা প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রথা বেঁচে আছে। ছোটনাগপুরের রাঁচী প্রভৃতি অঞ্চলেও নর্তকী প্রতিপালনের রীতি আছে। বলা বাহুল্য, কোন আদিবাসী ভূস্বামীর নিজস্ব নর্তকী থাকবে না, এ হতেই পাবে না। নর্তকী না থাকলে লোকে অভিজাত বলবে না। একদা বাঙলাদেশেব গ্রাম্য জমিদাবদেব মধ্যে এবং বণিকসভ্যতাপুষ্ট কলকাতার প্রথম যুগেব বিত্তশালীদের মধ্যে বক্ষিতা এবং বাইজী পোষাব যে বেওয়াজ ছিল, তার সংগে এব ভাবগত কোন পার্থক্য নেই।

সোজা কথায়, সহজ কথায় এই কথাই বলা যায় যে 'নাচ্‌নী' বা নর্তকীবা আদিবাসী ভূস্বামীদেব বক্ষিতা, আশ্রিতা এবং অনুগতা, ভূস্বামীদেব বিলাস-কক্ষেব নৃত্যগীতবিশাবদা নর্মসহচরী। বিশেষ বিশেষ উৎসবে—বিশেষ কবে করম উৎসবে এদের সাহচয অপবিহার্য। সপাবিষদ্ ভূস্বামী নর্তকীব নাচেব আগুনে ইন্ধন যোগান। দলে দলে লোকে সমবেত হয়ে নাচ্‌নীব নাচ উপভোগ করে। এ কথা স্বীকাব কবতেই হবে যে এ নাচেব না-আছে শালীনতা, না আছে কলা-কৌশল। অসংস্কৃত, অমার্জিত দেহভঙ্গিমায যৌন বোধকে খুঁচিয়ে তোলাই এ নাচেব বৈশিষ্ট্য এবং ভদ্র, মার্জিত, কচিমান সমাজে এ নাচ পুবোপুবি অচল। অবশ্য একথাও স্বীকাব কবতে হবে যে নাচের দিকটা যতো অশ্লীল হোক্ না কেন, গানেব দিকটা ততখানি নয়, আর লোক-সংস্কৃতির একটি বিশেষস্তবেই এব উত্থান-পতন। আদিবাসী ভূস্বামীদেরও গৃহ-পোষিতা নর্তকী ছাড়া বিশেষ বিশেষ পেশাদাব-দলভুক্তা নাচ্‌নীদেরও দেখা পাওয়া যায়। কবম উৎসবে এদেব কোন দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, সাবাবাত ধরে নাচ গান চালানোব জন্যে, পবিবর্তে পাবিশ্রমিক দিতে হয় দু-দশ টাকা। নাচনী নাচে নাচ্‌নীব দলভুক্ত লোকদেব বলা হয় 'হাউসী'[১] অথবা 'রসিক'। বিশেষ কোন একজনেব বক্ষিতা হিসেবে থাকলেও নাচ্‌নী সর্বজনভোগ্যা, সর্বপ্রিয়া। করম উৎসবের রাতে এদের সাক্ষাৎ সহজলভ্য। এম্‌নি একটি উৎসবেব বাতে—

'একটু রাত করেই আবন্ত হবে অনুষ্ঠান। অমুকের বাড়িতে করম-পুজোর রাতে নাচ্‌নী নাচ হবে, এ কথা কানে কানে হেঁটে গেছে আশে পাশের গাঁয়ে। আকাশে একাদশীর চাঁদ; মেঘের ধোঁয়ায় ঝাপসা হলেও নাচ গান চলবে। আকাশ যদি ভেঙে পড়ে ঝমঝম কবে একান্ত আকস্মিকতায় তাহলে অবিশ্যি

১ হাউস—আমোদ।

কথা চলে না আর। দলে দলে লোক এসে জমবে। নাচ্‌নী-ও এসে পড়বে, দলশুদ্ধ। দলে থাকবে বাদ্যযন্ত্র—ঢোল, ধুম্‌সা আর মন্দিরা। মাদলের প্রয়োজন হয় না এতে। আশেপাশের গাঁয়ে যারা আছে বায়েন, যারা আছে গায়েন, কেউ থাকবে না ঘরে বসে। সবাই এসে যোগ দেবে; সবাই এসে পরিচয় দেবে বাদ্যপ্রতিভার, গীতশক্তির। বায়েনের মুখে বাজনার বোল খই ফুটিয়ে ছাড়বে। তবেই না বায়েন! কাঠি পড়বে ঢোলে। চঞ্চল হয়ে উঠবে প্রতীক্ষমাণ জনতা, গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে নাচের জায়গার পরিসর বাড়িয়ে দেবে। বৃত্তের মধ্যে থাকবে নাচ্‌নী—একজন গায়েন আর তিনজন বায়েন। প্রধান বায়েন হচ্ছে ঢুলী,—যে ঢোল বাজায়। ধুমসা আর মন্দিরা তাল রাখে মাত্র।

ঠিক সময়েই প্রবেশ করলো নাচ্‌নী। কালো কুচকুচে রং। সুগন্ধি তেলে জবজব করছে খোঁপা-বাঁধা চুল। খোঁপাতে রূপোর পানকাঁটা গোঁজা; সিঁথিতে সিঁতলী, কপালে টিক্‌লী, নাকে নোলক, কানে কানপাশা, চিবুকে উল্‌কি, বাহুতে বাজু, হাতে চুড়, গলায় চাঁপাকুঁড়ি, কোমরে বিছেগোট—বিচিত্র ধরনের অলংকার, সবই প্রায় রূপোর।

গায়ে সেমিজ, পরনে শাড়ী, ঘাঘরার মতো করে। হাতে সস্তা আতর মাখানো একটি রুমাল।

নর্তকী হাতজোড় করে নমস্কার করবে সবাইকে। জনতার কণ্ঠ থেকে নানা ধরনের বাহবা ধ্বনি ভেসে আসবে।

একজন গায়ক দেবদেবীর বন্দনা করবে প্রথমে। নর্তকীও যোগ দেবে তার সঙ্গে। তারপর শুরু হবে নাচ-গান। মদ আর হাঁড়িয়ার রঙীন নেশায় সবাই তখন চঞ্চল।

ঝুমুরের সুর জাগে গায়ক-কণ্ঠে:

আইল সখী বসন্ত সময়—
না আইল আমার শ্যাম রসময়
কুথা রহিল ভুলিয়া……
দিন গেল যত বহিয়া—
ও গ……রাত গেল তো চলিয়া—আ—আ—আ—
কুঞ্জে না আইল আমার কালিয়া—।

কানে হাত দিয়ে গানে টান দিয়ে রসিক গায়ক গান গাইবে। উৎকর্ণ হয়ে

শুনবে নর্তকী। ঠিক সময়ে তাকে গানের শেষ কলিটা ধরতেই হবে, কুঞ্জে না আইল আমার কালিয়া—আ—আ—। স্তব্ধ হয়ে থাকবে ঢোল, মৃদু ধ্বনিতে তাল রাখবে ধুমসা আব মন্দিবা। নাচ্‌নীব জানা গান হলে সব গানটাই সে পুনরাবৃত্তি করতে পারে, না-হলে শেষ কলিটা ধবে তালরক্ষা করতেই হবে। আবার গান ধবলো গায়েন :

কোকিল কুহবে সাবা বাতিয়া
মধু রসে বইল মাতিয়া—
কুঞ্জে না আইল আমার কালিয়া—আ—আ—।
আহা—দেশে দেশে যান্ বসন্ত না পান—

ঐ চবণটিকে উল্টে পাল্টে আবাব হয়তো গাইলো—

যে দেশেতে যান্ বসন্ত না পান
তাই রইলো মোবে ভুলিয়া ··
কুঞ্জে না আইল কালিয়া—আ—আ—আ—

নর্তকীর পায়েব পাতায় চাঞ্চল্য দেখা দেবে এবাব। গানের অনুবণনে স্পন্দিত হবে তার দেহ। ঢোলে কাঠি পডলেই তাব সর্বাঙ্গ ফুলে ফুলে উঠবে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠবে ঢুলী :

ধেইটি ধেইটি ধা গেড্ গেড্ ধা গেড্ গেড্ ধিটি ধো—
উব্ ব্ ব্—ধিটি ধো ধো, ধিটি ধো—

সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্গ সঞ্চালন কববে নর্তকী। হাত-পায়েব বিচিত্র ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করবে সে। কখন দু-হাতে শাড়ীর দু পাশের ঘাঘরাব মতো অংশকে তুলে ধবে নাচবে, কখন বুক চিতিয়ে, কখন রুমাল তুলে। বাজনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নাচতেই হবে। দলেব বাইবেব ঢুলী হলে নাচ্‌নীকে বিপদে পডতে হয় মাঝে মাঝে। শুরু হবে রংয়েব বাজনা। মুখের বোলে ঢোলেব তালে নাচনীকে নাচতে হবে রংয়েব নাচ। গায়েন রংয়ের গান ধরলো :

সাঁজের বেলা জলকে গেলে দুটি শেয়াল হুল্‌কে[১]—
আমবা কি বলে যাবো জলকে।
হাত দুটা নাইডে (নেডে) দিলে লইতন চুড়ি
ঝল্‌কে—।

---

১ উঁকি দেয়

গান শেষ হলে বাজনা বাজবে :—

ধিদ্দি ধিদ্দি ধিদ্দি ধো

ধে ধেদ্দা গিড়্দা ধো

ধুম্সা বাজবে : গিড়ি গিড়ি গিড়ি ঘুম্, গিড়ি গিড়ি গিড়ি ঘুম্।

মন্দিরা তাল রাখবে : টিটি টিটি টিটি টিং, টিটি টিটি টিটি টিং।

নাচ্নীকে বিশেষ পরিশ্রম করে এ সময় নাচতে হয় না। নাকের সামনে রুমালটা হাওয়া খাবার ভঙ্গিতে তালে তালে নাড়তে থাকে আর সহজ পদক্ষেপে অঙ্গচালনা করে।

মাঝে মাঝে বিশ্রাম দিতে হবে নর্তকীকে।

নতুন গায়ক, নতুন ঢুলী বেরিয়ে আসবে ভিড় ঠেলে। মুচকি হেসে গান ধরবে সে :

হাত বাড়ালে বকুল ফুল

নাচ্নী তোমার গেল জাতি কুল।

তবে আনহে গায়ের গামছা

যৌবন দিব বাঁধিয়ে—

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু ঘরে দিব বলিয়ে।

জনমণ্ডলী থেকে সাবাস ধ্বনি উঠবে।

নাচ্নী ধরলো শেষের কলি : ছুঁইও না ছুঁইও না বঁধু ঘরে দিব বলিয়ে—।

বেজে উঠলো ঢোল। বোলের তুবড়ী ছুটলো মুখে—। বোলের ভাষা অনেক সময় অত্যন্ত অশ্লীল। নর্তকীর উদ্দেশে ছুঁড়ে মারা হয় সে বোলকে। বলা বাহুল্য, নর্তকী খুশি হয় তাতে। বায়েন যে খাঁটি রসিক, তা বুঝতে একটুও দেরী হয় না তার—। চোখ-মুখের নীরব ভাষায় সে নিজের খুশির ভাবটা প্রকাশ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ফিরে উঠে বসে, চরকীপাক খেয়ে উদ্দাম নাচে সবাইকে মুগ্ধ করে দেয়।

ঝন্ঝন্ করে ফেরী পড়ল একটি থালায়।

নাচ্নী হয়ত অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করেছে, একজন, 'রইস' গোছের ছোকরা তার নিজের কপালে একটি পয়সা রেখেছে কাঁচপোকার টিপের মতো করে। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে সে। তার কপালে নিজের কপাল ঠেকিয়ে, কপাল ঘষে নিজের কপালে তুলে নিতে হবে পয়সাটি। নাচতে নাচতেই

যেতে হবে, আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে নাচের অভিনয় করেই তুলতে হবে পয়সাটি। বলা বাহুল্য, এ আহ্বান কোন নাচ্নীই অস্বীকার করতে পারে না, মানহানি হয়। লোকে বলতে পাবে—'এ লাচ্নীটা আলাপ কবতে শিখে নাই, ইটা কি একটা লাচ্নী বঠে'।

বসিক এবারে রংয়েব গান ধরবে :—

সাঁঝের বেলা জলকে গিয়ে ঝুম্‌কা হারালি।
তুই লো ছক্‌রী চালাক বটে শ্যামকে ভুলালি॥

উর্‌র্‌র্ গিডি ঘুম। গিডি গিডি ঘুম। টি টি টিং টিং। টিটি টিটি টিং—।
নাচনী যাবে পয়সা তুলতে।

অনেক চেষ্টাব পর বুকে বুক দিয়ে, নাকে নাক দিয়ে নিজের কপালে তুলে নেবে পয়সাটি। চাবদিক থেকে হর্ষধ্বনি উঠবে। যার কপাল থেকে পয়সা তোলা হল, কৃতার্থ হয়ে সে খুশিমত ফেরী দেবে নাচনীকে।

কেউ হয়ত আঙুলেব ডগায় পয়সা বাখল। আঙুল দিয়েই তুলতে হবে সেটিকে। এদিকে হয়ত বা ঢুলু ঢুলু করছে নাচ্‌নীর চোখ, মদেব নেশায় নাচের তালে ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছে ক্রমশ, রাতও বাডছে শাঁ শাঁ করে। তা হলেও রসিকেব দল ছাডবে কেন। নাচ্‌নীর ক্ষমতাকে বেশ কবে ঝালিয়ে নেওয়া দ্রবকাব।

এবারে ঢোল ধবল আর একজন। বোল দেবে :—ধেইটি ধেইটি ধা গেড গেড ধা গেড গেড় ধিটি ধো। ধোগা তিনি পুঁই খাডাটা—

গান ধরলো গায়েন :
শবৎ পুর্ণিমা আলো
স্বামী থাক্‌লে তেমনি ভালো—,
শিশুকালে স্বামী মারা যায়।
ওরে সুবল, এ যৌবন বাখা হল দায়।

বাজনার পরে এর সঙ্গে রংয়েব গান দেওয়া হল :

জাডা কাঠের গাব গুবাটি
পাছায় রাখে তান,
ঢেঁকিটা দে হডকাঁই বারেক দুবার
আমার শুকিয়ে গেল ধান।

নাচ্‌নীনাচের গান আর নাচ এমনি করে এগিয়ে চলে। প্রেমের গান,

সামাজিক ।বধিনিষেধেব গান, বিধবা মেয়ের ভরা যৌবনে ব্যাকুল বেদনার গান, বস-পরিহাসের গান আরও কত কি গানের মধ্য দিয়ে সারা বাতকে মুখর কবে রাখা হয়। এ সঙ্গে এ কথাও বলা দরকাব যে এব মধ্যে বাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত গান, আধ্যাত্মিক গান এবং স্বদেশী গানও ঢুকে পড়েছে। তবে এ সব গানেব প্রাধান্য ততখানি অভিব্যক্ত নয়। উদাহবণ স্বরূপ কয়েকটি গানেব উল্লেখ করা যেতে পাবে। শহীদ ক্ষুদিবাম সম্পৃক্ত সেই বিখ্যাত গানটিও কিছুটা রূপ পবিবর্তিত কবে এদেব মধ্যে দেখা দিয়েছে :—

শনিবাবে দশটার পরে
লোক না ধবে কাচারী ঘবে গো মা।
(ওই) হাসতে হাসতে লিব ফাঁসী
দেখবে ভাবতবাসী।
বিদায় দাও মা ফিবে আসি।
অশ্ব যদি থাকত ছাড়া
ক্ষুদিরাম কি পড়ত ধবা
(ঐ) চাবুক মাবে চলে যাইত বিন্দে গয়া কাশী—
বিদায় দাও মা—ফিবে আসি।

আব একটি গানে বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষণীয় :—

মানুষ জনম দুলভ (দুর্লভ) ভাই
কুপথেতে কেন যাবিবে ভাই—
কুপথেতে যাবি পথ নাহি পাবি
বৈকুণ্ঠ ভুবনে—এ—এ—এ—
ভুলো না জীব গো হবিনামেব বীণে—

এসব গানের শেষেও বংয়েব গান কিন্তু আলাদা। বলা বাহুল্য, বংয়েব গান বললেই বোঝাবে হাল্কা চটুল চপল গান। তাই এ গানেব শেষে বং দেওয়া হতে পাবে।

তোদের পাড়া বুলতে গেলে
গুড় দিয়ে ভুলালি তোবা।
যাবে যা মন ভোমবা—
আব যাব না তোদেব পাড়া।

কতকগুলো গানের ভেতব আবার সংকেত-ধর্মকে ফুটিয়ে তোলা হয়।
গায়েন গাইলো :

ঘরেব উপবে ঘর
তায় বসেছেন গিরিবর,
পাখি দয়া নাই রে তোব—
সামান্য পিবিতিব লাগি পাখি গবাদের ভিতব।
কালো কালো ছোকবাটা ঘাড়ে রইলো ঢোল
সামান্য পিবিতির লাগি পাখি গবাদেব ভিতব
ঢোল ধুমসা পড়ে বইলো বাবান্দা ভিতব
সামান্য পিবিতিব লাগি, পাখি গবাদেব ভিতর
পাখিটি উড়ে গেল তেতলা উপব—
সামান্য পিবিতির লাগি পাখি গবাদেব ভিতব।

রংয়েব তানে গান উঠলো :—

আঘুব বাটে (=আগেব দিকে) বঁড়্শিলাঠি পাছুববাটে শিকাবী
লালবাজাবে লাচ লাগেছে চল গো যাব বেপাবী ॥

একেবাবে শেষের দিকে কোন কোন বসিকজন এসে গানেব ছলে জানিয়ে দিয়ে গেল :—

লোকে বলে হাতী হাতী
ভাতাবকে মারেছ লাথি।
ভাতাব মাবা নামটি তোমাব গেল না—
ফুঁকিলে আগুন জ্বলে না।

নাচ্নীর চোখে নেশার আবেশ, দেহে পরিশ্রমের ক্লান্তি, মনের মধ্যে ধোঁয়াটে স্বপ্ন। তখনও বাজছে ঢোল, ধুমসা আব মন্দিরা। ফর্সা হয়ে এসেছে পুর্বদিক।—তা হলেও কি নাচ-গান থামবে! কোন কোন ক্ষেত্রে দু জন বা তিন চার জন নর্তকী, পালা কবে অথবা একত্রে নৃত্যগীত পরিবেশন কবে। নতুন কোন ঝুমুর গায়ক এসে হয়ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝাঁজ মিশিয়ে কিছু রসিকতা করতে চাইল। সে রসিকতার মধ্যে গ্রাম্যতাই একান্ত স্বাভাবিক। 'ঝুমুরিয়া' যদি বলে :—

একটি মশা বাঁধে বাড়ে

দুটি মশা খায়—

ছুঁচা কামড়াইল কামড়াইল ভাই নাচ্‌নী দিদির গায়—

তা হলে নাচ্‌নীকে জবাব দিতে হবে মুখের উপর। জবাব দেবার জন্য নতুন কোন গান রচনার জন্য ব্যস্ত হতে হয় না তাকে। ঝুমুরিয়ার গানকেই সে নিজের কাজে লাগায়। তখন 'নাচ্‌নী দিদি-কে' আর ছুঁচো কামড়ায় না, কামড়ায় 'ঝুমুরিয়া দাদার গায়'। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল আর ধুমসা বা নাকাড়া—মেঘের আওয়াজ তুলবে। ঢোল আর ধুমসার বোল বলতে গিয়ে ঢোল-বায়েন হয়ত এমন ভাষায় তা প্রকাশ করবে যা অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়ে।

সীমান্তবাঙ্‌লার নাচ্‌নী-নাচকে ঠিক লোকনৃত্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তবু-ও লোকসংস্কৃতির বিশেষ অংগ হিসাবে এর কথা এড়িয়ে গেলে, সীমান্ত-সমাজের একটি জনপ্রিয় দিক বাদ থেকে যেত।

—সাত—

কাঠিনাচ ও ঝুমুর

কাঠিনাচকে শুধু সীমান্তবাঙ্‌লার মধ্যেই সীমায়িত করে রাখা যায় না। এই নাচটি কোন-না কোন রূপে সমগ্র ভারতবর্ষেই প্রচলিত। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, কাঠিনাচ সীমান্তবাঙ্‌লার বিশিষ্ট লোকনৃত্যের অন্যতম নয়, তবুও এর প্রচলনের আধিক্য এই কথাই প্রমাণিত করে যে সমগ্র ভারতবর্ষে এই নাচের যেমন আদর, এখানেও ঠিক সেই রূপই।

বীরভূম-বাঁকুড়া মানভূম-ধলভূম ঝাড়গ্রাম-ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের বাগদী-বেহারা-বাগাল-ভূমিজ-ভূঁইঞা-মাহাতো প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নাচের বিস্তৃতি লক্ষণীয়। অথচ প্রতিবেশী সাঁওতালদের মধ্যে অথবা ওরাওঁ-মুণ্ডাদের মধ্যেও এর প্রচলন একেবারেই নেই। দক্ষিণ ভারতের কোলাট্টম রাসনৃত্যের এবং রাজস্থানের দণ্ডিয়া রাসনৃত্যের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে এই কাঠিনাচের রূপ-সাদৃশ্য আছে। কাঠিনাচ যে মূলতঃ রাসনৃত্য, সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ নেই।

সীমান্তবাঙ্‌লার কাঠিনাচের সঙ্গে যে গান গাওয়া হয়, সে গানকেও বলা

হয় ঝুমুর :—শুধু 'ঝুমুর' নয়, 'কাঠিনাচের ঝুমুর'। এতে—রাধাকৃষ্ণলীলার গানই মুখ্য।

কাঠিনাচের দলটি একটি বৃত্ত বচনা কবে দাঁড়ায়। বৃত্তের মধ্যে মাদল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে বায়েনরা। কোন কোন সময় একজন অথবা দুজন বায়েনই একটু ঝুঁকে মাদল বাজাবাব জন্য প্রস্তুত হয়। সাধারণত, ধুমসা বা নাকাড়া-ও মাদলের সঙ্গে বাজে। গানের সুরেব মধ্যে খুব বেশী বিভিন্নতা পরিলক্ষিত না হলেও, সময় সময় সুরেব ভিন্নতা অনুসাবে ঢোলের বাজনাও চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে ধুমসা মাদলের সঙ্গে সঙ্গতি বাখে মন্দিবাব তাল।

বাস উৎসবেব সঙ্গে কাঠিনাচেব স্মৃতি বিজড়িত হলেও, সীমান্তবাঙ্‌লায় তা বিভিন্ন পুজাপার্বণ এবং উৎসবেব সঙ্গেই প্রচলিত। দুর্গাপুজা অথবা মকব সংক্রান্তিব মেলা উপলক্ষে, কাঠিনাচেব দল আত্মপ্রকাশ কবে বেশী। বলা বাহুল্য, সীমান্তবাঙ্‌লায় এই নাচ একান্তভাবে পুরুষদেবই নাচ, বিশেষ করে তরুণদেব, মেয়েরা কোনদিনই এ নাচে অংশগ্রহণ কবে না। পুরুষবাই নারীজনোচিত সজ্জায় বিভূষিত হয়ে 'গোপী' হয়ে যায়। মাদলের বাজনা সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই, বীতি অনুসাবে প্রত্যেকটি লোক তাব দক্ষিণেব লোকের বাম হাতেব কাঠিতে আঘাত করে এবং বাম ভাগে দাঁড়ানো লোকেব ডান হাতেব কাঠিতে আঘাত কবে তাল বাখে। বীবভূমেব বাগদী বেহারাবা মালকোঁচা মেবে পুরুষবেশেই কাঠিনাচে অংশগ্রহণ কবে।

একজন মূল গায়েন আব একজন সহকাবী গায়েন প্রথমে বন্দনা সুরু করে। বন্দনা শেষ হলে গান সুরু হয়। মূল গায়েন হয়ত গান ধববে :

বাঁশ নাই বাঁশির ফাবল
তরল বাঁশেব আগল গো—
বিনা ফুঁকে বাজে বাঁশী
বলে রাধা রাধা গো।

অথবা :—

বড বনের লতাপাতা ছোট বনেব শাল পাতা,
কোন বনে হারালে কানু সোনা বাঁধা বাঁশীবে।
হায়—হায়—

মূল গায়েন, প্রথম দু কলি গাইলে, তার অনুবর্তী দলটি—হায় হায়—বলে সুরের ফাঁকটুকু পুরণ করে পুনরাবৃত্তি করে গানের। অবশ্য এ রীতি

সর্বত্র প্রচলিত না হলেও, এও এক বিশেষ ধরণের রীতি। অনেক সময় প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলীর কিছু অংশ কাঠিনাচের ঝুমুর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

রাধাকৃষ্ণের গান ছাড়া রামসীতার উপাখ্যান-ও কাঠিনাচের গানে সুপ্রচলিত। রামসীতা এবং লক্ষ্মণ চলেছেন বনে, সূর্যতাপে রাজকুলবধূ সীতা ঝিমিয়ে পড়েছেন, তারই সুর ফোটে গানে। অবশ্য, শুধু রামসীতার উপাখ্যানই বা কেন, কাঠিনাচের অধিকাংশ গানই কোন না কোন পুরাণ থেকে সংগৃহীত। রামায়ণের অনুবর্তী হয়ে কাঠিনাচের ঝুমুরে বলা হলো হয়ত বা—

রাম ভাঙেন সরু ডাল
লক্ষ্মণ ধরে শিরে গো,
তাহার ছায়াতে সীতা চলেন ধীরে ধীরে গো।
হায়—হায়
আগে যান রামচন্দ্র পশ্চাতে যে লক্ষ্মী গো।
তাহার পশ্চাতে যান লক্ষ্মণ মহামতি গো,
হায়—হায়
উপরে সূর্যের তাপ গো তলে তাতা বালি
চলিতে না পারেন সীতা করেন বিকলি গো—
হায়, হায়

সঙ্গে সঙ্গে মাদলের বোল শোনা যাবে :—

তাই থেটে তাক ধেই, দা ধিনি তাং
দা ধিনি তাং তাক্, ধেই ধেই তাং।

গানের সুর ক্রমশ যত আরোহী পর্দায় উঠতে থাকে, মাদলের বোল তত বদলাতে থাকে। হাতের কাঠির তাল যত দ্রুত লয়ে উঠবে তত দ্রুত তালেই মাদল বাজবে। শেষে আসবে বং, কোন কোন জায়গায় বলে গাঢ় সুর বা গাঢ়ুয়া সুর। তখন মাদল বাজবে :

তাক্, ধিউর ধিতাং খিটি তাং
ধিনাক ধিতাং তাক্ খিটি তাং
ধিউর ধিতাং খিটি তাং

বংয়ের গান মোটেই মূল গানের অংশ নয় এবং এ গানগুলি সাধারণত হাল্কা মেজাজের গ্রাম্যসঙ্গীত।[১]

বলা বাহুল্য, এ নাচ সীমান্তবাঙ্‌লার লোকনৃত্য পর্যায়ের উচ্চস্তরের নাচ—এবং কাঠিনাচের সঙ্গে যে ঝুমুর গাওয়া হয়, তার অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের লীলা প্রসঙ্গ।

—আট—

দাঁড় ঝুমুর ও টাঁড় ঝুমুর

এবারে যে ঝুমুর গানের কথা আসছে তা খুব লৌকিক এবং মৌলিক। দাঁ'ড়শাল নাচে এবং পাঁতা নাচে এর প্রচলন খুব বেশী। দাঁ'ড়শাল নাচ বা দেঁউড়া নাচ শুধু পুরুষদের নাচ। কর্মক্লান্ত দিবসের শেষে মাদল এবং ধুমসা নিয়ে গ্রামীণ কৃষক এবং শ্রমজীবীদের আখড়ায় দাঁড়শাল নাচ হয়। হাত ধরাধরি করে, বৃত্ত রচনা করে সুরু হয় এই নাচ। পাঁতা নাচে স্ত্রীপুরুষ সম্মিলিতভাবে নাচে। করম-উৎসব উপলক্ষে পাঁতা নাচই উৎসব-নৃত্য। মদ এবং হাঁড়িয়া দাঁড়শাল এবং পাঁতা নাচে উন্মাদনা নিয়ে আসে। বলা বাহুল্য এই একই নাচের নাম অঞ্চল ভেদে দাঁ'ড় বা পাঁতা। দাঁড়ের উচ্চারণ সাধারণত 'দাঁয়েড়'।

আর, 'টাঁড় ঝুমুর' হচ্ছে মাঠের গান, ক্ষেতের গান। ক্ষেতে-মাঠে কাজ করবার সময় সম্মিলিতভাবে এই ঝুমুর গাওয়া হয়, সাধারণত শ্রমজীবী এবং কৃষাণী নারীদের কণ্ঠে এর আবির্ভাব। কাজের শেষে ঘরে ফেরার পথেও এদের কণ্ঠ ধ্বনিত হয় ঝুমুর গানে। এ সমস্ত ঝুমুর লোকসংগীতের আদিম সুর এবং আদিম প্রবণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোন অলংকারের কৃত্রিমতায় এসব গান মেকী হয়ে যায় নি আজও। বন-বাদাড় ক্ষেত-খামার, মাঠঘাটের এই ঘাসের ফুলগুলি সভ্যসমাজে অপাংক্তেয় হবেই, কিন্তু এ ফুল যেখানে ফুটেছে, সেখানে তাদের শোভা-সৌন্দর্য স্থানোপযোগী নিশ্চয়ই। সেখানে অনুর্বর মাটির বুক চিরে লাঙ্গল চালায় রুক্ষমূর্তি জনতা। তাদের মাথায় আগুন

১ পুঁটি মাছে ঘর ছায়েছে বক ধরেছে বাতা। ইঁদুর গেল বাপের বাড়ী শিয়াল ধরে ছাতা। ইত্যাদি।

ছড়ায় চৈত্র-বৈশাখের সূর্য ; মাথার ঘাম চোখের ওপর গড়িয়ে পড়ে। সে সময় তাদেরই প্রিয়তমার দল যদি গুন গুন করে গান ধরে, সে গানও বেদনামথিত ঝুমুরের ফুলের মত ঝরে পড়ে সর্বত্র :—

আমার বঁধু হাল করে কেঁদ কানালির ধারে
হায় হায় মাথার ঘাম চোখে পড়ে
দেখে হিয়া ফাটে
ননদিনী লো, আমি নিজে যাবো 'বাসিয়াম'[১] দিতে।

কল্পনা নেত্রে দেখা যেতে পারে এবার: সীমান্তবাঙলার একটি চিত্র: বধূ চলেছে মাথায় পান্তাভাতের হাঁড়ি নিয়ে, যেখানে বঁধুর মাথার ঘাম চোখের ওপর পড়ে হয়তো বা মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে।

আর ওদিকে হয়তো এক মেয়ে বাপের বাড়ী ছেড়ে যেতে নারাজ। স্বামী হয়তো তাকে নিয়ে যাবার জন্য আসছে। সংবাদ পেয়েই, মাথাব্যথা স্বরু হলো তার:

যখন জামাই আধাবাটে
তখন বিটি পুকুর ঘাটে,—
জামাই দেখে বিটির মাথা-তুখাজব গে
জামাই দেখে—

বিভিন্ন ধরনের ঝুমুর গান দাঁড়শাল নাচে এবং পাঁতা নাচে তো গাওয়া হয়ই। মাঠে-ঘাটে-ও লোককণ্ঠে এসব গান ধ্বনিত হয়। মাঠে-ঘাটে যে সমস্ত ঝুমুর গাওয়া হয়, তা অনেক সময় শ্লীলতার পর্যায় ছাড়িয়ে যায়। অনেক গানই ইংগিতপূর্ণ। কোন তরুণী মেয়েকে দেখে পথে-ঘাটে কোন ছোকরা হয়ত ঝুমুরের সুর ছড়াল :—

শুকনা গাছেতে ফুটেছে ফুল
বঁধু কেমনে তুলিব ডালিমের-ই ফুল
তুলিতে তুলিতে হলো সকাল ;
বঁধু কেমনে তুলিব ডালিমেরি ফুল।

এ গানের উত্তরও মিলবে :—

আম গাছে আম নাই ঢিল কেন ছুঁড় হে,
তোমার দেশের আমি নই— আঁখি কেন ঠার হে।

১ পান্তা ভাত

প্রেমের আকুতি এবং আকাঙ্ক্ষার কথাও নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে ঝুমুর গানে। বসন্ত ঋতুর আগমনে পাহাড়-বন চঞ্চল করে আগুন জ্বলে পলাশ ফুলের। সে আগুনের শিখা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় হৃদয়দেশ। কিশোরী মেয়ের বুকেও বয়ঃসন্ধির স্পন্দন জাগে। কখন বা ঝরঝর বর্ষণের দিনে ও রাতে দেহমন পুলকিত হয়, ব্যাকুল হয় স্পর্শের জন্য। কোথায় কে বিরহিণী নারী প্রতীক্ষায় রাত ভোর করে দেয়। এদিকে হয়ত কুমারী মেয়েদের বিবাহের লগ্ন আসে, পাহাড় পর্বতের কোণে কোণে গান জাগে। মানভূমের শুষ্কমাটির বুক ফুঁড়ে ফুল ফোটে ঝুমুরের, ধলভূমের বনে-বনে দেখা দেয় শিহরণ।

। ১। সাঁঝ সকালের বেলা
কে মারিল চালে ঢেলা—,
ঢেলা নয় শ্যাম, পানের পটলা—
গাল দিছে ননদী অবলা।

। ২। বঁধুয়া আসিবে বলে কপাট না দিল ঘরে—
বঁধুয়া—, সববস নিল চোরে। (=সর্বস্ব নিল)

। ৩। আজিকার রাতিয়া
বড়রে বিপতিয়া,
মনে পড়ে—
আমার পুরান সঙ্গতিয়া—
মনে পড়ে।

। ৪। চোত বোশেখ মাসে ফুটল পলাশ গে
চুহি চুহি দিদি করল গবাস গে।

। ৫। যখন ছিলাম ছুটুমুটু
খাঁয়েছিলাম জনার বুটু,
আজকালটুকু হয়েছি ডাগর—
কত ছলে ডাকছে নাগর।

। ৬। শেরাবনের কাদাতে—(=শ্রাবণের কাদায়)
লজ্জা লাগে কাছে দাঁড়াতে—
ভরতি রোদের বেলাতে রে—
হাঁসে বাসে ধরলি গলাতে।

উপরিউক্ত গানগুলি সমাজের আংশিক চিত্র বহন করছে, এতে সন্দেহ নেই কোন। পাহাড়-বন-টাঁড়েব এও এক রেখাচিত্র।

কিন্তু এই চিত্র শেষ চিত্র নয়, পবিবেশেব নানান্ দিক ঝুমুব গানে বাসা বেঁধে আছে। শুধু গান থেকেই ঐ সমস্ত অঞ্চলের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণের একটি সুস্পষ্ট ধাবণা জাগবিত হতে পাবে। কিন্তু গানের উদ্ধৃতিতেই গানেব প্রাণকে আবিষ্কার কবা যাবে না। ধুমসা মাদল সহযোগে এই ঝুমুব যখন প্রতিফলিত হয় মাঠে-ঘাটে-বনে, পাহাড়ের সীমায়, তখন যদি কান পেতে শোনা যায় এই একান্ত লৌকিক লোকসংগীত, তা হলেই এব সত্তাটি আবিষ্কৃত হবে নতুন কবে। সে দেশেব মাটির সংগে নিবিড় যোগ না থাকলে, এ ঝুমুবকে মনে হবে বুনো এবং অশ্লীল। তবুও একথা বলতে হবে, যে লোকসংগীতেব একটি মৌলিক রূপ বহুবিধ প্রভাবকে এড়িয়ে পুবোপুবি কৃত্রিম হয় নি।

অতি সোজা কথায় কয়েকটি শব্দ দিয়ে গড়া এক একটি গান। লোক-কবিদেব চোখেব সামনে যা কিছু দেখা দিয়েছে, তাই হয়েছে গানেব বিষয়বস্তু। বাইবেব স্থূল জগতেই বেশী এদেব আনাগোনা। অন্তবেব কথাও ততটুকুই এরা বলেছে, যতটুকু স্থূল, যতটুকু সাধাবণ অনুভূতি। তাই কাঁঠাল গাছেব গন্ধটি এদেব নাকে এসে ছেলেপিলেব আশাব কথা মনে কবিয়ে দেয় :—

বাড়ী নাময় কাঁঠাল গাছ
ছেলাপিলায় কবে আশ—
গমকি গমকি উঠে বাস।

আবাব, যে কুলগাছটিকে বেষ্টন কবে লতিয়ে লতিয়ে উঠে গেছে লাউগাছ, যাব ফলেব আশ্রয় কুল গাছেব প্রতি শাখা, তার কথাও এই লোক-কবিরা ভোলে নি। কিন্তু এ গান মানেই প্রাণচাঞ্চল্য, তাই এ ঝুমুবেব প্রথম পংক্তি যদি দ্বিতীয় পংক্তির সংগে কোন সুসংবদ্ধ সম্পর্ক না রাখে, তা হলেও অবাক হবার কিছু নেই। কুলগাছে ভরা লাউ-এব সংগে মামাশ্বশুরেব মদমত্ত হওয়ার সম্পর্ক নেই বা থাকল, তবু ঝুমুবেব গানে পাওয়া যাবে :—

বাড়ি নাময় কুলগাছটি লাউএ ভরি গেল্‌রে—
বেধা-শালাব মামাশ্বশুর মদে মাতি গেল্‌রে।

অবশ্য,—কুলগাছ এবং মামাশ্বশুর, উভয়েই ভবপুর এবং 'বেধা-শালা' শব্দটি

যদিও একটি গালাগালি যার অর্থ জারজ—, তবু এ ধরনের কথা আদরার্থেও ব্যবহৃত হয়।

বলা বাহুল্য, এজাতীয় অধিকাংশ ঝুমুরের রচনা যাঁরা করেন তাঁদের অধিকাংশই নারী। পুরুষ ও স্ত্রী—উভয় জাতের কবিই সীমান্তবাঙলায় অনেক। আর একটি চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক :

গগ্‌লি[১] কুঢাইতে গেলম নন্দাইদের হিড[২]—
মাথায় গগলির পাইচ্ছা[৩] উপরে উড়ে চিল।
দাদা দে-ন গুলেল রে (=দাদা, গুলতি দাওনা)
মার‍্যে দিব শাক চিল।

মাছের প্রাচুর্য নেই এ সব অঞ্চলে, অতএব গুগ লিটা অখাদ্য নয়। নন্দাইদের জলাজমি থেকে গুগলি কুড়িয়ে মাথায় ঝুড়ি চাপিয়ে ফেরার পথে, মাথার উপর উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে শংখচিল। গুলতি দিয়ে সেই শংখচিলকে মারবার জন্য এই অনুরোধ।

পাহাড়ী নদী কোন কোন সময় হামলা সুরু করে ক্ষেতের উপর, আবার কখন সেই যে আকাশ ধরে যায় একটি ফোঁটাও ঝরে পড়ে না, ক্ষেত যায় চৌচির হয়ে,—

।১। সরু ধানে কলমথাড়ি
তাই রুইছে বহালে,
ডুবে গেল সে ও বেকোনদীর হামালে।

তখন কাঁদতে হয়, ভাবতে হয় :

আইল যুগিয়ার বান, নিয়া গেল
ক্ষেতের ধান
হিডে বসে ঝুরত নয়ান
কৈসে বাঁচে প্রাণ।
মহাজন আল্যে কি দিব জবান।

অথবা—

বাদ গেল ফাট্যে ফুট্যে
বহাল গেল ছাতু ফুট্যে

১=গুগলি, ২=ক্ষেত, ৩=ঝুড়ি

এমন ধরনটা দেখি নাই গিহানে ;—(=জ্ঞানে)
জল হবে বিজয়া বিহানে।

দিনের কাজ সেরে ঘরে ফেরার পথে রাস্তার কাদায় যদি কোন মেয়ের পায়ের 'ঝুঁটি' হারায় তা হলে ঝুঁটি খোঁজার জন্য অপেক্ষা করতে হবে সংগীদের ; না-হয় তাদের কপালে নারীর গঞ্জনা জুটবে। তাদের শুনতে হবে :

আমপাতাটি জামপাতাটি কাদায় গাড়ালো,
দাঁড়া ন রে খাল-ভরারা ঝুঁটি হারালো।

আবার এই নারী যখন মাতৃত্বের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারছে না, তখন :—

যার ঘরে ছেলা নাই, তার পরাণ কেমন করে রে।
হাবাক ডুবুক ছেলিয়া মুতে, ঘর কাদা করে রে।

অথচ নারীর অলংকার হচ্ছে তার সন্তান। সেই সন্তান শোভা পায় চাঁদের মত। ঝুমুর গানে :—

হাঁড়ির উপর হাঁড়ি দিব তার উপর সরা দিব
ছেল্যার মাকে ছেল্যা সাজে যেমন লৈতন চাঁদরে।

আর সেই ছেলে বর্ষাকালে মাছ ধরে বেড়ায় এখানে ওখানে।

আষাঢ় শারাবণ মাসে ছেল্যার হাতে ঘুঘিরে
কি মাছ ধরিলি ছেল্যা শুধুই চেঙ্গা পুঁটিরে।

শেষ নেই ঝুমুর গানের। কত যুগ ধরে গানের পর গান গাইছে লোকে। আধুনিক সভ্য শহর দেখে তার কথা পর্যন্ত গানের সুরে নিবসিত হয়েছে। আদ্রা শহর দেখে গ্রামীণ মানুষ ভয় পেয়ে গেছে। ভয় পাবারই কথা ; আদ্রা শহরের জীবনের সংগে তাদের জীবনের কোন মিল নেই। ঝুমুর গান সেখানে ভীত, সংকুচিত, সন্ত্রস্ত। বড় শহর আদ্রা।

আগু আগু রেলগাড়ি
তাকর পিছন ঠেলাগাড়ি—
তাকর পিছন জোড়া পেসেনজর,
হাম্‌কে লাগে ডর—
আদ্রা ত বড়ি রে শহর—
হাম্‌কে লাগে ডর—।

তাই বোধহয় একেবারে আধুনিকতার পর্যায়ে নেমে এসে বন্ধনহীন ঝুমুর, বন্দনা করছে সরস্বতীর। প্রকৃতির উন্মুক্ত পরিবেশ ছেড়ে, তাকে আশ্রয় ভিক্ষা করতে

হচ্ছে কল্পিত দেবীব পদপ্রান্তে। সভ্য জগতের ভয়ে তাকে পরিবর্তন কবতে হচ্ছে তাব ভাব ভাষা সুর। কিন্তু এও অনিবার্য, অনিবার্য এই অতিক্রমণ। লোকসংগীত বেঁচে থাকবে না চিবকাল, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না কোন দিন। শুধু রূপান্তরের পব রূপান্তবের মাধ্যমে, সামাজিক বিবর্তনেব কাহিনী সে শুনিয়ে যাবে। আজ তাই নিরংকুশ দাঁড় ঝুমুর, টাঁড ঝুমুব, নানাবিধ নাচেব ঝুমুর যদি প্রকাশিত হবাব আগে বাগ্দেবীর শবণাপন্ন হয়, তা হলেও অবাক্ হবাব কিছু নেই। আধুনিক ঝুমুব তাই বন-পাহাড-গ্রাম-টাঁড থেকে দূবে সবে এসে বন্দনাগান করছে :

এসো মাগো সবস্বতী
কণ্ঠে দেমা ভব,
তোমাবি চবণে বন্দি।
খেলিব ঝুমব।

—নয়—

টাঁড় ঝুমুর। (টাঁয়েড়=মাঠঘাট)

টাঁড ঝুমুবের নামোল্লেখ করেছি আগে। এ ঝুমুব ঘবের বাইরে মাঠে ঘাটে গাইবার গান, কিন্তু এ গান গাইতে হলে সতর্কতার প্রয়োজন। কোন কোন অঞ্চলে একে বলে ঝাডখাঁডিয়া বা ঝাডখণ্ডী ঝুমুর। ঝোপে-ঝাড়ে সমাকীর্ণ অঞ্চলে এ গান গাইতে হয়, লোকসমাজে এ গান নিন্দনীয়। কাবণ, অধিকাংশ সময়েই লজ্জাশরমের কোন আবরণ বেখে এ গান গাওয়া হয় না।

বনপথের ওপর পা ফেলে কোন মেয়ে হয়তো চলেছে ক্ষেতেব কাজে, হয়তো বা কয়েকজন সখী মিলে চলেছে অন্য কোথাও, সখার দল আড়ালে আবডালে থেকে ঝাঁডখাঁডিয়া ঝুমুর গায়, টাঁড ঝুমুর গায়। ও পাশ থেকে যদি গানে গানে সাড়া মেলে তা'হলে, পাবস্পবিক আলাপ পবিচয়েব সীমা অনেকদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে।

এ সব গান গাওয়ার কতকগুলো রীতি আছে। কোন মেয়েকে গানের সুরে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, সে প্রেম-পিরীতের কিছুই জানে না।

গোবর পোকা গোবরে জনম
ওলো তুই কি লো তুই জানিস—ওলো
—পিরিতের মরম।

পিরিত-না-জানার অপবাদ অনেক মেয়েই স্বীকার করতে চায় না। উল্টে মেয়েরাই হয়ত 'খালভরাদের' আহ্বান জানাবে—ঝুমুর গানে :—

পিরিত করে লে রে খালভরা
পিরিত করে লে,
পাকা ডালিম রসেতে ভরা।

আগেই বলেছি, এ ঝুমুর বন-বাদাড়েই চলে, এ লোকসংগীতকে ঠিক তাই লোকসংগীতের পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। কয়েকজনের ব্যক্তিগত গান এগুলি, কিন্তু এর প্রচলন নেহাৎ কম নয়, ছোকরার দলই এসব গান গাইতে অভ্যস্ত বেশী। এ গানের জবাবও তারা পায়, কখন বা গানে, কখন বা কথায়, কখন বা ইংগিতে।

মাঠে ঘাটে গরু চরাতে যায় বাগালের দল, মাঠের শূন্যতা, তাদের শূন্য মনে সুর জাগায়। আর সে সুর গিয়ে আঘাত করে পথ-চলতি হঠাৎ-আসা মেয়েদের মনে। সে সুর বিবাহিতা অবিবাহিতা মানে না। সে সুর ঝাড়খণ্ডের আদিমতা ছড়ায় :—

ননদ নাই তোর শাউড়ী লো আছে
ওরে একটি ভাতার বালির বাঁধ লো—
ভয় করিস্ কারে।
ওলো ভাবিস না লো তার তরে—
আমরা আছি তোর কপালে।

তার কপালে ওরা হয়ত বা আছে। কিন্তু এর জন্য শেষপর্যন্ত না বাগালকে থানায় যেতে হয়।

মেয়েরা খুশিমত গালাগালি করে আর ভয় দেখায় প্রয়োজন হলে :

বাগাল শালা বাগালী করে
ওরে,—পরের বেটি দেখলে বাগাল গা চুলে মরে।
বাগাল করলি তুই কারখানা,
যাবি বাগাল জামবনী থানা।

কিন্তু এসব কথা আর নয়, বেশী কথায় রসাভাস দোষ ঘটবে।

—দশ—

ভাদুরিয়া ঝুমুর

ভাদ্রমাসটি তার সমস্ত পরিবেশ প্রতিবেশ নিয়ে এই সব সীমান্ত অঞ্চলের জীবন্ত মাস। ওদিকে নীল পাহাড়ের চূড়োয় কালোমেঘ, বনে বনে বর্ষা-কালের গেরুয়া জল। করম-ইদ আর ভাদু উৎসবের মরশুমী হাওয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ভাদুরে রোদের গায়েও পরশ দিয়ে যায়।

একদিকে আগামী আমন ধানের সবুজ ভূমিকা, আর একদিকে আউশ কাটা রিক্ততা। কোন কোন অঞ্চলে আউশধানেই নবান্ন উৎসব। শিলাই, কাঁসাই, অজয়, স্বর্ণরেখা, ময়ূরাক্ষীর বুকে ভরা যৌবনের চিহ্ন, ওদিকে শালবনের মঞ্চ জুড়ে ময়ূর নাচে পেখম তুলে, সবুজ বন ঘন সবুজ হয়ে তারুণ্যের বেদনায় শিউরে উঠে হয়তো-বা। 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।' কিন্তু বৈষ্ণব কবি আজ আর এ গান না গাইলেও—গান গাইবে সীমান্তবাঙলা, গান গাইবে ধলভূম, মানভূম, সেরাইকেলা। আর সে গানের নাম দেবে ভাদুরিয়া ঝুমুর। ভাদ্রমাসের সব কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা বেদনা-ভালোবাসা লৌকিক সুরে লৌকিক ভাষায় লোকসংগীত রূপে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে, নদী-নালা-খাল-বিল-মাঠ ঘাট-বন-পাহাড়-গ্রাম দেশকে। মকাই-ভুট্টার ক্ষেতে ক্ষেতে এই ভাদুরে গানের ছায়া পড়বে লুটিযে। ভাদ্রমাসের ফসল হিসেবে মকাই ফসল উপেক্ষিত নয় সীমান্তবাঙলায়। ভাদুরিয়া গানে এই মকাই-ভুট্টার কথা নানানভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অতিথি সংকারের জন্য ঘরে অন্য কিছু নাও থাকতে পারে কিন্তু 'জনার' পোড়া দিয়ে আদর আপ্যায়ন করতে বাধা আছে নাকি?

এত বড় ভাদর মাসে
পথে চলে যাইহে।
কেউ না শুধাল মুখে
জনার পোড়া লাও হে।

কোথাও নিরাভরণ স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত উপমা—

ভাদর মাসের গাদর জনার
খলায় দিলে ফুটেরে।
এমনি বঁধুয়ার মন
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে উঠে রে।

আরও বেদনা আছে ভাদ্রমাসে। আষাঢ় শ্রাবণের কালো মেঘ হয়তো কৃপণতা দেখিয়েছে : জলহীন ক্ষেতে ক্ষেতে শুকনো মাটির কান্না। ভাদ্রমাসে ভাদুরিয়া ঝুমুর সেই কান্নাকে সুর দিল সেরাইকেলার শুষ্ক ভূমিতে, অথবা মানভূমের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে :

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে নবীন মেঘে ঘেরলি
ওহোরে, পানিকে বুঁদা[১] না বরিষে
ও প্রাণ, দিন ধরিব কেইসে।
চাষীএ বুনিল ধান, ধান গেল অকাড়ান।
দুঃখ দেল ছলে,
কেয়সে বাঁচমরে প্রাণ দারুণ আকালে,
সিকি পুয়া চাউল নাহি মিলে।

গানটির রচয়িতা কোন এক 'মহিষা' নামধারী গ্রাম-কবি।

মহিষাহি পামবে গায
ভাবিয়ে ভাবিয়ে তনু যায়
ছুয়াপুতা পুসব কেইসে (কি করে ছেলে পুলে প্রতিপালন করবো)
ও প্রাণ, দিন ধরব কেইসে।

অথবা :

বাইদে বুনিলাম ধান,
ধান হল মানুষ পরমাণ
আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে না গেল কাড়ান,
দাদা কেমনে বাঁচিবে পরাণ।

মহিষা কবি ভাদ্রমাসের আর একটি রূপকে প্রকাশিত করেছেন। ভাদ্রমাস, তখন কাজের মাস। কেউ আর কর্মহীন জীবন যাপন করছে না, কেউ কাটছে ধান, কেউ লেগেছে কাড়ানের কাজে। এদিকে মাঝে মাঝে কাজের চাপ বাড়ছে কৃষিজীবী গৃহস্থদের গৃহে। 'কামিন' আর 'মুনিস্' খুঁজে খুঁজেও পাওয়া যায় না; সবাই কাজে ব্যস্ত। তবুও চাষীকে কামিন মুনিস্ খোঁজার জন্য ঘুরতে হয় পাড়ায় পাড়ায়—

১ বিন্দু

শেরাবণ ভাদর মাসে
চাষী বুলে ঘরে ঘরে (=চাষী বেড়ায় ঘরে ঘরে)
কামের মাসে। (=কাজের মাস)
কত ছল করে গো কামিনমুনিসে। (কামিন=মেয়ে-মজুর)
বড়ি বীত[১] ভাদর মাসে ॥
কামিনী বহুত আদরে
বিহানে ছচ-গোবর করে (=সকালে উঠে গোময়লিপ্ত করে)
কেউ কাঁখে ঘাইলা (=কলসী)
দাঁতে মিশি ঘসে
বড় বীত ভাদর মাসে।
মহিষাবি পামরে বলে—
যাব যাব সবাই বলে,
শেষে ফাঁকি দিয়ে অন্য ঘরে যাচ্ছে,—
বড় বীত ভাদর মাসে।

এ সব ছাড়া আরও আছে ভাদুরিয়া ঝুমুর। সে সব গানে রাধাকৃষ্ণ লীলার প্রাধান্য সাধারণ ঝুমুর গানের মতোই। উদাহরণে ভাবাক্রান্ত না করে ছোট একটি গান উদ্ধৃত করছি :

না জানি শ্যাম কোন দেশে গেল,
বড় প্রাণে দাগা দিল।
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে, নবঘন মেঘ ডাকে
সেই মেঘে বিন্দু না বর্ষিল গো—,
আসিব বলিয়া মোরে
গেল শ্যাম মধুপুরে,
আশাপথ চেয়ে প্রাণ গেল গো।

সবশেষে একটা কথা বলা দরকার, সেটা হচ্ছে এই যে 'ভাদুরিয়া' ঝুমুর ভাদ্রমাসের সঙ্গে আদিতে সম্পর্কযুক্ত থাকলেও বর্তমানে তা একটি বিশিষ্ট সুর রূপেই পরিগণিত এবং ভাদুরিয়া ঝুমুর বললে শুধু ভাদ্রমাস সম্পর্কিত ঝুমুর বোঝায় না, ঝুমুর গানের বিশেষ একধরনের সুরকে বোঝায়।

---

১ পিরীত

—এগারো—

লোকায়ত বিবাহ-সংগীত

লোকসংগীতের জন্মভূমি ও প্রতিষ্ঠাভূমি নাগর-সভ্যতার সীমান্তরেখার বাইরে। যূথ-সংহতি এই সংগীত গতানুগতিক ভাবেই শেখে, এর জন্যে কোন বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন হয় না এবং কোন বিশেষ নরনারীর জন্যও এর পক্ষপাত নেই।[১]

যতদূর জানা গেছে, বিবাহপর্বের স্ত্রী-আচারের মধ্যে যে সংগীত পরিবেষণের রীতি আছে, তা বাঙলাদেশের সর্বত্র নেই। উত্তরবঙ্গে, পূর্ববঙ্গে এবং পশ্চিম-বঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলেই এই প্রথা বেঁচে আছে। উভয় বঙ্গের এই আঞ্চলিক লোকসংগীতের মধ্যে ঐক্য অনেক। সীমান্তবাঙলার পশ্চিমপ্রান্তিক অঞ্চলের কূর্মক্ষত্রিয়, বাউরী, মুচি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই বিবাহ-সংগীতের প্রাধান্য। উত্তর ভারতেও বিবাহ উৎসবে মেয়েরা গানে এবং বাজনায় বিশেষ অংশভাগিনী। নিজেরা ঢোলক বাজিয়ে তারা বিবাহসংগীত গান অন্তঃপুরে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ-সংগীতগুলিও লোকসংগীতের বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বহন করে। (সাহিত্যের খবর : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, ভবানী-গোপাল সান্যালের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

কূর্মক্ষত্রিয় বা মাহাতো সম্প্রদায়ের বিবাহ-পদ্ধতি মূলত ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব-বর্জিত। বর্তমানে অবশ্য পুরোহিত নিয়োগের প্রথা প্রচলিত হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। তা' হলেও এদের বিবাহ-পদ্ধতির আচার-আচরণ প্রতিবেশী আদিম জাতিদের অনুরূপ।[২]

স্ত্রী-আচারের কিছু কিছু প্রথা, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন হলেও, আঞ্চলিক সীমারেখার বাইরেও তা' পরিদৃশ্যমান। এই সমতার মধ্যে আদিম সাম্যবাদী

---

১ "Folk song is an art in which the average member of the group participates more generally than in the case with the cultivated music or literature of the city. Nearly everyone in a folk group knows songs and sings them or at least listens to them and knows a good deal about them." —Standard Dictionary of Folklore, p. 1034

২ "In the marriage arrangements and the ceremonies of the kurmis there are several practices which are not found in the rituals enjoined by the Puran—but may be traced in the ceremonies followed by the aboriginal tribe." —Ethnology of Bengal : Hunter

সমাজেব ইংগিত যে নেই, একথা বলা চলে না। স্ত্রী-আচাবেব অনেক কিছুই বেদ-পুবাণেব বাঁধনকে অস্বীকাব কবে এসেছে এবং হিন্দু-সমাজেব সর্বত্রই স্ত্রী আচাব আঞ্চলিক স্বকীয়তা বক্ষা কবে চলেছে।

স্ত্রী-আচাবেব মধ্যে মেয়েদেব গান গাওয়াব প্রথা অন্যতম। কিন্তু এই যৌথ-সংগীতেব এমন একটি লৌকিক রূপ আছে ধলভূম মানভূমেব কূর্মক্ষত্রিয় বা কূর্মীসমাজে, যা লোকসংগীতেব বিশিষ্টতায উজ্জ্বল। এ গানের মধ্যে দেবদেবীব আহ্বান নেই, উপমা-উৎপ্রেক্ষায় পুবাণ-কথাও নেই। এব মধ্যে কল্পনা-বিলাস অচল। পবিবেশ এবং প্রতিবেশেব স্থূল কথা দিয়ে এই সংগীত বচিত। অতি সাধাবণ কথাই এব বিষযবস্তু। সামান্য মান-অভিমান, লৌকিকতা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে এই বিবাহ-সংগীত সমাকীর্ণ। বব এবং কন্যাব বাড়িতে বিবাহপর্বে এই লোকসংগীতেব আসব বসে। সে আসবে পুরুষ পক্ষেব কোন অংশ নেই। এ প্রসংগে একটি কথা মনে বাখতে হবে যে, এদেব সমাজে শ্রমচর্যায় নাবী ও পুরুষেব সমান অধিকাব। বর্তমানে কোন কোন কারণে তা ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে বটে, তবু ক্ষেতে খামাবে, কৃষিকর্মে নাবী ও পুরুষেব সম্মিলিত শ্রম এখানে স্বীকৃত। সংগীতেব মধ্যেও এই সম্মিলন অব্যাহত। এমন কি, বিবাহ-সংগীতেও তাই শ্রমচর্যাব কথা সহজভাবেই গানেব বিষয়বস্তুতে পবিণত হয়। মোটেব উপব, ধলভূম-মানভূমেব বিবাহ সংগীত লোক সংস্কৃতিব এক প্রাচীন পর্যাযকে বক্ষা কবছে আজও। মনেব বাঁধনকে শক্ত কবে তোলবাব জন্য দড়িব বাধনেব উপমাই এ সংগীতে যথেষ্ট, তবে দড়ি এক্ষেত্রে সোনাব দড়ি। মিলন উৎসবেব ভূমিকায় স্ত্রী আচাবেব প্রথানুযায়ী স্ত্রীলোকেবাই গান কবে :

আজ বালাকে বাঁধব
আজ বালাকে বাঁধব
সোনাব জোতে।
এমন কাব শক্তি আছে
ওগো, বলি, বাঁধন ঘুচাতে।

কন্যাপক্ষে, 'গাত্র হবিদ্রার' গান চলে। কোনরূপ সুকুমাব কল্পনা দিয়ে এ সমস্ত গান রচিত হয় নি। পরিবেশ-প্রতিবেশের ছায়ায়,—দৈনন্দিন হাসি-কান্নার মায়ায় এ সমস্ত গান প্রাণবন্ত। আনন্দের দিনেই হয়ত বা স্মৃতিব ছিটেফোঁটায় অভাব-অনটনের ইংগিত। কন্যার দেহে হলুদ মাখানব জন্য

হয়ত বা হলুদ আছে। হলুদ বাটবাব জন্য কাঁসাই নদীব শিলনোড়াও আছে, কিন্তু বিবাহেব দিনেও কি শুধু হলুদ। তেল যদি ফুবিযে যায়—।

কাঁসায়েবি শিল-লডা লগবেবই হলুদ গো।
ভাল কবে হলুদ বাটবি (যেমন) কন্যাব অঙ্গে সাজেগো।
তেলেব ভাঁড়ে তেলও নাই মা তেল ফুবাইছে গো।
তখন বাছা কাঁদিতে লাগিল গো।
বাপু গেল বুঝাইতে না-ন[1] বাছা কাঁদ গো।
তখনো বাছা কাঁদিতে লাগিল গো।

'বাবা, মা, কাকা, কাকি' সবাই এসে গানেব বিষযবস্তুতে ভিড জমিযে একটি পাবিবাবিক চিত্রে রূপাযিত হবে। তাবপব গানেব মধ্যে কন্যাব কান্নাও শেষ হবে :

[illegible] গেল বুঝাইতে না-ন বাছা কাঁদ গো
তখন বাছা হাঁসিতে লাগিল।

তাবপব ববানুগামীসহ ববেব প্রবেশ। বিযেব লগ্নে, ছাঁদনাতলায আনুষ্ঠানিক সবকিছু সম্ভাব সাজানো। কিন্তু কন্যাব জন্য বালা, চুডি, মল, কাপড ইত্যাদি কোথায়? এ সব তো ববকেই দিতে হবে। অতএব বিবাহ-সংগীতেই এসব কথাব পুনবাবৃত্তি :

ছামডাতলাকে[3] যাইযেঁ দেখ বালা নাই যে ডালাতে
ফিবে যেতে বল গো তোবা বব বাবুকে।
ছামডাতলাকে যাইযেঁ দেখ মল নাই যে ডালাতে
ফিবে যেতে বল গো তোবা বব বাবুকে।
ছামডাতলাকে যাইয়েঁ দেখ কাপড নাই যে ডালাতে
ফিবে যেতে বল গো তোবা বব বাবুকে।

তাবপব বব এবং ববানুগামীদেব প্রতি বঙ্গ-বসিকতা :

তোকে যে বে দেখেছিলি বলবামপুবেব হাটে
এমন মনে নাই জানিবে বরুয়া[4] জামাই হবি বলে।
তোকে যে বে দেখেছিলি শূয়োব-বাগালা[5]
শূয়োব তুয়োব ছাইড়ে দিযে ববা[6] সাজে আলি[7]।

১ না-না কেঁদো না। ২ ভগিনীপতি ৩ ছাদনাতলা। ৪ বর (তুচ্ছার্থে)। ৫ শূকর-রক্ষক। ৬ বর (তুচ্ছার্থে) ৭ এলি।

আসবি যাবি বে ববা পিঁয়াজ কাট্যে যাবি
পিঁয়াজ যদি না কাটবি ববা, শুধাই[১] খেয়ে যা'বি।
কুলিকুলি[২] আলি বওরা বব সাজে আলি
কুলু[৩] ঘবে খইল খায়েঁ রে বওবা মটাঁই[৪] বাহিবালি।
বব বব বলি, বরের আসন[৫] তলে ঘব
আস্‌কা পিঠা খায়ে ববেব সাবারাত জ্বর।

ববানুগামীদেব প্রতি আবও তীব্র বসিকতা :

কে আইল ববে ভাই বিহা দিয়াতে
ঠ্যাং দুটা কাটে বাথব হুডকা বানাতে।

আত্মীয়-স্বজন-পবিবৃত হয়ে বিবাহ পর্বেব যে লৌকিক অনুষ্ঠান, সে অনুষ্ঠানে গ্রাম্য মান-অভিমানেব সংগীতও গীত হয়। আত্মীয়-স্বজনেব দল এই বিশেষ অনুষ্ঠানে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা কবে না। কেউ হযতো সময়মত আমন্ত্রিত হয় নি, আমন্ত্রিত হয়েও কেউ বা অন্য কোনো মানেব বশে বিবাহ উৎসবে যোগদান কবে নি, এই ধবনেব ঘটনাও বিবাহ সংগীতে পবিত্যক্ত হয় না। এই উৎসবে মাতুল গৃহেব বিশেষ অংশ গ্রহণেব কথা সুবিদিত। তাই মাতুল গৃহ সম্পর্কে বিবাহ-সংগীত উদাসীন থাকে না :

আজ বিহা কাল বিহা কবে বাবুর বিহা গো
বাবুব মামা ঘবে না পা'ল[৬] পান-গুয়া গো।
গুয়া যদি পা'ল মা গো তাও কেন নাই আইল গো
বাবুব বব দেখায় কেন নাই খুঁজিল গো।

তাবপব বাবুব মাসী-পিসীব নাম যোগ কবে এই ভাবেই গান চলবে। বলা বাহুল্য, গানেব বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষ সীমানাব সব কিছুকেই অবলম্বন কবে। এদেব সমাজে কন্যাপণেব প্রথা প্রচলিত। সে কথাও গানে বলা হয় :

আজাই[৭] আমায় ভালোবাসে চোখের কাজল বলে গো
আর কি আজাই বাসবে ভালো পণ টাকা পালে গো।

তাবপব, খাদ্যতালিকায় পুরুলিয়াব 'মুডকি' বেগুন, ইঁচড়ি মাছের চচ্চডি আব ভাঁডকা মাছের চাটনিও অনিবার্যভাবে গানের বিষয়বস্তুতে রূপায়িত হয় :

১ শুধু ভাত। ২ গ্রামমধ্যস্থিত পথ। ৩ কলু। ৪ মোটা হয়ে।
৫ আসন গাছ। ৬ পেল ৭ মাতামহ।

পুরুলিয়াব লুডকী বাঁইগন, সেরে চাপে মন
সেই দেখে ববেব বাপেব রেগে গেল মন
বাঁইগন রাঁধোছে কেমন।

তারপর

ইঁচড়ি মাছেব চচ্চড়ি
ডাড়কা মাছেব চাটনি
আজ আমাদের ঘব জুড়েছে
বৌ আসছে আপনি।

বধূকে নিয়ে পাল্‌কী চলে যাবে ববেব বাড়ি। বিদায়-অশ্রুতে বেদনাব চিহ্ন। সকলেব চোখে জল। কিন্তু গান তখনো থামেনি :

কপি রুইলাম ডেলিডেলি গো নাবিকেলেব বাড়ি ঘেবি
ধীরে ধীবে চালাও পালকি আজিব[১] বোদন শুনি।
আজ্জাব বোদন যেমন তেমন আজ্জিব বোদন ভারী,
কাঁ'দ্যে কাঁ'দ্যে ভিজ্যে গেল আমাব মেঘমডমব্যা শাড়ি॥

এই সমস্ত গানে লোক-সংগীতেব সমস্ত লক্ষণই বিগুমান। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, পবিচিত প্রতিবেশ, অকৃত্রিম উপমা-উৎপ্রেক্ষা, যৌথ-মানসিকতা—এ সমস্তই লোকসংগীতেব বিশেষ বিশেষ চবিত্র। এ সমস্ত সংগীত গুরু-নির্ভর, শিক্ষা-নির্ভর এবং চর্চাসাপেক্ষ মোটে নয়। আনুক্রমিক ভাবেই অতীত থেকে বর্তমানে এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে এব সঞ্চবণ।

এই প্রসংগে পূর্ববংগে অনুষ্ঠিত স্ত্রী-আচাবেব অঙ্গীভূত বিবাহ-সংগীত সম্পর্কে দু একটি কথা বলা দবকাব। পূর্ববংগের বিবাহসংগীতে লোকসংগীতেব সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিলুপ্তপ্রায। পানখিলিব দিনে পান দিয়ে দেবতাদেব নিমন্ত্রণ জানানো হয় গানেব মাধ্যমে। এ সময মেয়েবা যে সব গান কবেন তাতে দুর্গা, লক্ষ্মী, সবস্বতী, গঙ্গা প্রভৃতিব নাম উল্লেখ কবে বিয়েতে আসবার জন্য তাঁদেব সবিনয়ে আহ্বান কবা হয। পানখিলিব দিন থেকে বিয়ের পূর্বদিন পর্যন্ত প্রতি বাত্রেই মহিলাবা উৎসবেব গান কবে থাকেন।[২] দেবদেবীদের এই আমন্ত্রণ-সংগীত[৩] এবং 'গুয়া পান' দিয়ে সীমান্তবাঙ্‌লার আত্মীয়-স্বজন আমন্ত্রণেব লোকসংগীত সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ধর্মী।

১ মাতামহী ২ বাংলার স্ত্রী-আচার: ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী সংকলিত, পৃঃ ২৯।

৩ এখন যাওরে নারদ গঙ্গামায়ের ঐ ভবন।

পূর্ববংগেব বিবাহ-সংগীত যৌথ-সংগীত হলেও এব লোকরূপ অগ্রসব সমাজেব সমস্ত কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দান কবেছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রাব স্থূলতা থেকে কল্পনাব রূপলোকে এব পদক্ষেপ। তাই স্ত্রী-আচাবেব মধ্যে পুবাণ-কথাব আতিশয্য, নানা দেবদেবীব আবির্ভাব। বামায়ণ কাহিনীব বামসীতাব উপমা ববকন্যাব উপব আবোপিত। এ সমস্ত গান যে কিছুটা চর্চাসাপেক্ষ, তা গানেব চেহাবা দেখেই অনুমান কবা যেতে পাবে। এব ভাষা এবং ভাব লোকরূপেব গণ্ডীকে অতিক্রম কবে গেছে।[১] কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাব ব্যতিক্রম যদিও বা পাওয়া যেতে পাবে, তা ব্যতিক্রমই।

সীমান্তবাঙ্‌লার আদিম বিশ্বাস

সীমান্তবাঙ্‌লাব সাধাবণ মানুষেব ধ্যান ধর্ম, আচাব-নিষ্ঠা প্রভৃতি এমন এক বিশ্বাসেব ওপব প্রতিষ্ঠিত, যে-বিশ্বাস বর্তমান কালেও আদিম জাতিব বিশ্বাস-প্রবণতাকে এড়িয়ে যেতে পাবে নি। ভাবতীয় সংস্কৃতিব একেবাবে গোড়ায় এই আদিম বিশ্বাস-প্রবণতা সংগুপ্ত আছে সন্দেহ নেই, এবং সংস্কৃতি সমন্বয়েব মূল সূত্রগুলিও বর্তমানে নানাভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে।

সীমান্তবাঙ্‌লাব পশ্চিম প্রত্যন্তসীমায় যে সমস্ত অনার্যভাষী জনগোষ্ঠী আজও তাদেব নিজস্ব বিশ্বাস এবং বীতি নিয়ে বিদ্যমান, সেই জনগোষ্ঠীদেব সংগেই বাঙলাভাষী জনগোষ্ঠীব বিশেষ সম্পর্ক।

এদেব সমাজে মনসাদেবীব প্রভাব খুবই বেশী। শুধু সর্পদেবী হিসেবেই যে মনসাব স্বীকৃতি তা নয়, গুরু চেলা প্রসংগে[২] একথাও উল্লেখিত হয়েছে যে,

গঙ্গা চললেন বঙ্গে
মকব-বাহন সঙ্গে
আজি যাইতে হবে অযোধ্যাভুবন।.....

(বাংলার স্ত্রী-আচাব ; পৃঃ ৩৪)

১ বাংলার স্ত্রী-আচাব পুস্তকে এরূপ কয়েকটি গান সংকলিত হয়েছে। উদাহরণ :—

আমি কি দেখিলাম জলে গো নবীন নীরদ শ্যাম।
কি দেখিলাম জলে সই গো কি দেখিলাম জলে॥
গগনমণ্ডলে যেন বিজলী চমকে গো, নবীন নীবদশ্যাম।
নবীন মেঘে সৌদামিনী অঙ্গের লাবনী।
বৈজয়ন্তী বনমালা ঝোলে শ্রীচরণে। নবীন নীরদ শ্যাম।

২ 'ঝাঁপান'—দ্রষ্টব্য॥

মনসাপুজো ক'রে মনসাথানে গুরু শুধু সর্পবিদ্যাই শিক্ষা দেন না, শিক্ষা দেন তুকতাক্, ঝাড়ফুঁক, ভূতপ্রেত ডাকিনীযোগিনী নিবারক মন্ত্রতন্ত্র। এই গুরু এবং চেলারা অনেক সময় গ্রামে গ্রামে চিকিৎসাদিও করে থাকে জংলী জড়িবুটির সাহায্যে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ভূত অপদেবতা বা ডাইনীর প্রভাবকেই স্বীকার করে এবং জ্বরাক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসা করে ডাইনী তাড়ানো মন্ত্রে।

এই গুরু চেলারা ওঝা, বা গুণী নামে বিখ্যাত।

সাপের মন্ত্র শিক্ষা দেওয়া ছাড়া গুরুর আর একটি কাজ হচ্ছে ভূত তাড়ানো, ডাইনী ছাড়ানো মন্ত্র শিক্ষা দেওয়া। তেলপড়া, নুনপড়া, বাটিচালা প্রভৃতি নানান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই গুরু-চেলারাই বহু মানুষের সান্ত্বনার স্থল।

এই গুণীরা-ঝাজারো মন্ত্র জানে। কারুর উপর ডাকিনী-যোগিনী-ভূত-প্রেত নজর দিলে, এদের ডেকে নিয়ে আসা হয়। নানা প্রক্রিয়ার সংগে এরা মন্ত্র পাঠ করে। একটি মন্ত্রের উদাহরণ :—

নধা[১] মিল কুঢাবটি নধানি নিল ঝোড়া।
কা'টে কুটে চাঁড় করলো যত ধুনার গুঁড়া।
নধা বলে আমার সংগে যে বাদ লাগাবে—
ধুনা দিয়ে পুড়ায়ে দিব তার মু।

ধলভূম-ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে লোধা নামে এক অরণ্যচারী উপজাতি আছে। এরা 'লুব্ধক' অর্থাৎ শিকারী বলেই লোধা নামে পরিচিত। নানা অপদেবতা-অধ্যুষিত অরণ্যের মধ্যে এরা যখন বাস করতে পারে, তখন এদের বিশেষ কিছু শক্তি আছে বলেই লোকের ধারণা। এই লোধা লোধানী কি ভাবে দেবত্ব লাভ করে সিঁদুর ফোঁটা লাভ করেছে, তাও আমাদের কাছে অবিদিত নয়।[২] শালগাছ থেকে ধুনো সংগ্রহ করা এই লোধাদের অন্যতম উপজীবিকা। আর ধুনোর গন্ধে ভূত-প্রেত-ডাকিনী-যোগিনী কেউই স্থির থাকতে পারে না, এ বিশ্বাস সকলেরই আছে। উন্নতফণা নাগরাজও ধুনোর গন্ধে ফণা গুটিয়ে নেয়। সেই জন্যই বোধহয় বাঙলার কোন কোন অঞ্চলে মনসা পুজোয় ধুনো নিষিদ্ধ। শালবৃক্ষক্ষরিত এই শুষ্করস লোধা-লোধানীর নামকেও চিরজীবী করে রেখেছে এদের কাছে।

১ = লোধা (ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের উপজাতি বিশেষ)। ২ দ্রষ্টব্য : ঝাঁপান প্রসংগ।

এই ধুনোব গুণপনা বিবৃত করে আর একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে :

কাঁধে কুঠাব নিয়ে নবসিং গেল সাঁতালি পর্বত।
সাঁতালি পর্বতে রে ভাই শালেরি বন,
তাহা দেখি নবসিং হবষিত মন।
ধরম শবণ করে তিন চোট দিল
আঙ্গেব ধুনাঝবা ঝবিতে লাগিল।
ধুনা বলে শুন মোব মুখেব উত্তর—
কোন বেটা আছে তোব অংগেব উপব।
ভূত প্রেত থাকলে তারা হাঁক দিয়া বুলে
ডাইনী যুগনী থাকলে ছাড়িয়া পালায়
বাবা নবসিংএব ধুনাবান বুকে মাবলে শিগ্রী ছাড়ে।

সীমান্তবাঙলায় এবং পার্শ্ববর্তী উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে 'ডাইনী'[১] নামক অসীম শক্তিমতী একজাতীয়-নাবী সম্পর্কিত বিশ্বাস এতো গভীবভাবে নিহিত যে, তাব ভয়ে গাঁয়েব লোকে সন্ত্রস্ত থাকে। এ বিশ্বাস অবশ্য ভাবতবর্ষেব সর্বত্রই আছে। একদা ইউবোপে-ও এ বিশ্বাস ছিল। সাধাবণত বৃদ্ধা কুৎসিতদর্শনা স্ত্রীলোকদেবই ডাইনী বলে সন্দেহ কবে সবাই। একবাব যদি ডাইনী বলে বটে যায়, তা হলে তাব জীবনকে অতিষ্ঠ কবে তোলে গ্রামেব লোক। ডাইনী অপবাদে ঠেঙিয়ে মাবাব ঘটনা-ও এই অঞ্চলে বিবল নয়। তখন একমাত্র ভরসা ঐ গুণীবাই।

সীমান্তবাঙলাব গুণী সম্পর্কিত আলোচনায় ডাইনীপ্রসঙ্গ তোলাব একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, এদেব ধর্মকর্ম পূজা-আচাবেব সংগে কোন-না-কোন রূপে ডাইনীব সম্পর্ক আছেই। ডাইনী ছাড়ানো, ভূত তাড়ানো, বাটিচালা প্রভৃতিব মন্ত্র এবং প্রক্রিয়া এদেব আচাব-আচবণেব সংগে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে ধর্ম এবং যাদু-বিদ্যাকে আলাদা ভাবে দেখা যেতে পাবে না।

তা ছাড়া ডাকিনী-যোগিনী-প্রেতিনী প্রভৃতি হিন্দু পুরাণাদিতে দেবী কালিকাব পার্শ্বচারিণী হিসাবে স্থানলাভ করেছে। লোক-কথায় ডাইনীদের উল্লেখ তো খুবই বেশী। গাঁয়ের মানুষ আজও নির্বিবাদে বিশ্বাস করে যে প্রত্যেক 'ডাইনী'ব অধীনে কয়েকটি 'বীব' থাকে। এই 'বীব' উপাধিধাবী ভূত-প্রেতগুলি ডাইনীর নির্দেশে সর্বদাই লোকের ক্ষতিকব কার্যে নিযুক্ত। সীমান্ত-

বাঙ্‌লার যে কোনও গ্রামে গেলে খোঁজ পাওয়া যাবে, কেমন করে গভীর রাত্রে ডাইনীরা দল বেঁধে, উলংগ হয়ে মাথায় প্রদীপ চাপিয়ে ঘোরাঘুরি করে। গাছের উপর চড়ে আকাশপথে তারা বিচরণ করে। কিন্তু এমন উপকথার গল্প ছাড়া-ও আর যে বিশ্বাস জগদ্দল পাথরের মতো অধিকাংশ লোকের মধ্যেই চেপে বসে আছে, তা' হচ্ছে, 'ডাইনী' আছে, আছে, আছে এবং তারা ঘোরতর ভাবে মানুষের অনিষ্ট-পন্থী। এই ডাইনীদের উদ্ভব সম্পর্কে নানা কাহিনীও সুপ্রচলিত। সে-সব কাহিনীর সংগে ওঁরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি উপ-জাতিদের ডাকিনী উদ্ভব কাহিনীর যথেষ্ট মিল আছে। ডাইনীরা যে মানুষের হৃৎপিণ্ড খেতে ভালবাসে, এ বিশ্বাস ভারতের সর্বত্র। একটি মন্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে যে গুরু এবং ডাইনীরা সতীর্থ। একই গুরুকে অবলম্বন করে তাদের শিক্ষা। যারা 'সোখা' হলো, গুণী হলো, তারা নিয়েছে সু-জ্ঞান, এবং ডাইনীরা নিয়েছে কু জ্ঞান। সু-জ্ঞান আছে বলেই গুণীদের মন্ত্রের প্রভাবে ডাইনীরা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই ওঝা-রোজা-গুণীদের ওপর এখনও অন্ধ আস্থা আছে, অন্ধ বিশ্বাস আছে, এবং সে বিশ্বাস ও আস্থা এক বিরাট জন-সমষ্টির। ডাইনীর উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনীটি এখানে বিবৃত করা হচ্ছে। কাহিনীটি ওঁরাওঁদের মধ্যে[১] এবং রাঢ়ি সিংভূম সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত আছে। ওঁরাওঁদের মধ্যে এই কাহিনীর ব্যাপক সন্ধান পাওয়া যায় বলেই এ কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কাহিনীটি রাঢ়ি থেকেই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

"এ যুগের কথা নয়। কত যুগ আগের কথা, তারও কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। সেই অজানা যুগে আদিদেব মহাদেব ভাবলেন: একজন মানুষকে তিনি গোপনে সব মন্ত্র শিখিয়ে দেবেন, দেবেন নানান ওষুধের গুণাগুণ, চিনিয়ে দেবেন রোগনাশী হাজারো শিকড় বাকড়, জানিয়ে দেবেন তুকতাক মন্ত্র আর ঝাড়ফুঁকের প্রক্রিয়া।

কিন্তু কাকে শেখাবেন। শেখার মতো যোগ্যতা আছে এমন একটি লোককে না পাওয়া গেলে তো শেখানো যায় না। সন্ধান করতে লাগলেন তেমন কোন লোক পাওয়া যায় কিনা, যে কোনদিন শক্তিশালী হয়েও অপব্যবহার করবে না শক্তির। সমস্ত মন্ত্র জেনেও যে লোকের উপকার

১ Vide Memoirs of the Asiatic Society of Bengal (vol I) The Religion and Customs of the Uraons, by P. Dehon

ছাডা অপকাব কববে না, যে হবে জিতেন্দ্রিয়, নির্লোভ, নিবহংকাব, সব কিছু কববাব ক্ষমতা হাতে পেয়েও যে গর্বান্ধ হয়ে পা ফেলবে না মাটিতে, এমন শিষ্যকেই তিনি গ্রহণ কববেন।

অবশেষে, অনেক অনুসন্ধান কবে অবণ্যভূমিতে এমনি একজন মানুষ পাওযা গেল। সন্তুষ্ট হয়ে, মহাদেব সেই মানুষটিকেই সব কিছু জ্ঞানেব অধিকাবী কবে দিলেন। ফলে, পৃথিবীতে তাঁব মত জ্ঞানী শক্তিমান পুরুষ আব দুটি বইলো না।

পৃথিবীব সেই মানুষটি এবাবে আখডা বসিযে চেলা খুঁজতে লাগলেন। চেলাব মতো চেলা তাঁবও চাই। তাঁব চেলাদেবও হতে হবে জিতেন্দ্রিয় এবং নিবহংকাব। শুধু তাই নয়, এব জন্য প্রযোজন ধৈযেব, অধ্যবসায়েব। তেমন ধৈযবান, অধ্যবসায়ী শিষ্য পাওযাও সহজ নয। তাব আহ্বানে অনেকেই এসে ভীড জমালো তাঁব আখডায। গুরুও আনন্দে তাঁদেব প্রথম পাঠে তালিম দিতে লাগলেন।

কিন্তু হলে কি হবে চেলাদেব অযোগ্যতা ক্রমশ প্রকাশিত হতে লাগলো। কেউ কেউ উচ্চাবণই কবতে পাবে না মন্ত্র, কেউ হল ধৈযচ্যুত, কেউ আবাব কিছু না শিখেই গর্বান্ধ। গুরু কিন্তু শিক্ষাদানে বিবত হলেন না, গুরুব কর্তব্য তাঁকে কবতেই হবে। শিষ্য যদি গ্রহণ না কবে তা হলে সে অপবাধ তাঁব নয। কিন্তু যা হবাব তাই-ই হলো। দেখতে দেখতে গুরুব আখডা শূন্য হয়ে গেল। চেলাবা কেটে পডলো একে একে। থেকে গেল দুজন।

গুরু বুঝতে পাবলেন যে, দুটি খাঁটি শিষ্য পাওয়া গেছে। মনে মনে খুশী হলেন তিনি। তাবপব, মহাদেবেব নিকট থেকে পাওযা সব কিছু প্রক্রিয়া, সবকিছু ওষুধপত্র, শিকড-বাকডেব নাম, তিনি তাদেব শিখিযে দিলেন। আব চেলা দুটিও সব কিছু গ্রহণ কবে 'গুণী' হয়ে দেশে ফিবে গেল। যাবাব আগে গুরু তাদেব উপদেশ দিলেন: অকাবণে মন্ত্রতন্ত্র প্রকাশ কবো না, অকাবণে প্রয়োগ কবো না, বিদ্যাব অহংকাব কবে কথা বলো না কোন দিন, ইষ্ট ছাডা অনিষ্ট কবো না কোন প্রার্থীব, বিনয়ী আব সচ্চবিত্র হয়ে কর্তব্য সাধনে ব্রতী থেকো।

গুরুব পায়েব ধূলো আব তাঁব আশীর্বাদ নিয়ে চেলা দুটি গুণী হয়ে ফিবে এলো স্বগ্রামে।

এদিকে মহাদেব এদেব পবীক্ষা কববাব মতলব আঁটলেন। পৃথিবীতে

তাঁর প্রদত্ত জ্ঞান, জ্ঞানের অধিকারীদের পথভ্রষ্ট, শক্তিমত্ত করেছে কিনা, সেকথা জানা তাঁর উচিত। তাই এক যোগীর ছদ্মবেশে তিনি আবির্ভূত হলেন পৃথিবীতে। মাথায় জটা, পরণে গৈরিক বাস, সর্বাংগে ভস্ম বিভূতি, হাতে লোহার চিমটে আর কমণ্ডলু।

নিজেদের ক্ষেতে লাঙল চালানো শেষ ক'রে, সেই দুজন গুণী তখন ঘরে ফিরছিল লাঙল জোয়াল কাঁধে নিয়ে। আকাশে গ্রীষ্ম ঋতুর সূর্য। প্রায় দুপুর হতে চলেছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে চারদিক। অদূরে বন-পাহাড়ের বুকে দীপ্ত রশ্মির জাল ছড়ানো, মেঠো পথ বেয়ে ক্লান্ত শ্রান্ত গুণীরা এগিয়ে চলেছে ঘরের দিকে। রাস্তার ওপরেই প্রকাণ্ড এক আম গাছ। ছায়াময় করে রেখেছে খানিকটা জায়গা। তার তলায় আসতেই শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। শীতল ছায়া তাদের সর্বাংগ থেকে উষ্ণ তাপ ধুয়ে মুছে স্নিগ্ধ করে দিল। সংগে সংগে মনও তাদের খুশীতে ভরে গেল। সবিস্ময়ে, সানন্দে তারা দেখলো, একজন সৌম্যদর্শন যোগী মৃদু হাসি দিয়ে তাদের যেন সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন।

কাঁধ থেকে লাঙল-জোয়াল নামিয়ে, প্রণাম করলো তারা সন্ন্যাসীকে।

সন্ন্যাসী বললেন: আমি তোমাদের কথা শুনেছি। এসো, গাছতলায় বসে বিশ্রাম করে যাও। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর সেই দু জন গুণী সন্ন্যাসীর সহৃদয়তায় মুগ্ধ হলো। সন্ন্যাসী তাদের কথা শুনেছেন জেনে আনন্দলাভ করলো তারা। কিন্তু যদি তারা জানতো যে সন্ন্যাসীটি আর কেউ নন স্বয়ং মহাদেব তা হলে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই তারা সজাগ থাকতো।

যাই হোক, সন্ন্যাসীর কথা মতো, তারা সেই আমগাছের তলায় বসে ক্লান্তি অপনোদনের চেষ্টা করতে লাগলো।

সন্ন্যাসী আবার বললেন: খুবই আনন্দের কথা, গুরুবিদ্যা লাভ করে তোমরা দুজন শক্তিধর হয়েছো। পৃথিবীতে তোমাদের গুরু আর তোমরা ছাড়া কেই বা কি জানে। তোমরা যদি চাও দিনকে রাত করতে পার, সমুদ্রকে শুকিয়ে ফেলতে পার, আমগাছে কাঁঠাল ফলাতে পার, সূর্যের তেজকে শীতল করে দিতে পার।

অবাক হলো গুণী দুজন। সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই সিদ্ধপুরুষ; না হলে কি করেই বা জানবেন তাদের গুপ্তকথা। আনন্দে বিভোর হয়ে গেল তা'রা। বুক যেন ফুলে উঠতে লাগলো। প্রশংসাবাক্য শুনলে কার না আনন্দ হয়।

কিন্তু গুরুবাক্য স্মরণ করলো তারা: অকারণে আত্মপ্রচার করো না, অহংকারকে প্রশ্রয় দিও না কোন দিন।

অত্যন্ত বিনয়ের সংগে তা'রা তাই বললো: আপনি আমাদের অকারণ প্রশংসা করছেন! আমরা গুরুর কাছ থেকে বিদ্যালাভের চেষ্টা করেছি বটে কিন্তু কতোটুকুই বা জানি। এমন কি আমাদের মনে হয় যে, আমরা কিছুই জানি না।

সন্ন্যাসী হাসলেন। বললেন: এই তো চাই। যা'রা জানে, তারা কি জানাতে চায় সহজে। কিন্তু আমি তো জানি তোমাদের গুণের কথা শক্তির কথা। আর বিনয়ই তো শক্তিধরের লক্ষণ। অতএব, তোমরা বাপু অন্য কোথাও বিনয় প্রকাশ করতে পার, কিন্তু আমার কাছে তা অবাস্তব। আমি তোমাদের গুণ দেখবো বলেই তো এসেছি। কিছু প্রকাশ করে দেখাও। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি সুরু হলো গুণী দুজনের।

দু জনের চোখে একই ভাষা। কিছু গুণ না দেখালে কি মান থাকে! কিন্তু—

সন্ন্যাসী বেশ বুঝতে পারলেন, গুণীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে। জালে পড়তে বেশী দেরী হবে না। সন্ন্যাসী তাড়াতাড়ি বললেন: তোমরা কুণ্ঠিত হচ্ছো অকারণে। আর যদি আমার বিদ্যা দেখতে চাও তো, এই দ্যাখো, বলেই অবাক কাণ্ড করলেন সন্ন্যাসী।

বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করলেন তিনি। আর সঙ্গে সঙ্গে চড চড করে শিকড়সুদ্ধ সেই আম গাছটি শূন্যে উঠতে লাগলো।

হাঁ করে, অবাক হয়ে দেখতে লাগলো গুণী দুজন।

তাজ্জব কাণ্ড নিশ্চয়ই। দেখতে দেখতে গাছটি আবার নেমে পড়লো শূন্য থেকে, আর যেখানে যেমন ভাবে ছিল, ঠিক তেমনি ভাবে বসে গেল।

সন্ন্যাসী মুচকি হেসে ভ্রূভঙ্গী করলেন।

গুণী দু জন আর স্থির থাকতে পারলো না। নিজেদের বিদ্যা প্রকাশের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো তারা। এক মুহূর্তে ভুলে গেল গুরুর উপদেশ। অহমিকা এসে অজ্ঞাতে জুড়ে বসলো তাদের মনে। মাটি থেকে ধুলো নিয়ে তারা মন্ত্রপূত করতে লাগলো সেই ধূলি।

সন্ন্যাসীর মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাদের তিনি ফাঁদে ফেলতে পেরেছেন।

সেই গুণী দু জন এবারে ছুঁড়ে মারলো সেই মন্ত্রপুত ধূলি—আম গাছের উপর। দেখতে দেখতে শুকিয়ে গেল আম গাছটা। পাতাগুলো হলদে হয়ে ঝরে পড়লো মাটিতে। একটা মরা গাছ শুধু দাঁড়িয়ে রইলো তা'দের সামনে।

সন্ন্যাসীর দিকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো তা'রা। সন্ন্যাসী তখনো চোখ দিয়ে হাসছেন মিটমিট করে।

কোন কথা বললো না তা'রা। আবার মন্ত্র পড়ে ছুঁড়ে মারলো সেই মরা আম গাছের উপর। আর দেখতে দেখতে ঝরা পাতাগুলো মাটি থেকে উপরে উঠে যে যেখানে ছিল, সে সেইখানে লেগে গেল। সবুজ হয়ে গেল পাতা। মরা গাছ বেঁচে উঠলো আগের মতো।

মুখে কোন কথা না বললেও, তাদের মনে যে অহংকারের বীজ ধীরে ধীরে বাড়বার পথে, তা বেশ বুঝতে পারলেন সন্ন্যাসিবেশী মহাদেব।

সন্ন্যাসী অবশ্য খুশীই হতেন, যদি তারা প্রলুব্ধ হয়ে শক্তিমত্তা প্রকাশ না করতো।

সন্ন্যাসী ভাবলেন মনে মনে: এরা এখনো পুরোপুরি সব কিছু বিদ্যা শেখেনি, কিন্তু ওদের গুরু তো শেষ পর্যন্ত মরামানুষ বাঁচাবার বিদ্যাও শিখিয়ে দেবে। আজ শুধু মরা গাছ বাঁচালো, কিন্তু যে দিন মরা মানুষ বাঁচাতে চাইবে সে দিন তো সৃষ্টিনাশ। কেউ কি আর দেবতাদের তখন মানবে! মানুষই তো তখন হবে সর্বশক্তিমান। না, ভুল করেছেন তিনি এদের সর্ববিদ্যার অধিকারী করে। মন্ত্র শিখে নিজে তারা অমর হোক তাতে আপত্তি নেই কিন্তু তা যদি প্রয়োগ করে, তা হলেই বিপদ। ভাবলেন, নির্মম হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। গুরুকে তিনি বাঁচতে দেবেন না। তাহলেই তো চুকে যায় ঝঞ্ঝাট। গুরু না থাকলে পুরোপুরি বিদ্যা কেই বা শেখাবে!

সন্ন্যাসী হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গুণী দু জন লাঙল-জোয়াল নিয়ে ফিরে গেল ঘরে। এদিকে হঠাৎ এক কালসাপ দংশন করলো গুরুকে।

কিন্তু তাতে কি? অমৃত আছে স্বর্গে। মন্ত্র-বলে তিনি তার চেলাদের পাঠাতে পারবেন অমৃত নিয়ে আসার জন্য।

ডাক দিলেন সেই দু জন চেলাকে, যারা এখন গুণী। বললেন: অমৃত নিয়ে এস। আমাকে সাপে কামড়েছে।

গুণী দুজন ছুটলো অমৃত আনতে।

পথে দেখা হলো মহাদেবের সংগে। তিনি বললেন: দেরী হয়ে গেছে

অনেক। আরো আগে যদি আসতে পারতে তা হলে কাজ হতো। এখন অমৃত নিয়েও কিছু কাজ হবে না। তোমাদের গুরু এতক্ষণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

শুনেই হতভম্ব হয়ে গেল ত'ারা। কি করবে বুঝতে না পেবে, শেষ পর্যন্ত ত'ারা ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো গুরুর দেহটা দেখবার জন্য।

কিন্তু একি। গুরু তখনো বেঁচে।

গুণী দু জন সব কথা খুলে বললো গুরুকে।

গুরু শুনলেন সব কথা। বললেন, তোমাদের দোষ নেই। মহাদেব চান না যে আমি বেঁচে থাকি। তাই হোক। তাঁব ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। তিনি আমাব গুরু। তাঁর কোন ইচ্ছাব বিরুদ্ধে কি যেতে পারে কেউ!

গুণীরা কাঁদতে লাগলো।

গুরু বললেন, কেঁদো না। তোমবা দু জনেই আমার শিষ্য, অনেক বিদ্যা তোমাদেব আমি শিখিয়েছি, এবাবে আব একটি কথা বলে যাই মন দিয়ে শোনো।

গুণী দু জন উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো।

গুরু বললেন: আমাব দেহ যখন নিথর হয়ে যাবে, তখন নদীর তীরে নিয়ে যেও দেহটা। তাঁবপব আমাব শবীর থেকে যকৃৎটা বাব কবে দু জনে খেয়ে নিও। যকৃৎ খাবাব পর গোটা দেহটা কেটেকুটে পুড়িয়ে খেও। এব ফলে তোমরা ভূতপ্রেত, দেবতা-মানুষ সবাইকে বশীভূত করতে পাববে। সবাই কাজ করবে তোমাদেব হুকুম মতো। আব যে সমস্ত মন্ত্র আজও তোমাদের শেখাই নি, তা আপনাআপনি তোমাদের আয়ত্তে আসবে।

বলতে বলতে, গুরুব দেহ নিথর হয়ে এলো। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি।

শোকে অভিভূত হলো গুরুর গুণী চেলাবা। কিন্তু শোক ক'রে কি ফল! গুরু যা বলে গেছেন এখন তাই করাই কর্তব্য।

নিয়ে চললো তারাই সেই শবদেহ অদূরবর্তী নদীতীরে।

পাহাড়ী নদী। দুধারে ঝোপঝাড়, আগাছার জংগল। এদিকে ওদিকে বুনো মহুয়া গাছ। গুরুর দেহটাকে নদীর তীরে রেখে, আগুন জ্বাললো তারা। তার ধোঁয়া এসে লাগলো শবের ওপর। এর পর দেহ থেকে যকৃৎ

বার করে পাতায় মুড়ে, একপাশে রেখে দিলো তারা। ভাবলো, দেহটাকে কেটেকুটে ঠিক করা যাক্, পরে একসংগে খেলেই হবে।

একটা ধারালো ছুরি দিয়ে দেহটাকে কাটতে লাগলো দু'জনে। ঠিক সেই সময়ে আবার মহাদেব এসে হাজির।

এসেই তাদের তিরস্কার করতে লাগলেন তিনি। বললেন: এই কি তোমাদের গুরুভক্তি! গুরু আদেশ দিয়েছেন বলেই কি তার দেহের সৎকার না করে, সেই দেহকে খেতে হবে রাক্ষসের মতো। এই কি তোমাদের মনুষ্যত্ব! ছিঃ ছিঃ, তোমরা মানুষ নামেরও অযোগ্য। মৃতদেহকে কি উদরসাৎ করাই তোমাদের নিয়ম! যার উপর যে তোমাদের গুরু, যার মৃতদেহের উপযুক্ত সৎকার করা তোমাদের কর্তব্য, তোমরা কিনা সেই গুরুর মাংসকেই খাবার ইচ্ছে করছো!

গুণীর চেলারা ভাবলো: তাই তো, কাজটা নিশ্চয়ই ভালো হচ্ছে না। এতে বদনাম রটে যাবে। কিন্তু মহাদেব বললেন, কোন দ্বিধা করো না, সব ফেলে দাও নদীর জলে। তারপর স্নান করে শুদ্ধ হয়ে বাড়ী যাও।

এদিকে আগুনের ধোঁয়া মাংসখণ্ডগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে আকাশের দিকে উঠছে।

গুণীর চেলারা শেষ পর্যন্ত মহাদেবের কথা অনুসারে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো সেই মাংসপিণ্ডগুলো আর সেই পাতার মোড়া যকৃৎ।

নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে সেই পুঁটলীটা শেষ পর্যন্ত এদেশ-ওদেশ ছাড়িয়ে অনেক অনেক দূরে গংগা নদীতে এসে পৌছুলো।

গংগায় তখন একটা নৌকার উপরে বসে একজন প্রৌঢ়া আর তার একুশটি মেয়ে আমোদ প্রমোদ করছিলো। হঠাৎ সবচেয়ে ছোট মেয়ের নজরে পড়লো, একটা পুঁটলী ভেসে যাচ্ছে—ওর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে ভেবে মেয়েটা ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। আর পুঁটলীটা ধরে লুকিয়ে রাখলো শাড়ীর আঁচলে।

এবারে চমক ভাঙলো অন্য সকলের। সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে আর কাড়াকাড়ি করে শেষ পর্যন্ত ছিনিয়ে নিলো সেই পাতায় মোড়া যকৃৎ। ভাগ করে খেয়ে নিলো সবাই। ফলে, যা হবার তাই হলো। সবাই শিখে ফেললো মন্ত্র। ভূত প্রেত বশীভূত করবার ক্ষমতা তারা পেলো। ইচ্ছেমতো তারা যে কোন ভূতকে হুকুম করে যে কোন কাজ করাতে পারে।

ভূতকে হুকুম দিয়ে অন্য কারুর ঘাড়ে তাকে চাপিয়ে দিতে পারে। এরাই হলো ডাইনী।

এদিকে গুণীদের কপালে আসল মন্ত্রগুলো জুটলো না। তবু, চিতার যে ধোঁয়া উঠেছিল, সেই ধোঁয়ার কিছুটা তাদের নাকে মুখে ঢুকেছিল। ফলে তারা পেলো ভূত ছাড়ানো মন্ত্র। আর এই দুজন গুণীর চেলারাই হলো ওঝা বা গুণী। ভূত আর ডাইনীকে এরা মন্ত্রের জোরে কাবু করতে পারে।”

— -

—তের—

সীমান্তবাঙলার গ্রামদেবতা

আদিম শ্রেণীহীন সমাজে ভগবান নামক পরম দেবতাটির অস্তিত্ব ছিল না। ভগবান শ্রেণী সমাজের আবিষ্কার। শ্রেণীহীন সমাজের মানুষ পারস্পরিক শোষণ ব্যবস্থার কথা কল্পনাও করে নি। সমতার ভিত্তিতে খাদ্য বিভাগের সহজ পদ্ধতি তখন একমাত্র পথ। এই সমতার ভিত্তিতে, শ্রেণীহীন সমাজকে ভগবান আবিষ্কার করার জন্য বাধ্য করে নি। সহজ ভাবে এই কথাই বলা যায় যে, ভাগ্যের নিয়ামক ভগবান আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা তখনো অনুভূত হয় নি।

সমাজ বিবর্তনের এক অধ্যায়ে নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের রহস্য মানুষের কাছে ভয়ের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ভয়ের পটভূমিকাতেই ভূত-প্রেত-দেব দেবীর জন্ম। এর সঙ্গে, মৃত পূর্বপুরুষকে ভয় করার প্রসঙ্গও জড়িত। পূর্বপুরুষ পূজার প্রচলনের মূলে মুখ্য ভূমিকা ভয়ের, গৌণ ভূমিকা কৃতজ্ঞতার। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং পূর্বপুরুষদের রহস্যময় অবলুপ্তিই মানুষের মনে দেব-দেবী-ভূত-প্রেতের কল্পনাকে জাগিয়ে তুলেছিল।

বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগের পুরোহিত-পুষ্ট দেব-দেবীদের প্রভাব আমাদের সমাজে আজও অপ্রতিহত। এর পাশে আর একদল দেব-দেবীও সেই আদিম কাল থেকেই প্রভাব বিস্তার করে আসছে। এরা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের করুণা লাভের জন্য অপেক্ষা করে নি। ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের পূজা প্রাপ্তির জন্য এদের মাথা ব্যথা নেই। তবু, একথা অস্বীকার করা

যায় না যে, এদের প্রভাবও সমাজ-স্বীকৃত। এদের প্রচলিত নাম গ্রাম-দেবতা।

বাঙলাদেশে, সংস্কৃতি সমন্বয়ের আদিপর্বেই, এই অকুলীন দেবতার দল, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। অন্-আর্য সংস্কৃতির অন্তঃশীলা প্রবাহের স্রোতরেখা ধরেই এদের আবির্ভাব। বেদ-পূর্ব যুগের সব কথা আমাদের জানবার কথা নয়। কিন্তু ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, মিত্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের পুরাণ-কাহিনীর অঙ্গাবরণ নেই বলে, এই দেবতাগুলির স্বরূপ বুঝতে অসুবিধা হয় না। বলা বাহুল্য, আদিম মানুষের যে ভয় এবং বিশ্বাস ভূত-প্রেত-আত্মার জন্ম দিয়েছিল, সেই ভয় এবং বিশ্বাসই পরিমার্জিত সংস্করণে, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে। বৈদিক দেবতা তো আসলে প্রকৃতি-দেবতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। বৈদিক দেবতাদের ক্রমবিকাশের পর্যায়টি মানবসমাজের অভিব্যক্তির সূত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। ঋগ্বেদের দেবতত্ত্বের মধ্যে আদিম মানুষের বিশ্বাসই নিহিত। জীবপুজা, অচেতন পদার্থপুজা এবং সর্বপ্রাণ পুজার সংমিশ্রণে বৈদিক দেবতার আবির্ভাব এবং এই দেবতাদের ক্রমবিকাশের আদিপর্বটি গ্রাম-দেবতাদের আবির্ভাবের সঙ্গেও বিজড়িত।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই গ্রাম-দেবতাদের আধিপত্য বিদ্যমান। সমাজে যখন গোষ্ঠী-জীবনের প্রাধান্য, যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের জন্ম হয় নি, তখন গ্রাম-দেবতার পুজাই মুখ্য ছিল। গ্রাম-দেবতার রূপটি আদিবাসী সমাজে এখনও সুপরিস্ফুট এবং গ্রাম-দেব-দেবীরা মূলতঃ পূর্বপুরুষ, এবং প্রকৃতির বিভিন্ন রূপেরই আত্মা (spirit)। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাঙলার লোকশ্রুতি' নামক গ্রন্থে গ্রাম-দেবতার পুজাকে মূলতঃ ধরিত্রী এবং সর্পপুজার আদি রূপ বলে উল্লেখ করেছেন। বলা বাহুল্য, আদিম শ্রেণীহীন সমাজে প্রাথমিক জ্ঞানের মধ্যে যে প্রশ্নগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, তা' খুবই সাধারণ এবং সে প্রশ্নগুলি তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত। আকাশে আলো হয় কেন, অন্ধকার বস্তুটি কি, বৃষ্টি হয় কেন, প্রভৃতি প্রাকৃতিক নানাবিধ নিয়মের ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে এবং সর্বোপরি মানুষের বা পশুর বা বৃক্ষলতাদির মৃত্যুরহস্য প্রভৃতি, সেই প্রাচীন সমাজে যে অনুত্তরের অন্ধকার সৃষ্টি করেছিল, মূলতঃ গ্রাম দেব-দেবীদের কল্পনাও তারই অনুষংগ।

সীমান্তবাঙলার গ্রাম-দেবতা অনেক ক্ষেত্রেই এখনও মুণ্ডা সাঁওতাল বা

অন্যান্য অষ্ট্রিকভাষী জনের গ্রাম-দেবতার সংগে সম্পৃক্ত। কিন্তু সংস্কৃতি সমন্বয়ের ফলে সীমান্তবাঙলার গ্রাম-দেবতা দলপুষ্ট হয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই, তাই শেষ পর্যন্ত গ্রামের নামেও এক একটি গ্রাম-দেবতা অধিষ্ঠিত। সীমান্তবাঙলার গ্রাম-দেবতাকে মোটামুটিভাবে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—

এক : পূর্বপুরুষ (ভূত-প্রেত), গুরু-দেবতা (ডোমগুরু, লোধা-লোধানী, সিধ্‌গুরু ইত্যাদি)।

দুই : ডাকিনী-দেবতা (ডাকবতী, বাশুলী, বংকিণী প্রভৃতি)।

তিন : বৃক্ষ নদী-নালা পাহাড়-বন-গুহার স্পিরিট বা আত্মা।

চার : পশু-দেবতা (বাঘুৎ, মহিষাসুর, নরসিংহ প্রভৃতি)।

পাঁচ : সর্প দেবতা (মনসা)।

ছয় : পৃথিবী।

সাত : চন্দ্র-সূর্য-পবন প্রভৃতি।

আট : বলা বাহুল্য, কতকগুলি গ্রাম-দেবতা বিভিন্ন গ্রামে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ তাদের আসন শুধু বিশেষ একটি গ্রাম-সীমান্তেই নয়, বিভিন্ন গ্রাম-সীমান্তে। বাশুলী-বংকিণী-মনসা প্রভৃতি এই পর্যায়ের গ্রাম-দেবতা। কিন্তু এ ছাড়াও সংখ্যাহীন গ্রাম-দেবতার অধিষ্ঠানে সীমান্তবাঙলা বিশিষ্ট। এই সমস্ত গ্রাম-দেবতাদের সম্পর্কে সংখ্যাহীন লোক-শ্রুতি এখনও অসংগৃহীত এবং গ্রাম-দেবতা সম্পর্কে বিশদ গবেষণার ক্ষেত্র আজও উন্মুক্ত।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মানভূম অঞ্চলের গ্রাম-দেবতার সম্পর্কে কয়েকটি গ্রামের দেব-দেবীর উল্লেখ করেছেন এবং কয়েকটি লোক-শ্রুতি সংগ্রহ করেছেন।[১] আদি দেবতা হিসাবে এই সব দেব-দেবীর পূজা-বিধিও অন্যান্য দেব-দেবীর পূজারম্ভের পূর্বভাগে। পৌরাণিক দেবতা গণেশ ঠাকুর যেমন সমস্ত দেবতা-পূজার অগ্রভাগেই পূজাপ্রাপ্তির অধিকারী, তেমনি এই গ্রাম-দেবতাগুলিও পূজাপ্রাপ্তির অগ্রাধিকারীরূপে বর্তমান। গণেশঠাকুর পৌরাণিকত্ব প্রাপ্তির পূর্বে এই সব অকুলীন গ্রামদেবতাদের পর্যায়ে পড়তেন বলেই মনে হয়। এখানে এই গজমুণ্ডধারী

১। খুঁটাসুর, বাথান ডাইন, ভাঙ্গানালা, জাহেরা, বুচাডারী, দামকোড়া, কুদরাখোঁচা, কালভৈরব (মূলতঃ জৈন-তীর্থঙ্কর মূর্তি), লাউকুড়ি, বেলেশ্বার, দেশোয়ালী, জামলালা, ঘাঘর বুড়ি— প্রভৃতি গ্রাম-দেবতা সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত 'বাঙলার লোকশ্রুতি' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

লম্বোদর দেবতাটি সর্বভারতীয় মুখ্য গ্রাম-দেবতা। দক্ষিণ ভারতের গ্রামে গ্রামে এঁর অবস্থান।

বর্তমান কালে, পুরুষ গ্রাম-দেবতাদের প্রভাব পরিক্ষীণ। কিন্তু গ্রাম-দেবীদের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, বাঙলা দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্র থেকে পুরুষ দেবতার দল আত্মগোপন করেছে।

একদা, এই দেব-দেবীগণ কেউ আলাদা ভাবে থাকত না। বিশেষ বিশেষ গাছের তলায় এদের একত্র অধিষ্ঠানভূমি ছিল। বর্তমানে কোন কোন জায়গাতে গ্রাম-দেবতা এবং গ্রাম-দেবীকে একত্র অবস্থান করতে দেখা যায় বটে, কিন্তু এমন দম্পতি-দেবতার সংখ্যা অনেক কম। ধর্মঠাকুর ও কামিনার সহাবস্থানের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে।

ভয়ের দেবী হিসাবে, চণ্ডী, শীতলা, মনসা, রংকিণী প্রভৃতি অপৌরাণিক দেবীগণ এখনো অপ্রতিহত প্রভাবে রাজাশাসন করছেন। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত দেবীগণ বর্তমানে ঠিক গ্রাম দেবী পর্যায়ে নেই। ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের অন্যান্য পৌরাণিক দেব-দেবীদের আসরে ওদের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এই সমস্ত গ্রাম-দেবীদের জন্য সাধারণত কোন মন্দিরাদি নির্মিত হত না। গ্রাম সীমান্তের কোন বৃক্ষকে অথবা বৃক্ষ-তলকেই এদের অধিষ্ঠান-ভূমি বলে ধরে নেওয়া হত। কিন্তু কালক্রমে এই সমস্ত গ্রাম-দেবতাদের অধিকাংশই পৌরাণিক রূপ পরিগ্রহ করে পুরোহিতপুষ্ট হয়ে ওঠে এবং হিন্দু দেবদেবীদের নিচের তলায় স্থান দখল করে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আর একটি অধ্যায়কে আমাদের সামনে তুলে ধরে।

মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যসাহিত্যে অনেক গ্রাম-দেবতার সন্ধান মেলে। পাঁচালী গানের আসরে মূলগায়েন গ্রামদেবতার বন্দনা গান করে আসল পালা শুরু করতেন। পৌরাণিক দেব-দেবীদের বন্দনাগানের সঙ্গেই আঞ্চলিক গ্রাম দেবদেবীদের বন্দনা গান করতেই হত। মঙ্গল-পাঁচালীগুলিতে এই প্রথার নিদর্শন পাওয়া যায় খুব বেশি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সূচনায় অনেক আঞ্চলিক গ্রামদেবতার বন্দনা গান করা হয়েছে।* এই

* হিজলীর দেবতা বন্দিব কালু রায়।
চণ্ডীপুরের বারাহী বন্দিলুঁ বিধিমতে।
পাড়ামুয়ার কামার বুড়ীর বন্দিয়ে চরণ।
বেতার গড়েতে বন্দো চণ্ডীকা বেতাই।

গ্রামদেবতাদের সকলেই প্রায় আঞ্চলিক গ্রামদেবী। ধর্মঠাকুর কালুরায়ই একমাত্র পুরুষ দেবতা। পলাশাই (পলাশবতী), হিঙ্গুলাই (হিঙ্গুলবতী), মেলাই (মেলাবতী), খেপাই (ক্ষিপ্তবতী), বেতাই (বেত্রবতী), বাশুলী, বারাহী, কামারবুড়ী, ডাকিনী যোগিনী, হিড়িমাই (হিড়িম্ববতী) প্রভৃতি নাম স্ত্রী দেবতাদের। বলা বাহুল্য, সর্বজনীন গ্রামদেবতাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, এবং তাদের অনেকেই পুরোহিততন্ত্রের মধ্যে আশ্রয়লাভ করে পৌরাণিক দেব-দেবীদের পর্যায়ে উঠে গেছে, অথবা শীতলা-মনসার মতো অপৌরাণিক হয়েও জাতে উঠে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করে চলেছে।

পশ্চিমবাঙলায় অঞ্চল বিশেষে, বিশেষ বিশেষ গ্রামদেবতার প্রাধান্য দেখা যায়। কোন কোন গ্রাম, বিশেষ কোন একজন গ্রামদেবতার অধিকারভুক্ত রূপেও চিহ্নিত। এক গ্রামের দেবতা আর এক গ্রামের পূজা পায় না। অনেক সময়ে এ গ্রামের দেবতা ও গ্রামের দেবতার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে গেছে, এমন কাহিনীও শুনতে পাওয়া যায়। দেবতাকে অবলম্বন করে সময়ে সময়ে পাশাপাশি দুটি গ্রামের রেষারেষি চরমে ওঠে। শুধু তাই নয়, এমন অনেক গ্রামদেবতার কথা জানা যায়, কোন কোন গ্রামে যাদের প্রভাব শীতলা মনসার চেয়েও বেশি। সেই সব গ্রামে কোনদিনই শীতলা বা মনসার পূজা হয় না।

শাস্ত্রের বিধানে এই গ্রামদেবতা এবং গ্রামদেবীর দল পতিত দেবতা। মনুসংহিতায় এই সব গ্রামদেবতাদের পূজারী ব্রাহ্মণকেও পতিত নামে অভিহিত করা হয়েছে। পশ্চিম বাঙলার সমতল অঞ্চলের গ্রামদেবতাদের সঙ্গে, সীমান্ত বাঙলার উচ্চাবচ ভূমির গ্রামদেবতাদের গরমিল যথেষ্ট। শুধু নামে নয় নানাবিধ প্রথা-পদ্ধতির কাজেও পরম্পরের শ্রেণী একেবারে আলাদা। পশ্চিমসীমান্তবাঙলার ভূ প্রকৃতি এবং জনবিন্যাস যে আদিম ধারস্তরভুক্ত, সেই আদিমতা, গ্রাম-দেবতার আকৃতিতে এবং আবাসেও বর্তমান। আঞ্চলিক জনসংস্কৃতির যে ধারাটি এই অঞ্চলে প্রবহমান, সেই ধারাটির সঙ্গে এই গ্রামদেবতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। পশ্চিমবাঙলার পশ্চিমসীমান্তে অবস্থিত মানভূম-ধলভূম-ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বাঁকুড়াতে যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান,

---

খেপুর খেপাই বন্দো আমতার মেলাই।
বড়পুরে হিড়িমাই অসুরদলনী।
ডাকিনী যোগিনী বন্দোঁ শ্রীধর্মের পা।

তার সঙ্গে সমতল বাঙলার ভেদ আছে। এই সাংস্কৃতিক অঞ্চলটি বয়সে প্রাচীন তো বটেই, তা ছাড়া এখানকার জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই সেই প্রাচীন নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পাহাড়-বন আর কঙ্করময় ভূমির কোলে যে গ্রামগুলি গড়ে উঠেছে, সেগুলির অধিকাংশই আদিম অধিবাসীদের অথবা হিন্দুগোষ্ঠীর প্রান্তসীমায় অবস্থিত মানুষদের গ্রাম। এই অঞ্চলের সাঁওতাল ভূমিজ বাগদী, বাউরী মাল, মাহাতো, কোড়া, লোহার, [illegible] প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সঙ্গেই আঞ্চলিক গ্রামদেবতাগুলি দায়বদ্ধ।

গ্রামদেবতাদের অধিকাংশই গ্রামদেবী। চলতি কথায় 'গরাম দেবী বা গেরাম দেবী'। ঝাড়গ্রাম অঞ্চলের কোন কোন জায়গায় বলা হয় 'গরামদেবতি।' সীমান্তবাংলার সর্বত্র এই গ্রামদেবীদের অধিষ্ঠানভূমির নাম 'গরামথান' বা 'গেরাম থান।' সাওতাল প্রভৃতি আদিম উপজাতিদের জাহের থানের সঙ্গে স্বরূপে এর কোন পার্থক্য নেই যদিও বাহ্যিক রূপ কিছুটা আলাদা। সাঁওতালদের জাহের থানে কিংবা শালুই থানে পোড়া মাটির কোন হাতি ঘোড়া থাকে না। শুধু কতকগুলো পাথরের টুকরোকে এলোমেলো ভাবে স্তূপাকৃতি করে রাখা হয় সেখানে। শালুই থানে কোন কোন ক্ষেত্রে আবার পাথরও থাকে না। শুধু বড় বড় শালগাছই সেখানে দেবতা।

গরাম থানের মধ্যে ঝোপঝাড়ই আসল। ঝোপঝাড়ের ভেতর বেশ কিছু সংখ্যক মাটির হাতিঘোড়া পাশাপাশি অবস্থান করে। এই সব হাতিঘোড়া গ্রামবাসীদের মানত করা দান। কোন কোন জায়গায় হাতিঘোড়ার স্তূপ ছোটো খাটো পাহাড়-টিলার আকার ধারণ করেছে।

যে সব গ্রামে পৌরাণিক হিন্দু দেবদেবীর পূজা হয় না, সে সব গ্রামের মুখ্য দেবতা গ্রামদেবী। হিন্দুপ্রধান গ্রামেও হিন্দু দেব-দেবীর পূজার [illegible] সবচেয়ে আগে এই আদিম দেবতার পূজা প্রচলিত।

গ্রাম দেবতাদের পূজারী সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্য পৌরোহিত্য তন্ত্রের আওতায় পড়ে না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু অথবা প্রায় হিন্দু আদিবাসী গোষ্ঠীর কোন একজন পুরুষানুক্রমে গরামথানের পূজারী হিসাবে কাজ করে। এদের প্রচলিত নাম দেঘরিয়া, দেহরী (দেহ্‌রী) এবং লায়া। দে-ঘরিয়া এবং দেহরী সমার্থবাচক শব্দ। দেবঘরিয়া বা দেওঘরিয়া শব্দটিই অঞ্চল ভেদে দেঘরিয়া এবং দেহরি (দেহরিয়া) শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। এই শব্দ দুইটির মধ্যে প্রথমটি মানভূম ও পশ্চিম বাঁকুড়া অঞ্চলে এবং দ্বিতীয়টি ধলভূম-ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে সুপরিচিত।

তা ছাড়া, পশ্চিম মানভূমে গ্রামদেবতার পূজারীর নাম লায়া। পার্শ্ববর্তী রাঁচি জেলার মুণ্ডাদের মধ্যে এই শব্দটি পূজারী অর্থেই পাওয়া যায়। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ প্রভৃতি আদিবাসী গ্রামেও 'গরাম থান' বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে সাধারণ গ্রামদেবতা 'জাহের' অথবা 'বড়াম'। তাই 'গরাম থান'গুলিও 'জাহের থান' বা 'বড়াম থান' নামে পরিচিত হয়।

এই জাহের থানের দেবতাও স্ত্রী দেবতা। জাহের বুড়ী বা বড়াম-বুড়ী। এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখযোগ্য যে সীমান্তবাংলার সব স্ত্রী দেবতাই বৃদ্ধা। তরুণী বা যুবতী দেবীর নাম কোন জায়গাতেই শোনা যায় না। বহুপ্রচলিত শীতলা এবং মনসা দেবীও বৃদ্ধা। তবে, যেখানে মূর্তি পূজার প্রচলন আছে, সেখানে শীতলা ও মনসাকে বৃদ্ধারূপে নির্মাণ করা হয় না। কিন্তু গ্রাম্য জনতার বিশ্বাসে যে শীতলা এবং মনসা অবস্থান করে, তারা বৃদ্ধাই। এর একটি বিশেষ কারণও আছে। অনার্যভাষী সমাজে বৃদ্ধা নারীদের মর্যাদা কোন ভাবে স্বীকৃত নয়। বৃদ্ধা নারী যে ডাইনী ছাড়া অন্য কিছু নয়, এ বিশ্বাস অত্যন্ত সাধারণ। এই বিশ্বাস উৎপাদনের পশ্চাতে লোলচর্মা, চক্ষুকোটরগতা এবং দন্তহীনা কুরূপা, ধূমাবতী স্বরূপা অতিবৃদ্ধাদের বীভৎস চেহারা যে কিছু পরিমাণে দায়ী নয়, এ কথা বলা চলে না। শারীরিক শ্রমে অদক্ষা এই সব বৃদ্ধাদের আদিম মানুষের সমাজ অপ্রয়োজনীয় বলেই মনে করত। কিন্তু বার্ধক্যের এই কুৎসিত রূপকেও তারা ভয় করত। অতিবৃদ্ধ কুৎসিত পুরুষদেরও এইরূপ ভয় করা হত। অতিবৃদ্ধরা শুধু বয়োবৃদ্ধ নয়, জ্ঞানবৃদ্ধও। তাদের বহুল অভিজ্ঞতা সমাজের সাধারণ মানুষকে অনেক সময়ে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে, অনেক সময়ে বিপদে ফেলেছে। ফলে সমাজের মধ্যে পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে সারা সমাজের ভয় এবং কৃতজ্ঞতাও এদের শক্তিশালী করে তুলেছিল এবং এদের দ্বারাই আদিম পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। নানাবিধ তুকতাক মন্ত্র প্রক্রিয়া, যাদুবিদ্যায় এরা অগ্রগামী ছিল। এদের মধ্যে যে বৃদ্ধ বেশী অভিজ্ঞ এবং বেশি পরিমাণে সমাজের ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখত সে হত সিদ্ধপুরুষ অথবা ডাকপুরুষ। স্ত্রী সিদ্ধাদের বলা হত ডাকিনী বা ডাইনী। 'ড্যাক্‌রা' নামে সুপরিচিত গ্রাম্য শব্দটির মূলেও 'ডাক' শব্দটি বিদ্যমান।

মানভূম-পশ্চিমবাঁকুড়া-ধলভূম-ঝাড়গ্রাম-ময়ূরভঞ্জ অঞ্চল নিয়ে বাঙলাদেশের যে পৃথক সাংস্কৃতিক অঞ্চল গড়ে উঠেছে, সেখানে গ্রাম-দেবতা সংখ্যাহীন। এই সংখ্যাহীন গ্রামদেবতার বেশির ভাগই গ্রামদেবী। কোন কোন জায়গায়

গ্রামদেবীর সংগে অথবা একক ভাবে, গ্রামদেবের সন্ধানও মেলে, কিন্তু দেবের সংখ্যা নগণ্য।

এই প্রসঙ্গে সিনি-অন্তিক দেবীদের কথা উল্লেখযোগ্য। কারণ গ্রাম দেবী হিসাবে এদের সংখ্যা মোটেই কম নয়। সিনি শব্দটি বাসিনী শব্দের শেষাংশ কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে সিনি-র পরিবর্তে সেনি শব্দটি প্রচলিত। এই সিনি-অন্তিক দেবদেবীর মধ্যে সর্বাধিক পরিচিতা দুয়ারসিনি (দ্বারবাসিনী)। প্রত্যেক গ্রামের প্রবেশস্থানেই দুয়ারসিনির অধিষ্ঠান। মূল গ্রামদেবী [illegible] এই গ্রামদেবীর পূজা সবচেয়ে আগে করতে হয়। এই দ্বারপালিকা দেবীও বৃদ্ধা। দুয়ারসিনি বুড়ী। দুয়ারসিনি দেবী কোনো কোনো জায়গায় [illegible] রূপেও অবস্থান করে। বিভিন্ন গ্রামের নামের সংগে অথবা অন্য উপজাতিক গোষ্ঠী-নামের সংগে যুক্ত হয়ে এই সিনি-অন্তিক দেবীদের নামকরণ ঘটে। ভেদাসিনি, মাথাসিনি, মালবাসিনি, বনাসিনি, লোবাসিনি, বড়াসিনি, কালাসিনি, গুণ্ডাসিনি, কুদবাসিনি প্রভৃতি গ্রামদেবীদের অধিকাংশই গ্রামনাম্নী দেবী। দুয়ারসিনি, কুদরাসিনি প্রভৃতি দেবী, সমস্ত অঞ্চলেরই দেবী। দুয়ারসিনি সমস্ত গ্রামদেবীর থানেই থাকতে পারে। দ্বারবাসিনি দেবী, কুদবাসিনি মূলত বনদেবী [illegible] ([illegible])। বনকুদরা নামক বনদাতা শিশুদেবতার কাহিনী সাঁওতাল [illegible] প্রচলিত। এই কুদরাই দুয়ারসিনি প্রভৃতি দেবীদের নাম সাদৃশ্য কুদরাসিনি হতে পরিণত হয়েছে। কুদরা ভূত আসলে বনরক্ষক যক্ষ শক্তির আদিমতম সংস্করণ।

এর পরে চণ্ডী দেবীর কথা বলা যেতে পারে। মূলতঃ ওরাও বনদেবী চণ্ডী বোঙার সঙ্গে এই দেবীর সাদৃশ্য অনেক। পশ্চিম বাঁকুড়া, আসানসোল অঞ্চল এবং মানভূম অঞ্চল এই চণ্ডী-নামাশ্রিত গ্রামদেবীদের আবাসভূমি। খেলাই চণ্ডী, মেলাই চণ্ডী, নালাই চণ্ডী, খুলাই চণ্ডী, সানাই চণ্ডী প্রভৃতি গ্রামদেবী এই অঞ্চলে সুপরিচিত। সীমান্তবাঙলার সংখ্যাহীন গ্রামদেবীর মধ্যে কেন্দুয়াবুড়ী (কেন্দুবৃক্ষবাসিনী), ডাকাই বুড়ী (ডাকবতী ডাকিনী), সাতবহিনী, মহামাই, জাহির বুড়ী, বড়াম বুড়ী, শিলাই বুড়ী প্রভৃতি গ্রামদেবীদের সম্পর্কে অনেক লোক-কথা প্রচলিত। এই সব লোক-কথার মধ্যে সাদৃশ্য অনেক।

পূর্বেই বলেছি যে পুরুষ গ্রামদেবতাদের সংখ্যা অনেক কম। এদের জন্য

সাধারণত কোন 'গরামথান' নির্দিষ্ট করা থাকে না। তবু যে সব পুরুষ গ্রাম-দেবতার সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে আদিতম গ্রাম-দেবতা ধর্মঠাকুর। তাছাড়াও 'কাল বেতাল' ভৈরব, কালিয়া বদা (কালো পাঠা), কালিয়া ষাঁড় প্রভৃতি গ্রামদেবতার থান কোন কোন গ্রামে আছে। আর যে সমস্ত পশু দেবতা বা অন্যান্য ভূত-প্রেত, ডাক-ডাকিনী জাতীয় দেবতা আছে, তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান না থাকলেও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে এদের ডাক পড়ে। বাঘুৎবীর, হনুমানবীর, মনপাটচেলা, পাটমসনা, লোধা-লোধানী, প্রভৃতি এই শ্রেণীর দেবতা।

সর্বাগ্রে এই গ্রাম-দেবতার পূজা, তারপর অন্য দেবতার। আদিম সংস্কৃতির এই ধারাটি, আজ-ও সীমান্তবাঙ্‌লার জনসমাজে প্রবহমান। সীমান্ত বাঙ্‌লার জনবিন্যাসের সঙ্গে এর যোগসূত্র অচ্ছেদ্য।[১]

—চৌদ্দ—

সীমান্তবাঙ্‌লার লোককথা

লোককথাই আদিম গণ-সাহিত্য।[২]

এই অলিখিত প্রবহমান গণসাহিত্যের উপকরণ, নগ্ন প্রকৃতি। মানুষ তখনো তার আশেপাশের বন-পাহাড়-নদী-নালার সংগে ঢের বেশী সম্পর্কযুক্ত।

১ দেব-দেবীদের উদ্ভব সম্পর্কে মুণ্ডা-লোককথায় একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সীমান্ত-বাঙলার সর্বত্র যে 'সপ্ত ভগিনী' বিরাজিতা সেই সাত-বহিন দেবতার উদ্ভব-ও মুণ্ডা-কাহিনীর মধ্যেই। কাহিনীটি সুদীর্ঘ। সংক্ষেপিত ভাবে :—"অসুরদের অত্যাচারে মুনডা জাতি সন্ত্রস্ত হয়ে সিং বোঙার শরণাপন্ন হয়। সিং বোঙা নানাভাবে অসুরদের সায়েস্তা করার চেষ্টা করেন এবং অবশেষে কৌশলে তাদের লোহা-গালানো চুল্লীতে পাঠিয়ে ভস্মীভূত করেন। এর পর অসুরিণীদের কাতর ক্রন্দনে বিগলিত হয়ে সিং বোঙা বলেন যে এরপর থেকে তারা-ও বোঙা হয়ে যাবে। কিন্তু সিং বোঙা-কে ওরা কিছুতেই ছাড়তে চাইলো না। ফলে, চুলের মুঠি ধরে সিং বোঙা ওদের ছুঁড়ে ফেললেন পাহাড়-বনে, নদীনালায় এদিক-ওদিক। এর ফলে বিভিন্ন 'বোঙা'র উদ্ভব। যে, পাহাড়ে পড়লো তার নাম হলো বুরু বোঙা। এমনি ভাবে,—ইকির বোঙা (জলদেবী), নাগে বোঙা (টাঁড়দেবী) দেশোয়ালী বোঙা (বনদেবী), চন্দোর-ইকির বোঙা (ঝর্ণাদেবী) এবং চাণ্ডী বোঙা (বনের অধিষ্ঠাত্রী কর্ত্রী) প্রভৃতি বন-পাহাড়-ঝর্ণা ধারার দেবী হয়ে গেল।

২ গণ-সাহিত্য শব্দটিকে ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করেছি।

সব কিছুর মধ্যেই আত্মা (Spirit), সেই আত্মার সংগেই মানুষের গভীর সম্পর্ক। বলা বাহুল্য, এ সম্পর্ক ভালোবাসার নয়, আধ্যাত্মিক চেতনারও নয়, এ সম্পর্ক নিছক ভয়ের। ভয়ের এবং ভক্তির। ভয় থেকেই ভক্তি। তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান আর অভিজ্ঞতায় তখন অদৃশ্য অপদেবতা, দৃশ্যমতী ডাইনী, আর এদের সন্তুষ্ট করার অধিকারী শক্তিধর 'গুণী' অথবা 'সোখা'। এই আদিম ভীতিপ্রবণতার ফলে যে ধরনের পূজা-পদ্ধতি বলিদানের প্রথা উদ্ভূত হয়েছিল, সেই ধরণের কাহিনীও দেখা দিয়েছিল এই সব আনুষ্ঠানিক বিধিসংগত রূপেই। 'লোক কথার' মাধ্যমেই এই সব আচার-অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত কাহিনীকে আমরা পেয়েছি। কাহিনী রচনা করার কল্পনালোক তখন গভীর রাতের শয্যায় অচেতন। উপকথার শুকতারা এখনো দেখা দেয় নি, কল্পনার রং তখনো তৈরী হয় নি মানুষের মনের আধারে।

লোককথাকে এভাবে কোন গণ্ডীর মধ্যে বেঁধে রাখা যায় না বরং এর ব্যাপ্তিই নজরে পড়ে প্রথম। আধুনিক কালেও যে লোককথা রচিত হয় না তা নয়, কিন্তু মূলতঃ তার লক্ষ্য থাকে শিশু-মনোরঞ্জনের দিকে। রূপকথা-জাতীয় রচনা সারা পৃথিবীর শিশুদের অথবা শিশুমনা বয়স্কদেরই সম্পত্তি। রোমান্সের ঘন রং দিয়ে রূপকথার ছবি এখনো আঁকা হয়, কিন্তু শুধু রংএ চংয়ে যাদের ভোলানো যায় না, তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। তাদের জন্যই এ যুগের গল্প-উপন্যাস। আধুনিক উপন্যাসের প্রারম্ভেরও আরম্ভ ছিল। লোককথাকে সেই আদি আরম্ভের পর্যায়েই ফেলেছি। বিশেষ বিশেষ অনগ্রসর অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যেই তার সীমাবদ্ধতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

পশ্চিমবাঙলার পশ্চিমসীমান্তে বিশেষ এক ধরনের লোককথার প্রচলন আছে, যা একান্তভাবেই আঞ্চলিক। বিশেষ কয়েকটি জনগোষ্ঠীর মধ্যেই তার জন্ম হয়েছিল বলে মনে হয়। আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনদিনই রূপকথার উদ্ভব হয় নি,—একথা মেনে নেবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। রূপকথার মধ্যে কল্পনার যে ব্যাপ্তি আছে, তা মানসিক ক্রমবর্ধনারই পরিচয় বহন করে। পশ্চিমসীমান্তবাঙলার লোককথার মধ্যে কল্পনার ব্যাপ্তি যে একেবারেই নেই একথা বলা চলে না, তবে তার কাঠামোটি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করলে একথা স্বভাবতই মনে হবে যে, এই আঞ্চলিক লোককথাগুলি একান্তভাবে আদিম হাওয়ার পাখি। যে আদিম সমাজে পরিবেশের গণ্ডী

সঙ্কীর্ণ, সেই আদিম সমাজেই সত্যকারের লোককথার সৃষ্টি হতে পারে এবং সমাজের মন্থর গতির সংগে পা ফেলে অনেকদিন পর্যন্ত চলতেও পারে। আদিমপর্বের গোড়ার ধাপ ছাড়িয়ে সমাজ যখন উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন লোককথার রূপান্তর ঘটে।

এ কথা স্বতঃস্বীকৃত যে, লোককথা শুধু আদিম সমাজেই বেঁচে থাকতে পারে। প্রাথমিক কৃষিসভ্যতার আওতায় এসে তার চেহারাতে আর এক ছাপ পড়বেই। আর অন্যান্য নরগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এলে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে আদিম চেহারার উপর পোষাকের জৌলুসও বাড়তে পারে। পশ্চিমবাঙলার যে অংশটি একদা অরণ্যভূমি ঝাড়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, সেই অংশের ঝাড়গ্রাম, মানভূম, ধলভূম, সাঁওতালপরগণা প্রভৃতি অঞ্চলগুলিতে এক ধরনের সংস্কৃতি সমন্বয় ঘটে গেছে এবং আজ-ও ঘটছে। এখানে, আদিম মানবগোষ্ঠীর উপর সমতলবাঙলার জনসম্প্রদায়ের প্রভাব নানাভাবে এসে পড়েছিল। তার পালা এখনো চলছে সাঙ্গীকরণ না হওয়া পর্যন্ত এর বিরতি ঘটবে না।

এই সব অঞ্চলের লোককথারও নিজস্ব একটি রূপ আছে এ সব কাহিনীতে কল্পনার রং চড়ানো হয় না। আদিম বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই লোকজীবনের বিশ্বাসকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মাত্র। এগুলিকে কাহিনী না বলে, আদিম পূজা-পদ্ধতির ভাষাময় নামে অভিহিত করলেও দোষের হবে না। দৈত্য রাক্ষস পরী হুরীর রূপকথার কোন রূপই এর মধ্যে নেই। এক্ষেত্রে কথানায়ক হচ্ছে অপদেবতা অথবা ডাইনী, গুণী অথবা ভূত, আর তারই সঙ্গে একান্তভাবে সম্পর্কবান আদিম মানুষের সমাজ। অরণ্য পাহাড় নদী নালা এবং অনুর্বর বন্ধ্যা মাঠই এখানে মুখ্য প্রকৃতি। মনের মধ্যে আদিমতম কুসংস্কার। এরই সংগে পাহাড়ের সানুদেশে, উপত্যকায় অধিত্যকায়, নদীনালার কোণ ঘেঁসে ফসল ফলে, শালবনের মাথায় ফুল ফুটলে সারারাত মাদল বাজে। জীবনকে অকৃত্রিমরূপে ভোগ করার ইচ্ছা এখানে অভিনয়ের ভণ্ডামীতে আবদ্ধ থাকে না। নিছক মনোরঞ্জনের জন্য এখানে কথা-কাহিনীর প্রচলন অল্প। বর্তমান কালে, অবশ্য কোন জাতি বা কোন নরগোষ্ঠী দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই যাতে পারিপার্শ্বিক বহু কিছুর প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকতে পারে। তাই মূল লোককথার আশে পাশে ভিড় জমায় আশেপাশের কল্পনা। তবু, লোক-বিশ্বাসের অনড় পাথর দিয়ে তৈরী থাকে বলে, তার বাহ্যিক পরিবর্তনের

রূপটি কোন না কোন রূপে প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেয়। বলা বাহুল্য, সমাজ বিবর্তনেব ধাবা কোন ক্ষেত্রেই অনড হ'য়ে বসে নেই বলে লোক-কাহিনী যুগে যুগে রূপান্তরিত হতে হতে এগিয়েছে।

কবমবাজাব কাহিনী অবলম্বন কবে এ প্রসংগে আবও কিছু বলা যেতে পাবে। কাহিনীটি দীর্ঘ এবং বিশেষ একটি পূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কথিত হয়। কবমগাছেব অধিষ্ঠাতা দেবতা কবমেব পূজাপ্রথা ভাবতেব অনেক আদিম জাতির মধ্যেই প্রচলিত এবং সংগে সংগে উত্তব বিহাবেব কোন কোন অঞ্চলে মেয়েদেব ব্রত হিসাবেও এব প্রচলনেব কথা জানা গেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে এ কাহিনীব আঞ্চলিক রূপায়ণ আছে। কিন্তু মূলত কাহিনীটি প্রায় অপরিবর্তিত। এ ধবনেব কাহিনীতে ব্রতমাহাত্ম্য প্রচাবিত হয় বলেই এব পবিবর্তন সহজে হয় না। পশ্চিমসীমান্তবাঙলাতে এবং ছোটনাগপুরের মুণ্ডাগোষ্ঠীতে প্রচাবিত কাহিনীটি যে আদি এবং অকৃত্রিম তা বুঝতে পাবা যায় অনায়াসে। কৃষি দেবতা কবমেব কোপে কৃষিজীবী কবমা এবং ধবমা কিভাবে সবস্বান্ত হয়েছিল এবং কিভাবে পবে আবাব সবকিছু ফিবে পায়, তাবই কথা এ কাহিনীতে বলা হয়। নানা ভাবে এই কাহিনীব উপর হিন্দুদেব ব্রতকথাব প্রভাব পড়েছে, সন্দেহ নেই। এই বিশেষ লোককথাটি কৃষিজীবী নবগোষ্ঠী থেকেই উদ্ভূত। তাই এব মধ্যে কৃষিসভ্যতাব পূর্ববর্তী যুগের চিত্র অনুপস্থিত।

ডাইনীব উদ্ভব সম্পর্কে যে লোককথাটি প্রচলিত আছে তাব মধ্যে প্রাচীনত্বেব ছাপ স্পষ্ট। কাহিনীটিব মধ্যে রূপকথাব কল্পনা নেই, অন্ধ বিশ্বাসেব সত্যতা আছে। আদিম সমাজেব মধ্যে এই ডাইনীভীতি আজও অন্ধকাবেব মতোই বর্তমান। অপদেবতা বা ভূত প্রেতেব মতো এই ডাইনীবা অদৃশ্য নয়, সশবীবে দৃশ্যমতী। আদিম সমাজে কি ভাবে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি শক্তিলাভ কবে গুণী বা ওঝাব পর্যায়ভুক্ত হলো,—ডাইনীদের সংগে তাদেব সম্পর্ক কি,—এই সব কথাই এই কাহিনীব বিষয়বস্তু। লোক-বিশ্বাসেব অকৃত্রিমতাই এব প্রাণ। ফলে, এব মাধ্যমে যে বিস্ময়েব আবির্ভাব, সে বিস্ময় কল্পনাব রঙে রঞ্জিত হয়ে রোমান্স হয়ে দাঁড়াতে পাবে নি। জীবনের সংগে এব সম্বন্ধ নিবিড়।

কিংবা ধবা যাক সেই বাখালেব কাহিনী। অসীমসাহসী রাখাল কিভাবে ভয়ংকরী রংকিণীকে মানভূম থেকে ধলভূমে বিতাড়িত করলো তারই কথা।

মূলত ডাইনী তাড়না থেকেই এর উদ্ভব। পরে অরণ্যভূমির ভয়ংকরী গ্রাম্যদেবী রংকিণীর সংগে জড়িত হয়ে এর রূপ কিছুটা বদ্‌লেছে মাত্র।

বলা বাহুল্য, এই সব গল্পকথা শিশুদের মনোরঞ্জন করবার জন্য রচিত হয় নি। মানুষের মনের বিশ্বাসকে কেউ একজন রূপদান করেছে মাত্র। এদিক দিয়ে, এই সব গল্পকেই খাঁটি লোককথা বলা যেতে পারে। এ সব কাহিনী জাতির বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর এক দিক দিয়েও এই সব লোককথার বিচার করা যেতে পারে। এই কাহিনীগুলিতে প্রেম ভালবাসা হৃদয়াবেগের কোন সুকুমারবৃত্তির উল্লেখও নেই। যে সমাজের মানুষ সুকুমার বৃত্তির অধিকারী হয় নি, সে সমাজের মানুষ প্রেমের গল্প তৈরী করতে পারে না। তার জন্য মনোরাজ্যে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন, সে প্রস্তুতি কোন সমাজেরই আদিপর্বে থাকে না। শরীরধর্মকে অতিক্রম করে মনোধর্মের বিকাশ ঘটতে বেশ কয়েকটি যুগের প্রয়োজন।

পশ্চিমসীমান্তবাঙলার এই সব কাহিনীতে রাজপুত্র-মন্ত্রিপুত্রের বা রাজ-কন্যা-মন্ত্রিকন্যার সন্ধান কিছুতেই পাওয়া যাবে না। যে আদিম সমাজ ব্যবস্থায় রাজা মন্ত্রীর প্রয়োজন ছিল না, সেই সমাজব্যবস্থার যুগেই এই সব কথা কাহিনী জন্ম নিয়েছিল। সামাজিক সংহত বিশ্বাস এবং দৈনন্দিন অজ্ঞাত বিস্ময়ের পরিবেশেই, এই সব লোককথাকে রূপকথা থেকে পৃথক করে রেখেছে। রূপকথার শিশুরাজ্য এখানে পুরোপুরি অনুপস্থিত। আর, এই সব লোককথার মধ্যে জাতির প্রাচীনতম ইতিবৃত্তের যে তথ্য রয়েছে, তার মূল্যও কম নয়। সাওতালী গল্পের সৃষ্টিকাহিনী অথবা মুণ্ডা লোককথার লুতকুম দম্পতির গল্পে অবাস্তব বস্তু নির্দেশ নেই বললেও চলে। ইতিহাস আর অন্ধ বিশ্বাসের সহজ মিলন স্বচ্ছন্দেই ঘটে গেছে। সাহিত্য সৃষ্টির জন্য এ সব কাহিনী রচিত হয় নি। বিশ্বাস করে বিশ্বাস উৎপাদনের ইচ্ছাটাই এক্ষেত্রে একমাত্র ইচ্ছা। জীবনের দুঃখদারিদ্র্য রোগ-শোক-হানাহানি থেকে আরম্ভ করে 'সিংবোঙা' পর্যন্ত সর্বকিছুই লুতকুম দম্পতির কাহিনীতে আছে। এ কাহিনীকে মুণ্ডা সমাজের আদিম ইতিহাসরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে অনায়াসে। কিন্তু এর মধ্যে জীবনের সুকুমার প্রেমের দিকটা একেবারেই গৌণ। আদিম ধর্মাচরণের সংগে সম্পর্কযুক্ত বলে অথবা আদিম বিশ্বাসের ধারাটি একান্ত ভাবে প্রবল বলে, এসব গল্পের মধ্যে বাইরের সাজসজ্জা বা কল্পনার রং একেবারেই নেই। যদি, কোন কোন কাহিনীতে

থাকে, তা হলে তার সৃষ্টিকাল সে কাল নয়। অপদেবতা উপদেবতা ডাইনী ভূত তুকতাক যাদুক্রিয়ার উপর অটুট আস্থা রাখতে গিয়ে অনেক দিন পর্যন্ত হৃদয়ের দিকে নজর দেবার সময় হয় নি বলেই এমনটি ঘটেছে।

সীমান্তবাঙলার আদিম সংস্কৃতির মানুষদের ক্রম-অগ্রগতির পথে হিন্দু সংস্কৃতির নতুন যোগাযোগ যখন ঘটলো, তখন সেই যোগাযোগের প্রভাবও অনিবার্যভাবে কোন না কোন দিকে পড়লো এবং বহুক্ষেত্রে তা পারস্পরিক হলো। বাঁদনা পরবের কাহিনীতে এমনি করেই হিন্দু দেবতা মহাদেবের আবির্ভাব হয়েছে।

সীমান্তবাঙলার বিভিন্ন গ্রাম দেবতা সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী সংগৃহীত হলে লোক কথার বৈশিষ্ট্য সমগ্রভাবে প্রকাশিত হ'তে পারে।

সীমান্তবাঙ্‌লার লোকযান

লোকসংগীত-সংকলিকা

১। ভণিতাযুক্ত সাধারণ ঝুমুর

।। ভবপ্রীতানন্দ ওঝা ।।

॥ ১ ॥

ববষা আগত ভেল, মেঘেতে বিজুবী খেল
মাতি গেল যত শিখীকুল গো—
হবিশূন্য হইল গোকুল ॥ (বঙ্)

ববষিছে জলধাবা, নিশি শশী-তাবা-হাবা
শ্যামহাবা গোপিনী ব্যাকুল গো ॥ (বঙ্)

শ্যামল বনশোভিত, শীত বায়ু প্রবাহিত
বিকশিত মালতীব ফুল গো ॥ (বঙ্)

অশানব ঝনঝনি, মদন-দুন্দুভি ধ্বনি
বিবহিনীব হৃদে বিঁধে শূল গো। (বঙ্)
বাধা কহে সখীগণে, ভবপ্রীতা ভাবে মনে
বাধা সনে জগতেব মূল গো।
হবিশূন্য হইল গোকুল ॥

॥ ২ ॥

কালি নিশি তব সনে, বঞ্চিব সুখ মিলনে
মিলাইব অধবে অধব গো,
হৃদয়ে ধবিব পয়োধব।
আজু ধনি মোবে ক্ষমা কব ॥ (রঙ্)

আজ বাধা সনে নিশি, যদি না মিলি রূপসী
ব্যাকুল হবে তার অন্তব গো
মদনে হানিবে ফুল শর গো ॥ (রঙ)

বিষম কুসুম বাণ, দহিছে বাধাব প্রাণ
কুপিত হবে মোব উপব গো।
না বহিবে উপায় অপব গো ॥ (বঙ্)

বাধাব ঘ'টল মান, মোব হিয়া কম্পবান
দংশবে বিবহ বিষধব গো,
ভবপ্রীতাব গতি বাধা কব গো ॥[১] (বঙ্)

॥ ৩ ॥

জেগে বইলাম সাবা নিশি
ন আইল কালোশশী—
প্রকাশিল পুর্বদিশি নাশি তমঘোব।
(আমাব) প্রাণধন না আইল সখী
নিশি হইল ভোব ॥

বাসি হইল ফুলেব মালা
না আইল নাগব কালা
চিত হইল উতলা শুনি পাখিব শোব।[২]
নিশি হইল ভোব ॥

পবিয়া মোহন ভূষা
হবষে ধাইল উষা
শশাংক ডুবিল, আশা ত্যজিল চকোব।
নিশি হইল ভোব ॥

পাতিযা কুসুম শয্যা, বড পাইলাম লজ্জা
ভবপ্রীতা কহে দাগা দিল মনচোব।
নিশি হইল ভোব ॥

॥ ৪ ॥

বাধা কহে সখী সনে
চল ও শ্যাম দবশনে
বৃন্দাবনে—

১ ভাদুরিয়া ঝুমুরের সুরে গীত এই ঝুমুরটি চন্দ্রাবলীব প্রতি শ্রীকৃষ্ণের
২ কাকলী (মুল অর্থ কোলাহল)

বাঁশী বাজিছে সঘনে গো,
বৃন্দাবনে। (বঙ্)
রাধা রাধা নাম ধরে
ডাকে বাঁশী প্রেমভরে,
ফুলশরে—
হিয়ায় বিঁধিছে মদনে গো,
ফুলশরে।
কি করিব কুল লাজে
যদি পাই গো রসরাজে
হৃদি পথে
তারে রাখিব আদরে গো
হৃদি মাঝে।
কহে রাধা উৎকলিতা[১]
চল তোরা ও ললিতা
ভবপ্রীতা ভণে সে নীলরতনে গো
ভবপ্রীতা।

॥ ৫ ॥

আধারি ভাদর রাতি, দেখিয়ে তড়পে[২] ছাতি
পতি নাহি পালঙ্ক উপরে।
সখীরে, প্রাণ দহে মদনের শরে। (বঙ্)
একেতো অবলা বালা, দোসরে যৌবন জ্বালা
কেমনে রহিব শূন্য-ঘরে। (বঙ্)
শুন শুন সহচরী, তোদিগে বিনয় করি
বাঁচাহ আনিয়া সে নাগরে। (বঙ্)
বিনা সেই শ্যামধন, না রাখিব এ জীবন
ভবপ্রীতা হরিপদে ধরে ॥

১ উৎকণ্ঠিতা।
২ কাঁপে।

॥ ৬ ॥

গরজে বাদল ঘোর
আমার হিয়ায় মারে শেল গো,
অসময়ে—
মোকে পিয়া দাগা দেল্[১] গো,
অসময়ে।
সফল যৌবন মোর
(আমার) বিফলেতে গেল্[২] গো,
গুনি গুনি—[৩]
রাধার পিয়া বুঝা ভেল্[৪] গো,
গুনি গুনি।
কি করে পোহাবো রাতি
(আমি) কুঞ্জেতে একেলা গো
ফুলশরে—,
কামে বিকশিত দেল্[৫] গো ;
ফুলশরে।
রাত হেরি মান করি
(আমার) সুখরাতি গেল্ গো,
ভবপ্রীতা,—
হরিপদে মাতি গেল্ গো
ভবপ্রীতা।

॥ ৭ ॥

যাইতে যমুনা জলে শ্রীরাধা সখীরে বলে
তরুতলে কালিয়া দাঁড়ায় গো.
একাকী সে যাব যমুনায়। (রঙ্)
দেখিলে যুবতী নারী শ্যাম বাজায় বাঁশরী
আঁখি ঠারি রমণী ভুলায় গো।
সেই ভ্রমর-কালিয়া নারী ফুলে জড়াইয়া
অধর চুমিয়া মধু খায় গো।
কহে রাধা প্রেমভীতা সঙ্গেতে চল ললিতা
ভবপ্রীতা মাধবে ধেয়ায় গো।

১ দিল ২ গেল ৩ দিন গুনে, ভেবে ভেবে ৪ হলো (রাধার প্রেম বোঝা গেল)
৫ দিল্, হৃদয়

॥ ৮ ॥

করিনু বাসর সাজ   না আইল রসরাজ
রজনী হইল ভোর—
রে সজনী—
আজু না আসিল মন-চোর। (রঙ্)
পূরবে লোহিত আভা   মলিন চাঁদের শোভা
পাখী সবে বনে করে শোর।
শুন বলি সখীগণ   কালি এলে শ্যামধন
আসিতে দিও না কাছে মোর।
পিরিতি খলের ই সাধ   নদীতে বালির বাঁধ
ভবপ্রীতা ভাবেতে বিভোর।—
আজু না আসিল মনচোর।

॥ ৯ ॥

শুন সজনীরে—
হিয়া য বিদরে মদন তীরে। (রঙ্)
আসিল বসন্ত ঋতু হরষিত প্রাণ
নবস্বরে কোকিল-কোকিলা করে গান।
আনন্দে গুঞ্জরে অলি পেয়ে নবফুল
এলো না বঁধুয়া আমে ধরেছে মুকুল।
মলয় পবন বয় অতি সুশীতল
জ্বলে উঠে বিরহিণীর বিরহ-অনল।
না আসে নাগর যদি না রাখিব প্রাণ
ভবপ্রীতা রাধা-হরি চরণে ধেয়ান।

॥ ১০ ॥

শুন গো আয়ান দাদা   কুলকলংকিনী রাধা
কালা সনে বনে করে খেলা রে—
চল দেখাইব এই বেলা। (রঙ্)

কবি মোদের অপমান ভাঙ্গিল সে কুলমান
বড়ই দুরন্ত নন্দের ছেলা[1] রে।
চল (রঙ্)
তুমি জান রাধা সতী, রাখালে তার মজে মতি
কাপুরুষের মত তোমায় হেলা রে।
চল (রঙ্)
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে সক্রোধে কুটিলা সনে
আয়ান শ্রীবৃন্দাবনে গেলা রে।

॥ ১১ ॥

আমারে রাখিয়া আশে সে রহিল কার পাশে
কপট করিল ছলনা।
অর্ধ নিশি গত তবু এলো না।
কপট করিল ছলনা। (রঙ)
আকাশে পূরণ শশী ঢালিছে অনল রাশি
ফুল গন্ধে বহে পবনা।
কপট করিল ছলনা। (রঙ)
কোকিলের কুহুস্বরে মরম যেন বিদরে
বাড়িছে বিরহ বেদনা
বিঁধে হিয়া ফুলশরে মদনা।
কপট করিল ছলনা। (রঙ)
যাও সখী আন তারে এ বিপদে রাখ মোরে—
সহে না দারুণ যাতনা।
ভবপ্রীতার হবিপদ সাধনা।
কপট করিল ছলনা

॥ ১২ ॥

হের সহচরী যায় বিভাবরী
এলোনা কপটের মূল রে
কোকিল কুহরে বিঁধিছে অন্তরে
মদনে বিরহ শূল রে।
এলোনা ত্রিভঙ্গ শ্যাম, পরাণ ব্যাকুল রে। (রঙ্

১ ছেলে।

স্থমধুব স্ববে ভ্রমব গুঞ্জবে
কুঞ্জে চুমি নব ফুল বে।
স্থধাকব কব অনল প্রখব
গবল ভেল তাম্বুল বে।
অঙ্গেব ভূষণ বৃশ্চিক সমান
সাপিনী নীল-ত্নকূল বে।
কণ্টক সমান শয্যা অনুমান
দহিছে কুঞ্জ মঞ্জুল বে।
মবি যাব তবে সে মজিল পবে
পব প্রেমে প্রেমাকুল বে।
ভবপ্রীতা ভণে মানস দর্পণে
হেবি সে রূপ অতুল বে।

॥ ১৩ ॥

হেমন্তেব শীতে অঙ্গ কাপে থব থব
হৃদয় ফাটিছে মোব বিনা সে নাগব।
প্রাণ ধবি কিসে
দিনবাতি দহিছে বিবহ বিষে। (বঙ
একাকিনী শয্যা লাগে কণ্টক যেমন
বাতি হৈলে বতি-পতি কবে জ্বালাতন। (বঙ)
কৃষক আনন্দ হেবি পবিপক্ক ধান
শ্যাম বিনা বিনোদিনী বেয়াকুল প্রাণ। (বঙ্)
প্রভাতে গাছেব পাতে শিশিব পতন,
ভবপ্রীতা কহে হবি বিনা কান্দে বন। (বঙ্)

॥ ১৪ ॥

ববষা ঋতু স্থন্দব উদিত ধবণী পব আকাশে ছাইল জলধব।
নাচায়ে শিখীপাল গবজে মেঘজাল ঝলসি খেলে সৌদামিনী—।
ববষে বিমিঝিমি। (বঙ্)
কোকিল চাতক তানে মদনেব ফুল বাণে
হায় ধনি ব্যাকুল পবাণে।

যৌবনে করত জ্বালা নাহি আওল কালা
দংশে বিরহ ভুজঙ্গিনী। (বঙ্)
আঁধারি ভাদর নিশি নাহি সুঝে[1] দশ দিশি
কাঁদি আমি একা কুঞ্জে বসি।
টুটল চিত আশ মন ভেল উদাস
কৈসে বাঁচত বিরহিনী। (বঙ্)
ব্রজ ত্যজিয়া সংগিনী সবে সাজিব যোগিনী
খুঁজিয়া ভ্রমিব গুণমণি।
ভবপ্রীতা ভণে পাবে হারাধনে
কেঁদো না শ্যাম সোহাগিনী। (বঙ্)

॥ ১৫ ॥

এ মধু যামিনী যায় না আইল রসরায়
প্রাণসখা না আইল,
সখী, কার প্রেমের ফাঁদে পাখি ধরা গেল।
কেনে, নাগর না আইল। (বঙ্)
নবীন প্রেমের পথে দাগা দিল।
আতর চন্দন চুয়া পুষ্পমালা পানগুয়া
সকলি পড়িয়া রইল।
কেনে নাগর না আইল॥
অঙ্গের ভূষণ আদি সকলি হইল বাদী
চন্দন গরল হইল,
(হেরে) চাঁদের মণ্ডলে বিষ বরষিল,
কেনে নাগর না আইল॥
কোকিল পাড়িছে গালি ভ্রমর বিষের ডালি
শবদে শ্রবণ গেল,
ভবপ্রীতা কহে প্রেমে দাগা দিল॥

॥ ১৬ ॥

আইল ঋতু বরষা পিয়া মিলন ভরসা
আমার ভাঙিল হিয়ায়[2] রে।

১ দৃষ্ট হয়, ২ হিয়া

জলদের ডাকে　　　　বিরহ বিপাকে
　　পরাণেতে বাঁচা দায় রে।
নবীন মেঘের ঘটা হেরি
　　মনে পড়ে কালিয়া (বঙ্)
শ্যামল মঞ্জুল কুঞ্জে　　　　মালতী কুসুম পুঞ্জে
　　অলি গুঞ্জরি বেড়ায় রে।
কোকিল কুহরে　　　　হৃদয় বিদরে
　　কেকারবে শিখী ধায় রে।　　(বঙ্)
ঘোর আন্ধারিয়া নিশি　　বিজলি উঠে ঝলসি
　　একাকিনী প্রাণ ডরায় রে,
সুগন্ধ বাতাসে　　　　অনল প্রকাশে
　　ফুলশরে প্রাণ যায় রে।　　(বঙ্)
সঘনে বরিষে বারি　　একাকী অবলা নারী
　　আমি করি কি উপায় রে।
ঘন পিয়া পিয়া　　　　ডাকিছে পাপিয়া
　　দ্বিজ ভবপ্রীতা গায় রে।

॥ ১৭ ॥

দিবসে, বিশাখা ধনি,　　শুনিয়া মুরলী ধ্বনি
　　হানিল মদনে ফুলশর গো
কহে রাধা দহিল অন্তর গো,
　　চল সখী যেখানে নাগর।　(বঙ্)
আহা কি মধুর সুর　　শুনি মাতে সুরাসুর
প্রেমাঙ্কুর বাড়ায় সত্বর গো—
শস্ত্রে যেন বিঁধে জলধর গো।
　　চল সখী যেখানে নাগর।
কি তপ করিল বাঁশি　　পান করে সুধারাশি
　　দিবানিশি চুমে সে অধর গো—
যার তরে ত্যজি মোরা ঘর গো।
　　চল সখী যেখানে নাগর।

বিলম্ব সহেনা আর ভবপ্রীতা কহে আর
অসার সংসারে রাধা ধর গো
ভবতরীর ও পদ সুন্দর গো ॥
চল সখী যেখানে নাগর ॥

॥ ১৮ ॥

[গত বিভাবরী, নেহারি শ্রীহরি, পরিহরি নব কামিনী।
আসি রাধা দ্বারে সভয়ে নেহারে বৃন্দা দ্বারবাসিনী ॥]

—কুঞ্জের দ্বারপালিকা বৃন্দার উক্তি—

কওন্ হো তুম নেহি কুছ মালুম
ইধার কাঁহাসে আতে হো।
দ্বার সাম্‌না চোর সমানা আধমুখড়া
দেখলাতে হো।
হঠ্ যাও জী বংশীবালে কাহেকো
অন্দর আতে হো। (রঙ্)
কাহে লাঠিকা সিঁধকাঠিহাতমে ক্যা দেখ্‌লাতে হো ?
রাই রাজাকে ধন হরণে কো চোর মতলব লাতে হো।
হঠ্ যাও জী……(রঙ্)
রাত কিয়া রঙ্ পরনারী সঙ্গ্, ভোর হিঁয়াপর আতে হো,
সিন্দূর কজ্জল মুখপর ঝলমল
জেরা শরম্ নাহি যাতে হো।
রঙ পহিরণ কালাবরণ ভি কালা নখরদাগ
দেখলাতে হো।
রাত জাগরণ তা' কে কারণ লাল আঁখি
চমকাতে হো।
হঠ্ যাও জী……(রঙ্)
রাতকা ডেরা থানা তেরা বেহ্‌তর হুকুম রহ্ পাতে হো।
ভবপ্রীতা চিত হরিপদসে প্রীত
দুস্‌রে মে কৈঁউ ভুলাতে হো ॥
হঠ্ যাও জী……(রঙ্)

॥ ১৯ ॥

[কৃষ্ণের উক্তি]

চিনিলে না সহচরী   আমি শ্রীরাধার প্রহরী
    দ্বারে থাকি ধরি অসি ঢাল গো।
মোরে, চোর বল কি জঞ্জাল গো। (বঙ্)
সিঁধকাঠি নয় রূপসী   করেতে মোহন বাঁশি
    রাধা নামে সাধা সদাকাল গো।
        মোরে চোর বল (বঙ্)
করিতে দেবীপূজন করি কমল চয়ন
    কাঁটা দাগ হৃদয়ে বিশাল গো।
    মোরে চোর বল   (বঙ্)
পূজেছিলাম ভগবতী,   তাহারি প্রসাদ দূতী
    সিন্দূর কজ্জলে মাথা ভাল গো—
        মোরে চোর বল · (বঙ্)
অভিসারে নীলবাস   আঁধারে নহে প্রকাশ
    পথ ভুলে এমন বেহাল গো।
        মোরে চোর বল   (বঙ্)
দ্বিজ ভবপ্রীতা ভণে   খেলে আসি বৃন্দাবনে,
    রাধাসনে ত্রিভঙ্গ রাখাল গো।
        মোরে চোর বল ·· (বঙ্)

নরোত্তম

॥ ১ ॥

আসার আশে রইলাম বসে
    বারিতলাই[১] গ—
কমলিনী ধনি তোমারি আশাই[২] গ
শীতলী বাতাস বহে শীতে ভিজে গায়[৩] গ,
সাড়া নাহি দেয় ধনি ডাকে ইশারাই[৪] গ।

১ বাইরে   ২ আশায়   ৩ গা   ৪ ইশারায়

যে দুঃখ দিয়াছ মোরে ভুলা নাই যাই[১] গ,
নিদারুণ অবাদ[২] সাধিলে আমাই[৩] গ,
আর কি বিশ্বাস হয় তোমারি কথাই[৪] গ
নরোত্তমা কহে, অ শেল পাশুরা না যাই[৫] গ

॥ ২ ॥

পুষেছিলাম পাখি, চোখে চোখে রাখি,
(আহা) পিঁজর কেটে পাখি পালাল ,
বড় শেল বুকে দিল। (বড়)
হারা হয়ে পাখি, জগৎ আঁধার দেখি
(আহা) সে পাখি কেমনে পাব বল,
বড় শেল বুকে দিল।
পাখিকে খাওয়াতম যে রূপ-জল প্রেমফল ,
(আহা) সে পাখি সকলি ভুলিল
বড় শেল বুকে দিল।
নরোত্তমা ভণে পোষ না মানে
(আহা) সে পাখি কোথায় রইল, বল
. বড় শেল বুকে দিল।

॥ ৩ ॥

পিরিতির কালে (আর) এনে চন্দ্র হাতে দিলে
বঁধু হে—,
বল দেখি তখন কি বলেছিলে— ,
এখন বড় দাগা দিলে। (বড়)
পুরুষ ভমরা জাতি (আর) স্বভাবে কুটিলা অতি গো
আমি তোমার, তুমি আমার না হলে—
এখন বড় দাগা দিলে।
চাপায়ে তরুর ডালে (আর) ছেদন করিলে মূলে
বঁধু হে—
ওহো, পিরিতি শিখায়ে শেষে কাঁদাইলে।

---

১ যায় ২ বাদ ৩ আমার ৪ কথায় ৫ ভোলা যায় না

হীন নরোত্তমা বলে, (আর) যা মনে তাই করিলে
আগাম[১] দরিয়ার মাঝে ভাসাইলে।
এখন বড় দাগা দিলে।

॥ ৪ ॥

তুমি হে লম্পট কঠিন কপট, বন্ধু হে—
ছিঃ ছিঃ বঁধুয়া, রসিকের কাজ—
প্রেম করে দাগাবাজ। (বঙ্)
ছলে ভুলাইলে, প্রেমে মজাইলে—বন্ধু হে—
ভাসাইলে হে দরিযার মাঝ—
প্রেম করে দাগাবাজ—।
কুলে কালি দিলে কলংখ[২] ঘটালে বন্ধু হে—
ডুবাইলে হে দরিয়ার মাঝ,
জানাইলে হে জগতের লাজ—
প্রেম করে দাগা, ভাব করে দাগাবাজ।
নরোত্তমা ভণে যা ছিল তোমার মনে বন্ধু হে—
কিছু বাকী তব রসবাজ।
প্রেম করে দাগা, ভাব করে দাগাবাজ।

॥ ৫ ॥

নিশি কোথা ছিলে শ্যাম
পুরালে কার মনস্কাম,—বঁধু হে—
প্রভাতে আইলে কিবা কাজে, নিলজ হে, নিলজ হে—
ফিরে যাও হে মানে মানে। (বঙ)
একলা নারীর কুঞ্জে দাঁড়িয়েছিলে কিবা কাজে
বন্ধু হে—
লাজ নাই শ্যাম নিলজ পরাণে, নিলজ হে
ওহে নিলজ—,
যা আছে কপালে আমি বলব একা পেলে—
বন্ধু হে—

১ অগম অতল। ২ কলংক

কাঁদাইলে শ্যাম নবযৌবনে, নিলজ হে—।
নরোত্তমা ভণে, রাব করে শ্যাম দিব টেনে
বন্ধু হে—,
কেঁদে কেঁদে শ্যাম যাবে অপমানে,
নিলজ হে—
ওহে নিলজ হে—
ফিরে যাও হে মানে মানে।

সুন্দর

॥ ১ ॥

কোকিলার ডাক শুনি, নিজ মনে ভাবি গুনি[১]
কলপি কলপি[২] উঠে ছাতি রে—
ওরে পাখি—
কেন ডাক নিশি ভোর রাতি। (বন্ধ)
নিশি হইল অবসান
না আইল বাঁকা শ্যাম
সে যে আমায় দিয়ে গেছে ফাঁকি রে—
ওরে পাখি,
কেন ডাক নিশিভোর রাতি।
দিবানিশি কেঁদে মরি
না হেরিনু বংশীধারী
ঝর ঝর বহে দুটি আঁখি রে,
ওরে পাখি
কেন ডাক নিশিভোর রাতি।
সুন্দর বলে শুনগো রাধা
তুমি যে শ্যামের আধা,
শ্যামে আনি মুছাব দু আঁখি রে
ওরে পাখি
কেন ডাক নিশিভোর রাতি।

১ চিন্তা করে ২ কেঁপে কেঁপে

॥ গোবিন্দ ॥

॥ ১ ॥

শুনগো বিন্দে সহচরী,
যমুনায় জল আনতে নারি গ
শ্যাম দাঁড়ায় কদম্ব তলায় গ
ওটা কে জলে যায় গো যায়। (বঙ্‌)
শ্যাম ফিরে ফিরে চায় ॥
ক্ষণেক কাছেতে দেখি
ক্ষণেক অন্তরে দেখি গো।
যোগীজন ধ্যানে নাহি পায়।
কুলসী ডুবায়ে জলে
'তুইলতে না পারি—' বলে গো—
চলে যেতে বাধে ঠহর না পায়।
কৃষ্ণ নিল শীল নিল
আপদ তুলিয়া নিল গো।
দ্বিজ গোবিন্দ হরিগুণ গায়,
ওটা কে জলে যায় গো।—যায়।

॥ জগৎ ॥

॥ ১ ॥

বলে দিব বৃন্দাবনে
পুরুষ হ'য়ে নারীর পায়ে ধরিলে কেমনে। (বঙ)
ছি ছি হে শ্যাম কি করিলে
কলংখ[১] রাখিলে গোকুলে,
এই কথাটি দিব বলে
মোরা রাখিব না গোপনে।
শুন ওহে কালশশী,

১ কলংক

মোদেব বদনে ধবে না হাসি
ধন্য মোদেব বাই-কিশোরী ধরাল চবণে।
শুন ওহে কালো সখা
তোমায় কে দিল কুমন্ত্রণা
জগৎ বলে ভালোবাসা জানা গেল এত দিনে।

॥ উদয় ॥

॥ ১ ॥

বাসি বইল ফুলেব মালা
না আইল নাগব কালা,
(হায় বে, হায় বে হায়—)
কেনে ভ্রমব কব আনাগোনা বে
কবি মানা—,
পিবিতি বতন কাঁচ-সনা।[১] (বঙ্)
যাইতে যবুনাব জলে
শ্যাম দাঁডাযে কদমতলে,
(হায়বে হায়বে হায)—
দেখা পেলে কবে দিও মানা বে —
পিবিতি বতন কাঁচ-সনা।
আগে ছিলাম কাঁচ-সনা
এখন হলাম বাং-তামা
(হায়বে হায়বে হায়)
উদয় বলে সাচা
যেন চিনিব পানা বে—
কবি মানা,
পিবিতি বতন কাঁচ-সনা।

॥ ২ ॥

প্রেম কি সহজে হয
আব—আগম কি দিগমে[২] কয়,
এই মিনতি কবি তোমায়
না বাসিও পর গো।

---

১ কাঁচা সোনা। ২ নিগম।

ও তুই বল্ গো—
খুলে কথা গোচবে বল্। (ঽঙ্)
নিয়ে দিয়ে তাবই আশ
এখন কবিলে নৈবাশ—
জডা[১] প্রেম ভাঙিল কিসে
খুলে কথা বল্ গো—
খুলে কথা গোচবে বল। (বঙ্)
তোমাব ৰূপমাধুবী আমি যে ভুলিতে নাবি—
ক্ষণে ক্ষণে মনে পডে তোমাব মধুব স্বব গো—
খুলে কথা বল গো—
খুলে কথা গোচবে বল। (বঙ)
হীন উদযে গায়, (আব—) ভাঙা প্রেম কি জুডা[২] যায়
ভেবে দেখ মন, ছি ডা[৩] জুবে না পডিবে সব গো।।
খুলে কথা বল গো—
খুলে কথা গোচবে বল্। (বঙ)

॥ মুক্তেশ্বর ॥

॥ ১ ॥

আমি তোমায ভালবাসি অন্তবে অন্তবে
তুমি যে চলিযা গেলে ছেড়ে অবলাবে—।
বঁধু কি বলিব তোবে, বধু কি বলিব তোবে। (বঙ্)
স্বপনে দেখেছি আজ নিশি ঘুম ঘোবে,
চমকি উঠিয়া দেখি পাইনা তোমাবে,
বঁধু কি বলিব তোবে।
তুমিও যাইবে যেথা, আমিও যাইব সেথা
তোমা ছাডা হলে বঁধু বাচে না পবাণ।
দ্বিজ মুক্তেশ্বব ভণে ভুলিতে না পাবি তোবে
পিরিত কবাব বড জ্বালা সহে না অন্তবে।
বঁধু কি বলিব তোরে।

১ জুড়ে থাকা, যুক্ত। ২ জোড়া। ৩ ছেড়া—।

॥ হরিপদ ॥

॥ ১ ॥

লাল শালুকের ফুল ফুটে আধারাতে,
যার সঙ্গে যার ভাব, বঁধু, মরিলে না টুটে
বঁধু এত রাত কিসে। (রঙ্)
মেঘ আঁধার রাতি বিজলী চমকে
এমন সঙ্কট পথে আইলে কি মতে
বধু এত রাত কিসে।
এস এস বঁধু বসহে পালঙ্কে
চরণ ধুয়াব তোমারে, মুছাইব কেশে,
বঁধু এত রাত কিসে।
যখন তোমার কাছে থাকি কথা বল হেসে,
সকল জ্বালা যাই গো ভুলে, তোমারি পরশে
বঁধু এত রাত কিসে।
দ্বিজ হরি ভাবে চিতে ভাবে দিনে রাতে
এমন সুন্দর কইন্যা পাইলে কিমতে—
বধু এত রাত কিসে।

। ২ ।

ঢিট লম্পট কালা মোরে সখী দেল[১] জ্বালা
মনাগুনে জ্বারল[২] পাঁজরা রে—
ধৈরয না যায় ধরা। (রঙ্)
গৃহে গুরুজনার মাঝে যাইতে না পারি লাজে
সে রহল[৩] তোর প্রেমে মরা রে—
ধৈরয না যায় ধরা।
নিশি বহল জাগি তাহার দরশ লাগি
গৃহ কাজে বহে ল'র[৪] ধারা রে—
ধৈরয না যায় ধরা। (রঙ্)

১ দিল। ২ জ্বলিল। ৩ রহিল। ৪ লোহের (অশ্রুর)।

দ্বিজ হরিপদ গায় মন বাঁধিলে তায়—
বুঝালি মজালি পাগল পারা— রে
ধৈরয না যায় ধরা।

॥ ৩ ॥

কোকিলা করত গান আকুল হইল প্রাণ গো—
দিবানিশি কেঁদে মরি আমি তোমারি
জ্বালায়,
আশা ভাঙিলে গো, (ও) প্রেম সহা নাহি যায়। (বও)
এ বিচ্ছেদজ্বালা সহে না কেন কর আনাগনা[১] গো
নিঁদ নাহি আসে প্রাণে, জাগিছে আমায়।
ও প্রেম সহা নাহি যায়।
আমারে ভুলিয়ে শ্যাম মজেছ কুবুজার সনে গো—
সারানিশি জেগে রইলাম তোমারি আশায়—।
ও প্রেম সহা নাহি যায়।
দ্বিজ হরিপদ ভণে
ভেবো না সে শ্যাম মনে গো—
এমন নিঠুর কালা ভুলিয়ে আমায়—
ও প্রেম সহা নাহি যায়।

॥ ভরত ॥

॥ ১ ॥

ঘনঘটা বাদলিয়া
চমকে বিজলিয়া
থাকি থাকি—
জ্বলে বিরহ আগুনিয়া, থাকি থাকি। (বঙ্)
কোথায় আছ প্রিয়তমে
দেখনা আসিয়া,
অদর্শনে—
আছি মরমে মরিয়া। থাকি থাকি—

১ আনাগোনা, আসা-যাওয়া।

অঙ্গ কাঁপে থরহরে
দহে রতিপতিয়া,
বিফলেতে—
গেল যৌবন চলিয়া। থাকি থাকি—
ভরত কিশোরে বলে
থাক ধৈরজ ধরিয়া
পুরাইবে—
আশা, বদন চুমিয়া গো থাকি থাকি-

॥ মন্নু ॥

॥ ১ ॥

প্রভাতে শ্যাম কি মনে করে,
জ্বালাতে দ্বিগুণ জ্বালা এলে এবারে।
গত নিশি কোথায় ছিলে
প্রভাতে জ্বালাতে এলে
যাও বঁধু হে যাও হে চলে কুঞ্জের বাহিরে।
তুমি হে লম্পট বঁধু
বাসি ফুলে নাইকো মধু
ফিরে যাও হে প্রাণবঁধু বলি তোমারে।
গোলাপ মল্লিকা ছেড়ে মজিলে শিমূল ফুলে
নাগরালি খাটবে না আর যাও ধীরে ধীরে—
পড়েছ বিষম ফাঁদে এখন তুমি মর কেঁদে
চন্দ্রাবলীর পদতলে থাকগে পড়ে।
পিরিতি অমূল্য নিধি রাখালে জানিত যদি,
মাঠে-গোঠে থাক লয়ে পাঁচনী করে।
মন্নু বলে মনের দায় ধর শ্রীমতীর পায়
তবে যদি দয়া করে প্যারী তোমারে।

॥ অনন্ত ॥

॥ ১ ॥

দহের মাছ না পড ভাই ডাঙ্গালে[১]
সাঁতার দিছ ভবজলে।
যদি হবে ইঁচলা-পুঁটি[২]
যা'তে হবেক গুটি গুটি
ঘুরাই ঘুরাই মাববে ঘুনি-জালে[৩] হে
সাঁতার দিছ ভবজলে।
যদি হবে দাঁড়কা-মুলি[৪]
যা'তে হবেক কুলি কুলি
ঘুঘি[৫] আড়া[৬] আছে কুলি-মুড়ালে[৭],
সাতাব দিছ ভবজলে।
যদি হবে গঢ়ই[৮] শোল
লাগে' যাবেক গণ্ডগোল
পাশি আড়া আছে জলেব তলে।
সাঁতাব দিছ ভবজলে।
যদি হবে রুই কাতলা
তাতে হবে মন মাতলা[৯]
অনন্ত কয় বাখ পদতলে।
সাঁতাব দিছ ভবজলে।

গদাধর ॥

॥ ১ ॥

বল দূতী গো, দূতী গো,
কাল রাতে হামাব ঘবে চোব সাঁধাইছিল।
চোবের নাম নীল-মণি, চুবি কবে খায় ননী
আবার, দৈ-টাও খাঁয্যো ভাঁডটা-ও ভাঙ্যো দিল,
গো, কাল রাতে হামাব ঘরে চোর সাঁধাইছিল[১০]।

১ ডাঙ্গায় ২ কুচো-চিংড়ী, পুঁটি মাছ ৩ একজাতীয় জাল ৪ দাঁড়কুনি মাছ
৫ এক জাতীয় জাল (বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরী) ৬ পাতা ৭ রাস্তার শেষে
৮ গড়ুই, ল্যাঠামাছ; ৯ মাতাল ১০ ঢুকেছিল

চোরের নাম কেল্যাসোনা, কদম তলায় করে থানা
আমায় চিন্হাপ চোবে পরাণে মারিল ;
দূতী গো কাল রাতে হামার ঘরে চোর সাঁধাইছিল।
দ্বিজ গদাধর বলে জনম সাঁতাইল চোরে
আমায় তাবের ঘরে দুঃখিনী করিল।
দূতী গো ... ..সাঁধাইছিল।

॥ ২ ॥

বাগ মানে না কানা কাডাটা[১] ,
বাগাল্যা নাই দিল গুহাল ঘরের টাডাটা[২]। (বঙ)
বঁদ[৩] ভাগিয়ে খঁদ[৪] খাইল হইল চাষীর বেদনা,
ঐ কাডাটা ছাড্যে গেলে পইসা জুটে না,
হায় রে পইলাম, কি যাতনা,
তোডা খুল্যে লাগ্যে গেল টাকাটা,
আমি থাকি মজলিশে বসে
ঘরের গিন্নী কাজ দেখে না মনের আলিসে,
খাঁয়ে দাঁয়ে বসে থাকে
বাগাল শালা বড ঠেঁটা।
দ্বিজ গদাধর বলে,
পুরুষ হইয়েঁ ঘরের কাজ কি
সব সময় দেখা চলে,
হায়রে পাইলম কি যাতনা ,
তোডা খুল্যে লাগ্যে গেল টাকাটা।

॥ পীতাম্বর দাস ॥

॥ ১ ॥

পোডারমুখী কলঙ্কিনী রাই গো
তোর মত কুল-মজানী গোকুলেতে নাই লো ॥
যমুনায় জল আনতে গেলে, রসের খেলা কদম তলে। হায় লো

১ পুং মোষ, ২ খিল, হুড়কো, ৩ বেড়া, ৪ খন্দ, শস্য।

দেখে এসে লোকে বলে, সকল শুনতে পাইলো
খাওয়াইয়ে পাগলা গুঁড়া, পতিকে করেছিস্ ভেড়া। তুই লো।
দাদার মুখে নাইকো সাড়া, বুক বেড়েছে তাই লো॥
ওলো রাধে রাজার মেয়ে, ভুলে গেলি রাখাল পেয়ে। ছি লো।
খাসা দইকে ফেলে দিযে কাপাস খেলি তুই লো॥
আ মরি কি রূপের ছটা, কয়লা হতেও ময়লা সেটা। হায় লো।
তার সঙ্গে তোর প্রেমেব ঘটা, লাজে মরে যাই লো।
আঁকা বাঁকা অঙ্গখানা, ভঙ্গী দেখে যম ছোঁয় না। হায় লো।
দাস পীতাম্বব সেই সাধনা কবিছে সদাই লো।

॥ ২ ॥

(কৃষ্ণের উক্তি)

চম্পকেব হাব পবাইলি কেনে।
চম্পক ববনী বাধা উদয় হলো মনে।
মালা গেঁথে অন্যফুলে, কেন ভাই না দিলি গলে, (সুবল বে)
চাঁপাব ফুলে হিয়া জ্বলে, যাতনা হয় প্রাণে।
ওরে সুবল, কি করিলি, বিষম বিপদ ঘটাইলি,
বিরহানল জ্বেলে দিলি, বাঁচিব কেমনে।
বিনে প্রাণাধিকাব সঙ্গ জীবন-লীলা হবে সাঙ্গ, (সুবল রে)
থব থব কাঁপে অঙ্গ অনঙ্গেবি বাণে।
দাস পীতাম্বরে লয়ে সাথে, যা বে সুবল জাবটেতে (ভাই রে)
রক্ষা কর ভাই, বিপিনেতে কিশোরী মিলনে।

॥ ৩ ॥

(সুবলের উক্তি)

ওরে কানাই, বন মাঝে রাধা কোথা পাই
গাছের ফল নয় যে তোবে তুলে দোব ভাই।
অসঙ্গত কথা শুনে, বড় দুঃখ হয় রে মনে।
কুলবধূ দিনমানে, কেমনে মিলাই।
জটিলা কুটিলার কাছে, রাধা আনবার বাধা আছে,
সেখানে যাবো মিছে, আসবে না তোর রাই।

চম্পকের মালা পরে অধৈর্য ভাই একেবারে
ত্রিভঙ্গ তোর রঙ্গ হেবে, প্রাণেতে ডরাই।
রজনীতে কুঞ্জমাঝে, মিলাইব সময় বুঝে
দাস পীতাম্বর সেবা-কাজে থাকিবে সদাই।

॥ ৪ ॥

(বেশ-বদল)

হায়রে ভাবে যাইরে বলিহারি।
সুবল-বেশে কৃষ্ণ-পাশে চলিল কিশোরী।
আজড়িয়ে নীল শাটি কটিতে বাঁধিল ধটী (হায় রে)
বেণী খুলে উভঝুঁটি, বাধে যতন করি।
পীনোন্নত পয়োধরে, গোপন করিবার তরে, (হায় রে)
বাহু দিলেক বক্ষ পরে, ধরিল বাছুরী।
রাই সুবলে একই বর্ণ, অবয়ব নাহি ভিন্ন (হায় রে)
নয়ান বয়ান সমান চিহ্ন, পৃথক বলিতে নারি।
রাধার বেশ করিয়ে ধারণ, গৃহে সুবল রহিল এখন
পীতাম্বর যেন অন্তে হেরে ঐ মাধুরী।

॥ ক্ষ্যাপা

॥ ১ ॥

কৃষ্ণ প্রেম গোপনে রাখ রাই
হস না উতলা। (রঙ্)
আমি নয়ন দিলাম শ্রী যমুনায়
মন করলাম কদম তলায়,
হসনা উতলা।
দিবানিশি বসে কাঁদিস বিরলে
কাল চিনবে না গো তোরে ব্রজমণ্ডলে
নিজ হাতে তুলে নিলি দারুণ কলংক ডালা।
হসনা উতলা।
এমনি তোরে মিলাব ছলে
সমুদ্রেতে থাকবি ধনি, ভিজবি না জলে

ওগো ক্ষ্যাপার কথা না যায় যেন
পাপ ননদী কুটিলা।
হস না উতলা।

॥ সৃষ্টিধর ॥ ॥ ১ ॥

শুন গো ধনি বলি তোরে ভুলিলে কি একেবারে
মম মনে জাগে নিরন্তর গো—
তব হৃদে কঠিন কঠোর। (বও)
মম প্রাণে দুঃখ দিয়া পাষাণে বাঁধিল হিয়া
প্রেম করে ধরিলে পাথর গো।
তব হৃদে কঠিন কঠোর ॥
আগে করি অপমান নিজে তুমি কৈলে মান
কথা কইলে হও নিরুত্তর গো,—
তব হৃদে কঠিন কঠোর ॥
সিষ্টিধরে[১] দিহ[২] দুঃখ ফিরে না চাহিলে মুখ
পাঠাইলে দেশ দেশান্তর গো,
তব হৃদে কঠিন কঠোর।

॥ কালিপ্রসন্ন সিংহদেব ॥ ॥ ১ ॥

বৃন্দা কহে বনমালী, আমি ব্রজে যাই চলি
থাক বঁধু মধু খাও, মধুপুরে হে
থাক বঁধু (বও)
যেমন কন্যা তেন বর মিলায়েছে সৃষ্টিধর
কুবজী পেয়ে বঁধু ত্যজ শ্রীমতীরে,
কুবজী পেয়ে—
কুবজা কহে আঁখি ঠারি এবা হয় কোন নারী
বৃন্দা নাম হরি কহেন সাদরে হে,
বৃন্দা • ম—
এত বলি বৃন্দাদূতী ব্রজে গেল শীঘ্রগতি
হৃদি মাঝে পারে বাধা সে নাগরে গো,
হৃদি মাঝে—

১ সৃষ্টিধরে ২ দিও।

ভণে শ্রী কালিপ্রসন্ন শুনি রাধা শান্ত হন
হৃদি মাঝে ভাবে ত্রিভঙ্গ ঠাকুরে—
হৃদি মাঝে।

॥ ভিক্ষাম্বর

মোহে বংশীরবে চমকিত সবে,—
ব্রজাঙ্গনা শুনি চাহিছেরে সব
হৃদয়ে ভাবিয়ে মাধব।
মুরলী বাজিছে হৃদয় গাজিছে[1]
বল কেমনেতে বাঁচিব রে সব—
হৃদয়ে ভাবিয়ে মাধব
থির নহে অঙ্গ দহিছে অনঙ্গ
বিনে শ্যাম অঙ্গ পরশিব সব—
হৃদয়ে ভাবিয়ে মাধব।
শ্যাম বিনে প্রাণ—
নহে পরিত্রাণ,
ভূপ ভিক্ষাম্বর বলিছে রে সব—
হৃদয়ে ভাবিয়ে মাধব।

॥ ধনপতি সিংহদেব।

॥ ১ ॥

ঐ নাম ফিরে ফিরে বল
শুনে মন মানে না গো।
পাখিরে ঐ মধুর নামে
কুলবতীর কুল টানে—
কানের ভিতর প্রবেশিয়া মন করে বিকল।
এমনি নামের মহিমা, যমুনা বয় উজানা—
ঐ নামের গুণে ছিদ্রকুম্ভে এনেছিল জল ॥

১ গর্জিছে—ব্যাকুল হচ্ছে।

কত পাপী তাপী ঐ নাম করে
অবহেলে গেছে তবে,
সখী দে না আমায় ঐ নাম শিখায়ে,
পাব হই ভব সাগর অতল।
ধনপতিব এই মিনতি থাকে যেন নামে মতি
অন্তিম কালে বলে যাই যেন হবি হবি বোল।

॥ ২ ॥

কেন থেকে থেকে বাঁশি আমায় ডাকে
আমি ছাড়া কি তাব কেউ নেই-কো। গোকুলে
যাও গো সহচবী যমুনাব কূলে,—
বাবণ কবে দে তাবে আব না ডাকে—।
দাঁ। ক্ষণ ননদী সদা বহে জানি—
(আমাব) পবাণ ব্যাকুল বাঁশীব ডাকে।
মন প্রাণ সদা ঐ চবণে বাঁধা
ধনপতিব আশা যুগল হেবিতে।

ও বাবা পীতাম্বব কনট্রোলে কি হলে দিগাম্বব,[1]
এখন কাপড ছেডে তাই পবেছ গন্ধযুক্ত বাঘাম্বব।
তেলেব কনট্রোলেব জন্য বুঝি হলে জটাধব[2]।
তাই তো হয়েছে তোমাব ছাই মাখা কলেবব।
ওহে সূতাব কনট্রোলেব জন্য খালি ববেছ কোমব,
দডিব অভাবে কি তাই ধব বিষধব।
এখন মা লক্ষ্মী কনট্রোলেব জন্য অন্ন ছেডেছে শ্রীধব,
তাই অন্ন ব্যঞ্জন ছেডে জলে ভরালে উদব।
এখন তুমিই নিজে নিজেব কনট্রোল কবেছ সৃষ্টিধব-
বাজেশ্ববী মায়েবও কি ছাডাবে অম্বব।
বিশ্বেব নিয়ন্তা তুমি হলে কনট্রোলে কাতব—
ধনপতি হরিপদ ভাবে তাই নিবন্তব।

১ দিগম্বর। ২ জটাধর।

॥ বিষ্ণুপদ দাস ॥

॥ ১ ॥

ও সই কই এল ভালোবাসা, (বঙ্)
ঐ দেখ আগত নবীন উষা গো
ও সই কই এল ভালোবাসা।
শ্যাম আসিবে দিলি আশা গো।
ও তাই ত্যজি গুরু জনা কুঞ্জে করি থানা
জেগে রইলাম সারা নিশা গো।—
ও সই কই এল ভালোবাসা।
নিঝুমের রাতি গত হল দূতী
আর আছে কিবা আশা গো।
ঐ দেখ প্রদীপের পারা নভে শুকতারা
দিতেছে মোরে নিরাশা গো।।
ঘুঘু পিকরবে নাশিল গরবে
ফুরাইল শ্যামের আশা গো।
ওই শুন জেগেছে বিহঙ্গ প্রভাতী প্রসঙ্গ
প্রকাশিছে নিজ ভাষা গো—
ও সই কই এল ভালোবাস।
ঐ দেখ সখী পূরুবে নিরখি
দিবাকর সুপ্রকাশা গো—
ওই দেখ প্রফুল্ল নলিনী ম্লান কুমুদিনী
চকোরিণীর উড়ে দিশা গো।
বৃথা রাতি জালা বনফুল মালা
বৃথা সে চন্দন ঘসা গো।
বৃথা হল হেনা ফুলের বিছানা—
বৃথা হল কুঞ্জে আসা গো।
মুখে মাত্র সুধা অন্তরেতে দ্বিধা
কু-জনার ভালোবাসা গো,
এই বাসর রচিত উপাদান যত
সর্ব একত্রেতে মিশা গো।

বিষ্ণুদাসে ভণে, পাছে লোকে জানে
শীঘ্র যমুনাতে ভাসা গো—
ও সই কই এল ভালোবাসা।

॥ ২ ॥

তুমি ধন্য সে নারী—
ছি ছি কি করিলে কামে মাতি গো— (বঙ্)
পিরিতিকে সার করিলে এবার
ইহাতে যে যাবে জাতি গো।—
নবসঙ্গ ধরে উপপতি করে
ভুললে কোলের পতি গো।—
ছি ছি কি করিলে কামে মাতি।
ছাড়িলে আচার না কর বিচার
ধর্মাচারে নাহি মতি গো—
অসম্পর্কে[1] তোরা পড়েছিলি ধরা
ভুবন ভরা অখ্যাতি গো।
গ্রাম্য আলাপনা করিয়ে ছলনা
আমোদে ভরালে ছাতি গো,
বিষ্ণুদাসে ভণে নাগরের সনে কেমনে পোহালে
রাতি গো—
ছি ছি কি করিলে কামে মাতি।

॥ ভোলানাথ

॥ ১ ॥

মাইরি সরসে খাঁটি,
দুনিয়াতে কেবল রূপচাঁদ টাকাটি। (বঙ্)
টাকা নৈলে সকল ফাঁকা রে—
চলে না কারো দিনটি—। (বঙ্)
এই টাকা হতে ভবের খেলা খেলে জগৎ সংসারটি।

১। অসম্পর্কিত ব্যবহার কালে

পৃথিবী গোলাকার রে—
গোলাকার তাই টাকাটি। (রঙ্)
টাকায় ধর্ম টাকায় কর্ম বাণিজ্য ব্যবসাটি,
টাকায় রাজ্য টাকায় বাজাবে ধনী মানী পণ্ডিতটি,
দেখ টাকা নৈলে হয় না কোন তীর্থ ধর্ম কর্মটি। (রঙ্)
টাকার বাজনা শুনতে ভালো রে
ঠুং ঠাং তার শব্দটি,
দেখ টাকার জন্য দিনে রেতে লোকে করে ছুটাছুটি—
টাকায় নাচায় টাকায় ফাঁসায় রে—
ভাসায় কারো ঘর বাটি। (রঙ্)
এই টাকা বিনে সংসার একেবারে সকল মাটি— (রঙ্)
টাকার নাম রেখেছে যেবা রে জানিলাম রসিক সেটি—
সোজা হলে ভালো, উল্টাইলে নাশে আবার জীবনটি—।
(রঙ্)
দ্বিজ ভোলানাথে বলে, ভুল না মন মায়া জালে—
নৈলে যাবে সারা জীবনটি—
মাইরি সরসে খাঁটি
দুনিয়াতে কেবল রূপচাঁদ টাকাটি।

২। ভণিতাহীন সাধারণ ঝুমুর

॥ ১ ॥

খালভরায়[১] হামকে[২] সাঁতাছে[৩] গে
নদীভরায় হামকে সাঁতাছে।
খাচ্ছে দাচ্ছে মক মকাছে[৪]
নিতই[৫] পরের ঘরে শুছে।
ও সে, কতই মজা পাছে হে। (রঙ্)
যেদিন করি ঝাল ঝোল
সেদিন করে গণ্ডগোল

১ খাল ভরা, নদীভরা = মৃত (গালাগালি অর্থে ব্যবহৃত) ২ আমাকে
৩ যন্ত্রণা দিচ্ছে। ৪ মক মক করছে, চাল দেখাচ্ছে, ৫ নিত্য, কুলায়,

কুলাই[১] নাহে পাঁচসেরের মাছে হে ॥ (বড়্)
রাগের মাথায় ধরে ঠেঙ্গা,
বলে,—করা চাই সাঁঘা[২]
ওসে ঠেঙ্গা ধরে বাঙ্গা চোখে নাচে হে । (বড়্)
দেখব তার কত জোর
চল্যে যাব বাপের ঘর
খালভরার হাঁড়ি টাঙ্গাক গাছে হে । (বড়্)

॥ ২ ॥

পর পিরিতি শুনতে গো ভালো
পিরিত করে আমার কুল গেল,
এখন আমি ভাবছি মনে মনে ।
কি বলিব পিরিতির কথা—
আমি মরছি মনস্তাপে । (ঘোষা)
আজ যে দুঃখে দিন গেছে
ও সই বলব কার কাছে । (ঘোষা)
খুঁজি শ্যামকে বনে বনে
পাইনা শ্যামকে দরশনে
আমি খুঁজব বনে বনে
শ্যামকে দেখা পা'লে বন্ধু
ধরবো দু চরণে ।
বাজারে বাজারে যাবো
কোন্ বাজারে পিরিত পাব ।
নিক্তি ধরে চুক্তি করে
পিরিত নেব ওজন করে
সুখের জন্য প্রেম করিয়ে আমার জনম গেল দুঃখে ।

॥ ৩ ॥

শিশুকালে ছিলাম ভালো ধরণী ধরিয়ে,
এরে শ্যামকে বাহির করে কুলে কালি দিলে—
কাজ নাই পিরিতে সই গো, কাজ নাই পিরিতে—
বুঝাই সুঝাই[৩] পাঠাই[৪] দে গো পথে নিব কোলে ।

---

১ কুলায় ২ দ্বিতীয় বার বিবাহ করা ৩ বুঝিয়ে সুঝিয়ে ৪ পাঠিয়ে

॥ ৪ ॥

দাও হে দোকানী। (বঙ্)

অনেক জিনিষ নিব পয়সা পয়সা দাম দিব
হিসাবে পইসা[১] নিবে গনি,
হয়ে তুমি সাবধান শুন আগে পাত্যে কান
অন্য মন না কব আপনি—
হিসাবে পইসা নিবে গনি।
নাবিকেল সাঁচি[২]তেল, লাল সাদা মাটিতেল[৩]
নিমতেল, কুসুম[৪], কচড়া,[৫]—
লইব ফুলাম তেল[৬], ওজনে না কব ভেল[৭]
লইব বাদাম বেডি জাডা[৮]।
নিমকাদি[৯] সব লিব উচিতেতে দাম দিব
সুঝি[১০] আটা দাও হে চা চিনি
বিস্কুট তালমিছবি ঘৃত মধু পানসুপাবি—
বিলম[১১] না করুন আপনি—
দাও হে দোকানী।

॥ ৫ ॥

যখন আমি ঘবেব কোণে
তখন বাঁশি বাজে কানে
সখী বল ভাই কবি কি উপায়।
বাঁশিব তানে প্রাণ না দাডায।
যখন আমি বাঁধতে বসি
তখন কানেব গোডায বাজে বাঁশি-
যখন আমি জল ঘাটি
তখন বাঁশি বাজে আমাব অন্তবে,
সখী, বল ভাই করি কি উপায়।

১ পয়সা ২ সরষে তেল ৩ কেরোসিন তেল ৪ কুসুম বীজের তেল ৫ মহুয়া বীজের তেল ৬ সুগন্ধি তেল ৭ ভেজাল, [কারসাজী] ৮ রেড়ি তেল ৯ নুন ইত্যাদি ১০ সুজি ১১ বিলম্ব

॥ ৩ ॥ নাচ্‌নী নাচের ঝুমুর

॥ ১ ॥

জ্যোস্না রাতে কাচা কাপড
ধনি সময় বুঝে আসবে—
যদি পিরিত করবে
যদি পিবিত রাখবে—

॥ ২ ॥

একটি পানেব ষোলটি খিলি
[illegible] নব বঁধু পানেব খিলি।
হাতে দিলাম পান
তবু নিলে না,
মুখে দিলাম পান
তবু খেলে না—
শিশু দেখে আমাব মনে ধবে না
ডাগব হলে হে আমি কাক সঙ্গে শুব না।

॥ ৩ ॥

যথন ফুলটি কলি ছিল
তখন ভমব এল গেল
এখন কেন চাইবে হে ভমর—
আমাব স্থখেব সময গেছে।

॥ ৪ ॥

বর্ধমানের পাকা পান বংখ[১] যায় খসিয়ে
তোমা বিনে প্রাণনাথ আমার অন্তর কাঁদিছে
যাও সখী মধুপুরে—
শ্যামকে আনিবে বুঝায়ে।

১ বোঁটা

॥ ৫ ॥

পায়ে আলতা গায়ে শাড়ী
আঁচলেতে চাবিখাড়ি
কাঁখেতে গাগরি সাজেছে,
কেমন বিধাতা তোকে গড়্যেছে।

॥ ৬ ॥

ঠিক তুপুর বেলা হ'ল
গৌরী সিনানে গেল,
অঙ্গ মাজিতে হ'ল বেলা।
পথ ছাড় কালা—
গাল দিবে শাশুড়ী অবলা।

॥ ৭ ॥

সকালবেলা চাঁদ উঠেছে,
ওগো চাঁদ বঠে কি গৌর বঠে,
ও ললিতে চিনতে নারি
ওগো চিনহাই[১] দেগো
বংশীধারীকে।

॥ ৮ ॥

হাঁড়ি ভাঙ্‌লে হয় খপরা[২]
মন ভাঙলে হয় চপরা।
আর না যাব ঐ কদম তলা,
পথ ছাড় কালা।

॥ ৯ ॥

খুলখুল বাতাস বহে ও তোর গুলাব-বাগানে—
(ও তোর) ঝুমরিয়া দাদার মন ভুলার জোড়া-পানখিলিতে।

১ চিনিয়ে ২ মাটির পাত্রের ভাঙা টুকরো

॥ ১০ ॥

আস্যেছি রাস্তা ভুলে
ওগো বস্যে আছি নদীব কূলে,
এ কূল ও কূল দুকূল নদী
বান দেখে উড়িল পবাণ।
কাছে নাই হে কড়ি
পাব কব হবি,
আমি কি কব্যে হইব পাব—
বান দেখে উড়িল পবাণ।

॥ নাচনী নাচের ঝুমুরের 'রঙ' ॥

॥ ১ ॥

এক মণ মাছ মাব্যেছি গোপেব গড়াতে[১]
ও সেখানে আব কেউ না আসে।
খায়ে গেল গো সকল বাত-চবাতে[২]।

॥ ২ ॥

নাচতে ত জান না টেনে আন্যেছে
ও, খাল-ভবি বে
লাচবো[৩] তোব ছাইলা[৪] কোলে লে।

॥ ৩ ॥

এক ছেদামেব কুলুপ খাড়ি
লিয়ে যাবো দিগাম্বব
হেলে দুলে আসছে তোব লাগব।

॥ ৪ ॥

খবিস সাপেব ফেণা[৫]
ও তুই ছুঁই দে না,
ঘব বিকি[৬] বাড়ী বিকি গো
তোকে দিব গয়না।

১ গোড়াতে, ২ রাতচরা পাখি, ৩ নাচবো, ৪ ছেলে, ৫ ফণা, ৬ বিক্রয় করে

॥ ৫ ॥

বাড়ী নাময়[১] লীল[২] বুনেছি
লীলে স্বটি[৩] ধরে না—
লাচ্‌নী দিদি চাঁদবদনী
লীল সাড়ী বই পবে না।

৪। দাঁড় ঝুমুর : (দাঁড়, দাঁড়শালিয়া, দাঁড়শাল, পাঁতাশালিয়া, পাঁতা, দেঁউড়া)

১। ছুটুমুটু[৪] মবিচ গাছটি কতই যতন কববো.
লীলমনি স্নবধনী তোকেই সাঁঘা কববো।

২। আমাব বঁধু বাত কানা বাড়ীব পথে আনাগোন।
সিটিক[৫] জলে বঁধুব ভিজিল গামছা।

৩। এক ডুভা[৬] বাসি মাড তলায় ছুটি ভাত হে,
সেহ[৭] দেখে বহু কাঁদয়[৮] সাবা বাত হে।

৪। ভাদব মাসে আইলে বঁধু কি খা'তে দিব হে,
তালপাকা গাদব[৯] জনাব[১০] আব গায়া[১১] ঘি হে।

৫। আষাঢ় শেবাবণ মাসে ছেল্যাব হাতে ঘুঘি[১২] হে
কি মাছ ধবিলি ছেল্যা শুধু গডইটুনি[১৩] হে।

৬। যাব ঘবে ননদ নাই তাব বড মঝা[১৪] হে,
ক্ষনেক তাতা[১৫] ক্ষনেক বাসি ক্ষনেক চাল সিঝা[১৬] হে।

৭। এক খাপবী পুঁটি মাছ কি দিযে বাঁধিব হে,
বাগাল বঁধু মবে গেলে কি বলে কাঁদিব হে।

৮। যাব ঘবে ছেল্যা নাই তাব মন কেমন কবে হে,
ডাবাক ডুবুক ছেলায মুতেই কাদা কবে হে।

৯। শালগাছে শালপংডা[১৭] খেজুব গাছে ঝুবি হে,
বঁধুব গায়ে লাল গামছা চটক দেখে মবি হে।

---

১ নীচে, ২ নীল, ৩ শুঁটি, ৪ ছোট (আদরার্থে ছুটুমুটু) ৫ অল্প, ৬ পাথরেব বাটি, ৭ সেই, তা, ৮ কাঁদে, ৯ পুষ্ট, ১০ মকাই, ১১ গাওয়া ১২ এক ধরনের জাল, ১৩ ছোট ছোট গড়ুই মাছ, ১৪ মজা, ১৫ গরম, ১৬ সিদ্ধ, ১৭ শালকোঁড়া

১০। ডিংলা[১] ধরেছে জালিজালি,
কুলিব লোকে কবে ভালাভালি[২]।

১১। কাশীপুবেব হাটে পাথর বসা চুড়ি হে
দেখে মন টল্যে গেল, নাই লিযে দিলি হে।

১২ ডিংলাতে দিয়েছি সপয়বা[৩],
বাগাই গেল গো তোদেব জামাই চেঁদবা।[৪]

১৩ ছুটুমুটু সায়েবটি[৫] লবংলতায ঘেবা হে
ডুব দিতে বিলম[৬] হইল পড়ে বইল বাসা হে।

১৪। আদাড়ে বাদাড়ে[৭] ঝিঙ্গা ঝিঙ্গায় শুধু জালি হে
ননদমাগী ছলছল, তুলে ডালি ডালি হে।

১৫। ই বন কাটি উ বন কাটি কাটি বনেব ধ্বজা হে,
কোন বনে হার্বাই আলি সনা[৮] বানা ছাং। হে।

১৬। বিহালা[৯] পুরুষ হইত আগু আগু[১০] নিয়ে যাইত
সাঘালা[১১] পুরুষেব মুখে ছাই, ছিঁড়া পাপড়ে নিয়া যায়।

১৭। বাধ বাধালে বঁধু না বানালে ঘাট হে
ডালিম লাগাই বধু গেলে পবদেশ হে।

১৮ পাকিল ফাটিল ডালিম চোবে তুলে খায হে,
এমন সময়ে বঁধু ঘবে আমাব নাই হে।

১৯। দে না[১২] গো চুনটুকু দে না গো তামুকটুকু
থাম বাবু থাম,
বেবেবেতে তেবে নেতে তেনে থেপে কাম।[১৩]

২০। হাতে লিব বুদিটি[১৪], কাঁধে লিব কদালটি[১৫]
টিক্‌মলাই[১৬] বনাই[১৭] লিব চুটিটি[১৮]
লহকে[১৯] ধবিব আড়[২০]ডটি

১ কুমড়ো, ২ দেখাদেখি, ৩ লংকা (স্বর্পাবক), ৪ চ্যাংড়া, ৫ পুকুর, ৬ বিলম্ব, ৭ বেড়া. ৮ সোনা, ৯ যে বিবাহ করেছে, ১০ আগে আগে, ১১ যে সাঙ্গা কবেছে, পূর্বে বিবাহিতা কোন নারীকে বিবাহ করেছে। ১২ দে-না, ১৩ অর্থহীন শব্দসমষ্টি ১৪ আগুন রাখাব জন্য খড়ের তৈবী বিঁড়ে, ১৫ কোদাল, ১৬ হাতে পাকিয়ে, ১৭ বানিয়ে, ১৮ শালপাতার তৈরী বিড়ি, ১৯ মুহূর্তে, ২০ আড় ধবা=ক্ষেতের আল ধরা

২১। মাছ ধবি খালাখালা[১], পলাশপাতেব খালা হে,
নদীয়ে পডিল বান বেসাতীব জ্বালাহে।

২২ কুলি-মুডায়[২] টানাটানি,
ছাড লোহা দিব আমি[৩]
খালভবাব এত মনে ছিল
জুয়ান[৪] বয়সে দাগা দিল।

২৩। বাসি ভাতে নুন লংকা লুচিব মজা পুবি হে,
নূতন পিবিতিব মজা চোখ ঠাবাঠাবি হে।

২৪ ববাবাজাবেব ইদদাদা চাকলতডেব ছাতা বে
কাশীপুবেব দুর্গাপূজা, জযপুবেব বাস হে।

২৫। আম ধবে থপাথপা[৫] তেতুল ধবে বাঁকা হে
পূব দেশে যাঁযে দেখ বাঁডীব[৬] হাতে শাখা হে।

২৬ আকবাডীব[৭] শিয়াল বাজা বনেব বাজা বাঘ হে,
বিহাঘবে[৮] মাযা[৯] বাজা, সমান সমান ভাগ হে।

২৭। ছট্‌মুট্‌ পাহখটি[১০] হলুদ বনে চবে হে,
কন[১১] খালভবায বিঁধে দিল কহব কহব[১২] কবে হে

২৮ ধানবাড়ীব পাহাডে বাঘেব বড বাগ হে
আন দেউবা[১৩] ঝাক তবাল[১৪] কাটি বনেব বাঘ হে

২৯। তুই নাকি লো বড ডাঙ্গা[১৫] মানভূঁয়ে দিব সাঘ —
ভালো ঘবে সতীন উপবে খাটাবো লো।

৩০। ভাদব মাসেব গাদব জনাব আডে বসে খাব হে
যে আসবেক ছাতা ফুটাই তাব সঙ্গে যাব হে।

৩১। পডিল ভাদব মাস পিযা নাই ঘবে হে,
লাগডা নিশান বাজে চমকিত হিযা হে।

৩২। বড তলাব হাঁডি কুঁডি কুডচি বনেব কাঠ বে,
এখনি বাঁধিব বাঁধা খাঁয়ে লিবি ভাত বে।

৩৩। লোকে বলে ছি ছি
আমি বা কবেছি কি,

১ শালপাতার তৈরী পাত্র, ২ রাস্তার মাথায়, ৩ ছাড় হাতের নোয়া খুলে ফেলবো, ৪ জোয়ান, ৫ থোকাথোকা, ৬ বিধবা, ৭ আখক্ষেত, ৮ বিয়েবাড়ীতে, ৯ মেয়ে, ১০ পাখি ১১ কোন্, ১২ কাতর চীৎকার, ১৩ দেবর, ১৪ তরোয়াল, ১৫ দজ্জাল,

হাতে শাঁখা নাকে নথ পরেছি,
বিহালা পুকুর ছাড়েছি।

৩৪। আম বাগানের লোক তুমি পুহা[১] বাগানে যাও হে,
গরা[২] গায়ে ঘাম পড়ে কে ছাতা ধরবে হে।

৩৫ ইঁদ দেখতে গেলি দাদা ইঁদের বড় রাগ রে—
ডেগে ডেগে পঞ্চবেগে উঠলো রাজার ইঁদ রে।

৩৬ চোত বৈশাখ মাসে ফুটিল পলাশ গে[৩],
চুহি চুহি[৪] দিদি করল গরাস গে।

৩৭ পান খাইলে ন্নী[৫] মুখ ভেল লাল গে,
মিশি লাগালে ন্নী দেখায় চমৎকার গে।

৩৮ যখন জামাই আবারাটে তখন বিটি পুকুরঘাটে
জামাই দেখে বিটির মাথাদুখা[৬] জর গে
জামাই দেখে।

৩৯ কুলি কুলি যাতে হিনি, বাঁশিটি বাজায়ে দিলি
সোরা নাকি বড়ই মনচোরা,
দু পানে দু-কদম ফুলে ভরা।

৪০ চাকুলিয়ার হাটে যাব, বাছ্যে বাছ্যে চুড়ি লিব
কালো চুড়ি ছেঁচিয়ে ভাঙ্গিব
কালোরূপ আর না হেরিব।

৪১ আমগাছে আম নাই ঢিল কেন ছুড় হে
তোমার দেশের আমি নই, আঁখি কেন ঠার হে।

৪২ বাঘ মুড়ির পাহাড়ে নানা রংয়ের ফুল ফুটে
দিদিলো, দাঁড়ায়ে তুলিতে মন করে।

৪৩। ঘরের শোভা আঁচির পাঁচির ক্ষেতের শোভা ধান রে,
হোক আমার ছেলে জামাই যেমন কচি চাঁদ রে।

৪৪ যার হাতে কালো চুড়ি
সেই বঠে চেল্যার খুড়ি,
বলে দিবে সেঁবাকে[৭]
কাঁসাই নদীতে বান পড়েছে।

---

১ চারা ২ গৌরবর্ণ ৩ গো, ৪ চুঁয়ে চুঁয়ে, ৫ ছোট মেয়ে, ৬ মাথায় ব্যথা সহ,
৭ সথাকে

৪৫। পাহাড়ের লাল জল নদীএ নামিল রে,
লাউড্যাদের[১] মরণ হল নৌকা ভাসিল রে।

৪৬ বঁধু আসিবে বলে, কপাট না দিলম ঘরে
বঁধু হে এত রাত কেনে,
পথের মাঝে কিবা হল জানিব কেমনে।

৪৭। ছেল্যায় খুঁজে মাছ মাছ কুথায় পাব মাগুর মাছ,
দাজং[২] দেখে ঝাঁপ দিব দামোদরে হে।

৪৮ চারকুন্যা সায়েবটি নানা পাখের বাসা হে।
উড়ে গেল পংখরাজ পড়ে রইল বাসা হে॥

৪৯। গেলছিলম জিতুজুড়ি দেখ্যে আইলম বুঢ়া ভেড়ী,
মার[৩] ভেড়ী বল্যে দিবি ভেড়াকে—
কালীপূজায় কাটবেক তুমাকে।

৫০ বলরামপুরের হাটে ঝিলিরবসা শাড়ী হে।
দেখ্যে মন টল্যে গেল নাই কিন্থে দিলি হে॥

৫১। আদাড়ে বাদাড়ে সাপ সাপে আতুর ছাড়ে হে।
সাপের গায়ে পা পড়লে, বুক ধড়ফড় করে হে॥

৫২। শুকনা বাগনের থাড়া[৪] তুই নাকি রে বৌ ছাড়া,
বৌ ছাড়া নামটি তোর গেল না।
ফুঁকিলে আগুন জ্বলে না।

৫৩ নদী নদী যাইও না, সোনার চড়া ছুইও না।
বঁধু হে, পাতপচা ঝরনার জল খাইও না।

৫৪। জুড়গুঁড়ার বনে ভয় লাগে প্রাণে
মন কি মানে আমার নূতন যৌবনে গো।
কাড়া গেল গাড়া[৫] ধার খায়্যে আইল কলাপাত—
বাবুর বাপ বাবুর বাপ, ছেল্যা তুটির বিহা দিয়া যাব্।

৫৬। অযোধ্যার পাহাড়ে পাখ বসে পাথরে।
অনাহারে ও পাখ মরে আছে পাথরে।

৫৭। ও ঝিঙা-ফুল মনে রাখিও।
জলকে যাবার বেলা ডাকিও।

---

১ নাবিকদের ২ দহ ৩ অর্থহীন আলংকারিক প্রয়োগ, ৪ শুকনো বেগুন গাছের মত চেহারা, রোগা, ৫ নদী

৫৮ ছুটুমুটু[১] খাসিটি বুঢ়া ভাঁড়ে তেল হে
মানে মানে বুঢ়ায় সাঁঘা[২] করি গেল্ হে।
৫৯। হাতে হাতে পান দিতে
দেখেছে কুলির[৩] লোকে,
চুন দিতে দেখেছে ভাসুরে—
সখী, আজ আমার কি আছে কপালে।
৬০ পাহাড় পর্বতে ঘর তায় আস্থেছে সাঁঘাল[৪] বর
বর দেখ্যে কন্যা বেযাকুল গো—
শাশুড়ী জামাইয়ে গোঁদাফুল।[৫]
৬১ বড়কলার হাড়িকুঁড়ি কুড়চি বনের কাঠ রে—।
এখানি রাধির বাবা খাযে পলি ভাত রে।
৬২ গাণ্ডয়ালি দাদা না [illegible] ওালি ঘিমা[৬] ধর
আর কি দেখাবি দাদা বাগুড়দার[৭] সীমা রে।
৬৩। কুলিমুড়ার ক্ষেত দাদা পলি [illegible] ভাখ্যালরে[৮]
উগাল-সামাল ক্ষেত দাদার খিল বন্দিল রে।[৯]
৬৪ মেঘ আন্ধার রাতি বিজলীর ছটা গো—
এমন সংকটের পথে কেনে আলি একা রে।
৬৫ সরু সরু কলমকাঠি সরু ধানের চাষ রে।
ঘরে শুতই মুতজ্বার,[১০] চোরে কাটে ধান রে।
৬৬। সিকি লয় আধুলি লয় গিরায় বাঁধ্যে রাখবো,
দেখা পাইলে শ্যামকে মনের কথা বলবো।
৬৭ শালুক নাড়ার[১১] কমরদড়ি[১২], হালবাহতে পড়ে মরি—
বেরুয়া[১৩] শালা জনমের কুড়ি[১৪], খেতে খুজে তেলসানা[১৫] মুড়ি
৬৮। শাগ তুলি টুপাটুপা[১৬] মাছ ধরি গটা[১৭] রে,
ননদ ভাউজ[১৮] দেখাদেখি করে কেন খোঁপারে।

১ ছোটখাটো, ২ দ্বিতীয়বার বিবাহ ৩ রাস্তার দ্বিতীয় পক্ষের বর ৫ শাশুড়ী-জামাইতে ফুল পাতানোর মত সম্পর্ক [বরের বয়স কন্যার বয়সের চেয়ে অনেক বেশী] ৬ গীমে শাক ৭ একটি গ্রামের নাম ৮ পলি মাটিতে ভরে গেছে ৯ ভালো জমি পতিত থেকে গেল ১০ মুখপোড়া ১১ ডাটা, ১২ কোমরের ঘুনসী, ১৩ জারজ, ১৪ কুঁড়ে, ১৫ তেলমাখা, ১৬ গোছা, ১৭ গোটা ১৮ ভাজ

৬৯। হাট গেলি বাজার গেলি, পিতল কাঁটা-ডোর লিলি,
লদী কিনারে বসি বঁড়সী ফেললি গো
লদীর মাছ ডাঙ্গাযে ফেলিলি।

৭০। তাল পাতের আগুর[১] টা হাডার-হুডুর করে রে—
এসে বঁধু ফিরে গেল, মন কেমন করে রে।

॥ ৫। 'করম' সম্পর্কিত ঝুমুর ॥

১। করম কাটিকুটি আখড়া থাপন করি—
গোপিনী সব করে একাদশী—
আজরে করম ভেল[২] রাতি।

২। করম কাটতে যাযাছিলি করম টলমল,
রাজার বেটী দুলালী টাঙ্গি ঝলমল।

৩। খলা[৩] চাঁছ রে দাদা মাচিযা[৪] বন রে—
আসিবেন করম রাজা, বসিবেন রে।

৪। ভাদর মাসের তিথি আজ একাদশী—
আজ সখী বহু উপবাসী।
জ্বালি দাও বাতি—
জ্বালিযে পুহাব বাতি—
আজরে করম ভেল রাতি।

৫। কাকে বুঝে দাদা করম গাড়লি
এ চুঁটা[৫] তামাকে নাই চিনলি
কাকে বুঝে করম গাড়লি।

৬। আজ তবে করম রাজা ঘরে তযারে
কাল তবে করম রাজা শাক নদীর ধারে।

৭। কোন্ঠিনে[৬] বাজে জড়াবে[৭] ধুম্শা,[৮] কোন্ঠিনে বাজে
করতাল,
করমতলে বাজে জড়াবে ধুম্শা, রাজাঘরে বাজে করতাল।

১ আগড়, ২ হ'ল, ৩ খামার, খোলা, ৪ দড়ি দিয়ে বোনা ছোট চারপাযা,
৫ শালপাতায় তৈরী বিড়ি, ৬ কোথায়, ৭ জোড়া, ৮ নাকাড়া, বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ

৮। ভাদর একাদশী নবনারী উপবাসী
বহুত করমকে উপাস যে।
নূতন বস্ত্র ডালা আঁকুয়া[1]-ত ফুল মালা
গন্ধ চন্দনকে সুবাস যে।
নব নব নবনারী ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালি
চঞ্চলা চলল উদাস যে—
গাঁয়ে করম রাজা যাইয়ে করিব পূজা
গিরিহা[2] ও আনন্দে উদাস যে।
৯। উঠ উঠ জাওরা[3] মন শুদ্ধ করগো
তোর তরে একদিন উপাস।
১০ আমপাতর ছায়া ছায়া চক্ষু দুটি অন্ধ হয়্যা
জাগর জাগায়ে রাত পুহার।
কৈ সে রে দিন ররার।

॥ ৬: টাঁড় ঝুমুর ॥

১। ভাঙ্গা ঘরে দুটা রামবাঘা আছে
ওলো, ছাগল ধরবার জন্যে
রামবাঘা রাত্রেতে আছে।
আটা রাররি হে ভালো করে
না হলে তোমাকে হে খাবে।
২। তোর ভাতারের এমনি বুদ্ধি
পিঁড়ায় তাঠি[4] দিয়ে শুয়ে রাতে
যে চুরি করে সে তার পালাই আসে
ও তার ধিক থাকে জীবনে।
৩। ওলো ওলো কালো ছুকরী—
তোর গায়ে কি বা আছে
আয়না খুলে দেখবি ছুকরী লো
চরা বকে চরে গেছে।

আকন্দ, ২ গৃহপতি, ৩ করম পূজা উপলক্ষে অংকুরিত শস্য, ৪ আগল

॥ ৭। ভাদুগান ॥

শুন ভালোবাসা
যেন চকবাজারে হয় দেখা
শুন ভালোবাসা— (বঙ্)[১]

১। ও মালতী গাঁথছিস মালা গাঁথা হবে অকারণ।
তোর প্রিয় আমার ঘরে ধুলায় পড়ে অচেতন ॥
২। কাশীপুরের একটি মিঠাই ভাঙ্গ্যে হল এর কাঁসা[২]।
এ মিঠাই কি দিবার বটে সঙ্গতিদের মনভুলা[৩] ॥
৩। রামের মায়ে রামকে মারে রাম কাঁদে ধুলায় পড়ে।
কাশীপুরের মহারাজ ধুলা ঝাড়্যে লেয় কোলে ॥
৪। কাশীপুরের মহারাজা সে করে ভাদুর পুজা।
সন্ধ্যা হলে ঝারল বাজে হাতে দেয় ফুলবাতাসা।
৫। কাশীপুর দেখে আইলম দালানে ধান ধুটেছে।
এমনি চাষায় চাষ কর‍্যেছে শিয়ালে ধান মাড়্যেছে ॥
৬। কাশীপুরে দেখে আইলম সোনার পিঞ্জরায় বাঘ বসে।
ই বাঘে কি মানুষ খায় গো, দেখবার শোভা বটে ॥
৭। বেড়োর ভাদু, বেড়োর ভাদু, বোড়োর ভাদু আনবো না।
বেড়োর ভাদু পান খাউনী একশ পানে কুলায় না ॥
৮। বেড়োর বাধে দেখে আইলম শিঙ্গি মাছের পহনা[৪]।
কি দিয়ে মাছ বাঁধবে ভাদু তেঁতুলের দাম চার আনা ॥
৯। আমার ভাদু আকুমারী[৫] আনগো কন্যা সাজাব।
আনগো বিন্দে কাজললাথা[৬] নয়নে কাজল দিব ॥
১০। ও ললিতে চাবুক হাতে, বিড়াল গেল গলিতে।
কাঁচা দুধের সর খেয়ে বিড়াল সুখ পালঙ্কে ঘুমাছে ॥
১১। বাড়ীর নামর কুয়া খুঁড়লম ঘটী ভরে জল খাব।
এমনি কুয়া বাদী হ'ল শালুক ফুল ফুটে গেল ॥

১ ('রঙ্গের' ছত্রগুলির সঙ্গে সাধারণত মূল গানের কোন সম্পর্ক থাকে না। টুসু গানে প্রচলিত 'রং' এবং টুসুগানের অধিকাংশই ভাদুগানে প্রযোজ্য। ২ কাঁসার থালা, ৩ মন ভোলানো, ৪ পোনা, ৫ কুমারী, ৬ কাজল লতা,

১২। লালায় লালায় জল যায় মা তাথে[1] ডুব্যে মরি গো।
ঝাঁপীর কাপড় বার কর মা দখিন দেশে যাব গো॥

১৩। এ পারে বাছুব বাঁধা ওপারে ধমলী গাই।
হামালে হামালে কাঁদে মায়ের প্রাণ কি ধরা যাই[2]॥

১৪ কাশীপুরের ভাঙ্গা পাল্‌কী রঘুনাথপুরে ঝালাব।
চারিধারে মশাল জ্বাল্যে বামহনভোজন করাব॥

১৫। সাহেব দিলেক নূতন সড়প বিবি দিলেক হাটতলা।
ভাদু দিলেক ফুলের বাগান হাওয়া-খাবার গাছতলা॥

১৬। কাশীপুরের মহারাজা সে ত দিছেন জকের ঘর।
তুই নাকি মুলুকের রাজা রাজ্য করে টলমল॥

১৭ মাথায় জটা ত্রিশূলকাঁটা পর রাম গাছের বাকল।
রাম সাজেছেন বনে যা'তে বাকল করে ঝলমল॥

১৮। রামের মা কৌশল্যারাণী লক্ষ্মণের মা সুমিত্রা।
তুই বহিনে বনে যায়েঁ ঘুরাই আনবো রামসীতা॥

১৯। আমায় ভাদুর বেড়োয় বিহা পঞ্চকোটে শ্বশুরঘর।
পুরুলিয়ায় বাজবাজনা আসানশোলে বাসরঘর॥

২০ বেড়ো বাঁধে বেড়ো বাঁধে বেড়ো বাঁধে কে তুমি।
শ্যাওড়াগাছে ডগ মেলেছে হরতকি তলায় আমি॥

২১। বনফুলের মালা দিয়ে ভাদুকে সাজাব।
ভাদুরাণী লিয়ে সাথে ইষ্টিশানে যাব॥

২২। ইষ্টিশানের লইতনবাবুর রাঙ্গাটুকটুক বন্ন।
তাকেই ভাদু বিহা করবে হীরার পাশে স্বন্ন॥

২৩। আমার ঘরকে ভাদু আইলেন কুথায় বসাব।
পিয়াল গাছের তলায় বেদী আসন সাজাব॥

২৪। ভাদুর লাগে সাধের মোয়া লাডু বেঁধেছি।
আঁচলভরা কড়কড়া আর কদমা রেখেছি॥

২৫। কি জ্বালা ধরিলি ভাদু
বল না প্রকাশ করে।
বল না প্রকাশ করে ভাদু বল না প্রকাশ করে।

১ তাতে, ২ যায়

তুমি যে মা রাজুবালা[১]
তুমার আবার কিসের জ্বালা
কিসের তবে প্রাণ উতলা
আকুলতা কিসের তরে।
ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস
কেন এত হা হুতাশ
করবে নাকি গৃহবাস
বল ভাদু মা আমারে।
মনের কথা মনে রেখে
নীরবে কাঁদ কি দুখে
উঠ কেন চমকে চম্‌কে
কোকিলের কুহু স্বরে।
বল ভাদু বল বল
কারেও কি বেসেছো ভালো
বিশু বলে চিকন কালো রইতে বুঝি দেয় না ঘরে।[২]

॥ ভাদুগান ॥

২৬। হীরা-জীরা মোতি-পুঁতির গহনা কুথাকে পাব।
খেল-কদম্ব চাঁপার মালা ভাদুরাণীর গলায় দিব ॥
তুলসী কাঠের মালা দিব গলায় চুড়ি ঘুনসী দিব—
ঝল্‌মিল ঝিলমিল শাড়ীর আঁচল—
ভাদুর রূপের পিদিম জ্বালিব ॥

২৭। দে এনে দেলো ভাদুরনকে এনে দে গো তোরা।
ভাদু বিনে বাঁচি না যে কেঁদ্যে হইলাম সারা ॥
স্বয়ংবরা হবে ভাদু, আসবে কত রাজকুমার।
বরমাল্য দিবে গলায় যাকে ইচ্ছা হবে তার ॥
সে সাধে কে বাদ সাধিল হল গৃহছাড়া।
রাজার ঐশ্বর্য ত্যজ্য করে একাকিনী গোপনে—
গেল ভাদু দেশান্তরে কি জানি কেনে অভিমানে।

১ রাজবালা। ২ এ ধরনের ভণিতাযুক্ত ভাদু গানের প্রচলন খুবই অল্প।

কুথা যাব কুথা পাব আমার নয়নতারা।
একটিমাত্র মেয়্যা আমার ঘরের বাছাধন।
ভাগ্যদোষে হারাইলাম মাণিক রতন॥
হায় কি হল কুথা যে গেল কাঁদে যে গো মায়ের প্রাণ।
বিকুর বানা বাদি-ও না বাণী——
ভাদু নি যাবে নি ঘর।।

২৮। দেখে যা লো তোরা।
ভাদু দেখে উঠিছি লো দিশেহারা।
রূপের ছটা মেঘঘটা লো, আলো ঘর আঁধার করা।
আননেতে বসে আছে ঠিক যেন পেঁচীর পারা॥
মুখের ছিরি আহা মরি লো শ্রাবণ মাসের মেঘ করা।
চোখ দুটা তার বেলের মতন ঠিক যেন আগুন পারা॥
নাকটায় যে ব্যাঙ বসেছে ঠোট দুটা উঁচু করা।
দেখেশুনে এমন ভাদু আনলি কেন সইয়েরা।
হাত পা সরু পেট মোটা লো
তাতে আবার গাল পোড়া।
বুঝি রোগে ভুগে ভাদুর তোদের হইছে লো এমন ধারা॥*

২৯। ভাইরে মনে মনে—
আমার ভাদুর রূপ দেখে জ্বলিস কেনে। (বঙ্)
আমার ভাদুর রূপটি তোদের লো
চোখে বল্ সইবে কেনে।
সূর্য্যের আলো দেখলে পেঁচা লুকায় গিয়ে ঘোর বনে।
তেমনি তোরা ভাদু বনে লো দেখতে নারলি নয়নে॥
তোদের ভাদু আমার ভাদু তফাৎ লো রাতে দিনে—।
আমার ভাদু স্বরগ শোভা, তোদের পাতাল ভুবনে॥
সত্যমিথ্যা দেখ না চেয়ে চোখ থাকিতে অন্ধ কেনে।
তোদের ভাদু অনামুখী লো ভেবে দেখ মনে মনে॥

* ভাদু মূর্তির নিন্দাসূচক গান।
{ এই গানগুলি, উঃপশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং বীরভূমের কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত }

তপড়াগালী[১] চেপ্টামুখী পান্তাখাকী তার সনে ॥
আস্তাকুঁড়ের সঁকড়িখাকী লো বসা গা তায় সেই খানে।
আমার ভাদুর সনে তোরা সমান করিস কেমনে ॥

৩০। ভাদু বিধুমুখী।
এস এস হৃদয়ে ধরে রাখি—।
বিদায়-কথা শুনে তোমার গো অবিরাম ঝরে আঁখি।
যেও না লো বিনয় করি আমাদের দিয়ে ফাঁকি।
তুমি মোদের প্রাণের আধার গো
তোমায় অধিক বলবো কি।
এলে বছর পরে থাক দু দিন
আমাদের করে সুখী।

৮। **বাঁধনা পরবের গান (অহীরা সংগীত)** *

(ক) **জাগরণী বা জাগান গীত** ॥

১। জাগো মা লছুমনি[১] জাগো মা ভগবতী
আজি ত অমাবস্যা রাতি
জাগেরা[২] প্রতিফল[৩] দিবে গো মহাদেবে
পাঁচপুতায় দশ বেন্ত গাই রে।

২। চাঁদমা[৪] উঠি গেল কুকুড়ামা[৫] ডাকি গেল
ধনি[৬] পুত্র তোহারিকা[৭] নিন্দ।
গঙ্গা গোহালে ভালা[৮] গায়[৯] মোর কান্দয়ে
উঠ পুত্র খুলত[১০] মযদান।

৩। জাড়ে শিশিরে ভালা অঙ্গ মোর ভিজয়ে
হামে নাহি খুনম[১১] আধারাতি।

---

১ চোয়াল ভাঙা, যার গাল বসে গেছে

* বাঁধনা পরবের এই গানগুলির ভাষা কুর্ম-ক্ষত্রিয় বা ভূমিজদের মাতৃভাষায় রচিত নয়। গানগুলির ভাষা খোট্টা বাংলা। উত্তর মানভূম এবং হাজারীবাগ সীমান্তের ভাষা। বাঁধনা পরবের এই গানগুলি মুখ্যতঃ উক্ত অঞ্চলে রচিত এবং সীমান্তবাঙলার অন্যান্য অঞ্চলে অপরিবর্তিতরূপে গৃহীত। অবশ্য একথা ঠিক যে এই গানগুলির সঙ্গে আঞ্চলিক বাঙলাভাষাও মিশ্রিত হয়েছে। তবু এই গানগুলির ভাষা প্রধানতঃ রক্ষণশীলতার বেড়াজালে আবদ্ধ।

১ লক্ষ্মিণী, লক্ষ্মী, ২ জাগরণের ৩ ফল, ৪ চন্দ্রমা, ৫ কুক্কুট (চাঁদ-মার সাদৃশ্যে কুকুড়মা) ৬ ধন্য, ৭ তোর, ৮ (আলংকারিক প্রয়োগ) ৯ গাই ১০ খুলেছে, ১১ খুলো না,

(খ) ডহরিয়া ॥[১]

১। ডুংবিকে ধাবিঁ ধাবিঁ ঝবনাফুল ফুটি গেল্
উঠি গেলাই তিতা পুঁটি মাছ।
সেহ তিতা পুঁটি মাছ ভউজী খাওলে গো
দেওবে তো খালেক দুধভাত।

২। চোদ্দসালেব আকালে লোক চলে সকালে
নাই যাব ধনিযা বেপাবে।
ধনিযাব বাসে নিন্দ নাহি আসে
পান-বিড়ি বহিল পকেটে।

॥ গ ॥ গোরু খেলানোর গান ॥

১। আবে অহিবে[২] —
আবে কেউ ত কাঁদে বালা জনমে জনমে গো
কেউ ত কাঁদে ছয় মাসবে।
মাযে ত কাঁদে বালা জনমে জনমে গো
বহিনা ত ছয মাসবে।
বর্হজিনা[৩] কাঁদযে নিশাভোব বাতি হো
আবে ছিও বে—
খুজে তুস্বা তযাবী বে।

২। কাহাব ঘব ভালা উঁচা উচা পিঁডা যে
কাহাব ঘববে গভীব।
কাহাব ঘব ভালা অতি চমৎকাব যে
সাবাবাতি জ্বলে মোমেব বাতি।
অহিবে—

গাইকা ঘব ভালা উঁচা উঁচা পিঁডা যে
মহিষাকা ঘব বে গভীব—
শিবধনী[৪] কা ঘব ভালা অতি চমৎকাব
বাবু হো—
সাবারাতি জ্বলে মোমেব বাতি।

১ মেঠো, ২ ঐ বে— ৩ বধূ, ৪ সুরধনী গাভী অথবা শিরধেনু। (শ্রেষ্ঠ ধেনু)

৩। অরুণ বনে কেবি তরুণ লতা হো
লগনে ভাগব জোতি[১]।
সেও জোতে বাঁধব কপিলাকা পুতা হো
হলিডলি[২] আওত[৩] মাতুয়াল[৪]।

৪। কাকব[৫] ববদা[৬] ভালা গুডা ক্ষেতে ঘুবই
কাকব ববদা ঘানি ঘুবে
কাবব ববদা ভালা সহবমব ছুটয়ে
স্ববগে পা তাগে ধুলি উডে।

চাষাকা ববদা ভালা গুডা ক্ষেতে ঘুবে
তেলিকাব দা ঘানি ঘুবে।
ব্যাপাবীকা ববদা ভালা সহবময ছুটয়ে
স্ববগে পাতাগে ধুলি উডে।

৫। কাকে ত সাজে ভালা হাতী বল ঘোডা হো
কাকেত সাজে পাকা পিঁডা।
কাকে ত সাজে ভালা উঁচা উঁচা পিঁডা হো
কাকে ত সাজে পাজি-পুথি।

বাজাকে সাজে ভালা হাতী বল ঘোডা হো
জমিদাবকে সাজে পাকা পিঁডা।
মণ্ডলকে সাজে ভালা উঁচা উঁচা পিঁডা হো
বামহনকে সাজে পাজি-পুঁথি।

৬। কোন্ ফুলেবে অহিবা[৭] উডন পিঁবন হো
কোন্ ফুলে ঘষণ মাজন
কোন্ ফুলে বে ঐবা খোঁপাবাই চিবন হো
কোন্ ফুলে বাখিল সংসাব।

কাপা[৮] ফুলেবে অহিবা[৭] উডন পিঁবন হো
সর্ষা ফুলে ঘষণ মাজন।

১ দড়ি, ২ হেলেদুলে, ৩ আসছে, ৪ মাতাল, ৫ কাব, ৬ বলদ।
৭ আহীর (?) ৮ কার্পাস

কিয়া ফুলে বে ঐরা খোঁপাবী চিকন হো
ধানফুলে রাখিল সংসার।

৭। অহি রে—
কুলি কুলি যাতে ছিলি নাচিয়ে খেলিযে
তোরি গিবিহায় ডাকিয়া ঘুরাল।
তোরি যে ঘরে আছে পাঁচমুড[১] লছুমন[২]
তাহাকে জাগাই মোবা যাব।

৮। অতদিনে যে চরালি বরদা কচায-বন-খুঁদিয়ে[৩]
বাটে-চুয়াডে দেত গালি।
চারিপাযে ঝাঁকবে[৪] জড়া[৫] শিং এ মারবে
বাখি দিঅ বাগালেবি নাম।

৯। ভালা অহিরে—
কোনে কা পুতা ভালা শিশু বালক গো
কোনে কা পুতারে ডামাল,
আব,—কোনে কা পুতা ভালা
অতি বলবান গো
বগডি ধবত ধেনু গাই বে।

ভালা অহিরে—
আরে, কপিলাকা পুতা ভালা শিশু বালক গো
মহিষাকা পুতারে ডামাল।
আর —বাঘেকা পুতা ভালা অতি বলীযান গো
বগডি ধবত ধেনু গাইবে।

১০। কোনে ত চাঁছয়ে কোনে ত ছুলযে
কোনে ত গাডে মালথাম বে—
আর, কোনে কা পুতা বেঁধে কর নানা রঙ্গ গো—
কোনে ত হল ধূলাময় রে।

ঈশ্বরে চাঁছয়ে মহাদেবে ছুলয়ে
মানবী-এ গাডে মালথাম রে।

---

১ পাঁচমাথা অর্থাৎ পাঁচটি, ২ লক্ষ্মী, ৩ মাঠে-বনে-গুহায়, ৪ চেপে ধরবে ৫ জোড়া

আব কপিলাকা পুতা বেঁধে
কবি নানা বঙ্গ গো
স্ববগে পাতালে ধুলা উড়ে।

৯। টুসু গান॥

(ক) টুসু গানের রং বা ধুয়া :

১। ও সই দলে দলে
মেয়েবা সব যাচ্ছে গো যমুনাব জলে।

২। বল ভালোবাসা
যেন চকবাজাবে হয দেখা।

৩। বুঢাব ঠকবা গালে
জড়া[১] ঢেঁকি পড়ছে গো তালে তালে।

৪। জড়া পানেব খিলি
এত খন তুই কাব মুখেতে ভবা ছিলি

৫। সাবী সাবাশ করি—
তোব বুকেতে কুটবো লো চিড়াব ঢেকি।

৬। টুসু গাগবা কাঁখে
যমুনাব জল উঠছে লো ঝাঁকে ঝাঁকে।

৭। ও তোব মুখেব চাটি
এক চাপড়ে উড়াব তোব দাঁত-পাটি।

৮। জামা-জাকিট ভালো
ঐ ছুকরীটি কাব তবে গবভ[২] কবে।

৯। ওবে কালো মেঢা
লঢাই দিতে কই আইলি আমাব পাড়া।

১০। ধন্য বে কাগজেব মান্যমান
তোকে কে দিলবে বুদ্ধিমান।

১১। টুসুর ভাসানেতে—
চাল ভাজা আব কুরথি ভাজা ভোগ দিতে
চল ভাসানেতে।

---

১ জোড়া, ২ গর্ব।

১২। সাজা মটর গাড়ী
টুসু ধনকে আনবো লো তাড়াতাড়ি।

(খ) টুসু গান ॥

১। বড় বনের লতাপাতা ছোট বনের বাতা গো।
কোন বনে হেরালে[১] টুসু সনা[২] বাঁধা ছাতা গো ॥
২। রাম গেছে মা সিনান করতে আমরা যাব ডুব দিতে।
দে মা হল্দি দে মা জলদি রাম কোন ঘাট সিনাছে[৩] ॥
৩ আমার টুসু মুড়ি ভাজে উপর কোঠার দলানে।
গরীব টুসু গরভা-খাওকী[৪] আচল পেতে লেয় মেগে ॥
৪। আমার টুসু খেলা করে খেল কদমের তলে।
ডাকলে টুসু ঘর আসেনা কাজ কাররার ভয়ে ॥
৫। টুসু নাকি দখিন যাবে ক্ষুধা লাগলে খাবে কি।
আন টুসু গায়ের গামছা ঘিয়ের মিঠাই বেঁধে দি ॥
৬। গাড়ী আইল গুড়গুড়ায়ে দেখলো টুসু বাহরা এঁ[৫]।
সখের গাড়ী চলে গেল জোড়া বিগুল বাজায়ে ॥
৭। বাড়ীর নীচে গুইহা বাবলা কেটে করব ঘন্গাড়ী।
ঐ গাড়ীতে চলে যাব টুসু ধনের ঘর বাড়ী ॥
৮। এক সড়পে দু সড়পে তিন সড়পে লোক চলে।
আমার টুসু মধ্যে চলে বিন বাতাসে গা ডলে
৯। পুরুলিযাতে দেখে আইলম ডালায় ডালায় ডুবরালা।
আমার টুসুর নাইরে ছেল্যা কাকে দিব ডুবরালা ॥
১০। ওমা আমি ফুল পাতার পাহাড় বাবের সরলাকে।
হেলে দুলে আসছে সরলা টুসুর মাথায় ফুল দিতে ॥
১১। ঐ টুসুটি গড়েছে গো লাবানগড়ের মিস্তিরি।
মিস্তিরিকে ইনাম দিব কাঁইচিকাটা পান খিলি ॥
১২। টুসুর চালে লাউ ফলেছে লাউ তুলেছে বাগালে।
অরে বাগাল ধরা যাবি বড় বাবুর মহালে ॥
১৩। গেলি গেলি গেলি বাগাল গোল অনেক ধূর[৬] রে—।

১ হারালে, ২ সোনা, ৩ স্নান করছে ৪ গর্ভ-খাকী, ৫ বেরিয়ে, ৬ দূর।

মনে করে আনবি বাগাল লাল শালুকের ফুল রে ॥
১৪ তোদের ঘরে টুসু আছে তাই করি আনাগোনা।
যখন টুসু চলে যাবে করবি গো দুয়ার মানা ॥
১৫। লালশালুকের ফুলে বাগাল বড বান ভরার রে।
হেলে ফুলে জল ডুবাব মাথায় তুলে লিবরে ॥
১৬। ঘাস কাটতে গেলি ছুঁড়ি দা হারাই আলি লো।
বুঢ়া ভাতার দেখে ছুঁড়ি ছুটো্য পালাইলি লো ॥
১৭। পাহাড়কে যে উঠলে টুসু জমি জরিপ করিতে।
হাতে দুহাত কানে কলম লো টুসুর মাকে সাজেছে ॥
১৮ মেদিনীপুরে দেখে আইলম তিনটি টুসু চলেছে।
মাঝার টুসুর কাকাল সরু কাঁটার জুড়া[১] বাঁধেছে ॥
১৯। তলে পাটা উপরে পাটা তায় বসেছে দারোগা।
রাস্তা ছাড রাস্তা ছাড টুসু যাবেন কলকাতা ॥
২০ ভায়ে বলে বহিন আনব ভাউজে বলে কি দিব।
খড়িকাকুঁচি পাড়ের শাড়ী বহিনকে বিদায় করব ॥
২১। টুসুর চালে ফুল ফুটেছে ফুটেছে কাল কলি।
হাত বাড়ালে তুলে আনবো দে জোডা পানের খিলি ॥
২২ কালী দেখে নাগলম জলে জল হইল মোর একগলা।
কে আছ মোর প্রাণের বঁধু তুলে নব এত বেলা ॥
২৩। আঁধার ঘরে ছচ[২] গুলেছি ভাইসুর[৩] বল জানি না—।
ও ভাইসুর তোর পায়ে পড়ি পায়ে গোল করো না ॥
২৪। উপর দিকের হুডহুডানি নামো দিকের ফেনালো।
ওই ফেনাতে ভেসে যাবে টুসুর কানের সোনা লো ॥
২৫ মেদিনপুরে দেখে আইলম কাপা লড়াই লেগেছে।
দুই ধারে দুই শিপাই পড়েছে রক্তে[৪] বাণ বহেছে ॥
২৬ মাছ কাটলম চেকা চেকা (ওলো) জামির কাটলম দু চেকা
বাছে বাছে কাটবি কলা লো কাল যাব শ্বশুরবাড়ী।
২৭। বাড়ী নামর কুল গাছটা কুল ভদ্ ভদ করে।
শেষ রাইতে কোকিল ডাকে গো, টুসুর মন ভুলাতে ॥

১ খোঁপা, ২ ছাঁচ (মেটে ঘরে ন্যাতা দেবার গোবর-জল/ছোয়াচ) ৩ ভাশুর, ৪ রক্তে

২৮। ওরে ওরে কালো ছোকরা তুই তো পিরিত বাঢালি।
স্বরগের চাঁদ হাতে দিয়ে গো পথে বসাই কাঁদালি ॥

২৯। আঁধার ঘরের কালো শাড়ী জোসনা রাইতে পইরো না।
হামদের টুসু বাজার বুলে গো চোর বলে কেউ মাইরো না ॥

৩০। ওলো ওলো কালো ছকরী তোর ঘরে চোর সামাইল[১]।
চোরের মাথায় বাঁকা নথা গো সিঁদ কেটে চোর পালাইল ॥

৩১। তিনটি টুসু জলকে যায় গো কোন টুসুটা ভালো গো।
মহদের টুসু চন্দনা জলে আখি ঠারে লো ॥

৩২। জল জল যে কর টুসু জলে ডুবার কে আছে।
মনেতে ভাবিয়ে দেখ চলে শ্বশুর ঘর সে ছে ॥

৩৩। সড়প বাবে ঘর, করে'ও নাবরেন তেলের অভাব কি।
ভালো করে সিঁথা কাটবে সে কপালে সুবা[২] আয়েছি ॥

৩৪। জড়া জড়া পানের খিলি জাহাজ কাটা সুপারী।
আজকার মত গাও প্রাণনাথে এলাচ দিতে ভুলেছি ॥

৩৫। হামদের টুসুর একটি ছাইলা[৩] কুইল[৪] তবে বই খেলে নাই।
কোন্ সতীনে বুলা দিল লো, বুলার চিন[৫] ত গেল নাই ॥

৩৬। চল টুসু চল খেলতে যাব কুলিমুড়ার বটতলা।
ফিরবার সময় দেখাই দিব লো, পলাশপাতে জল তোলা ॥

৩৭ উপর বাঁধ ভাঙ্গে গেল নাবো বাঁধে ঢেউ উঠে
বাবাও বাবাও গায়ের মেয়ে লেতে জড়া পদ্ম যায় ভাসে ॥

৩৮। ওরে ওরে বাড়া বাগাল তোর বাড়ে আগুন আছে।
আমার কাছে ছকা কলকা বে তামুক খাবার মন আছে ॥

৩৯। বেলা উঠে রাত ফিরিতে পৃথবী আলো করে।
এমনি আলো করবে টুসু এ খেলা কদম তলে।

৪০। শিকড় বাকড় কত খাবো, কত খাবো চিনির জল।
হে ভগবান এই করালে হে কত যায় বাগেশ্বর ॥

৪১। কদম গাছে উঠলে টুসু কাচা কদম ভাঙিও না।
পাকলে কদম সবাই খাবে, কারেও বারণ করবো না ॥

১ ঢুকলো, ২ সিঁদুর। ৩ ছেলে, ৪ কুল, ৫ চিহ্ন,

৪২। টুসুব মাগো টুসুব মাগো কি তবকারী বাঁধেছ।
ঐ সতীনেব বাড়ীব বাইগন বড বাঁধেব গুগলী ॥

৪৩। ওবে ওবে কলমী লতা জল বিনে কি ডগ মেলে।
চিবদিনেব ভালোবাসা আজ কেনে জবাব দিলে ॥

৪৪। সডপ ধাবে ঘব কবেছি তায় বেখেছি ঝবকা।
আসবে-যাবে তামুক খাবে বোহিনী গাঁযেব ছোকবাবা ॥

৪৫। আচিবেব ধান পাচিবেব ধান যে ধান খায় হাঁসে লো।
হাঁস বাগালে হাস ফিবায না কিয়া ফুলেব বাসে লো ॥

৩৬। ওবে ওবে কালো ছোববা তোব সংগে কি হাট যাব।
পাডাব লোকে জিগাস কবলে কি বলে জবাব দিব ॥

৪৭। ওলো ছডি ওলো ছডি তোব গীতেব নাই আগাগোডা।
আন লো ছডি কাগজ কলম লো লিখে দিব সাত জোডা।

৪৮। কাল্লা[১] কাটলম চাকা চাকা হাতেব তিত গেল না।
কাল্লা ফুলকে দেখা পালে লো ধববো জুঁটে[২] ছাডবো না ॥

৪৯। টুসুব আমাব জ্বব হঁয়েছে পড্যে আছে একপাশে।
নডে না চডে না টুসু নীলবৰণ ধুযাঁ উঠে ॥

৫০। আযনা দিতে বাযনা দিলাম তবু আযনা পেলাম না।
সখেব আয়না সখেব চিরুণ মুখ দেখিতে পেলাম না ॥

৫১। কাক ডাকে কোকিল ডাকে আব ডাকে ঘুঘু সে।
দিশা হাবা জোডা পাযবা ঘুবিছে পাশে পাশে।
কোযেব গুডুব তিতিব মযুব ভীড কবে এসে এসে
বাব বাজায জোডা মানিক ঝবণায জল খাতে বসে।
প্রেম শিকাবী আটা বসে বারুদগুলি তায ধাসে
শববিঁধা হবিণীব মত জব জব হয শেষে।
জুলুস দিয়া[৩] নযনা টিয়া বাধাকৃষ্ণেব নাম ঘোষে।
টুসুব গানে বিষ্ণু ভণে লেগেছে প্রণয় ফাঁসে
(সাধে মধুব মিলনেব আশে—
সে তো শুকসাবী ডালে বসে। ঘোষা)[৪]

---

১ করলা, ২ জটায়, চুলে ৩ জৌলুসযুক্ত ৪ এ ধরণের ভনিতাযুক্ত টুসুর গান সাধারণতঃ ব্যতিক্রম।

৫২। লাল পাখিটি ধরে দে আমায়—
আমি আছি গো পাখির আশায়—।
থাকে গো নিরলে পাখি কথা বলে ইশারায়,
বলগো সখী এমন পাখি গড়েছে কোন্ বিধাতায়।
অপরূপ মাধুরী পাখী আমার নয়নে দেখায়—
(তবু) মন-হরা দেয় না ধরা আসলে গেলে উড়ে যায়।
কোন বাসাতে থাকে পাখি বলগো পাখি—
কি বা খায়—
বিষ্ণু ভণে দিব কিনে যদি হাজার টাকা চায়।

৫৩। টুসু বলি তোমায়—
কেমন করে দিব গো বিদায়।
দয়া করে টুসুমণি গো—এলে কত সাধনায়,
আজ সকালে যাচ্ছ চলে ফেলিয়ে বিষম মায়ায়।
সুখে থেক টুসুমণি গো ভুলনা আমা সবায়—
বার মাসের পরে টুসু, ফিরে এস পুনরায়—
(তবে হই বিদায়)
সুখসাগরের টুসুমনি গো সুখ সলিলে ভেসে যায়
টুসুমণির খেলার সাথী কাঁদছে নদীর কিনারায়।
(তবে হই বিদায়)।[১]

১০। বিবাহ সংগীত ॥

(ক) বিবাহের নিমন্ত্রণ-গীতি ॥

১। বিয়া বিয়া করি হামদের করে হবে বিয়া গো।
ররের মামা ঘরে না পাইল পান গুয়া গো ॥

২। পাত মুড়া মুড়া বলি পাত মুড়া মুড়া।
কৈ আসছে বরের বাপ চাঁদলা-মুড়া[২] ॥

৩। বিয়া বিয়া করি হামদের করে হবে বিয়া গো।
কনইয়ার মামা-ঘরে না পাইল পান-গুয়া গো ॥

১ রচয়িতা—৺ মনোমোহন সিংহ দেব ২ টেকো মাথা,

(খ) বিবাহ-প্রারম্ভিকা সংগীত ॥

১। ই ভবেব বাজাবে হ ভবেব বাজাবে—
বাজাহে বিক্রি বড হছে।
ও বিক্রি বড হছে।
কি লিবে লাও আসে,
বালাহে বাজাব ভাঙ্গ্যে যাছে।

২। সাহ[১] ম্যাব বাখিও বাজা সুগা[২] মাব্যে বাখিও
আবালেব[৩] পব ভু আসবেক বাণী গো—
তুমি গুহা[৪] গাঁথে বাখিও।

৩। সাদি শালুকেব ফুল সাদ শালুকেব ফুল
বাজাহে ফুটে অনেক বাতে।
যাব সঙ্গে যাব দেখা নাই বালাহে
দেখা হবেক আজেব বাতে।

(গ) গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের গান ॥

১। বনেব গুরুলা[৫] গুরুলে[৬] বুলে
আজ বড শুভ বেলা কুড[৭] হলুদ চডে।

২। উডলি ভমবা বসলি আগুডালে।
পঙ্কফুলেব মধু খায়ে না ফিবাল ঘবে ॥

৩। ভমবা বে ভমবা ও কালো ভমবা।
যাব ঘবে সিঁদুব কাজল তাব ঘবে বিয়া ॥

৪। মাঘ-ফাগুন মাসে ঝলা[৮] বড বহে হে।
কি মাখাবে হলুদ তেল গাহ[৯] বড জ্বলে হে ॥

(ঘ) কন্যাকে বেশ ভুষা করানোর গান ॥

১। কাজল মাখাও বাণীকে অতি যতনে।
চন্দন মাখাও বাণীকে অতি যতনে।
এমন সাজান সাজাও বাণীকে কিষ্টেব মিলনে।

১ সারী, ২ শুক, ৩ শিশু, ৪ মালা, ৫ এক প্রকাব পাখি, ৬ গুর গুর করে, ৭ কুণ্ড ৮ রোদের ঝাঁজ ৯ গা

২। সিঁদুবেব টম্‌মম্‌ বাণীকে সাজোছে।
কাজলেব টম্‌মম্‌ বাজাকে সাজোছে ॥

৩। আমাদেব দুযাবে মা বন দুলেব গাছ।
সেই দেখে বেবি ছেলা[1] খুঁজে বিছানা ॥

৪। আমাদেব দুযাবে মা চিল ডাকিবে[2] ॥
চিল লয় শকুন লয বেবি ডাটবে ॥

(৬) বিবাহ-কালীন গান ॥

১। এই না বযসে ছেডেছে উদাস
মা জননী অভাগিনী কেঁদে আকুল হচ্ছে।

২। ববেব মাকে বগা শহব ঘোডাবে।
সাবেব বাণা আমবো নগব ঘোডাবে ॥

৩। ইঁচা কাঁবি ববিও মবনা ছাতা। চাঁদমুখে বোদ লাগে।
তুলে ধব ছাতা।
বাণীব লোকে বলে বব লস্কব আসে।
আস্তক লস্কব বসাইব লাছে[3]
আব সে লস্কব বুঝাইব ফুটকিবি মদে ॥

৪। এই রূপেব মাতলী গলে গাথ্যে লিব।
বামসীতাব মিলন কবে যমুনায ভাসাব ॥

৫। বাণীব ববণ পাকা আমেব পাবা।
তাব ভিতবে মধু আছে ভমবা-গুঞ্জবা
দূবে যে বাজিছে নানা বংযেব বাজনা।
তাই শুনে মোদেব বাণী ডব-ডবাছে ॥
ডব না কর বাণী ভয না কব—
ও বাণী ভয না কব।

৬। বাঁশ লয বাঁশুবী লয তবল গাছেব ধ্বজা
বিনি ফুঁকে বাজে বাঁশী বলে বাধা বাধা ॥
শাওডা গাছে স্তাব গেছ তুমাম বড সাজে।
বিনি ফুঁকে বাজে বাঁশী বলে বাধা বাধা ॥
বাজা একবাব বাজাও বাঁশী আমবা কানে শুনি।

১ জারজা (আদবার্থে) ২ ডাকে (কান্নার মতো শব্দ) ৩ সদর দরজাব রাস্তা

৭। দিন দুপহর বেলা রাজা হে তুমি ধরা দিলে কেনে
আঁগিনায় আল্‌পনা দেখে রাণীর হাতে।

৮। রাণীর হাতে সরুশাখা রাজার হাতে থালা।
কি খেল না খেলছ রাজা তুমার বাগিচা আলা[1] ॥

৯। ঘুঁটা বুড়া[2] মাঠে মাঠে সে বরং ভালো।
শ্বশুর ঘরে কাজ করে সোনার অঙ্গ কালো ॥

১০। কেনে রাজা তোর এত খাতি।
নিশীথ রাতে হবেক গলাগলি।

(চ) বিবাহের সময় তিরস্কার সংগীত ॥

১। ধান শিস্‌টির পারা রাজা বাড়িল।
এত দিনে রাজার বাবার চেতন বসিল।

২। তোকে যে লো দেখেছিলি সাত ভায়ের বহিন—।
সাত মায়ের সাত ঝিরা লো তোর তেল মাখা বাটি ॥

৩। তোকে সে হে দেখেছিলি শুয়র বাগালী।
শুয়র তুয়র ছাড়্যে ধরা বর সাজে আলি।

৪। তোকে যে লো দেখেছিলি ছাগল বাগালা।
ছাগল ঢাগল ছাড়্যে বেবি বনহয়্যা সাজে আলি।

৫। কুলি কুলি আলি বেবি কুলিবর সানাগা।
কুলু ঘরের খইল খাঁয়্যে বেবি
মোটাই বাহিবালি।

৬। হাসলী যদি পালি নাইত বলিস্ নাই কেনে।
তোর বাপ পদ্দারের সঙ্গে চুক্তি করে নাই কেনে।
বালা হতো নাই কেনে।

(ছ) বিদায় সংগীত ॥

১। সাজ সাজ বলি রাজাহে
তুমি কত না সাজিছ।
দশ কুটুমের চরণ ধরে তুমি
বিদায় মাগিছ।

---

১ আলো, ২ ঘুটে কুড়ানো।

২। বাজার হাতে ফুলের সাজি বাজা হে।—
সে ফুল হইল বাসি।
তোমায় বিদায় দিয়ে আসি।

৩। বাজা যাচ্ছেন বনে বনে শাল পিয়ালের বনে
মাযের দুলালী বেটী বাজাহে—
তুমি চলবে সুযে সুযে।

৪। তুমি ত যাচ্ছ বাজা দেশ বুলিতে
মনে ত কববে বাজা মাযের বাপের দেশ।
মায-বাপের দেশ বাজা কিছুই ভালো লাগে
শ্বশুরের দেশ বাজা মধুর দেশ।

৫। পুবরে না যাইও পশ্চিমে না যাইও
না যাইও মালংগা দেশ।
মালংগা দেশে বাজা ডাহিনী যুগিনী গো
কোন ডাহিন বাখিবে ভুলায়ে

সাঁওতালী লোক-সংগীত

১। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের গান :—সুর : বাড়্-বির।

বুর বুরুলাং পারমকেদা গেলবার বুরুলাং পারমকেদা
উকুর মাইবি চেংএম চিকালেং
হড়ম্ মাইবি জালি গেতাম বড়ামতাই নালি গেতাম
বাংঘানদ বুক পদামবে সববনখা
দাঃ লেকা লাং সকচকেনা।

২। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসের গান :—সুর : বাড়্-হেডহেৎ

ইযাদ চাঁদম্ সিবজা বিদাঞ আবসিলেকা বাবসিংলেকা
সুনাঃ চুকদম গিতি আদিঞা।
হয়দ দাবায হালায় হালায ইঞবেন জুবি থেকা বেনচং
ইঞাঃ সিতী পে কানদ
সুনাঃ চুক্দ অকাবিঞ দহযা।

৩। আশ্বিন মাসের গান :—সুর : বাড়্—দাঁসায়।

হায়রে গুরিচ সাদেরে গুরুহ হন্‌ৎইঞ রহয়'লেং
গুরুহ বুয়াং ইঞ রেনতি লেং গুরুহ দিশনইঞ দাঁড়ালেং।
গুরুহ দিশাবেদহ গুরুহ চেৎদ ইয়ামঃ হ
গুরুহ দিশাবেদহ গুরুহ চেৎদ গাঁঃহ
গুরুহ দিশাবেদহ গুরুহ সুগমে। সিন্দুরহ
গুরুহ দিশাবেদহ গুরুহ আয়নমে কাজল্‌দ।

৪। কার্তিক অগ্রহায়ণের গান :—সুর : বাড়্-সহরায়।

পাঞ্চেৎনুক চেদানরে দ পাপনতে তেলাং চুড়ুর আন
চেদাঃ নাই বি মেৎদাঃ জরং কাম্‌
দিশাবেদাঞ গয় গড়া দিশাবেদাঞকাড়া
সাদম্‌ চেতান রলের তিরিঞ দিশায়ে কানা।

৫। মাঘ ফাল্‌গুনের গান : – সুর : বাড়্ : বাপ্‌লা।

আম্‌নাক নাহু আম্‌ বাহাঞরেরেদ
অরযতাং এল্‌তে বাহাঞরেরেদ্‌
বাহু হচ্‌ভাক বাং চং দহরে
বাহা রেরেদ দরে আলম বাগি।

৬। যে কোন পর্ব-পাবনের গান : সুর : বাড়্-পাতা।

নাহা। পুগ্‌রেন অলঃরড়া
মচাতের রড়া কাথা সিরিলগে
রড়ায় সারংগে সিত্ত বাঙে অঃ
এন্‌রেহ দহ ঘংঘান বাং চয় দহমে।

৭। নৃত্যরত যুবক যুবতীদের সম্মিলিত গান : সুর : বাড়্-লাঁগড়ে

হাড়াং হাড়াং নিম হাড়াং
হাড়াং হাড়াং হিরম্‌ হাড়াং।
নিম হাড়াং সাহায়া।
হিরম্‌ হাড়াং বাং সাহায়া

(অনুবাদ—গ্রন্থ মধ্যে দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থপঞ্জী

বাঙ্‌লা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা	ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য	ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ভাষার ইতিবৃত্ত	ডক্টর সুকুমার সেন
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)	ডক্টর সুকুমার সেন
বাংলা সাহিত্যের কথা	ঐ
মনসা বিজয়। (বিপ্রদাস)	ঐ সম্পাদিত
বাঙ্গালীর ইতিহাস	ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি	বিনয় ঘোষ
বাংলার ব্রত	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাংলার লোকসাহিত্য	ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য
নবীন ও প্রাচীন	নির্মলকুমার বসু
ভারতের সংস্কৃতি	ক্ষিতিমোহন সেন
হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ	ঐ
পুজা পার্বণ	যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
ধর্ম মঙ্গল	মাণিক গাঙ্গুলী, ময়ূরভট্ট
বাংলার স্ত্রী-আচার	ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী
বাংলার লোকশ্রুতি	ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য
Cultural Anthropology and other essays	Nirmal K. Bose
Religion and Folk-lore of Northern India :	William Crooke (Oxford University Press—1926)
Encyclopaedia Mundarica (Edited)	Hoffmann & Emelen (Govt. Printing, Bihar & Orissa—1936)
Encyclopaedia of Ethics and Religion (12 vol.)	James Hastings (Edi.), Edinburgh 1921
The Mundas and their Country :	S. C. Roy (Thacker Spink, 1912)
The Oraons of Chhotanagpur	S. C. Roy (Ranchi 1915)

Descriptive Ethnology of Bengal :	E. T. Dalton (Govt. Prnting, Calcutta 1872)
The Standard Dictionary of Folk-lore, Mythology and Legend (2 vol.)	Edited by Maria Leach (Funkwegnalls, N. Y. 1945)
The Folk dances of Bengal :	G. S. Dutta (1954)
Folk-lore of Santhal Parganas :	H. C. Bompus (D. Nutt, London, 1909)
Tribes and Castes of Bengal (2 vol.)	H. H. Risley Govt. of Bengal, Calcutta, 1891
A Statistical Account of Bengal :	Hunter (W.W.) Trubner, London, 1875
A Handbook of Folk-lore :	C. S. Burne (Sd.) Sidgwick & Jackson, London, 1914
Les Hindous (Vol. I) ·	F B. Solvyns (Paris, Cher L'anterir— 1808-12)

District Gazetteers and Handbooks of various districts of Bengal, Bihar and Orissa.

Census, West Bengal—(A. Mitra, I C. S.) published in 1963.

শব্দ-সূচী

শুদ্ধিপত্র

সাঁওতালী লোকসংগীত

	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
১।	কডামতাই	—	কডামতওয়া
	বাংঘান্দ	—	বাংখানদ
	পদাম্বে	—	পাবমবে
	সকচকেনা	—	সকচকেমা
২।	ইয়াদ	—	ইএদ
	সিবজা	—	সিবজাও
	গিতি	—	গিডি
	থেকাবেন্চং	—	অকাবেচং
	সিতী পে কান্দ	—	ছাতি থডেঘঃ কানদ
৩।	সাদেবে	—	মাদেবে
	বেনতি	—	বেনাও
	দিশনইএ	—	দিশম ইএ
	দিশমদেহ	—	দিশমবেদহ
৪।	আন	—	আবান
	জবংকাম	—	জবঃবান
	দিশাবেদাএ কাডা	—	দিশায়ে দাএ কাডাগডা
৫।	আমনাক	—	আমমাক
	অকযংতাং এলতে	—	অকয়বাং ইয়ঁল্তে
	ভাক	—	ডাক
	দহবে	—	দহয়ে
	সবিলগে	—	সিবিলগে
	বাঙে অঃ	—	বাডে জঃ
	এন্বেই দহ ঘংঘান	—	এনবেইঁ দহ জঘান্
	সাহায়া	—	সাহাঃআ

১৩২ পৃষ্ঠা—পঞ্চম অনুচ্ছেদ—দ্বিতীয় চরণ

(অশুদ্ধ) মধুভাষা—সাধুভাষা (শুদ্ধ)